

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইসেন্স
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৩

মুদ্রক : শ্রীমিহিরকুমার মুনোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৪

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
প্রদ্যাক্ষদেয়

নিবেদন

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস আছে। বাংলা সাহিত্যেরও ইতিহাস আছে। প্রতিভাশালী, দীপ্তবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিতবর্গ পৃথক পৃথক ভাবে এই দুই সাহিত্যের ইতিহাস বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় সাহিত্যের যোগসূত্র কি, কিভাবে প্রাচীন সাহিত্যের ভাবধারা যুগবাহিত হইয়া বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে— ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা থাকিলেও ধারাবাহিক ভাবে তাহা দেখাইবার চেষ্টা ইহার পূর্বে করা হয় নাই। ‘প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার’ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এই যোগসূত্র নির্ণয়ের প্রথম চেষ্টা। ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহারই পটভূমিকায় আসিয়াছে বাংলা সাহিত্যের বিচার ও আলোচনা। পটভূমি প্রাচীন সাহিত্য, আলো তাহারই, —সেই আলোকেই এই গ্রন্থে বাঙালীর উত্তরাধিকারের সমীক্ষা। ইহাকে একদিক হইতে তুলনামূলক সাহিত্যালোচনাও বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলিতে আমি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্ধভাষ্য গ্রন্থিত সাহিত্যসম্ভারকেই বুঝিয়াছি। অর্থাৎ ইহা বৈদিক, সংস্কৃত, মিশ্রসংস্কৃত, (বোধিসংস্কৃত), পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট ভাষার সাহিত্য। এই সাহিত্য সর্ব ভারতীয় যে-কোন নব্যভাষা-সাহিত্যের সাধারণ সম্পদও আদি উৎস—ইহা আমাদের পিতৃ-পিতামহের মহামূল্য দায়ভাগ। আমাদের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্য-চিন্তায় ইহার প্রভাব সহজ নিবাসের মত সঞ্চারিত। যুগের আবর্তনে নব্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ভাবধারার সংস্পর্শে আসিলেও ইহার মূলে স্থায়ীভাবের মত ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে প্রাচীন সাহিত্য। বাংলাদেশের ঐতিহ্যেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আছে দুইটি সংস্কৃতির সুস্পষ্ট মিশ্রণ—একটি প্রাগাধ লৌকিক সংস্কৃতি, অপরটি আর্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য বিকাশের ধারায় আর্ধসংস্কৃতিতে আসিয়া ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়াছে আর্ধের উপাদান। বৈদিক যুগেই এই মিশ্রণের লক্ষণ অতি স্পষ্ট। দর্শনে ও পুরাণে এই মিশ্রণ একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত রূপে প্রতিষ্ঠিত। তবে দেখা যায় মিশ্রণের বিপরীত রূপ : উহাতে আদিমতম সংস্কৃতির উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছে আর্ধ সংস্কারের প্রভাব। বাংলাদেশের ধর্মে ও সাহিত্যে মিশ্রণের এই বিপরীত রীতিই অসুস্থ হইয়াছে।

বাংলাদেশ বহুদিন প্রাগাধ আতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এদেশ পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ-রাঢ় পুলিন্দ-শবরাধির আদি ভূমি। এই সূত্রে বাংলার ধর্ম-কর্ম-সাহিত্যের মূলে প্রতিষ্ঠিত লৌকিক সংস্কার। ঐতিহাসিক সমাজের প্রভাব এদেশের মর্ম-মূল প্রসারিত; ঐতিহ্যবাহীকে

কেবল করিয়া আর-বাংলার আনাচে-কানাচে বৃত্তীনা, রক্ষিণী, বিবিধ চণ্ডীদেবী, মা-মন্সা, বসী ও শীতলার হান বা থান। বাংলা বঙ্গলকাব্যের বিবন্ধনা অংশে এই মৌলিক সংস্কারের পূর্ণ পরিচয় বিদ্যমান। বাংলার অধিকাংশ দেব-দেবতাও মৌলিক। বরদামাই ভিখারী শিব, কোপন চণ্ডী, গোয়ার গোবিন্দ মহাদানী কাহ প্রভৃতি লোকজনদেরই চরিত্র। বৃক প্রস্তর ও জীব-জন্তুতে দেবতা-কল্পনার ভাবটিও মৌলিক। বাংলা কাব্যের জাতকর্ম, জ্ঞানপ্রাপন ও বিবাহে ব্রীষাচার্য্যদিগের বর্ণনাতেও মৌলিক সংস্কারের প্রাধান্য। এই মৌলিক সংস্কার একদিন জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অনীত্ব হইয়া বাঙালীর সংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট রূপে রূপায়িত করিয়াছিল। বাঙালীর ব্রত-পার্বণে কঠোর কল্ক সাধনা ও দেবতার নামে 'হত্যা' দেওয়া জৈন প্রভাবের ফল; বাংলার রথযাত্রার, স্নানযাত্রার ও কতিপয় দেব-দেবতার বৌদ্ধ প্রভাবও রহিয়াছে। এই সকল মৌলিক ভাবের উপর আর্ব-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব-প্রতিষ্ঠাটাই বাংলার ধর্ম ও সাহিত্য বিকাশের মূলস্রোত। অন্ততঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এ উক্তি ঐতিহাসিক সত্য।

যে-কোন দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রভাব-গ্রহণের পদ্ধতি লক্ষ্যীয় : একটি গতানুগতিক পথে পুরাতনের ভাব গ্রহণ, অপরটি সময়স্বয়ের পথে আত্মীকরণ। দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রভাব-গ্রহণেই মৌলিকতা অধিক। অপর সাহিত্যের কতকগুলি ঘটনা বা চরিত্র বা রূপক গ্রহণ করিয়া এক প্রকারে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করা বাইতে পারে; তাহাকে বলা যায় অনুবাদ বা অনুকরণ। তাহাতে মৌলিক প্রতিভা-বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় না; সকারী ভাবের মত তাহা কবির সৃষ্টিকে মুহূর্তের জন্য অনুরঞ্জিত করে মাত্র। কিন্তু একটি বহিরাগত ভাব যখন স্রষ্টার মর্মস্থান অধিকার করিয়া কবির রচনা-ভাবনাকে অন্তর হইতে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে কবির সৃষ্টি স্বতঃ প্রকৃত ফলের মত প্রস্ফুটিত হয়, তখন সেই প্রভাব হারী ভাবের মর্মান্বায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে নবাগত ভাবের স্পর্শে স্রষ্টার 'অপূর্ববস্তনির্মণিকা' প্রকার নব নব প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে। প্রতিভাবান কবি-চিন্তে এই ধরনের প্রভাবই পূতসকারী ও মার্শক।

আলোচ্য গ্রন্থে এই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর উত্তরাধিকার বিচারিত হইয়াছে। এই বিচারে দেখা গিয়াছে, বাঙালীর মানস-চিন্তায় প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব কোনক্রমেই অল্প নয়। বৌদ্ধ চর্চাগান হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পুরাতনের স্রুৎ প্রচুর—কোথাও ইহা অনুদিত, কোথাও বা স্বীকৃত ও স্রীকৃত। বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে, বঙ্গলকাব্যে পর্বাবলী সাহিত্যে বৈষ্ণব-পুরাণ-ভক্ত-বর্ণন-মহাকাব্যের ভাব বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত। বাংলার বঙ্গলকাব্য পুরাণের আদর্শে একেশ্বর জাতীয়

পুরাণ ; বাংলার অল্পবাহ সাহিত্য বাঙালীকৃত নব রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ; বাংলার ধর্ম-কর্মের পুরাতনের আধারে ধর্ম-কর্মের নূতন রূপ । প্রাচীন ভাষাধারা কেবল উচ্চতর সাহিত্য প্রবাহিত হয় নাই, বাংলার লোক-সাহিত্যে—বাউল-গানে, ধাঁধা ও ছড়ার পর্বত কোন্ হুল্লুন্ধ্য বাত বাহিয়া আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রকারে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যকে অপূর্ব শোভায় ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর উত্তরাধিকার সমালোচনার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিত্য প্রয়োজন বোধেই প্রস্তুত হইয়াছে। ইতিহাসের এই দ্বিগ্ধর্ষনে প্রচলিত প্রকার সাহিত্যের কাল-বিচারের অটলতা বা কপোলকল্পিত কবি-পরিচিতির অবাস্তব বিভর্ক বখাসম্বব পরিহার করা হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় ও রসাবাদ প্রবানের চোঁটাই মুখ্য। প্রাচীন সাহিত্যে যে অংশগুলি সমুদ্র, সমর ও সারগর্ভ তাহাদের সাহসবাহ মূল প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ধারা সাধারণ পাঠক, বাহারা প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদের উৎসুক্য ও রসশিলা চরিতার্থ হইবে এবং তাঁহারা অতি সহজে তাঁহাদের প্রাচীন ঐশ্বর্ষের পরিমাপ করিতেও সক্ষম হইবেন। যে সমস্ত প্রাচীন রচনা বিচার-বিভর্কের লক্ষ্যেই-রচিত এবং বাহা নীরল এই গ্রন্থে তাহাদিকেও যোগ্য আসন দেওয়া হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যে উহাদের প্রভাবের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দুইটি ভাগ : প্রথম ভাগে পড়ে হিন্দুর অষ্টাদশ বিভা—বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি। বস্তুতঃ এই বিভাই ভারতীয় ধর্ম জীবন ও সাহিত্যের নিরাসক। এগুলি ধর্মসাহিত্যের পর্যায়ভূক্ত হইলেও উহাদের রসাবোধন তুচ্ছ নয়, এমন কি কোথাও কোথাও উহা সমুচ্চ শিল্পকর্মের স্বাক্ষর ও স্বাক্ষর। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে সংস্কৃত রসসাহিত্য ও মধ্যভারতীয় অন্তান্ত ভাষাসাহিত্য (পালি, বৌদ্ধসংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ)। দ্বিতীয় ভাগটিই প্রকৃত রস-সাহিত্য। কিছু বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের কথা বাদ দিলে অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ই রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বিতীয় ভাগের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে গুরুতর। প্রাচীন বাংলার অপূর্ব প্রেমকাব্য বৈষ্ণবপদাবলী সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রেম কবিতার লাক্ষ্য উত্তরাধিকারী। নব্যযুগের বাংলা নাটক ও কাব্য-কবিতার রস-সাহিত্যের অপরিণীম প্রভাব। বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব তো আছেই, বস্তুমোতা জৈন ধর্ম-সাহিত্যের প্রভাবও অল্প নয়। বাংলা সাহিত্যে জৈনভাবের আলোচনা নাই বলিলেও চলে। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন।

এই গ্রন্থ রচনার আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ও শুভাশুভাঙ্গী বিদ্বৎজন ও ব্রহ্মাঙ্গদ

ছাত্রদের অকুণ্ঠ সহায়তা লাভ করিয়াছি। প্রথমেই মনে পড়ে মিটি কলেজের পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক স্বর্গত দেবব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা। তিনি বহু দৃষ্টান্ত্য প্রাচীন গ্রন্থ প্রদান করিয়া আমাকে চিরঞ্চী করিয়া রাখিয়াছেন। মতরাঙ্গা মণীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বঙ্কুবর শচীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ দ্বারা আমি বহুল পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি। এই গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন স্কন্দর বঙ্কু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ইহার শব্দনির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে আমার একান্ত রেহের অধ্যাপক জীমান হুশান্ত বহু ও অধ্যাপক জীমান দিলীপ নন্দী। ডি, এম লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী অগ্রজোপম অক্কেয় ত্রিগোলাপ দাস মহম্মদার মহাশয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। মহেন্দ্র প্রেসের স্বযোগ্য কর্মসচিব শ্রীধনজয় সামন্ত মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার এত অমূল্য গ্রন্থরচনার অন্ততম প্রেরণা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক অক্কেয় ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত। তাঁহার নামে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিতে পারিয়া আমি অশেষ তৃপ্তি বোধ করিতেছি।

শারীরিক অগ্রহতা নিবন্ধন ভাল করিয়া প্রকসংশোধন করিতে না পারায় কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রহিয়া গেল। এবিষয়ে শুদ্ধিপত্র অপেক্ষা পাঠকের সাধারণ বুদ্ধি-বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি। এই ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বলিয়া ক্রটি থাকি অস্বাভাবিক নয়। আমার লক্ষ্য একনিষ্ঠ সেবা; সে সেবায় যদি ক্রটি ঘটিয়া থাকে তাহা মার্জনার যোগ্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই তুলনামূলক আলোচনার নতুন দ্বার উন্মোচন করায় যদি আমার বর্তমান ও ভাবীকাল বিন্দুমাত্রও উপকৃত হয়, তাহাট আমার সেবার পুরস্কার বলিয়া গণ্য হইবে। আমি সর্বজ্ঞেয় পাঠকের শুভেচ্ছা ও আলীপদ প্রার্থনা করি। নিবেদন ইতি।

সূচী

॥ বৈদিক সাহিত্য ॥

পৃষ্ঠা—১-১১৪

বেদের প্রাচীনতা ও অপৌরুষেয়তা ১-২ : বেদের সংজ্ঞার্থ ও বিষয় ৩-৪ : মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ৪-৬ : সংহিতা-পরিচয়—ঋগ্বেদসংহিতা ৮-২৩ ; যজুর্বেদ সংহিতা ২৩-২৫, সামসংহিতা ২৬, অথর্ব সংহিতা ২৭-৩৫, ব্রাহ্মণ ৩৫-৪০ : বেদান্ত বা উপনিষৎ ৪০-৫২ ; বেদান্ত ৫৩-৫৫ : হৃত্র সাহিত্য ৫৫-৫৯ : বৈদিক দেবতা ৬০-৭২ : বৈদিক সমাজ ৭২-৭৬ : বৈদিক সাহিত্যে লোকসংস্কার ৭৬-৭৮ : বেদের সাহিত্যিক মূল্য—কথাসাহিত্যে বেদের দান ৮১-৮২, বেদে নাট্য ও ছন্দশাস্ত্রাদির উপাদান ৮৪-৮৬, বৈদিক হৃত্রের কবিত্ব ৮৭-৮৯, বৈদিক সাহিত্যে অলঙ্কার ৮৯-৯৩, বেদের সৃষ্টি ৯৩-৯৪, ব্রহ্মোক্ত ৯৫-৯৬ : বৈদিক সাহিত্য ও বাংলা—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বৈদিক ভাব ৯৯ ১০৫, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বেদ ১০৫-৬, রবীন্দ্রনাথ ও বেদ-উপনিষৎ ১০৬-১০৮ ।

॥ দর্শন ॥

পৃষ্ঠা—১১৫-১৭৯

ভূমিকা ১১৫-১১৬ : ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয়—ভাস্কর্যদর্শন ১১৬-১৮, বৈশেষিক ১১৮-১২১, নব্য-ভাস্কর্য ১২১-১২২, সাংখ্য ১২৩ ২৭, বৌদ্ধদর্শন ১২৭-১৩২, পূর্ব-মীমাংসা ১৩১-১৩৬, উত্তর-মীমাংসা ১৩৬-১৩৭, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ১৩৭-১৪১, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ১৪১-১৪৩, মধ্বাচার্যের ত্রৈতবাদ ১৪৩-১৪৪, নিম্বাকের ভেদাভেদবাদ ১৪৪-১৪৬, নাস্তিক দর্শন ১৪৫-১৫২ : দর্শনশাস্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য ১৫২-১৫৫ : বাংলা সাহিত্যে দর্শনের প্রভাব ১৪৫-১৫০, বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ১৫০-১৫৬, বাংলাদেশে লোকায়ত মত ১৫৬-১৫৯ ॥

॥ তত্ত্ব ॥

পৃষ্ঠা—১৮০-২৪৪

সাধারণ পরিচয় ১৮০-১৮১ : তত্ত্বসাধনার প্রাচীনত্ব ১৮১-১৮২ : তাত্ত্বিকতার কেন্দ্র ও তত্ত্বের তালিকা ১৮২-১৮৪ : কয়েকটি মূলতত্ত্ব ও তাত্ত্বিক নিবন্ধের পরিচয় ১৮৫-১৯০ : শাক্ত দর্শন ও সাধনার মূল কথা ১৯০-১৯৩ : তত্ত্বের সাহিত্যিক মূল্য ১৯৪-১৯৭ : প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শক্তিবাদ ১৯৭-২০২ : বুদ্ধধর্ম ও বুদ্ধতত্ত্ব ১৯৯-২০৪ : বৌদ্ধ সহজিয়া ২০৫-২০৬ : নাথপন্থ ২০৭-২০৮ : বৈষ্ণব সহজিয়া ২০৯-২১৬ : বাউল ২১৬-২১৭ : বাংলাদেশ ও তত্ত্বসাধনা ২১৭-২২০ : নব্যবাংলায় শক্তি-চেতনা ২২০-২২৪ ॥

॥ পুরাণ ॥

পৃষ্ঠা—২৪৫-২৯২

পুরাণের অর্থ ও লক্ষণ ২৪৫-২৫৫ : পুরাণের বিশিষ্টতা ২৫৬-২৬১ : পুরাণ-
পরিচয় ২৬২-২৬৬ : উপপুরাণ ২৬৬-২৭০ : পুরাণের সাহিত্যিক মূল্য ২৭১-২৭৭ :
পুরাণ ও বাংলা সাহিত্য—প্রাচীন যুগ ২৭৭-২৮২, আধুনিক যুগ—বাজা, নাটক, কাব্য ও
কবিতা ২৮২-২৮৬, বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমা ২৮৭-২৯২, রবীন্দ্রনাথ ও পুরাণপ্রসঙ্গ
২৮৯-২৯২ ॥

॥ রামায়ণ ॥

পৃষ্ঠা—২২২-৩৩৭

ঐতিহাস ও মহাকাব্য ২২৩-২২৬ : রামায়ণ-প্রসঙ্গ—কাব্যোৎপত্তির কাহিনী ২২৬-
২৭. কাহিনীসার ২২৭-৩০৪, প্রাক্কণ্ডাংশ ৩০৫-৬, সমাজ ও চরিত্র—নরসমাজ, কপিবংশ
ও রক্ষোবংশ ৩০৬-১৩ : বাঙ্গালীর কবিতা ৩১৩-১৬ : রামায়ণের রূপান্তর—অধ্যাত্ম-
রামায়ণ, ষোণবাশিষ্ট, অন্তত রামায়ণ ৩১৬-২৪ : বাংলাদেশে রচিত রামায়ণ—সংস্কৃত
রামায়ণ, বাংলা রামায়ণ ৩২৪-৩১ : নবাবালায় রামায়ণের নব রূপান্তর ৩৩১-৩৪ :
কাব্য ও কবিতায় রামায়ণ প্রসঙ্গ ৩৩৪-৩৫ : রবীন্দ্রনাথ ও রামায়ণ-প্রসঙ্গ ৩৩৫-৩৭ ॥

॥ মহাভারত ॥

পৃষ্ঠা—৩৩৮-৩৮৫

ভূমিকা ৩৩৮ : পর্ব বিভাগ ৩৩৮-৪১ : কাহিনী—প্রেম ও বীর্যের কাহিনী ৩৪১-৪৬ ।
ধর্মমূলক উপাখ্যান ৩৪৬-৫০ ; নীতিমূলক কাহিনী ৩৫০-৫২ : মহাভারতীয় চরিত্র
৩৫২-৩ : সাহিত্যিক মূল্য ৩৫৩-৬৮ : বাসকুট ও প্রহেলিকা ৩৬৮-৭০ : মহাভারতের
খিল অংশ (হরিবংশ) ৩৭১-৭২ : জৈমিনী-ভারত ৩৭২ : বাংলা মহাভারত
৩৭৩-৭৯ : নব্যযুগে বাংলায় ভারতীকথার রূপায়ণ—মধুসূদনের বীরচরিতা ৩৮০ :
রবীন্দ্রনাথ ও ভারত-কাহিনী ৩৮১-৮৪ ।

॥ নির্ঘণ্ট ॥

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার

॥ বৈদিক সাহিত্য ॥

১. বেদের প্রাচীনতা

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ। কেবল ভারতীয় সাহিত্যের নয়, বিশ্ব অর্ধ সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ।^১ ইহা যে কত প্রাচীন, তাহার কালসীমা নির্ণয় করা দুঃসহ।

তথাপি বেদের ভাষা, ভৌগোলিক উপাদান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রমাণ দ্বারা বিবৃধ-বর্গ বৈদিক যুগের কালসীমা চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ‘সায়ণাচার্য Maxmuller বলেন, বেদের কাল ১২০০—১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ : আচার্য Winternitz বলেন, অন্ততঃ ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।^২ মহামতি তিলকের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে বেদ সংগৃহীত ও বিভক্ত হইয়াছিল, উহা আরও পূর্ববর্তী।

সংরক্ষণশীল হিন্দুরা মনে করেন, আদি বেদ কোন মাহত্বের রচনা নয়, উহা অপৌরুষেয়। অনাদিকালে পরমব্রহ্মের নিঃস্বাসরূপে অবলীলাক্রমে বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিষ্ঠাবান হিন্দুযাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস,—বেদ ব্রহ্মের সহজরূপ [‘ব্রহ্মণঃ সহজং রূপম্’]। ইহা নিত্য অব্যয়শক্তি স্বরূপ ব্রহ্মাত্মক বাক্য। ঋগ্বেদে এই শব্দকে বলা হইয়াছে ‘গৌরী’ [ঋ. ১.১৬৪.৪১] : আচার্য সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন ‘দেবগর্জনরূপ শব্দ’। আদি কল্পারম্ভে এই শব্দ বেদগর্ভ ব্রহ্মার নিকট প্রকট হইয়াছিল। ব্রহ্মা হইতে ‘ঋতজাত’ ঋষিগণ অনন্ত ব্যোমে ইহা দর্শন করিয়াছিলেন। ঋষিগণ ‘সাক্ষাৎকৃতধর্ম’। জীবনের এক একটি চরম মুহূর্তে যে অক্ষর সত্য প্রকট হইয়াছে, আশ্চর্য তপশ্চর্যাবলে ঋষিগণ সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষিদৃষ্ট বেদ অপরোক্ষাত্মক

১। The Rigveda is the most ancient book of the Aryan world—
Preface to Rigveda Samhita. Vol. IV—Maxmuller.

[অধুনা হিন্দী ভাষায় ঋগ্বেদ হইতে প্রাচীনতর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।]

২। Vedic culture may be traced back at least to the second
millenary B. C. —A Hist. of, Indian Lit. Vol. I

প্রকাশ, উহা দৈব প্রেরণালব্ধ। যে কোন মহাকাব্য রচনার ইহাই মূলমন্ত্র। কাব্য-
সৃষ্টির প্রেরণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন
একটি আকস্মিক অলৌকিক-আবির্ভাবের মত, তাহা কবির আয়তনের অতীত।'
[কবি-জীবনী]। এই অর্থেই বেদ অশৌকযেয়। উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি
নয়, উহা চোটা প্রসঙ্গ নয়, উহা যেন একটি 'অনিবচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ।'
কবি বৃহস্পতি একটি ময়ে এই সত্যের আভাস দিয়া বলিয়াছেন,

উত ত্বঃ পশুন্ ন দদর্শ বাচম্

উত ত্বঃ শুনন ন গৃণোতি এনাম্।

উতো অস্মৈ তদ্বৎ বি সম্বে

জায়েব পত্যো উশতী স্তবাসাঃ ॥ [ঋ. ১০. ৩১. ৪]

—(অলৌকিক) থাকে কেহ দেখিয়াও দেখেন না, কেহ শুনিয়াও শুনে
না, আবার কাহারও নিকট স্তবাসা পাই যেমন পতির নিকট দেহ অনাবৃত
করে, তেমনিই তিনি প্রকাশিত হন।

এসকল যুক্তি বাদ দিলেও বেদের সঠিক কাল নির্ণয়ে আরও অনেক বাধা বর্তমান।
বেদের উপলব্ধি, প্রকাশ ও বিকাশ এক যুগের নয়। সৃষ্টি অনন্তকালের, আর বেদ
অনাদিনিত্য। প্রথম সৃষ্টির পর অনেক প্রলয়, অনেক প্রতিসঙ্কর, অনেক কল্লাস্ত
হইয়াছে। প্রতি কল্লারম্ভে ঋতবাক্ ব্রহ্মার ধানে 'স্বপ্নপ্রবৃত্ত জায়ে'র অন্তরঙ্গণে পূর্ব
পূর্ব কল্পের অন্তরূপ সৃষ্টিপতন হইয়াছে, নতুন করিয়া অনাদিনিত্য বেদ প্রকাশিত
হইয়াছে। 'যে চিদ্র হি পূর্ব ঋতসাপ আসন', সেই সত্যসঙ্ক ঋষিগণ ব্রহ্মা হইতে
বেদ দর্শন করিয়াছেন। পরবর্তী কালেও বহু ঋষির নিকট বেদ আবির্ভূত হইয়াছে।
কেহ আবার সাক্ষাৎ মহা দর্শন না করিয়া 'শ্রাবক' শিষ্যরূপে পিতা বা গুরুর নিকট
হইতে বেদ লাভ করিয়াছেন।^১ এইজন্ত বেদের এক নাম 'শ্রুতি'। এইরূপে বেদের
দর্শন, প্রবণ ও বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ যে কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে,
অধুনাপ্রাপ্ত বেদে যে কত স্তর পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবে কে? বৈদিক
সাহিত্যের বিপুল ব্যাপ্তি বিচার করিলেও এই সংশয়ের সত্যতা অন্বিত হয়। অগ্নিপুরাণে
সমস্ত বেদকে বলা হইয়াছে 'বেদপাদপকানন'। উপমাটি সার্থক। এই স্ববৃহৎ
অরণ্যানি একদিনে সৃষ্ট হইতে পারে না। অল্প বা অল্পশত দিয়াও ইহার ব্যাপ্তিকাল
নিরূপণ করা অসম্ভব।

১। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয় বহুবুঃ তে অবরেভ্যোহিসাক্ষাৎকৃতভ্যো উপদেশেন মহান্
সম্ভ্রাহুঃ—বাক্য।

তবে এইটুকু বলা চলে, বর্তমানে বেদ বলিয়া গ্রন্থাকারে ঘাষা পাওয়া যাইতেছে, তাহা অবরকালীন শ্রাবক মুনি-ঋষিদের সংগ্রহ এবং তাহা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের মধ্যে সংগৃহীত ও সংকলিত হইয়াছিল।

২. বেদের সংজ্ঞার্থ ও বিষয়

জ্ঞানার্থক ‘বিদ্’ ধাতু হইতে ‘বেদ’ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যাপক অর্থে বেদ অখণ্ড জ্ঞানরাশি। ইহা মনু-কর্ম-জ্ঞানাত্মক স্ত্রাপ্রাচীন প্রমাণ বাক্য। বেদ নিত্য, অদ্বান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। আচার্য সায়ণ বলেন, ‘বেদবাক্যমবিতথম্।’ আমরাও কথায় বলি, যে বাক্য সত্য ও অকাটা, তাহাই ‘বেদবাক্য’। বেদ ভারতবর্ষের মর্মবাণী। ইহা এদেশের ধর্মের উৎস, কর্মের মীমাংসা, জ্ঞানের আকর। বেদ ভারতবাসীর চক্ষু, জীবনের নিয়ামক। বেদ যিনি মানেন, তিনি আন্তিক—বেদ যিনি মানেন না, তিনি নাস্তিক। এক কথায় ভারতবাসীর ঐহিক ও ‘আমুণ্ডিক’ আশ্রয় বেদ। বেদের প্রতি এদেশবাসীর এমনই শ্রদ্ধা যে, তাহারা ইহার একটি বাক্য, একটি পদ, এমন কি একটি অক্ষরকে পবিত্র বিহিত হইতে দেন নাই; প্রত্যেকটি বাক্যের পদপাঠ^১, ক্রমপাঠ^২ প্রভৃতি দ্বারা বাক্যের পদসংখ্যা, অক্ষরপরিমাণ ও স্বরগান্ধারকে পবিত্র যথাযথ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাহারা বিশ্বাস করেন, বেদ ননাতন প্রমাণ।

বেদের প্রকৃত তাৎপৰ্য বুঝিতে হইলে, মে-যুগের জীবনাদর্শকে বুঝিতে হয়। দৈনিক যুগে জীবনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল, সত্য ও জ্ঞান। ‘ইরাবতী ধেনুমতী’ পৃথিবীতে ঋষিগণ বালন্ত জীবন লইয়া শতায় হইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, ‘জীবেম শরদঃ শতম্,’ আর সেই সঙ্গে কামনা করিয়াছিলেন, দেবদান মার্গে জ্যোতির্ষ্ময় পরলোক [‘অগ্ন্য জ্যোতির্কৃতম্’], চাহিয়াছিলেন অমৃত ও অভয়ে প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠালাভের জন্ত তাহারা দৈবশক্তিকে আহ্বান করিতেন। যজ্ঞকর্ম ছিল ঐহিক ও পারিত্রিক কললাভের উপায়। যজ্ঞ উপলক্ষে তাহারা সমবেত হইতেন। প্রজ্জলিত হোমায়গ্নর সম্মুখে দেবতাকে আহ্বান করিয়া কেহ মনোচ্চারণ করিতেন,

১। পদপাঠ—সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া প্রত্যেকটি পদের বিস্তৃষ্ট পাঠ; যেমন ‘অগ্নিমীলে’র পদপাঠ ‘অগ্নিম্ ঈলে’।

২। পদের ক্রমানুসারে পরবর্তী পদের সহিত পূর্ববর্তী পদকে যুক্ত করিয়া যুগ্ম পদের যে পাঠ, তাহা ক্রমপাঠ; যেমন ‘অগ্নিমীলে পুরোহিতম্’এর ক্রমপাঠ, অগ্নিমীলে ঈলে পুরোহিতম্। ইত্যাদি।

কেহ বা ময় পাঠ করিয়া যজ্ঞ আত্মি প্রদান করিতেন। যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ছিল—
আত্মি ও আত্মি—ময় ও ক্রিয়া।

এই দুইটি অঙ্গ লইয়া বেদেব দুই প্রধান ভাগ—ময় ও ব্রাহ্মণ। আপনস্থ স্বত্রে
বলা হইয়াছে, বেদ বলিতে ময় ও ব্রাহ্মণকেই বুঝায়—‘ময়ব্রাহ্মণয়োবেদে নামধেয়ম্’;
আচার্য সায়ণও বলেন, ‘ময় ব্রাহ্মণরূপে ধ্যানেব বেদভাগো’।

৩. ময়্যার্থ ও ময়্যের বৈশিষ্ট্য

যজ্ঞ আত্মি ও আত্মিকালে যে শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করা হয়, সাধারণভাবে
তাহাই ময়। ময় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও গূঢ়ার্থবাহক। উহা মনন সাপেক্ষ। যাক
বলেন, ‘ময়ো মননং’। এই ময় যজ্ঞের প্রাণবন্ত।

একটি ময়্যের তিনটি অঙ্গ : ঋষি, ছন্দ ও দেবতা। যাহার নিকট ময়টি প্রকাশিত
হয় বা যিনি ময়্যের দ্রষ্টা, তিনিই ‘ঋষি’। দৈব প্রেরণাবশে তিনি ময় দর্শন করেন।
তিনিই যাবাব ‘ময়কৃত’, কারণ, ঋষির মাধ্যমেই তুরীয় বাক্ বৈগরী বাণীরূপে প্রকাশিত
হয়। প্রকাশকালে দৃষ্টময় বিশিষ্ট কোন ছন্দকে আশ্রয় করে। ছন্দ হইতেছে অক্ষর-
পরিমাপ। এই অক্ষর-মাত্রাই ছন্দ। ময় মাত্রই ছন্দ-স্পন্দিত। যাহাকে লক্ষ্য
কবিয়া ময় উচ্চারিত হয়, তিনি ‘দেবতা’। ‘দেবতা’ ময়্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় [‘ময়স্ত
বাচা দেবতেতি’ কিংবা ‘ময়্যেণ দ্বোততে ইত্যর্থঃ’—সায়ণ]। এইরূপে প্রত্যেকটি ময়ই
ঋষিদুঃ, ছন্দ-বিলসিত ও দেবোদ্ভিষ্ট। যেমন এই একটি ময় :

মো যু বরুণ যুয়য় গৃহং রাক্ষসঃ গমঃ।

মুড়া অক্ষর মডয় ॥ [অ. ৭ চ. ১]

—হে রাজা বরুণ, যুয়য় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই।

হে অক্ষর, দয়া কর, দয়া কর।

এই ময়্যের ঋষি ‘বসিষ্ঠ’। ইহার ছন্দ ‘গায়ত্রী’। বরুণের উদ্দেশে উক্ত বলিয়া ইহার
দেবতা ‘বরুণ’।

ময়কে ‘অক্’ বা শ্লোকও বলা হয়। অক্ বা শ্লোক সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু
সর্বত্রই ময় সুষম ছন্দে গ্রথিত নয়। কোন কোন স্থলে উহা গন্ত-পত্তময়, কোথাও বা
অধু গন্ত। গন্তময় ময়্যের ভঙ্গি এইরূপ :

অগ্রে জনিত্বমসি। বুধণো হঃ। উবহুসি। আয়ুরসি। পুরুববা অসি।

গায়ত্রেণ বা ছন্দসা মম্বামি। জৈষ্টুভেন বা ছন্দসা মম্বামি। জাগতেন বা

ছন্দসা মম্বামি। [শুক্ল বজ্র: ৫. ২]

ইহা অগ্নি-মন্ত্রন মন্ত্র। ঋষি বলিতেছেন, তুমি অগ্নির আধার। তোমরা অতীষ্ট-বর্ষী। তুমি উর্বরী। তুমি আয়ু। তুমি পুরুষা। গায়ত্রীছন্দে তোমাকে মন্ত্রন করি। ত্রিষ্টুপ ছন্দে তোমাকে মন্ত্রন করি। জগতী ছন্দে তোমাকে মন্ত্রন করি।^১

মন্ত্র, ঋক্ বা শ্লোকের সমষ্টি ‘হুক্ত’ (হৃ+উক্ত)। হুক্ত পূর্ণাঙ্গ স্তুতি। স্তুতিই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ। স্তুতি-রহিত যজ্ঞ দেবতার প্রীতিকর হয় না। স্তুতিদ্বারা দেবতা, আস্থিত হন। ঋত্বিকারীকে বলা হয় ‘হোতা’ (আপ্সাতা)। কেহ বলেন, অন্যান্য তিনটি ঋক্ না থাকিলে পূর্ণাঙ্গ হুক্ত হয় না।

এইরূপ অনেক হুক্ত লইয়া বেদের মন্ত্রভাগ। কতকগুলি মন্ত্র বা হুক্ত নানাদিক হইতে বিশিষ্ট; সেগুলি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত—যথা, মধুপ্লব্ [ঋ. ১. ২০. ৬—৮], হংসবতী ঋক্ [ঋ. ৪. ৪০. ৫], কিংবা গায়ত্রীমন্ত্র [ঋ. ৩. ৬২. ১০] বা ত্র্যম্বক মন্ত্র [ঋ. ৭. ৫১. ১২]। বিভিন্ন ভাবে কতকগুলি মন্ত্র ধেমন বিশিষ্ট, তেমনই কতকগুলি হুক্ত। হুক্তগুলি সাধারণতঃ তত্ত্ব দেবতা বা ঋষির নামে পরিচিত। দেবতার নামে বিখ্যাত হুক্তগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—‘দেবী হুক্ত’ [ঋ. ১০. ১২৫] ‘বাহ্নি হুক্ত’ [ঋ. ১০. ১২৭], ‘হিরণ্যগর্ভ হুক্ত’ [ঋ. ১০. ১২৮], ‘পুরুষ হুক্ত’ [ঋ. ১০. ২০], ‘শতক্রদ্রিয়’ [শুক্ল, যঃ, ১৬], ‘পৃথিবী হুক্ত’ [অথ, ১২, ১] প্রভৃতি। ঋষির নামে প্রসিদ্ধ হুক্তাবলীর মধ্যে—‘সূর্য্য হুক্ত’ [ঋ. ১০, ৮৫], ‘অষমর্ষণ হুক্ত’ [ঋ. ১০, ১২০] প্রভৃতি বহুবিখ্যাত।

বৈদিক মন্ত্রের বিষয় বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বিশিষ্টতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রার্থনায়ুক্ত স্তুতিই মন্ত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার একদিকে আছে ‘দৈলে’ (প্রশংসা করি), ‘আগহি’ (এস) ‘যজামহে’ (ভজনা করি), ‘ধীমহি’ (ধ্যান করি), ‘নমঃ’ বা ‘অকরং নমঃ’ (নমস্কার করি)—অন্যদিকে আছে, রয়িঃ দাঃ (অন্ন দাও), বলং ধেহি (বল আধান কর), ‘অহং দধাতু’ (প্রাণ দান করুন), কিংবা ‘পাত স্বস্তিভিঃ’ (স্বস্তিদ্বারা পালন কর), ‘মা নো বধীঃ’ (আমাদিগকে বধ করিও না), ‘বৃড় নঃ’ (আমাদিগকে রক্ষা কর), ‘মা হি সী’ (হিংসা করিও না)। কোন কোন মন্ত্রে আবার শক্রনাশের প্রার্থনা, কোথাও বা শাস্তি, সৌভাগ্য ও সৌম্যস্তের প্রার্থনা।

১। এখানে ‘উর্বরী’ অধরারণি (নীচের অগ্নিমন্ত্রন দণ্ড)। ‘পুরুষা’ উত্তরারণি (অপর অগ্নিমন্ত্রন দণ্ড)। উহাদের ঘর্ষণে আয়ু নামক অগ্নির জন্ম। মন্ত্রটিকে পুরুষা ও উর্বরীর প্রণয় কাহিনীর উৎস বলিয়া মনে করা হয়।

ময় ও যজ্ঞের সর্গস্থই দেবজ্ঞতি নাট। কোন কোন যজ্ঞে যজ্ঞমান, দাতা বা রাজার জ্ঞতি। এগুলিকে বলা হয় 'নারাশ'সী'। 'নারাশ'সী' প্রকৃতপক্ষে কীৰ্ত্তিমান নরের প্রশংসা ['নরৈ, শক্তমানস্বাং নরাশ'সম্বন্—সায়ণ]। দানকে উপলক্ষ করিয়া যে জ্ঞতি, তাহার নাম 'দানজ্ঞতি'। কতকগুলি যজ্ঞের নাম 'আখ্যান যজ্ঞ' বা 'সংবাদ স্তোত্র' ['Narratives in forms of dialogues'-Winternitz —যেমন পুত্ররব ও উবশী সংবাদ [ক. ১০. ২৫], যম ও যমীর কপোপকন্দন [ক. ১০. ১০]। এগুলিতে আছে অতি পুরাতন কাহিনী-বীজ। নারাশ'সী ও আখ্যান-যজ্ঞ ইতিহাস ও পুরাণের আকর।

এই প্রসঙ্গে বেদের 'ভাবার্থ' ও মূলক ও সৃষ্টি-বিষয়ক যজ্ঞগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই যজ্ঞগুলির দ্বিতীয় বৈদিক যুগের নীতি, সম্বাদ ও দার্শনিক চিন্তা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ঋগ্বেদের 'নাসদীয় যজ্ঞ' [১০. ১২২] ও অথব বেদের 'রোহিত যজ্ঞ' [অ. ১৩. ১] সৃষ্টি-বেদের রূপায়ণ। বৈদিক 'ব্রহ্মোজ যজ্ঞ'-গুলিও বিচিত্র। এগুলি প্রাচীনকাল ওয়াহায় প্রসারের। ঋগ্বেদের ১. ১৬৪ যজ্ঞ, শুক্ল যজুর্বেদের ২৩. ৪৫—৬২, অথব বেদের ১১. ১০—এই প্রকার ব্রহ্মোজের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই প্রকার বৈদিক যজ্ঞ ময় বা যজ্ঞের সমষ্টি লইয়া বেদের মূলভাগ। ময় বা যজ্ঞের সংগ্রহগ্রন্থের নাম 'সংহিতা'। সংহিতাই মূল বেদ। বেদের অপরাপর অংশ সংহিতার সম্প্রসারণ মাত্র। 'ব্রাহ্মণ' সংহিতার ভাষ্য, 'উপনিষৎ' সংহিতোক্ত দর্শনতত্ত্বের আলোচন, 'বেদান্ত' ও সংহিতোক্ত ময়ের স্বরস্ব, মিতত্ব ও বিনিয়োগের প্রসঙ্গ মাত্র। সংহিতাই বেদ-জ্ঞানের আকর এবং প্রাচীনত্বের দিক হইতেও সুপ্রাচীন।

৪ সংহিতা-পরিচয়

প্রথমে সমগ্র বেদ ছিল এক ও অখণ্ড। মাতৃগের শ্রুতিশক্তি প্রথর ছিল, শ্রুতিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। শ্রুতির সাহায্যে বেদ ভাষণ করিয়া শ্রুতির সাহায্যে বেদ মনে রাখা হইত। কালক্রমে লোকের স্মরণশক্তি হ্রাস পাইল, বিপুলায়তন বেদের অনেক অংশ লুপ্ত হইতে বসিল। মতৃগের শক্তি ও পরমায়ুর কণিতা দেখিয়া বিদ্বান বৈদ্যায়ন বেদরক্ষার নিমিত্ত 'সমগ্ধ' (অবিভক্ত) বেদকে 'ব্যস্' (বিভক্ত) করিয়া চারিটি

১। 'উত্তর-প্রত্যুত্তরঃ পরস্পরঃ সংবাদঃ ব্রহ্মোজম্' [যজুঃ-টীকা. ২৩. ৪৫—

উব'ট] : যজ্ঞকালে হোতা ও অধ্বর্য, কিংবা যজ্ঞমান ও যাজক, কিংবা সদস্যদের মধ্যে জ্ঞান-রহস্য বিষয়ে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক আলোচনা হইত, তাহাই ব্রহ্মোজ।

সংহিতা করিলেন এবং তাঁহার চারিজন বেদপারগ শিষ্য—শৈল, বৈশম্পায়ন, ভৈমিনী ও স্রমজ্জকে বথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ উপদেশ করিলেন। নিখিল বেদের ‘ব্যাস’ বা বিভাগ করার জন্ত মহর্ষি বৈশম্পায়নের নাম হয় ‘বেদব্যাস’।

অধুনা বেদের ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব—এই চারিটি সংহিতাই প্রচলিত। কিন্তু অনেকেই বলেন, পূর্বে বেদ ছিল তিনটি—ঋক্, যজুঃ ও সাম; ‘অথর্ব’ পরবর্তীকালের যোজন। বেদের ‘ত্রয়ী’ নামকরণটি এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও ‘ত্রয়ী’ বা ত্রিবেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খ্রীশ্চিষ্টাব্দে আছে, ‘দেবী ত্রয়ী’ [মধ্যম চরিত. ৪.১০] অর্থাৎ তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের ললিত পাঠসমূহের মূল; চার্বাক দর্শনে ‘ত্রয়ো বেদস্ত ক্তারো ভগুপ্তনিশাচরাঃ’ বলিয়া বেদকর্তাদের নিশ্চয় করা হইয়াছে; স্বপ্রাচীন পালি সাহিত্যেও বলা হইয়াছে ‘তেবিজ্জো হোদি বাস্তুনো’। কিন্তু এসকল স্থলে ‘ত্রয়ী’ ‘ত্রয়’ বা ‘তে’ শব্দগুলি বেদের সংখ্যার নিরূপক নয়, উহা বেদ-লক্ষণের নির্দেশক। বেদের মন্তগুলি ত্রিলক্ষণাক্রান্ত, কোন মন্ত পঞ্চ, কোন মন্ত গান, কোন মন্ত গজ। পঞ্চাংশ ঋক্, গীতাংশ সাম এবং গজাংশ যজুঃ। তাই বেদকে বলা হয় ‘ত্রয়ী’। ঋগ্বেদ মন্তের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ ছিল না, উহা ছিল ঋক্-সাম-যজুঃ-এর মিলিত রূপ। প্রকারান্তরে উহা ত্রয়ীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জন্ত বেদ ত্রয়ী নামেই অভিহিত হইয়া আসিয়াছে।

বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—চারি প্রকার মন্তেরই প্রয়োগ ছিল, প্রয়োগকর্তাও ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন। যজ্ঞ ছিল বৈদিক ক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ। ‘সবকামধুক্’, ‘অমৃতচেতন’ যজ্ঞের জন্তই বেদের আবির্ভাব—‘বেদার্হি যজ্ঞার্থমভি-প্রবতাঃ’। শুরু যজুর্বেদে এই যজ্ঞকে বলা হইয়াছে ‘চতুঃশৃঙ্গঃ’ [শু. যঃ ১৭. ১২]—আচার্য মহাধর বলেন ‘চত্বারো বেদাঃ শৃঙ্গানি’—চতুর্বেদই এই শৃঙ্গ। প্রচলিত হোমাগ্নির সম্মুখে কেহ দেবোদ্দেশে স্তব করিতেন, কেহ যজ্ঞশরীর নির্মাণ করিতেন, কেহ রম্যপদ গান করিতেন, কেহ বা যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপগুলি লক্ষ্য করিতেন। ঋতারা যজ্ঞকর্মে এই সকল অংশ গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকে বথাক্রমে বলা হইত—হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও বলা হইতেছে, ‘ঋগ্বেদেন হোতা কয়োতি সামবেদেনোদ্গাতা যজুর্বেদেনোধ্যব্যাঃ সর্বৈব ব্রহ্মা’। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে,—একজন ঋকসমূহ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞস্থানে সাহায্য করেন, কেহ গায়ত্রীছন্দে সামগান করেন, ব্রহ্মা প্রায়শ্চিত্তাদি কার্যের কথা বলেন, এবং কেহ যজ্ঞের

‘মাত্রা’ অর্থাৎ বক্তৃতাটির নির্মাণ করেন।^১ গোপথ ব্রাহ্মণে কেবল চারি বেদের কথা স্বীকার করা হয় নাই, চতুর্বেদ হঠাৎ নিত্য পাঠ্য প্রথম চারিটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে [গোপথ পূর্বাধ ১.৩৩]

তবে একদা ঠিক, অপরবেদ পূর্বে অপাণ্ডক্য ছিল, অস্তুতঃ ইহা সংহিতার মর্বাদ লাভ করে নাই। অপর বেদকে বেদও বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে ‘অপরবেদস’ বা ‘অপরবণ’ বা ‘তুর্গদস’। ইহার কারণ পরে আলোচনা করা হইবে। এখানে ব্যক্তব্য এই যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অপর বেদবিশ্বাসের প্রয়োগ ছিল এবং ঋগ্বেদ ঋগ্বেদবিদ্যার মনুষ্যগুলি ছিল অবিভক্ত। ঋষি বেদব্যাঙ্গ এই বিদ্যাবিশ্বাসকে পৃথক করিয়া ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অপরবেদ সংহিতা লঙ্ঘন করিয়া চারিজন শ্রাবক শিষ্যকে প্রদান করেন। এই শ্রাবক ও তন্ত্র শ্রাবক পরস্পর চারি বেদ কালক্রমে সহস্রাধিক শাখায় বিভক্ত হওয়ায় ‘বেদপাদপকানন’ সৃষ্টি হইয়াছে।^২

(ক) ঋগ্বেদ সংহিতা

ব্রহ্মাণ্য পৈল বেদব্যাঙ্গ হইতে ঋগ্বেদসংহিতা প্রাপ্ত হইয়া উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং তাঁহার দুই শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাঙ্কলকে প্রদান করেন। বাঙ্কল হইতে ঋগ্বেদের বাঙ্কল শাখা প্রচারিত হয়। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতেও অনেক শাখা-প্রতিশাখার বিস্তার হয়, তন্মধ্যে শাকল্য ঋষির ‘শাকল্য সংহিতা’ বিখ্যাত। বর্তমানে ঋগ্বেদের শাকল্য শাখাই বহু প্রচলিত।

বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতা নানাদিক হইতে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভাষার প্রাচীনত্ব, গভীর অমুভূতির বলিষ্ঠ প্রকাশ ও ছন্দস্পন্দিত কবিত্ব এই সংহিতার প্রধান বিশেষত্ব। সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের প্রতিনিধি ঋগ্বেদ একটি প্রবৃদ্ধ বটবৃক্ষ। বিরট বনস্পতি যেমন বহু শাখা-লেশাখা বিস্তার করিয়া, বহু জট মেলিয়া বনমধ্যে সমুদয়মস্তকে দণ্ডায়মান থাকে, ভারতবর্ষের হোম-তপোবনে তেমনই উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান এই প্রবৃদ্ধ জটিল বট।

- ১ ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষান্
গায়জং যো গায়তি শকরীযু।
ব্রহ্মা যো বদতি জাতবিজ্ঞা
যজ্ঞস্ত মাত্রা বিমিষীতে উত ত্বঃ [ঋ. ১০. ৭১. ১১]

- ২ সৌম্যমেকো মহা বেদস্তকন্তেন পৃথক্কৃতঃ।
চতুর্বা তু ততো জাতং বেদপাদপকাননম্ ॥ [অগ্নি ৩.৪]

ভারতের সনাতন ধর্ম ও কর্ম, দর্শন ও ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্যের উৎস ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদকে বলা হয় 'বহুচ সংহিতা', বহুসংখ্যক ঋকের সমষ্টি বলিয়াই এই সার্থক নামকরণ। অত্যাশ্চর্য্য বৈদিক সংহিতা বহুল পরিমাণে এই বহুচ ভাণ্ডারের নিকট ঋণী। সামবেদের অধিকাংশ গান ঋগ্বেদের ঐশ্র, আশ্রয় ও পবমান সোম স্তবাবলীর অন্তর্গতঃ, যজুর্বেদের গদ্যাংশ নিজস্ব, কিন্তু পদ্যাংশের অনেক মন্ত্র ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে অভিন্ন, অথর্ববেদের আশ্রয় মিল দৃষ্ট হয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত।

শাকল শাখার ঋগ্বেদ সংহিতায় মোট ১০১টি সূক্ত। সম্পাদক Maxmuller অতিরিক্ত ১১টি 'বালখিলা' সূক্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এই সূক্তগুলির কোন ভাণ্ডা করেন নাই। মনে হয়, বালখিলা সূক্তগুলি শাকল শাখাত্ত নয়। এগুলি ছাড়া, পরিশিষ্টরূপে আরও কতগুলি মন্ত্র ও সূক্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এগুলিকে বলা হয় 'খিল সূক্ত'। এগুলিও মূল সংহিতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি কোথাও অষ্টক-অধ্যায়ে, কোথাও বা মণ্ডল-অন্তবাকে বিভক্ত অথবা কোথাও এগুলিকে আটটি অষ্টকে, ৬৭ অধ্যায়ে, ২০০০ বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। কোথাও আবার ১০টি মণ্ডলে, ১০০ অন্তবাকে সজ্জিত করা হইয়াছে। মণ্ডল-বিভাগটিই প্রচলিত ও বিখ্যাত। এই মতে ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত।

প্রথম মণ্ডলে মোট ১০১টি সূক্ত। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের ঋষিগণ এই সূক্তগুলির দ্রষ্টা। ঋষির নামানুসারে তদৃষ্ট সূক্তগুলি পর পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রধান ঋষিদের মধ্যে আছেন মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, কথ, গৌতম, কুৎস, দীর্ঘতম। ও অগস্ত্য প্রভৃতি। সূচনায় বিশ্বামিত্রপুত্র ঋষি মধুচ্ছন্দা গায়ত্রীছন্দে অগ্নিদেবতার স্তুতি উচ্চারণ করিতেছেন :

অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ

যজ্ঞস্তা দেবমুস্বিজন্ম।

হোতারঃ রত্নধাতমম্ ॥ [ঋ. ১. ১]

—অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্ ; অগ্নি দেবগণের
আহ্বানকারী, ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির
স্তুতি করি। [অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত]

ইহাই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম ঋক্। হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে এই মন্ত্রটি প্রথম উচ্চারিত হয়। এই মণ্ডলের আরও অনেক ঋক্ অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে ঋষি মেধাতিথি-দৃষ্ট বিষ্ণুমন্ত্র বা বৈষ্ণবী সংহিতা—‘ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে’ মন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য।

কেহ কেহ মনে করেন, ইচ্ছা দ্বিবিক্রম বিষ্ণুর পৌরাণিক পরিকল্পনার অঙ্কুর। এই
স্বকল্পেরই অন্তর্গত হিন্দুর বিশ্বাসে বিশ্বস্রবণ মন্ত :

তদবিক্রোঃ পরমঃ পদঃ

সদা পশুস্তি স্রবয়ঃ ।

দ্বিবীণ চকুরাত্তম ॥ [ঋ. ১. ২২. ২০]

আকাশে চকু যেমন অবাসিত ভাবে দেখিয়া থাকে, সংযত তত্ত্বদর্শী

ঋষিগণ সেইরূপ বিষ্ণুর পরম পদ দেখিয়া থাকেন।

গৌতম ঋষির মধুকৃ গুণিণ্ড প্রথম মণ্ডলে স্থান লাভ করিয়াছে। তিনিই ঋকের
সমষ্টি এই মধুক্লোক, ইচ্ছা পশুপাবন 'গ্রিমধু' নামে বিখ্যাত। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে
পৃথিবী ও বিশ্বপ্রকৃতি নীচের নয়, পৃথিবী মধুক্লোক। তাহাব সর্বত্র মধুর ক্ষরণ : বাতাস,
বনস্পতি, স্রব, সিদ্ধ - এমন এক মাটির দলিঙ্গ মধুময়। ঋষি বলিতেছেন,

মধু বাতা কতায়তে মধু ক্ষরাস্তি সিদ্ধবঃ ।

মাক্ষীণ : সন্তোষদাঃ ॥

মধু ন কতায়তোমসো মধুং পাথিব্য রজঃ ।

মধু জৌরস্ব নঃ পিতা ॥

মধুমান নো বনস্পতি মধু মা অস্ত স্রবঃ ।

মাক্ষী বাবো ভবস্ব নঃ ॥ [ঋ. ১. ২০. ৬-৮]

--মধু বাতায়তে সকল বাতাস। মধু ক্ষরিতেছে নদ ও নদী।

মধু হউক আমাদের পিতা সকল।

মধু হউক রজনী ও উষা। মধু হউক পৃথিবীর দলিকণা। মধু হউক
আমাদের পালয়িতা এই ছালোক।

মধু হউক আমাদের বনস্পতি। মধু হউক ঐ স্রব, মধু হউক
আমাদের স্রবগণ। [অন্তবাদ ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত]

গৌতম ঋষির প্রার্থনা মরুগুলি সহাই স্তব্ধ। দ্বিবাভাবে অনুপ্রাণিত স্তুতি। স্বস্তি
প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিতেছেন :

স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃকশ্রবাঃ

স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ ।

স্বস্তি নঃ স্তাক্ষেণী অরিষ্টনেমিঃ

স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ [ঋ. ১. ৮২. ৬]

—প্রকৃত অন্নদাতা ইন্দ্র আমাদের স্বস্তি দান করুন, সকল জ্ঞানে

জ্ঞানবান্ পুষা স্বস্তি দান করুন। তাক্ষ অরিষ্টনেমি (গরুড়)

আমাদের স্বস্তি বিধান করুন, বৃহস্পতি স্বস্তি বিধান করুন।

শুধু তাই নয়, যষ্টব্য দেবতার রূপায় আমরা যেন কর্ণে ভদ্র বাক্যই শ্রবণ করি,
নয়ন ভরিয়া যেন ভদ্র কল্যাণকেই দর্শন করি :

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা

ভদ্রং পশ্চোম অক্ষভির্যজ্ঞত্ৰাঃ। [ঋ. ১, ৮২, ৮]

দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত মণ্ডলগুলিকে ‘গোষ্ঠীমণ্ডল’ বলা হয়।
এক এক মণ্ডলে কোন একজন বিশিষ্ট গোত্র-প্রবর্তক ঋষি বা তাঁহার পুত্র বা শিষ্যের
দৃষ্ট স্তবগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গোষ্ঠীগতভাবে মন্ত্রগুলির বিস্তার দেখিয়া মনে হয়,
এক এক গোষ্ঠীর মন্ত্র সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই রক্ষিত হইত এবং বংশধরগণ শ্রদ্ধা সহকারে
মন্ত্রগুলি স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতেন।

দ্বিতীয় মণ্ডলের গোষ্ঠীপতি ঋষি গৃৎসমদ। এই মণ্ডলে ৮৩টি স্তব : তন্মধ্যে ৩৩টি
স্তবই গৃৎসমদের, কেবল ৩র্থ হইতে ৭ম স্তব—এই চারিটি ভৃগুপুত্র সোমাত্তির।
ঋষি গৃৎসমদের স্তবগুলি নাদগভীর ও ভাবগভীর। একটি স্তব [ঋ. ২. ১২]
‘স জনাস ইন্দ্রঃ’—হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র—এই পৃথাসহ তিনি ইন্দ্রের যে স্তুতি
করিয়াছেন, তাহা অববত। ইন্দ্র ভীষণ, তাঁহার ভয়ে কম্পমান্ আকাশ, পৃথিবী, পর্বত ;
তিনি ‘অচ্যুতচ্যুৎ’—স্থিরকেও অস্থির করিয়া তুলেন। যেমন ইন্দ্র, তেমনি দেবতা ক্রতু।
ক্রতুও উগ্র এবং হিংস্র পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর [ঋ. ২. ৩৩]।

তৃতীয় মণ্ডলের ঋষিপ্রধান মহাতেজা বিশ্বামিত্র। তিনিই এই মণ্ডলের অধিকাংশ
মন্ত্রের দ্রষ্টা। তদগোষ্ঠীয় অত্যাগ ঋষিদের মধ্যে উৎকীল, ঋষভ, প্রজাপতি
(বিশ্বামিত্র পুত্র) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডলের মোট স্তবসংখ্যা ৬২।
এই দ্বিবিষ্টিতম স্তবের দশম ঋকটিই হিন্দুর প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র। ‘দধিনীব সপিঃ’—
বেদরূপ দধির সার এই ত্রিপদা গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্রে ঋষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রী ছন্দে
সবিতা দেবের বরগায় তেজকে ধ্যান করিয়া বলিয়াছেন,

তৎসবিতুর্ভরগেভ্যঃ ভর্গোদেবস্ত ধীমহি।

ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ [ঋ. ৩. ৬২, ১০]

—সবিতৃদেবের বরগায় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ
করেন। [অহুবাদ—বন্ধিমচন্দ্র]

এই মণ্ডলের ৩০নং স্বকৃতি ইতিহাসের দিক হইতে মূল্যবান। অমিতপ্রভ বিশ্বামিত্র স্বপক্ষীয় মৈত্রগণের পারাপারের নিমিত্ত যে প্রবলস্বোতা বিপাশা ও শতদ্রু নদীর স্রোতকে মন্দীকৃত করিয়াছিলেন, ইহাচার ভাঙ্গিত এই স্বকৃতে আছে। বিশ্বামিত্রের জ্ঞানগুলি উন্নত সংগ্রামে ক্রমা হইবার প্রাথমিক পূর্ণ-সমগ্রই বলিদ মনের প্রকাশ। অগ্নির মধ্যে তিনি দেখেন তদন্যায় তেজ—উজ্জ্বলত শিখের জ্বাল ঘাঁটার পরাক্রম, প্রদীপা শিখা ঘাঁটার কেশর। তদ্রূপ ইহাচার দৃষ্টিতে মচ্ছাভয়ঙ্কর মাহিয [‘মহা অসি মাহিয’—ঋ. ৩. ৫৬. ২.]।

চতুর্থ মণ্ডলের গোষ্ঠীপাত ঋষি বামদেব। এই মণ্ডলে মোট ৫৮টি স্বকৃ। অধিকাংশ স্বকৃের প্রমাণ বামদেব স্বয়ং। কেবল দুই একটি স্বকৃের ঋষিরূপে তদন্যায়, অজমীলুহ ও পুণ্ডরীকভের নাম দৃষ্ট হয়। বামদেবের মতে ‘ঋতিই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ’—ইহা যেমন গূঢ়, তেমনই ‘অনাদবর্ষী : ঋতি যেন সহস্র দারাবর্তী কামধেনু। দেবগণ স্রোতার অগ্ন প্রবাহ করেন। ‘ঋত’-দেবতার উদ্দেশ্যে বামদেবের জ্ঞানিত [ঋ. ৪. ২৩. ৮-১০] আতি স্বন্দর। ‘ঋত’ শব্দটি তুপ্রাচীন। Maxmüller বলেন, সবশক্তিমান পরমাত্মার আতি আদ্যম বৈদিক নাম ‘ঋত’—ইহা সত্যগাত, সত্যকর্ম ও সরল পথ,—এক কথায় ঋতই ধর্মনীতি। ঋষি বামদেব বলিতেছেন, ঋতদেবতার অনেক তেজ, অনেক শক্তি, বিচিত্র রূপ :

ঋতায় পৃথ্বী বহলে গভীরে

ঋতায় দেব পরমে দুহাতে ॥ [ঋ. ৪. ২৩. ১০]

—বিশ্বাণ (বহলে) ভুববগাহ জাবাপৃথিবী (পৃথ্বী) ঋত দেবেরই জন্ত। অত্যাশ্চর্য (পরমে) দেহরূপা জাবাপৃথিবী ঋতদেবের সেবার জন্তই অন্নজল দান করেন (দুহাতে) [অথবাদ—ঋতদাস দত্ত]। বামদেব-দৃষ্ট ‘হংসঃ শুচিষং’ ঋকটিও [ঋ. ৪. ৪০. ৫] বিখ্যাত। এই শ্লোক কঠোপনিষদেও স্থান পাইয়াছে। মন্ত্রটি ‘হংসবর্তী ঋক’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে সর্গভূতে অধিষ্ঠিত, সর্গাশ্রম্যামী, সবব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ উন্মোচিত হইয়াছে।

পঞ্চম মণ্ডলের মোট স্বকৃ সংখ্যা ৮৭। এই মণ্ডলের প্রধান ঋষি অত্রি। অত্রি-দৃষ্ট স্বকৃসংখ্যা আতি অল্প : বেশির ভাগ স্বকৃ অত্রির অপত্য ভোম, স্বপ্তি, জাবাণ প্রভৃতি ঋষির। ইহাতে কয়েকটি বিখ্যাত ‘নারাসংগী’ আছে। ঋষি অত্রির নারাসংগীতে [ঋ. ৫. ২৭] ত্র্যাক্ষ ও ত্রসহস্রার প্রশংসা দৃষ্ট হয়। ৩১নং স্বকৃতে ঋষি জাবাণ বীর ভরস্কের পত্নী শকীরদীর প্রশংসা করিয়াছেন।

এই মণ্ডলের ২৮নং স্তব্ধের দ্বিতীয় অত্রিগোত্রজা মহিলা ঋষি ‘বিশ্ববারা’। বৈদিক নারীরও যে স্বজ্ঞকর্মে অধিকার ছিল, তাঁহারাও যে দিবা অমৃতভূতি দ্বারা অমৃতপ্রাপ্ত হইতেন, বিশ্ববার-দৃষ্ট অগ্নিস্বকৃত তাহার প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন :

সমিদ্বো অগ্নিদিবি শোণিরশ্চেৎ
প্রতাণ্ড্ মুষসমুবিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভি-
দেবা ইলানা হবিষা ঘৃতচী ॥ ঋ. ৫. ২৮. ১]

—প্রজলিত এই অগ্নি আকাশের দিকে তাহার শিখা বিস্তার করিয়া উষার অভিমুখে প্রদীপ্ত হইয়াছেন। অর্চনরতা, ঘৃতপাত্রহস্তা বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখী হইয়া স্তুতি উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অগ্নির নিকট বিশ্ববারার প্রার্থনাটিও সুন্দর : তিনি বলিতেছেন, হে অগ্নি, তুমি শত্রুগণকে দমন কর। আমাদের যেন মহৎ সৌভাগ্য লাভ হয়, তুমি আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কে স্তুতিপ্রদীপ্ত কর : ‘সংজাম্পত্যং সুযমমা কৃণুগ ॥’ [ঋ. ৫. ২৮. ৩]

ষষ্ঠ মণ্ডলের গোত্রপ্রধান ঋষি ভরদ্বাজ। এই মণ্ডলে ৭৫টি স্তব্ধ আছে। ভরদ্বাজ ও তদগোত্রীয় সুহোত্র, নর, শংযু, গর্গ প্রভৃতি স্তব্ধগুলির দ্রষ্টা। অনেকগুলি স্তব্ধের শেষে একই প্রার্থনা—‘আমরা যেন শোভন সন্ততি সম্পন্ন হইয়া শত হেমস্ত স্বখভোগ করি।’ একটি ঋকে ঋষি গর্গ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ইন্দ্রমায়ার কথা বিবৃত করিয়াছেন। একই ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপে বিভাসিত :

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব
তদস্ত্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রে মায়্যভিঃ পুরুরূপ ইয়তে
যুক্তা হস্ত হরয়ঃ দশাশতঃ ॥ ঋ. ৬. ৪৭. ১৮]

—সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হইয়েন। তিনি মায়্যা দ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞমানের নিকট উপস্থিত হইয়েন। তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে। [অমৃতবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত]

ঋষি গর্গের এই ঋকটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে ‘মধুবিষ্ঠা’ নামে অভিহিত হইয়াছে, কারণ, সকল রূপের অন্তরালে সেই অরূপই মধু বা অমৃতের উৎস। তাঁহাকে জানিলেই অমৃতের স্বরূপ জানা যায়।

—এই মণ্ডলের অন্তর্গত ঋষি ভরষাঙ্কের ‘সুতবর্তী কুবনানামভিপ্রিয়া’ [ঋ. ৬. ৭০. ১] মন্ত্রটিও অতি স্তম্ভর। বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে জাণাপৃথিবী মধুময়। ঋষি বলিতেছেন, জাণাপৃথিবী সুতবর্তী ও মধুত্বা, তাহার দেবতারূপে আমাদের কাছে যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও স্তবর্ণ দান করেন।

সপ্তম মণ্ডলের গোষ্ঠিপতি মহর্ষি বসিষ্ঠ। এই মণ্ডলের মোট ১০৪টি স্তোত্রেরই স্রষ্টা বসিষ্ঠ। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, ‘বসিষ্ঠের পাণ্ডুলিপিগোষণা ও ধর্মোপাসা পবিত্রভাবে জন্ম প্রাপ্ত করে।’ উক্তিটি এক হিসাবে সত্য। অবশ্য বৈদিক স্তোত্র ঋষি মাত্রই ‘শ্রীকাম কিংবা মেধাকামঃ প্রায় প্রতি স্তোত্রেই প্রার্থনা বা কামনা। সেই প্রার্থনাই বসিষ্ঠ-স্তোত্রাবলীতে অতি উচ্চ গ্রামে ছন্দিত হইয়াছে। শুধু নিজের জন্ম নয়, পুত্র-পৌত্রাদির জন্ম, ধন, যশ ও রক্ষা প্রার্থনায় ঋষিকর্তৃ অধার। ‘মৃড়া স্তম্ভয় মৃডয়’ [ঋ. ৭. ৮০]—হে স্তম্ভ দয়া কর, দয়া কর, কিংবা ‘যয়ি, তস্ত, সখাদি দেবতার নিকট ‘যয়’ পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ’—ভোমরা স্বস্তি দ্বারা সদা আমাদের পালন কর—ইহাই প্রায় প্রতিটি স্তোত্রের স্তোত্রান্তিক ধরণ।

বসিষ্ঠ-দৃষ্ট উষা স্তম্ভগুলি ও চমৎকার কবিতা। ‘হিরণ্যবর্ণা স্তম্ভশী’ উষার আবির্ভাব এক অপার বিষয় [৭. ৭৫—৮১]। সর্গাপেক্ষা বিখ্যাত ঋষি বসিষ্ঠের ত্র্যম্বক মন্ত্র। বিশ্বামিত্র দৃষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রের মতই ইহা শক্তিশালী। শৈব ও শাক্ত সাধকের নিকট এই মন্ত্রের অশেষ সমাদর। মন্ত্রটি এই—

ত্র্যম্বকং যজামহে সৃগ্যাং পুষ্টিবর্ধনম্।

উবারকমিব বন্ধনায়ুতো মুক্ষীয় মায়াতং ॥ [ঋ. ৭, ৫০. ১২]

সৃগ্যাং, পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকেব উপাসনা করি। উবারক ফলের লাগ্ন্য বেন আমরা বন্ধন ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে বেন বঞ্চিত না হই।

অষ্টম মণ্ডলকে ‘প্রগাথ’ মণ্ডল বলে। কারণ প্রগাথ নামক একপ্রকার মিশ্রছন্দে মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত। প্রগাথ একজন ঋষি ও বটেন : ঈনি খোর ঋষির পুত্র হইলেও কথের পুত্র বলিয়া পরিচিত।^১ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ‘কথ’ বা তৎসংশ্লিষ্ট অষ্টম মণ্ডলের ঋষি। কিন্তু এই মত বৃক্তিসহ নহে। কারণ, কথগোত্রীয় ঋষি ছাড়াও এই মণ্ডলে অনিরা গোত্রীয় বৈয়স, অত্রি-কস্তা অপালা এবং ভৃগুবংশের নেম, জমদগ্নি

প্রভৃতির স্তব্ধ আছে। অতি প্রাচীন কয়েকজন ঋষি—নারদ, মনু, নাভাগ প্রভৃতির স্তোত্রও এই মণ্ডলের অন্তর্গত। উপরন্তু ‘বালখিলা’ স্তব্ধগুলিও এই মণ্ডলের অন্তর্গত। অষ্টম মণ্ডল সকল দিক হইতেই মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত। অনেক মনে করেন, এই মণ্ডল লইয়াই ঋগ্বেদ সমাপ্ত হইয়াছিল। ১১টি বালখিলা স্তব্ধসহ এই মণ্ডলে ১০৩টি স্তব্ধ আছে। এই মণ্ডলে মনু ঋষি-দৃষ্ট স্তব্ধগুলি অতি স্বন্দর। দেবতার হবে তিনি প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন : ছোতমান্ দেবতা অভীষ্টবর্ষী, তাঁহাদের ভিতর ছোট-বড় নাই, সকলেই মহান [‘বিশ্বে সতো মহাস্ত ইৎ’—ঋ. ৮. ৩০, ১] ঋষির প্রার্থনা,

তে ন দ্বাপর* তে অবত তে উনো অধিবোচত।

মা নঃ পথঃ পিত্র্য্য মানবাং অধিদূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ [ঋ. ৮. ৩০. ৩]

—তোমরা আমাদেরকে ত্রাণ কর, রক্ষা কর—আমাদেরকে মিষ্ট কথা বল, পিতৃলোকের পথ হইতে আমাদেরকে দূবে নিক্ষেপ করিও না।

আর একটি মধ্যে ঋষি মেধা একই দেবতার বহুরূপে প্রকাশের কথা ব্যক্ত করিতেছেন :

এক এবাগ্নি বহুধা সমিদ্ধ

একঃ সূর্য্যো বিশ্বমহু প্রভূতঃ।

একৈবোষা সর্বমিদং বিভাতি

একং বা ইদং বিবদুর্ব সর্বম্ ॥ [ঋ. ৮. ৪৮ ২]

—এক অগ্নি বহুধা প্রজ্জলিত, এক সূর্য্য বহুরূপে বিশ্বে অম্লপ্রবিষ্ট ও একই উষা নানাভাবে ভাস্বর ; যিনি এক, তিনিই সর্ব হইয়া আছেন।^২

নবম মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মোট ১১৪টি স্তব্ধের দেবতাই পবমান সোম। এইজন্য ইহাকে সোমমণ্ডল বলা হয়। সোমদেবতার স্তব্ধ অন্যান্য মণ্ডলেও আছে। তবুও বিশেষভাবে কতকগুলি সোমস্তুতি এই মণ্ডলে সমাহৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগে সোমযাগ ছিল অন্যতম যাগ : প্রায় প্রত্যেক যজ্ঞেই দেবতার উদ্দেশে সোম নিবেদন করা হইত। সোমলতার মধ্যে ঋষিগণ অম্নে তেজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, সোমরস মানুষকে দিব্যালোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে : সোমের উদ্দেশে তাই তাঁহাদের প্রার্থনা :

২। এই মন্ত্রটি বালখিলা স্তব্ধাবলীর অন্তর্গত দশম স্তব্ধের দ্বিতীয় মন্ত্র।

যত্র জ্যোতিরজ্ঞঃ স্মিল্লোকে স্থহিতম্ ।

তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে

ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব ॥

যত্র রাজা বৈবস্বতে। যত্রাবরোধনং দিবঃ ।

যত্রানুগ্ধ স্বতীরূপে স্তত্র মামমৃতং কৃধি

ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব ॥

যত্রা চ কামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ ।

লোকা যত্র জ্যোতিষ্যস্ত স্তত্র মামমৃতং কৃধি

ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব ॥

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রহ্মশ্চ বিটপম্ ।

স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধি

ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব ॥

যত্রানন্নাশ্চ মোদাশ্চ মৃদঃ প্রমৃদ আসতে ।

কামস্ত যত্রাপ্তাঃ কামা স্তত্র মামমৃতং কৃধি

ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব ॥ [ঋ. ৯. ১১৩. ৭-১১]

—যে লোকে অবিনশ্বর অজস্র জ্যোতি, যে লোকে আদিত্যাখ্য আলো নিহিত, হে পবমান, আমাকে সেই অক্ষীণ লোকে লইয়া যাও । হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্তু করিত হও ।

যেখানে আছেন রাজা বৈবস্বত, যাহা স্বর্গের দ্বার ; যেখানে আছে আকাশ-গন্ধার্দী পুণ্য সরিৎ—সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর । হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্তু করিত হও ।

যে দু্যলোকে উত্তম, মধ্যম, অধম তিন স্থানই বর্তমান, যেখানে বিষ্ণুর পরম পদ, অপিচ যে লোক পরম জ্যোতির্ময়—সেই উত্তম লোকে আমাকে লইয়া অমর কর । হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্তু করিত হও ।

যেখানে সকল কামনার শেষ, যেখানে সকল কর্মের প্রেরণা-উৎস আদিত্যের স্থান ; যেখানে স্বধা, যেখানে তৃপ্তি—সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর । হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্তু করিত হও ।

যেখানে আনন্দ, আনন্দ, কেবল আনন্দ, যেখানে সকল কামনা পূর্ণকাম—সেইখানে আমাকে লইয়া অমর কর । হে ইন্দো, ইন্দ্রের জন্তু করিত হও । এই সূক্তটিতে বৈদিক যুগের স্বর্গ-কল্পনার একটি স্বন্দর আলেখ্য পাওয়া যায় ।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল প্রথম মণ্ডলের মতই নানা গোত্রীয় ঋষিদের স্তুতির সমষ্টি। অনেকে বলেন দশম মণ্ডলটি পরবর্তী কালের সংযোজন। কোন কোন স্কন্ধের সরলীকৃত ভাষাই এই সিদ্ধান্তের কারণ। দশম মণ্ডলের দর্শনকাল বা সম্ভলনকাল যাহাই হউক, এই মণ্ডলের মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। ইহাতে মোট ১২১টি স্তুতি আছে [প্রথম মণ্ডলের স্তুতসংখ্যাও ১২১]। ইহার ঋষি অনেক—ত্রিষ্ট, ত্রিশিরা বিমদ, কবষ, লুশ, ঘোষা, বাক্, বৃহত্‌কথ, গয়, অজ, বেন, অজি, জমদগ্নি প্রভৃতি। কয়েকটি স্তুতের দেবতাই ঋষি, যেমন যম, ইন্দ্র, অগ্নি, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা। বিশ্বকর্মা, বৃহস্পতি, সূর্য্যও কয়েকটি স্তুতের দ্রষ্টা। এই মণ্ডলের বিষয়বৈচিত্র্যও অসাধারণ। সামান্য অক্ষকীড়াও যেমন ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে [১০. ৩৪], তেমনই অনেক গভীর ও গভীর ভাববৃত্তি—শ্রদ্ধা, দান ও সত্যোক্তি ও সৃষ্টির বিষয়ও ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। অতি বিখ্যাত কয়েকটি সংবাদস্তোত্র বা আখ্যানস্তুত—যেমন যম ও যমীর কথোপকথন [ঋ. ১০. ১০], পুরুরবা ও উর্বশী সংবাদ [ঋ. ১০. ২৫], সরমা ও পণির উপাখ্যান [ঋ. ১০. ১০৮] এই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। যমের আত্মসংযম চারিত্রিক দৃঢ়তার একাদর্শ। যম ও যমীর কথোপকথনে এই আদর্শই রূপায়িত হইয়াছে। পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ ভারতীয় কাব্য ও নাটকের আদি উৎস। উর্বশী স্বর্গের অঙ্গরী, পুরুরবা মর্তের রাজা। মিলনান্তে নায়ক-নায়িকার বিদায়ী সংলাপ এই সংবাদের বর্ণনীয় বিষয়। সরমা-পণি আখ্যানে সরমার নিলোভ চরিত্র আর এক উজ্জল আদর্শ। সরমা স্বর্গের শুনী, ইন্দ্রের দূতী। ইন্দ্রের নির্দেশে তিনি পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীর সন্ধানে আসিয়াছেন। পণিগণ ধন-সম্পদ দ্বারা সরমাকে প্রলোভিত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু বিশ্বস্ত সরমা। প্রলোভন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

দশম মণ্ডলের ‘সূর্যাস্তুত’ [ঋ. ১০. ৮৫] বহুখ্যাত। ইহাতে বৈদিকযুগের বিবাহ-পদ্ধতির চিত্র পাওয়া যায়। আর্ঘের বিবাহ শুধু ভোগ নয়, গৃহ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ইহার লক্ষ্য। বধু এখানে পবিত্র গার্হপত্য ব্রতের কল্যাণী সঙ্গিনী। বিবাহকালে ভাবগভীর কণ্ঠে আত্মীয়-স্বজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বর বলেন,

স্বমঙ্গলীরিয়ং বধুরিমাং সমেত পশত।

সৌভাগ্যমশ্ৰৈ দদ্বা ষাথাস্তং বিপরেতন ॥ [ঋ. ১০. ৮৫. ৩৩]

—এই বধু মঙ্গল লক্ষণযুক্ত। আপনারা সমবেত হইয়া ইহাকে দেখুন। ইহাকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া গৃহে গমন করুন। ইনি যেন আপনাদের বিপ্রিয়া না হন।

বধূকে গৃহে আনিবার সময় কত না উপদেশ। তুমি প্রসন্ন দৃষ্টিসম্পন্ন হও, পতির মঙ্গলকারিণী হও। তোমার মন যেন সর্বদা সতেজ ও সদা প্রফুল্ল থাকে। তুমি বীর-প্রসবিনী, জীবৎ-বৎসা, দেবকামা হও। গৃহের পরিজন তো বটেই, গৃহপালিত পশুর প্রতিও বধু যেন মঙ্গলকারিণী হন। এই বিবাহ দাসীত্ব নহে। পতির গৃহে বধুর সম্রাজ্ঞীর অধিকার :

সম্রাজ্ঞী স্বশ্রেণে ভব সম্রাজ্ঞী স্বশ্রাং ভব।

ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবযু ॥ [ঋ. ১০. ৮৫. ৪৬]

—তুমি স্বশ্রেণ-শাস্ত্রীর উপর সম্রাজ্ঞী হও, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় অধিকার লাভ কর।

‘দানন্ততি’ ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত আছে। দশম মণ্ডলে ভিক্তু ঋষির ‘দানন্ততি’ [ঋ. ১০. ১১৭] উল্লেখযোগ্য। ঋষি বলিতেছেন, দাতার ধন কখনও শূন্য হয় না—‘উতো রয়িঃ প্রিণতো নোপদস্যতি’। এই মণ্ডলে বৈদিকযুগের কতিপয় সংস্কার ও প্রাচীন বিশ্বাসেরও পরিচয় রহিয়াছে। মৃত্যু সম্পর্কে ঋষিদের ধারণা অতি স্পষ্ট। তাঁহারা জানেন,

ন দেবানামতিত্রতং শতাত্মা চ ন জীবতি।

তথা যুজা বি ববুতে ॥ [ঋ. ১০. ৩৩. ২]

—শতাত্মা হইলেও দেবতাদিগের মর্খাদা অতিক্রম করিয়া কেহ চিরদিন বাঁচে না। এইজন্যই মৃত্যুর বিয়োগ হয়।

মৃত্যু হইবেই, তাহাতে দুঃখ নাই। ‘অণ্ড মমার স হঃ সমানঃ’ [ঋ. ১০. ৫৫. ৫]—কাল যে জীবিত, আজ সে মৃত। তবুও এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত গভীর আকৃতি। ‘জ্যোক্ত পশ্চেম সূর্যমুচ্চরন্তম্’ [ঋ. ১০. ৫২. ৫]—আমরা যেন চিরকাল সূর্যোদয় দেখিতে পাই; মৃত্যু হইলেও আবার যেন প্রাণ পাই,—

পুন নোঁ অস্থং পৃথিবী দধাতু

পুন দ্যৌ দেবী পুনরন্তরিক্স।

পুন নঃ সোমস্তস্বং দধাতু

পুনঃ পুষা পথ্য্যং যা স্বস্তি ॥ [ঋ. ১০. ৫২. ৬]

—পৃথিবী পুনরায় আমাদের জীবন দান করুন। দ্যলোক ও অন্তরিক্স পুনরায় জীবন দান করুন। সোম পুনরায় আমাদের দেহ দান করুন, আর শুভকারী পুষা পুনরায় আমাদের বাক্য দান করুন।

দশম মণ্ডলের ‘পুরুষ হুক্ত’ [২০ হুক্ত], ‘দেবী হুক্ত’ [১৪৫ হুক্ত] ও ‘রাজিশুক্ত’ [১২৭ হুক্ত] নানাদিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষহুক্তে ‘সর্বলনীর্ধা...

সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাদ্' পুরুষের বিশ্বব্যাপী রূপ আভাষিত হইয়াছে। দেবীস্বকৃ শক্তি-উপাসনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ : এখানে ব্রহ্মরূপিণী দেবীর সর্বাঙ্ক, সর্বাঙ্গধারী শক্তির পরিচয় আছে। ঋষিকল্পা বাক্ এই স্বজ্ঞের দ্রষ্টা। 'রাত্রি স্বকৃ' রাজারূপা মহাশক্তির আর একরূপ। এই দুইটি স্বকৃই চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ করার বিধান আছে।

বৈদিক ঋষিদের সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যান-ধারণার পরিচয় রহিয়াছে দশম মণ্ডলের অন্তর্গত 'নাসদীয় স্বকৃ' [১২২], 'হিরণ্যগর্ত স্বকৃ' [১২১] ও অশ্বমর্ষণ স্বকৃ' [১২০]। সৃষ্টিবিষয়ে ঋষিদের চিন্তা যে কত স্বল্প ও উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, এই সকল স্বকৃ হইতে তাহার পরিচয়:পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না—না সৎ, না অসৎ : মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না—দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। সমস্তই চিহ্নবিহীন, তমোভূত, জলমগ্ন। ঋষিবাক্যে সেই চরাচর ব্যাপ্ত মহাশূন্যতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে :

নাসদানীন্নো সদানীভদানীঃ
নাসীদ্রজো নো ব্যোম পরো যৎ ।
কিমাৱরীবঃ কুহ কস্য শর্মরজঃ ।
কিমানীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ [ঋ. ১০. ১২২. ১]

—তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না—যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল ? কোথায় কাহার স্থান ছিল ? হৃগম ও গভীর জল কি তখন ছিল ? [অত্ৰুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত]

পৃথিবীর এই প্রথম অবস্থা যে অব্যক্ত ও অচিন্ত্য, বৈদিক ঋষি তাহা অত্ৰুভব করিয়াছিলেন। পরম সত্যকে বুঝিতে না পারায় তাঁহাদের কণ্ঠে আত্মার গভীর জিজ্ঞাসা ক্রন্দনের মত ধ্বনিত হইয়াছে^১ :

কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত অজ্ঞাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ।
অর্বাগ্ দেৱা অস্য বিসর্জনেন
অথ কো বেদ যত আবভূবঃ ॥ [ঋ. ১০. ১২২. ৬]

১। There arises a sad wail, set 'to sadder music of the soul's lament over the defeat of human hopes to pierce the secret of the omniscient and omnipotent cause which existed from before all time :—
Literary Hist of India. Chap iv, Frazer.

—কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল, কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সকল নানা সৃষ্টির পরে হইয়াছেন। কোথা হইতে হইল কেই বা জানে? [রঃ দঃ]

বৈদিক ঋষিগণ সৃষ্টির আদি খুঁজিয়াছেন, উপলব্ধি ভাবায় রূপায়িত হইয়াছে। সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ না করিয়া^১ তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, মনীষী কবিগণ নিজের হৃদয়ে বুদ্ধি দ্বারা পর্যালোচনা করিয়া অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন :

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন

হৃদি প্রতীয়া কবয়ো মনীষা। [ঋ. ১০. ১২২. ৪]

এই ১২২নং সূক্তই বিখ্যাত ‘নাসদীয় সূক্ত’ : ইহার দ্রষ্টা স্বয়ং প্রজাপতি। অল্প একটি সূক্তেও [ঋ. ১০. ৭১] বলা হইতেছে, অসং হইতে সতের উৎপত্তি— [‘দেবানাম যুগে প্রথমে অসতঃ সদজায়ত’, ঋ. ১০. ৭২]।

এই সূক্তগুলির পরিপূরক হিরণ্যগর্ভ সূক্ত [ঋ. ১০. ১২১]। অব্যক্ত এক হইতে যিনি জন্মিলেন, তিনি দেবগণের পুরোধা দেবতা হিরণ্যগর্ভ। ইনিই পরম প্রজাপতির প্রথম পুত্র। প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ—মূল সৃষ্টির কারণ। তিনিই এই সূক্তের দ্রষ্টা। উদাস্ত স্বরে তিনি ঘোষণা করিলেন :

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে

ভূতস্য স্রাতঃ পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং জাম্ উত ইমাম্

কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ (ঋ. ১০. ১২১. ১)

—হিরণ্যগর্ভ আবির্ভূত হইয়াছেন সর্বাগ্রে। জাত হইয়াই তিনি নিখিলের একমাত্র পতি হইলেন। তিনি ধারণ করিলেন এই পৃথিবী ও দ্যলোক। কোন্ দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা অর্চনা করিব?^২ (ডাঃ স্ত্রধীর দাশগুপ্ত)

১। এই হিরণ্যগর্ভ সূক্তে মোট ১০টি ঋক্ : প্রথম ঋকটি এখানে উদ্ধৃত হইল। দশম ঋক্ ব্যতীত প্রত্যেকটি ঋকের পরেই ‘কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম’ এই উক্তি আছে। অনেকেই এই বাক্যটিকে প্রশ্নবোধক ধরিয়া অত্ববাদ করিয়াছেন To what God shall we offer our oblation? [Muir’s—O.S.T. Vol. iv]—কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করিব? [রঃ দঃ]। কিন্তু আচার্য সাগর অর্থ করিয়াছেন, ‘কং প্রজাপতিং দেবায় দেবং...হবিষা...বিধেম পরিচরেম’—তাঁহার মতে, ‘ক’ নামক প্রজাপতিই এই সূক্তের দেবতা—‘ক-শব্দাভিধেয়ঃ প্রজাপতি দেবতা’। ইহার অর্থ—‘ক’ নামক দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা অর্চনা করিব।

কুত্র ‘অঘমর্ষণ’ হুক্তটি [ঋ. ১০. ১২০] পূর্বোল্লিখিত হুক্তগুলির চূষক। এই হুক্তে অতি সংক্ষেপে সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, বিধাতার (হিরণ্যগর্ভের) উৎপত্তি এবং বিধাতার সৃষ্টি পত্তনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুর নিত্যসন্ধ্যার মন্ত্রে পাণকয়ের নিমিত্ত এই ‘অঘমর্ষণ’ হুক্তটি পাঠ করা হয় :

ঋতঞ্চ সত্যাকাশীদ্ধাং তপসোহধ্যজায়তঃ ।

ততো রাত্ৰ্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ষবঃ ॥ ১ ॥

সমুদ্রাদর্শবাদধি সংবৎসরোহজায়ত ।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বশ্রমিষতো বশী ॥ ২ ॥

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ।

দিবঞ্চ পৃথিবঞ্চান্তরিক্ষমথ স্বঃ ॥ ৩ ॥

—প্রজ্বলিত তপস্তা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিনরাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন। তাবৎ লোক দেখিতেছে। সৃষ্টিকর্তা যথা সময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন। [অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত]

বেদের সংহিতাভাগে প্রায় সর্বত্রই প্রার্থনা। কতিপয় দানজ্ঞতি, নারাশংসী ও দার্শনিক হুক্ত ব্যতীত সর্বত্রই স্তুতিযোগে কাম্য প্রার্থনা করা হইত। ঋষিরা ছিলেন শ্রীকাম ও মেধাকাম। শ্রীকাম ঋষিগণ ধন, জন, পুত্র, আয়ু ও সৌভাগ্য কামনা করিতেন। কিন্তু মেধাকাম ঋষিগণ জ্ঞান প্রার্থনা করিতেন, কখনও বা সৌমনস্ত্র ও ঐকমত্য প্রার্থনা করিতেন। বৈদিক ঋষিদের সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতের মন্ত্রগুলি শাস্ত্রত মানবধর্মের বলিষ্ঠ প্রকাশ। দশম মণ্ডলের শেষ হুক্তটি এইরূপ সৌমনস্ত্র প্রার্থনা। ইহার ঋষি ‘সংবলন’, দেবতা ‘সংজ্ঞান’ বা ‘ঐকমত্য’। ইহাতে সাম্যের উদার মন্ত্র উদ্ঘোষিত হইয়াছে :

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাসি জানতাম।

দেবা ভাগ যথা পূর্বে সং জনানা উপাসতে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানী সমানং মনঃ সহচিন্তমেবাং ।

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

সমানী বঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমন্ত্র বো মনো যথা বঃ হৃসহাসতি ॥ [ঋ. ১০. ১২১. ২—৪]

—তোমরা মিলিত হও, একত্রে শ্রব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর এক হউক। প্রাচীন দেবতাগণ একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকার হউক, ইহার সঙ্গে সমাগত হউন ইহাদিগের মন; চিন্তা সকলও একপ্রকার হউক। আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের একামতের জন্য হোম করিতেছি। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অস্তঃকরণ এক হউক। তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্বপ্রকারে একমত হও।

Maxmuller সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতায় দশটি মণ্ডলের অতিরিক্ত ৩২টি ‘খিলসূক্ত’ যোজিত হইয়াছে। ভাষা বিচার করিলে উহাদিগকে খুব প্রাচীন বলা চলে না। এগুলি মূল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। শোনক বলেন, খেলিক নামক যে সূক্ত, সেগুলিকে মূল সূক্তগুলির সহিত গণনা করা হয় না।^১ কিন্তু বহুবিখ্যাত ‘শ্রীসূক্ত’টি এই খিল অংশের অন্তর্গত। শ্রীসূক্ত হিরণ্যবর্ণা হরিতকাস্তি লক্ষ্মীর আবাহন মন্ত্র। ইহার নবম ঋকটি খুব বিখ্যাত,

গন্ধদ্বারাং ছুরাধ্বাং নিত্যপুষ্ঠাং করীষিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বসয়ে শ্রিয়ম্॥

—গন্ধ লক্ষণা ছুরাধ্বা নিত্যপুষ্ঠা (শস্ত্রাদি দ্বারা) শুদ্ধ গোময়বতী (অর্থাৎ গবাদি বহু পশু সমৃদ্ধা) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে আমি এখানে আহ্বান করিতেছি। [অনুবাদ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত]^২

খিল সূক্তে বিষ-অপনয়নের মন্ত্রও স্থানলাভ করিয়াছে। একটি সূক্তে অজগর, কালিক ও কর্কোটক সাপের নাম পাওয়া যায়। অন্য একটি সূক্তে জরংকার, জরংকন্টা ও আস্তীকের নাম রহিয়াছে।

ঋগ্বেদের জগৎ জীবনের ছন্দে ছন্দিত। সে জীবন বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ, দেবভাবে পূর্ণ। ঋগ্বেদের মন্ত্রগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ‘Pastoral tribes’; বৈদিক সূক্তগুলিকে কেহ কেহ বলিয়াছেন ‘চাষার সঙ্গীত’। সে যুগের সভ্যতা কৃষি-নির্ভর ছিল সন্দেহ নাই—গোধন, শস্ত্রসম্পদ ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু এ সভ্যতা নানাদিক হইতে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত বহন করে। এ যুগেও রাজা ছিল, রাজ্য ছিল, দার্শনিক চিন্তা ছিল, স্বপ্ন মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ছিল। অলৌকিকতা ও ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস

১। খেলিকা নাম নাদেশোহস্মিন্ গ্রন্থে অনুবাকানাং।

যজ্ঞ চর্চায়তে বেদে তস্য সংখ্যতি ন শ্রুতিঃ ॥

২। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

যেমন ছিল, তেমনই অপরদিকে যুক্তি-বুদ্ধিও অভাব ছিল না। ‘কো দর্শ প্রথমং জায়মানং’ বলিয়া সংশয়প্রসূ ও তাঁহাদের মনে জাগিত।। সর্বোপরি এ যুগের মানুষের ছিল, কবিত্তে ভরা মন উদার প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া ভগবদ্ মহিমায় তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, আর সেই সঙ্গে আবেগোচ্ছল সঙ্গীতে তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত ‘Pearls of lyric Poetry’; দেবতার সহিত তাঁহাদের ছিল সখ্যপ্রীতির সম্পর্ক—এ সম্পর্ক বাহিরের নয়, অন্তরের দিব্য শক্তিই তাঁহাদিগকে উদার, বলিষ্ঠ ও সাম্য-মৈত্রীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আর্য সাম্যমন্ত্রগুলি শাস্ত মানবতার আদর্শে উদ্দীপ্ত।

খ। যজুর্বেদ-সংহিতা

যজুর্বেদের প্রধান সংহিতা দুইখন্দি : তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয় সংহিতা অথবা রুক্ষ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। বেদব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ উপদেশ করেন। বৈশম্পায়ন এই বেদ তাঁহার শিষ্যবর্গকে প্রদান করেন। শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম শিষ্য ছিলেন ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য। ব্রহ্মহত্যার পাপক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্ত কীরূপ হওয়া উচিত—এই প্রশ্ন লইয়া গুরুশিষ্যে মতভেদ হয়। গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া শিষ্যকে তাঁহার উপদিষ্ট বেদ পরিত্যাগ করিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বেদ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সহাধ্যায়ী ঋষিগণ তত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া এই বেদ গ্রহণ করেন। এইজন্য যজুর্বেদের এই শাখার নাম হয় ‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’। ইহাকে ‘রুক্ষ যজুর্বেদ’ও বলা হয়। এই সংহিতায় গতাংশের সহিত পতাংশ মিশ্রিত হইয়া আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য হৃষ্যদেবের আরাধনা করিয়া যজুর্বেদের একটি নূতন শাখা প্রাপ্ত হন। হৃষ্যদেব বাজিরূপ ধরিয়া এই বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় ‘বাজসনেয় সংহিতা’। কেহ কেহ বলেন, ‘বাজ’ শব্দের অর্থ অন্ন। কীরূপে এই অন্ন উৎপন্ন হয়, তাহার নির্দেশ এই সংহিতায় আছে বলিয়া ইহার নাম বাজসনেয় সংহিতা। ইহা ‘শুক্ল যজুর্বেদ’ নামেই বেশি পরিচিত। শুক্ল অর্থাৎ পরিষ্কৃত। ইহাতে গতাংশ ও পতাংশ পৃথক ভাবে সন্নিবিষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য এই বেদকে পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত করিয়া কথ, মধ্যম্ভিন প্রভৃতি শিষ্যবর্গকে প্রদান করেন। বাংলা দেশে শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যম্ভিন শাখার অধিক প্রচলন। আচার্য মহীধর ইহার ভাষ্যকার।

শুক্ল যজুর্বেদ চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় আবার কতকগুলি কণ্ডিকা বা ময়ের সমষ্টি। কোন কণ্ডিকার মন্ত্র গণ্য, কোনটির পণ্য। গণ্য মন্ত্রগুলি যজুর্বেদের নিজস্ব। অপর্যুগণ যজুর্বিধানে যজ্ঞশরীর নির্মাণ করিতেন ও যজ্ঞের

ক্রয়োদযোগ করিয়া দিতেন। যজ্ঞের ক্রিয়াকর্মের অংশ ছিল অপসর্গদের অধিকারে। এইজন্ত যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি ক্রিয়াত্মক, অনেকটা বৈদিক কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণের অনুরূপ। সমিধাহরণে, গো-দোহনে, যজ্ঞবেদী নির্মাণে, অগ্নিজননে, আহুতি প্রদানে এই সকল মন্ত্র প্রয়োগ করা হইত। প্রত্যেকটি কর্ম ছিল মন্ত্রপূত, প্রত্যেকটি দ্রব্য দেবভাবে ভাবিত। যজ্ঞে যজ্ঞমানের মন্তক মুগুন করা হইবে, ক্ষুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে হইবে :

শিবো নামাসি। স্বধিতিস্তে পিতা। নমস্তে অস্তু। মা মা হিংসীঃ। [৩. ৬২]

—তুমি শিব, মঙ্গলকর পরশু তোমার পিতা। তোমাকে নমস্কার। হিংসা করিও না। ইহাই যজুঃ মন্ত্রের ধরন।

যজুঃ-সংহিতার অধ্যায়-বিভাগেও স্বাতন্ত্র্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন যাগ-যজ্ঞ অনুসারে মন্ত্রগুলি বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দর্শযাগ, দ্বিতীয়ে পিতৃযাগ (শ্রাদ্ধ), তৃতীয়ে অগ্নিহোত্র, নবমে রাজসূয়, একাদশে অগ্নিচয়ন, বোড়শে শতরুদ্রিয় হোম ইত্যাদি। ষড়্বিংশতি অধ্যায় হইতে ঊনচত্বারিংশতম অধ্যায়ে খিলমন্ত্র অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সকল মন্ত্র। কোথাও বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও যজ্ঞবিধানও প্রদত্ত হইতেছে। এই সংহিতার শেষ অধ্যায়টি (৫০ অঃ) একটি উপনিষৎ; উহাই ঈশোপনিষৎ। যজুর্বেদ ক্রিয়ামূলক বলিয়াই এখানে দেবস্তুতিগুলি কাটা কাটা, একমাত্র শতরুদ্রিয় ব্যতীত ইহাতে সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কোন স্তুতি নাই।

সুত্র যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্রটি এই :

ইষে ড়া। উর্জে ড়া। বায়বহ। দেবো বঃ সবিতা

প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। [ঋঃ যজুঃ ১. ১]

এই মন্ত্রটি হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে দ্বিতীয় মন্ত্ররূপে পঠিত হয়। এই মন্ত্রের ঋষি স্বয়ং পরমেশ্বর প্রজ্ঞাপতি। ‘অনিয়তাক্ষর পাদাংবসানানং যজুঃ’—তাই যজুর্বেদের গণ্যমন্ত্রে ছন্দ-কল্পনার তেমন স্থান নাই। তথাপি প্রত্যেক অংশের বিভিন্ন ছন্দ কল্পনা করা হয়, ছন্দ বলিতে বুঝায় অক্ষরপরিমাণ। যজুঃমন্ত্রের পাদগুলি অনিয়তাক্ষরা হইলেও প্রত্যেকটি পাদ অক্ষরপরিমিত। তাই ইহার এক এক পাদে এক এক প্রকার ছন্দ। উপরের মন্ত্রের দেবতা ‘শাখা’ (পলাশ বা শমী শাখা)। শাখাছেদনে এই মন্ত্রটির প্রয়োগ। ইহার অর্থ—(হে শাখে), বৃষ্টির জন্য তোমাকে (ছেদন করিতেছি); বলকারক রসের জন্য তোমাকে (সংনিমিত করিতেছি); তোমরা আপ্যায়ক হও [‘বায়বহ’]। যজ্ঞরূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত দেব সবিতা তোমাঙ্গিকে সংযুক্ত করুন।

যজুর্বেদের মন্ত্রগুলিও স্ততিযুক্ত প্রার্থনা। তন্মধ্যে অতিবিখ্যাত ষোড়শ অধ্যায়ের ‘শতরুদ্রিয়’। ৬৬টি কণ্ডিকা বা মন্ত্রে ঈশান রুদ্রকে নমস্কার জানাইয়া প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে। রুদ্র এখানে পৌরাণিক শিবের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি পশুপতি, ভূতপতি, পৃষ্ঠিপতি—তিনি ‘স্তেন-তাধু-তঙ্করে’রও পতি। ইহারই উদ্দেশ্যে ঋষির নমস্কার ও প্রার্থনা

নমস্বে রুদ্র মণ্ডবে উতো ত ইষবে নমঃ।

বাহুভ্যামূত তে নমঃ ॥ ১ ॥

যা তে রুদ্র শিবা তত্তুরঘোরা পাপকাশিনী।

তয়া ন স্তম্বা শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাক্ষীহি ॥ ২ ॥

—হে রুদ্র, তোমার মন্থ্য (ক্রোধ) ও ইষুকে নমস্কার; নমস্কার তোমার বাহুকে। তোমার যে তনু অঘোর, মঙ্গলকর ও অপাপকাশিনী—সেই স্তম্বকর তনু দ্বারা, হে গিরিশ, আমাদিগকে দর্শন কর।

যজুর্বেদের গাথাময় প্রার্থনাগুলিও স্তম্বর। একটি মন্ত্রে ঋষি তেজ, বীর্ষ, বল ওজঃ (কাস্তি), মন্থ্য (ক্রোধ) ও সহ (সহিষ্ণুতা) প্রার্থনা করিতেছেন :—

তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহি।

বীর্ষমসি বীর্ষং ময়ি ধেহি।

বলমসি বলং ময়ি ধেহি।

ওজোহস্ত ওজো ময়ি ধেহি।

মন্থ্যরসি মন্থ্যং ময়ি ধেহি।

সহোহসি সহো ময়ি ধেহি ॥ [শুঃ বঃ ১২২]

আর একটি মন্ত্রে ঋষি এই পৃথিবীতে বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া শত শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার আকুতি জনোইতেছেন,

পশ্বেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্।

শৃংগ্যাম শরদঃ শতম্। প্রব্রবাম শরদঃ শতম্।

অদীনাঃ স্তাম শরদঃ শতম্। ভূয়শ্চ শরদঃ শতাং ॥ [শুঃ ৩৬.২৪]

—একশ বছর যেন চোখে দেখি। একশ বছর যেন বাঁচি। একশ বছর যেন কানে শুনি। একশ বছর যেন কথা বলিতে পারি। একশ বছর যেন অদীন হই। এইরূপ হউক শত শত বছর।

মধুমতী পৃথিবীকে বাঁহারা অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, এ প্রার্থনা তাঁহাদেরই। বৈদিক যুগের মানুষ জীবন-পলাতকা নহেন, জীবন-প্রেমিক।

(গ) সাম-সংহিতা

ঋষি জৈমিনী বেদব্যাসের নিকট হইতে সামবেদ লাভ করেন। ‘সহস্রবর্ষা সামন্’—সামবেদের সহস্র শাখা। জৈমিনীর পৌত্র স্বকর্মা, স্বকর্মার অগ্রতম শিষ্য পৌম্পিল্লি। পৌম্পিল্লি-শিষ্য কুথুম হইতে সামবেদের প্রসিদ্ধ ‘কৌথুমী শাখা’র ঙ্গপত্তি। সাম-সংহিতার এই কৌথুমী শাখার পাঠই বিশেষভাবে প্রচলিত।

এই সংহিতায় মোট ১৫৪০টি ঋক আছে। কতকগুলি ঋক দুইবার, এমনকি তিনবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। ৭৫টি বাদে আর সবগুলি ঋক ঋগ্বেদ সংহিতাতেও হান পাইয়াছে। পার্থক্য এই যে—ঋগ্বেদে ঋক ছন্দোবদ্ধ স্তুতি, সামবেদে উহার৷ চল্লি-লয় যুক্ত স্থলনিত গান।

সাম-সংহিতার ঋকগুলি দুইভাগে সাজানো—ছন্দ আচিক ও উত্তরাচিক। ছন্দ আচিকের ঋকগুলি আগ্নেয়, এন্দ্র ও পাবমান—এই তিন পর্বে বিভক্ত। মোট ৫১টি ঋক ছন্দ আচিকে স্থান পাইয়াছে। উত্তরাচিকে ২১টি অধ্যায়। ইহাতে ছন্দ আচিকের ছ মন্ত্র দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তর আচিকের মন্ত্রগুলি বিশেষতঃ গানের দ্ব্যাকারেই বিভক্তঃ গানগুলি সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ ৩, ৪ বা ৫টি ঋকের সমষ্টি। সামবেদ গীত পাঠ্যবৃত্ত গান, অনেকটা Hebrew Psalms-এর মত। যজ্ঞকালে উদ্গাতৃগণ এই মন্ত্র গান করিতেন। বৈদিক সাহিত্যে সামগানের যে কত উচ্চমূল্য ছিল, ঐতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিই—‘বেদানাং সামবেদোহস্মি’ তাহার প্রমাণ।

ছন্দ আচিকের আগ্নেয় পর্বের প্রথম ঋকটি হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে তৃতীয় মন্ত্ররূপে গঠিত হয়। মন্ত্রটি এই,

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য দাতয়ে ।

নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ [সাম. ছন্দ. আগ্নেয় ১, ১]

—এই ঋকের ঋষি ভরদ্বাজ। দেবতা অগ্নি। ছন্দ গায়ত্রী। ঋষি বলিতেছেন, হ অগ্নি, সূর্যমান হইয়া তুমি দেবগণকে হব্য প্রদানের নিমিত্ত আগমন কর। স্বাত্মরূপে এই আন্তরীর্ণ দর্ভে উপবেশন কর।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের ইতিহাসে সামগানের একটা বিশেষ স্থান আছে।

যে সঙ্গীত ‘শিশুবর্ভি পশুবর্ভি বেত্তি গীতরসং ফণী’—সেই শিশু-পশু-সর্পেরও যনোমুখকর গীতরসের আদি নির্ঝর সামবেদ। এই সামরব ভারতের তপোবনে প্রথম স্ননিত হইয়াছিল।

(ঘ) অথর্ব-সংহিতা

মহর্ষি ব্যাসদেব হইতে অথর্ববেদ লাভ করেন অমিতত্ব্যতি স্মৃন্ত। ঋষি স্মৃন্তর শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা এই বেদেরও বহু শাখা বিস্তৃত হয়। তন্মধ্যে পিঙ্গলাদ ঋষির ‘পৈঙ্গলাদ সংহিতা’ ও শৌনক ঋষির ‘শৌনক সংহিতা’ প্রসিদ্ধ। শৌনক শাখার পূর্ণাঙ্গ সংহিতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এ যাবত পৈঙ্গলাদ শাখার যে সংহিতা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই খণ্ডিত। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় উড়িষ্যার এক গ্রাম হইতে পৈঙ্গলাদ শাখার পূর্ণাঙ্গ সংহিতা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত অথর্ব-সংহিতা সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা শৌনক সংহিতারই আলোচনা। আমরাও শৌনক সংহিতাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে অথর্ববেদ নানাদিক হইতে বিশিষ্ট। অথর্ববেদ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম লিখিত আকর গ্রন্থ, যোগসাধনার ভিত্তি ও অতি প্রাচীন লৌকিক বিশ্বাসের ভাণ্ডার। অথচ প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রতি একটি তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ ইহাকে অপ্রাচীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ ইহাকে যজ্ঞানুপযুক্ত বলিয়া হীন প্রতিপন্ন করার প্রয়াস।

অথর্ববেদ অপ্রাচীন নয়। Weber সাহেব বলেন, ‘Atharva Samhita contains pieces of great antiquity’ [Hist. of Indian Lit.]; ঐতিহাসিক .রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘The Atharvaveda contains much earlier matter’ [Pre historic Ancient & Hindu India]; পণ্ডিতপ্রবর Winternitz বলেন, It is equally certain that magic poetry of the Atharvaveda is in itself at least as old, if not older than the sacrificial poetry of the Rigveda [A Hist. of Indian Lit. Vol 1] : বালগঙ্গাধর তিলক দেখাইয়াছেন, অথর্ববেদোক্ত ‘তৈমাতা’ স্বপ্রাচীন স্বমেরীয় ধর্মের সর্পদেবতা। অথর্ববেদের অর্ধেকেরও বেশি মন্ত্র ঋগ্বেদের মন্ত্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ববেদের আশ্চর্য মিল দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের বিষ্ণুহুক্ত, ত্র্যম্বক মন্ত্র, হিরণ্য-গর্ভ হুক্ত, দেবীহুক্ত প্রভৃতি অথর্ব-সংহিতারও প্রসিদ্ধ হুক্ত। অথর্ববেদের ঋষি ‘অথর্বাক্সিরস’ প্রাচীন ঋষিদের অন্ততম। অতএব অথর্ববেদ অপ্রাচীন, এই মত বিচারসহ নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি, অথর্ববেদে যজ্ঞানুপযুক্ত [‘অথর্ববেদস্ত যজ্ঞানুপযুক্ত শাস্তি-শৌষ্টিকাভি-চারাদি কর্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্ত বিলক্ষণ এব’—প্রস্থানভেদ]। এই আপত্তি একটু বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। শাস্তি, পুষ্টি, অভিচারাদির মন্ত্র ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদেও রহিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের শেষ যুক্ত বিষ-অপনয়নের মন্ত্র, সপ্তমণ্ডলের নিহুটি মন্ত্র [‘সহস্র শৃঙ্গে বৃষভো যঃ সমুদ্রাদদাচরং’] অথর্ব বেদেরই মন্ত্র [অ. ৪.৫, ১]। ঋগ্বেদেও রকোম্ব মন্ত্র [ঋ. ১০.৮ :] ও শাস্তি মন্ত্র অনেক আছে। যজুর্বেদেও এই ধরনের মন্ত্রের অসংখ্য নাই, যথা,

১। বধান দেব সবিভঃ পরমশ্রাং পৃথিব্যাং শতেন পশৈশ

যোহস্মান্ ঘেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিযঃ। তমতো মা মোক্। [শুঃ যঃ ১. ২৫]

—হে দেব সবিভা, যে আমাদের হিংসা করে, আমরা যাহাকে হিংসা করি তাহাকে শত পাশ দ্বারা অন্ধ তামিশ্র নরকে বন্ধন কর। অন্ধকার হইতে মুক্ত করিও না।

২। তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো ঘেষ্টি তমেযাং জন্তে দ্বয়ঃ [শু য. ১৫. ১৬]

—যাহাকে আমরা হিংসা করি, যে আমাদের হিংসা করে, তাহাকে ইহাদের মুখে নিক্ষেপ করিব।

যজ্ঞে যে এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ ছিল, ‘কৌশক যজ্ঞে’ তাহা বিবৃত হইয়াছে।

তাহা হইলে অথর্ববেদকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার বা ইহার অমর্যাদা ঘোষণার কারণ কি? স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, আদৌ দার্ষণ্য অসভ্য ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যেও অনাধিকারোচিত অনেক অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আধর্ষণ যখন সভ্য হইলেন, তখন এই অন্ধ বিশ্বাসগুলিকে স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিলেন। এই জন্যই অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রগুলি প্রথমে আধ-স্বীকৃতি লাভ করে নাই।^১

১। It is a repository of the magical charms and incantations which were used by the Indo Aryan people before they became civilised by contact with the Dravidians and which in a later stage of culture, they were ashamed to recognise as a part of their holy ritual. Pre-historic Ancient Hindu & India—K. D. Banerji)

আমাদের মনে হয়, অথর্ববেদে আৰ্যপূর্ব জাতির বহু সংস্কার ও বিশ্বাস স্থান লাভ করিয়াছিল। এগুলি ছিল ‘a real popular belief uninfluenced by the priestly religion’, এই লৌকিক সংস্কারগুলিকে উচ্চতর সমাজ নিন্দার চোখে দেখিতেন। অথচ উহাদিগকে অস্বীকার করিবার উপায়ও ছিল না। বৈবাহিক হুজ্জে বা অন্য কারণে মিশ্রণের ফলে লৌকিক সংস্কার বৈদিক সংস্কারের উপর সংক্রামিত হইতেছিল। যে ব্রাত্যগণ অদীক্ষিত ও নিন্দিত ছিলেন, অথর্ববেদে সেই ব্রাত্য মহাহুভব দেবাদিদেবের মৰ্যাদায় ভূষিত হইয়াছেন [অঃ. ১৫], আত্বৰ্ণ মন্ত্রগুলিও ক্রমে পৌরোহিত্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে [‘পৌরোহিত্যে অথর্ববিদেব কার্যম্’—সায়ণ]। ঠিক এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় তন্ত্রশাস্ত্রে। তন্ত্র যেমন ব্যবহারিক ধর্ম, অথর্ববেদের ক্রিয়াও তেমনই ব্যবহারিক ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ। যে কারণে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বহুকাল নিন্দিত হইয়াছে, সেই একই কারণে আত্বৰ্ণ ক্রিয়াকর্ম তির্যক কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন যেখানে স্বীকৃত এবং প্রভাব যেখানে অপরিহার্য—সেখানে বিষয়টিকে গ্রহণ করিতেই হয়। কাজেই অথর্ববেদ তথা তন্ত্রশাস্ত্র পরবর্তীকালে আৰ্য-মৰ্যাদা লাভ করিয়াছে। অথর্ববেদের এবং তন্ত্রের ভাবে ও ভাষায় ব্রাহ্মণ্য হস্তক্ষেপের স্থপষ্ট চিহ্নও বর্তমান। আচার্য Winternitz ঠিকই বলিয়াছেন, ‘The songs of magic in the Atharva Veda which according to their main contents, are certainly popular and very ancient, have no longer even their original form in the Samhita, but are Brahmanised’ (A Hist. of Indian lit. Vol 1)

অবশ্য একথা স্বীকার্য, অথর্ব-সংহিতায় যাহুমন্ত্রের প্রভাব বেশি। ইহাতে আছে মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, উদ্বেজন ও বলীকরণাদি মন্ত্র। অথর্ববেদের জগতটিও ঋগ্বেদের জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদে ঋষির কল্পনা প্রকৃতি-জগৎ সঞ্চারী; ভূলোক ও দ্যুলোকের বিশ্বপ্রকৃতি—‘সুদৃশা সুধারা’ নদীর সৌন্দর্য, ‘অঞ্জনগন্ধা সুরভী’ অরণ্যানির মহিমা, ‘দেবচক্ষু সূর্য’, ‘মধুদ্রবা’ ছাপা পৃথিবী, ‘ভাস্বতী উষা’ ও ‘আয়তী’ রাত্রির অপরিমেয় ঐশ্বর্যে-মাদুর্যে মুগ্ধ কবি জীবনের স্বাদে তন্ময় : বলিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁহাদের বলিষ্ঠ প্রার্থনা। দেবতার সঙ্গে তাঁহাদের পিতা-পুত্র, সখা-সখ্যের সম্পর্ক। আত্বৰ্ণ ঋষির প্রকৃতি-দৃষ্টি অনেকটা সঙ্কুচিত। মানুষ দুর্দিন-দুঃশকুনভীত, দুঃস্বপ্নে ও সপত্নভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, পাপ দেবতা নিষ্ঠুরতার নিকট অবনমিত। শত্রুকে নিস্তেজ করিয়া যাহু দ্বারা কাম্যবস্তুকে লাভ করিয়া এখানে ঋষি অত্যাশ্রয় যাক্ষা করেন,

১। সূর্য যন্তে তপন্তেন তং প্রতি তপ ।

যোহিমান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দিয়ঃ ॥ (২. ২১. ১)

—হে সূর্য, তোমার যে সম্ভাপন শক্তি, তাহা দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট কর যে
আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরা যাহাকে দ্বেষ করি ।

২। ব্যসৌ মিহ্রাবরণৌ হৃদকিত্তানি অস্ত্রতম্ ।

অথৈনাম্ অক্রতুং কৃত্বা মমৈব কৃণুতং বশে ॥ [অঃ ৩. ২৫. ৬]

—হে মিহ্রাবরণ, তোমরা ওই স্বীর হৃদয় ও চিত্ত বিক্ৰিপ্ত করিয়া ইহাকে
কার্য্যকার্য জ্ঞানশূন্য করিয়া আমার বশ কর ।

৩। হৃদয় কাম প্রহৃদয় কাম

অবর্তীঃ যন্ত মম যে সপত্নাঃ ।

তেষাং হৃদানাম্ অধমা তমাসি

অগ্নে বাস্তুনি নির্দহ ত্বম্ ॥ [অঃ ২. ২. ৪]

—হে কাম, আমাদের বাহারী শত্রু, তাহাদিগকে অপসারিত কর, দূরে
অপসারিত কর । অপসৃত হইয়া তাহারা যে অধম তমোময় লোকে
বাস করে, হে অগ্নি, তুমি তাহা দগ্ধ কর ।

কিন্তু এই ধরনের প্রার্থনা ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদেও ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে । তবে
অথর্ববেদে সুরটা অত্যন্ত চড়া । তাহার কারণ, আত্মবর্ষণ জগতের মানুষ অনেকটা
বাস্তববাদী । জগতে বন্ধন আছে, ব্যসন আছে, সপত্ন আছে, সপত্নী আছে, দৈব-দুর্যোগ
আছে, মরণ-ভয় আছে । ঐহিক জগতে অভ্যুদয়ের পথে অনেক বিপত্তি ।
অথর্বাক্সিরা এই বিপত্তিকে দেখেন, ইহা হইতে মুক্ত হইতে কামনা করেন । তাই
প্রার্থনার সুরে বলেন,—‘জহি’, ‘অরসাং-কৃণু’, ‘অতেজসং কৃণু’, ‘বিধ্যামি’, ‘জন্তে দধ্যঃ’
(মুখে তর্পণ করিও), ‘অধম্পাদং দ্বিষতম্পাদয়ামি’ ইত্যাদি । অবশ্য অথর্ববেদে
অন্ততর প্রার্থনাও আছে । আচার্য সায়ণ বলেন, অথর্ব-মন্ত্র দ্বারা ঐহিক ও আত্মিক
উভয়বিধ ফল লাভ হয়—‘ঐহিকাত্মিক সকল পুরুষার্থপরিজ্ঞানোপায়ভূত অথর্ববেদঃ’
[অথর্ব-সংহিতা-ভাষ্যের উপোদ্যাত] । এখানে ঐহিক স্বার্থসিক্তির কামনা; ভুক্তির
কামনা যেমন আছে, তেমনই আছে মুক্তির কামনা, উচ্চতর লক্ষ্য ও শাস্ত্রত ঐক্যমতের
পাণী । অথর্ববেদের বিষয় বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে ।

শৌনক শাখার অথর্ব-সংহিতা বুদ্ধিটি কাণ্ডে বিভক্ত । প্রত্যেক কাণ্ডে কতকগুলি
মন্ত্র আছে । মন্ত্রগুলি বিশেষ কোন ক্রম অনুসরণে বিস্তৃত হয় নাই ; যদিচ
কোনোমতে একটি বিশেষ ক্রম অনুসারেই মন্ত্রগুলির যজ্ঞে প্রয়োগের কথা বর্ণনা

করা হইয়াছে। মন্ত্রগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, ১. মেধাজনন কর্ম ২. একমত্য-সম্পাদক কর্ম ৩. সম্পৎ-সাধক কর্ম ৪. রাজকর্ম (শত্রুজয়, শত্রুজ্ঞান, সপত্ন্য-ক্ষয় ইত্যাদি) ৫. পৌষ্টিক কর্ম (গৃহপুষ্টি, পাপক্ষয়, গো-সমৃদ্ধি সাধক কর্ম) ৬. সৌভাগ্যকরণ (অভীষ্ট সিদ্ধি, দুঃশকুন ও দুঃস্বপ্ননিবারণ, বৃষ্টিজনন, ঋণোপনোদন ইত্যাদি)। ৭. ভৈষজ্য কর্ম, (রোগ নিবারণ, প্রাণ-সঞ্চারণাদি) ৮. গৃহকর্ম (বিবাহ, পুংসর্বন, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়নাদি) ৯. অভিচার কর্ম, ১০. শাস্তি কর্ম ও ১১. দার্শনিক চিন্তা (সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতত্বাদি)।

আত্মবর্ষণ ক্রিয়ার প্রধান উপকরণ রস বা জল। জল অভিষব করিয়াই শাস্তি-পুষ্টাদি কর্ম সাধন করিতে হয়। এইজন্ত এই বেদের প্রথমেই ‘আপ’ দেবতার কয়েকটি স্তব্ধ স্তুতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আপোমার্জনে আত্মবর্ষণ মন্ত্র তুলনারহিত। হিন্দুর নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে এই মন্ত্রটি চতুর্থ মন্ত্ররূপে পঠিত হয় ;

শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে ।

শংযোরতি শ্রবন্ত নঃ ॥১

—এই মন্ত্রটির দ্রষ্টা সিদ্ধদ্বাপ ঋষি, দেবতা আপোদেবতা। ঋষি বলিতেছেন, জল দেবতাগণ যজ্ঞের জন্ত সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হউন এবং মঙ্গলবিধায়ক হইয়া আমাদের অভিসিদ্ধি করুন।

জলের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। জল ‘ময়োভূব’ (স্থখকর)। তাহার রস কল্যাণকর [‘শিবতমো রসস্তস্য’ অ. ১. ২] ; এই জল আমাদের পক্ষে শিবময়ী হউন—‘শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ’ [অ. ১. ৬. ৪]।

বিতীয় কাণ্ডের ‘অভাঃ’ মন্ত্রগুলিও স্তব্ধর ঋষি বলিতেছেন,

যথা গোশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিম্যতঃ ।

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥

যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো রিম্যতঃ ।

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥

[অ. ২. ৫. ১. ৫]

১। শৌনক সাহিত্য এই মন্ত্রটি প্রথম কাণ্ডের ষষ্ঠ স্তব্ধের প্রথম মন্ত্র। নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞে বেদোক্ত যে মন্ত্রগুলি পঠিত হয়, তাহা তত্ত্ব বেদের প্রথম মন্ত্র। অর্থর্ববেদ সম্পর্কে ইহার ব্যতিক্রম একটি সন্দেহের বিষয় ছিল। যদিও বিনিয়োগ-বিধানে এই মন্ত্রটি যে পৈগ্নলাদ শাখাভুক্ত আত্মবর্ষণ মন্ত্র, তাহার নির্দেশ ছিল। কিন্তু এই শাখার পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য আবিষ্কৃত না হওয়ায়, বিষয়টি সন্দোহাভীত ছিল না। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা এই সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। ‘শন্নো দেবী’ মন্ত্রটি পৈগ্নলাদ শাখার অর্থর্ব সাহিত্যের প্রথম মন্ত্র।

—জ্যাপা পৃথিবী যেমন ভয়শঙ্কা করে না, তাগাদের যেমন বিনাশ নাই, সেইরূপ হে প্রাণ, অভয় হও।

লোকব্যবহারে সত্য ও মিথ্যা যেমন ভয় পায় না, বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ, হে প্রাণ তুমি অভয় হও।

অথর্ববেদের একমতা-সম্পাদক সাংমনস্য মন্ত্র, ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে কোন অংশে হীন নয়। সমগ্র গৃহকে সমনা করিবার জন্ত ঋষি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,

সহদয়ঃ সংমনস্যমবিদেষঃ কৃণোমি বঃ।

অন্তোঃকৃতমভির্হৃত বংস জাতমিবায়া ॥

অনুব্রতঃ পিতৃঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।

জায়া পত্যে মধুমতীং বাচাং বদতু শান্তিবাম্ ॥

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিষং মা স্বসারমূত স্বসা।

সমাক্ষ সত্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া ॥ [অ. ৩. ৩০. ১. ৩]

—আমি তোমাদিগকে সমনা ও হিংসা রহিত করিতেছি : বংস যেমন জাতমাত্র গাভীর অভিমুখে গমন করে, তোমরাও তেমনই পরস্পরের অভিমুখী হও।

পুত্র পিতার অনুব্রত হউক, মাতার সহিত সমনা হউক ; জায়া পতির প্রতি মধুমতী ও শান্তিকরী বাক্য প্রয়োগ করুক।

ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে হিংসা না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে বিদেষ না করে। সমনা ও সত্রতা হইয়া ভদ্র বাক্য বলুন।

এতদ্ব্যতীত এই বেদের ব্রহ্মচারী-প্রশংসা [১১. ৭], পৃথিবীস্থক্ত [১২. ১], ব্রাত্য-স্তুতি (পঞ্চদশ কাণ্ড) প্রভৃতি নানাদিক হইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ‘ব্রহ্মচারীক্ষত্ৰয়তি রোদসী উভে’—ব্রহ্মচারী তপসাবলে উভয় লোক বিচরণ করেন ; ব্রহ্মচারীই প্রজাপতি ব্রহ্মচারীই বিরাট, ব্রহ্মচারীই ইন্দ্র : ‘ব্রহ্মচর্যেন তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি’ (১১. ৭. ১৭)—ব্রহ্মচর্য দ্বারা রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন, ‘ব্রহ্মচর্যেন কত্তা যুবানং বিন্দতে পতিম্’ (১১. ৭. ১৮)—ব্রহ্মচর্য দ্বারা কত্তা যুবা পতি লাভ করে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডের পৃথিবী-স্থক্ত। ঋগ্বেদে স্বতন্ত্র কোন পৃথিবীস্থক্ত নাই, ত্রোপিতার সহিত যুক্ত হইয়াই পৃথিবীর মহিমা। আথর্ব ঋষির দৃষ্টিতে পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বিশ্বয়। ৬৩টি শ্লোকে সেই বিশ্বয়কে ঋষি ভাষা দিয়াছেন,

সত্যং বৃহদতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী।

না নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্নী উক্সং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥ অ. ১২. ১১]

—সত্য. বৃহৎ ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপশ্চা ব্রহ্ম ও বজ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। সেই পৃথিবী, যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রী, তিনি আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুন।

সমতল ও বন্ধুর এই পৃথিবী কত না গুণধী ভরণ করেন, ইহাতে কত সমৃদ্ধ, কত লিঙ্গ—চতুর্দিকে রুচিযোগ্য ভূমি, এই পৃথিবী ‘বিশ্বভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্য-বক্ষা জগতো নিবেশনী’ [১২. ১. ৬] ; এই পৃথিবীর অমৃতহৃদয় পরম ব্যোমে সত্য হারা আবৃত [‘যশা হৃদয়ং পরমে ব্যোম্নি সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ’—১২. ১. ৮] । জনধারায় ‘ভূরিধারা’ ভূমি ; এইখানেই গিরি-শর্বত-অরণ্য। বিশ্বরূপা এই ধ্রুবভূমি কোথাও শ্বেতবর্ণা, কোথাও কৃষ্ণা, কোথাও রোহিণী—মরুতহৃতি । ‘অগ্নিবাসা পৃথিবী’ [১২. ১. ২১]—ইহার গুণধী, রস ও প্রসূর অগ্নিগর্ভ। শিলা-মৃত্তিকা-কঙ্কর-পাংস্ব-ধূতা ভূমি [‘শিলাভূমিরশ্মাপাংস্বঃ-সা-ভূমি-সংধূতা ধূতা’-১২. ১. ২৬] । এইখানেই আবর্তিত হয় ষড়্ধাতু [‘গ্রীষ্ম স্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ’ ১২. ১. ৩৬] । পৃথিবীতে বাস করে বিচিত্র জীবজন্তু—আরণ্য পশু—মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, উল, দৃক—দ্বিপাদ পক্ষী হংস, স্বপর্ণ, শকুন, কাক ; পৃথিবীই ‘আবপনী জনানাম্’ (মহুয়ালোকের আধার) । ইনি ‘কামভূবা পপ্রথানা’ (বিস্তীর্ণা কামধেয়)-১২. ১, ৬১।

ঋষির বড় গৌরব যে, তিনি এই পৃথিবীর পুত্র : ‘মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ’ [১২. ১. ১২] । আবুল হুদয়ে জীবধাত্রী জননীর নিকট তাঁহার প্রার্থনা : ‘ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু’ [১২. ১. ৫]—পৃথিবী আমাদেরকে বরাহ ও রূপ দান করুন ; ‘সা নো ভূমির্বিস্জতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ’ [১২. ১. ১০]—মাতা যেমন পুত্রকে দুগ্ধ দান করেন, তেমনই ভূমিমাতা আমাদেরকে দুগ্ধ দান করুন ; ‘সা নো ভূমিঃ প্রাণমায়ুর্দধাতু’ [১২. ১. ২২] এবং

শান্তিবা সুরভিঃ স্তোনা কীলালোগ্রী পয়স্বতী ।

ভূমিরধি ব্রবীতু মে পৃথিবী পয়সা সহ ॥ [১২. ১. ৫২]

—অমৃতস্নানী, দুগ্ধবতী, সাধুগন্ধী, আনন্দময়ী পৃথিবী আমাদেরকে শান্তি-বচন বলুন ।

ভূমে মাতর্নিধেহি মা ভদ্রয়া স্বপ্রতিষ্ঠিতম্ ।

সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি হৃত্যাম্ । [১২. ১. ৬৩]

—হে মাতা পৃথিবী, কল্যাণ দ্বারা আমাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত কর; হে কবি (কালিদাস), দ্যালোকের সহিত তুমি আমাকে শ্রী ও বৈভবে প্রতিষ্ঠিত কর।

অথর্ব-বেদের এই পৃথিবী কবির চোখে-দেখা বিচিত্ররূপিণী, কল্যাণকারিণী পৃথিবী; কবিশ্বে, আবেগে ও বস্তুদৃষ্টির সত্যতায় এই পৃথিবীর স্তুতি অপূর্ব।

অথর্ববেদের ব্রাত্য কাণ্ডটিও (পঞ্চদশ কাণ্ড) কয়েকটি দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাত্য হইতেছে সাবিত্রী-পতিত সংস্কারহীন পুরুষ। বেদবিহিত যজ্ঞকর্মে ব্রাত্য অনধিকারী। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ব্রাত্য অবৈদিক লোকায়ত সম্প্রদায়। ইহার পতিত ও অপাণ্ডিত্যের। অথচ অথর্ববেদে এই ব্রাত্যই দেবাদিদেবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রাত্য কাণ্ডের ভাষা গভীর : ইহাতে মোট ১৮টি সূক্ত।

ব্রাত্যের অঙ্গবর্ণ নীল-লোহিত—‘নীলমস্তোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্’ [১৫. ১. ৭] : তাঁহার অনন্ত মহিমা, অপরিমেয় তেজ। তিনি চতুর্দিক কম্পিত করিয়া চলেন। পূর্বদিকে ভব ইহার ইষু, দক্ষিণে ঈশান, পশ্চিমে পশুপতি, উত্তরে উগ্র [১৫. ৫]। ইতিহাস, পুরাণ, নারায়ণী ইহার জয়গান করে : ‘তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারায়ণীশ্চানুব্যচলন’ [১৫. ৬. ১১]। ব্রাত্যের সপ্ত প্রাণই অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা, পবমান, আপ, পশু ও প্রজা। ব্রাত্যই ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যালোক, নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর। ব্রাত্য কোন গৃহে আতিথি হইলে, সে গৃহ ধ্বংস। গৃহী তখন কি করিবেন? —নিজে প্রত্যাগমন করিয়া বলিবেন, ব্রাত্য কোথায় ছিলেন? ব্রাত্য, এই যে পাত্যোদক। ব্রাত্য, তপ্ত হউন, আপনার যাহা প্রিয় তাহাই হউক, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, আপনার যাহা ঈক্ষিত (‘নিকাম’) তাহাই হউক [১৫. ১১. ২]

এই ব্রাত্যকে নমস্কার—‘অহা প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাজ্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায়’।

অথর্ব-বেদের সৃষ্টিতত্ত্বও বিশেষত্ব মণ্ডিত। ঋগ্বেদে পরম পুরুষ হইতেই সৃষ্টির পত্তন দেখানো হইয়াছে; অথর্ববেদেই প্রথম জায়া ও পতির বিবাহ-রূপকে সৃষ্টি পত্তনের কথা পাওয়া গেল (ঋ. ১১. ১০. ১.)। মহাদেব সঙ্কল্পের গৃহ হইতে যে জায়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সৃষ্টির উৎসার।

আখর্বর্ণ সৃষ্টিতত্ত্বে ‘কাল’ একটি বিশেষ তত্ত্ব। কাল সৃষ্টির উৎস, কাল সৃষ্টির নিয়ন্তা; কালেই তপস্তা, কালেই ব্রহ্ম সমাহিত; কাল সর্বেশ্বর :

কালে তপঃ কালে জ্যোষ্ঠঃ কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।

কালো হি সর্বেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ। [১২. ৫৩. ৮]

এই কাল-তত্ত্ব পরবর্তী কালের শৈব ও শাক্ত ধর্মের মূল তত্ত্ব। অর্থব্বেদ যত নিম্নিতই হউক, লোকসংস্কারের বাহক রূপে ইহার মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।

৫. ব্রাহ্মণ

বেদের দ্বিতীয় অংশ ‘ব্রাহ্মণ’। ইহা প্রধানতঃ বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও বাগযজ্ঞের নির্দেশে পূর্ণ। ইহা বেদের কর্মকাণ্ড। ইহার বাহন বর্ণনাত্মক প্রাজ্ঞল গন্ত, মাঝে মাঝে কিছু শ্লোক ও গাথাও আছে। ব্রাহ্মণগুলির একদিকে আছে ‘বিধি’—অর্থাৎ মন্ত্র-প্রয়োগের বিধান, মন্ত্রোৎপত্তির ইতিহাস ও মন্ত্রের বা যজ্ঞের প্রশংসা; অপরদিকে আছে ‘অর্থবাদ’—মন্ত্রের, ভাষা-ব্যাখ্যা এবং কোন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি। ব্রাহ্মণ বেদ-জ্ঞানের ভাণ্ডার। জানিয়া ক্রিয়া করাই ব্রাহ্মণের প্রধান নির্দেশ: ‘য এবং বেদঃ স বেদ সর্বমিতি’—ইহাই প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা, নির্দেশ বা বিনিয়োগের দ্ব্যস্তিক বাক্য। জ্ঞানার্থে ‘বেদ’ শব্দের প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণেই। মন্ত্রার্থ, মন্ত্রের বিনিয়োগ, মন্ত্রের ইতিহাস জানানোই ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষ্য—ব্রাহ্মণ বেদিতব্যের বেদন। ব্রাহ্মণের মতে বেদনেই অহুদয়; বেদনেই নিঃশ্রেয়স: তাই কথায় কথায় ‘বেদ’ (জ্ঞান)-এর প্রশংসা: ‘অপ পাপ্মানং হতে য এবং বেদ’ [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ], ‘উদ্ভিয়বান্ বনীয়ান্ ভবতি য এবং বেদ’ [গোপথ ব্রাহ্মণ]।

ব্রাহ্মণকে একদিক হইতে বলা যায় বৈদিক যুগের পুরোহিতদর্পণ। তবে পুরোহিতদর্পণ হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। দর্পণে বিধি আছে, অর্থবাদ নাই—ব্রাহ্মণে দুইই আছে। উপরন্তু ব্রাহ্মণ শুধু ক্রিয়া-কর্মের নির্দেশ নয়, জ্ঞানেরও ভাণ্ডার। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণের তিনটি অংশ: ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। ব্রাহ্মণে ক্রিয়ার অংশ প্রধান, উপনিষৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রকাশ। বৈদিক যুগের দার্শনিক চিন্তার সার উপনিষৎ। আরণ্যক মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত; উহা কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যুক্তবেণী। আরণ্যকোপনিষৎ সহ ব্রাহ্মণের মর্যাদা অপরিমেয়। কর্মে ও জ্ঞানে যেমন জীবনের পরিপূর্ণতা, তেমনই বেদের পরিপূর্ণতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদকে দেয়। শাখার যেমন পল্লব ও পুষ্প, তেমনই মন্ত্র-সংহিতার ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সমবায় সমগ্র বেদ।

ব্রাহ্মণভাগ লইয়াও বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে। সংহিতার যেমন অনন্ত শাখা, ব্রাহ্মণেরও তেমনই অনন্ত শাখা। ব্রাহ্মণের এই অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে—তাহার সংখ্যাও নগণ্য নয়।

ঋগ্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ দুইখানি,—(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও (২) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণখানিকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে ঋগ্বেদীয় মন্ত্রগুলির প্রয়োগবিধি ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের ত্রয়বিংশ অধ্যায় দেবরাত স্তন্যশোষণের কাহিনী। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্র-রোহিত সংবাদে ভারতবর্ষের বিখ্যাত চলার মন্ত্র ‘চরৈবেতি’ স্মৃতিগুলি স্থান লাভ করিয়াছে।

যজুর্বেদের দুইটি সাহিত্য—কক যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। ককযজুর্বেদের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ইহা মূল সাহিত্যের সহিত যুক্ত। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয় সাহিত্যখানিই ব্রাহ্মণের লক্ষণাকার। অনেকে ইহাকেও অতিশয় প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। এই ব্রাহ্মণ হইতে সাহিত্যের সমকালীন গজভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’। শত পথে (অধ্যায়ে) বিভক্ত বলিয়া ইহার নাম ‘শতপথ’। এই ব্রাহ্মণখানি নানাদিক হইতে মূল্যবান। ইহা হইতে প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসের বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। মংস্ত পুরাণের বহুখ্যাত মনু-মংস্ত কাহিনী ইহার অন্তর্গত। তাহা ছাড়া আছে পুরুব-উর্বশীর উপাখ্যান, সোমরাজার বৃত্তান্ত, সৃষ্টি-বিষয়ক নানা পৌরাণিক আখ্যান। ভাষা বিচার করিলে শতপথ ব্রাহ্মণের গুণ অপ্রাচীনত্বের লক্ষণ বহন করে।

সামবেদের প্রধান ব্রাহ্মণ ‘তাত্ত্ব’ বা ‘পঞ্চবিংশ’ ব্রাহ্মণ। অথর্ব-সাহিত্যে আছে ত্রাত্য-স্ততি; এই ব্রাহ্মণে ত্রাত্যষ্টোমের বিধান। গায়ত্রী-পতিত হইলেও ত্রাত্যগণ শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন, ত্রাত্যষ্টোম প্রকৃতপক্ষে অনার্য জাতিকে শুদ্ধ করিয়া আয়সমাজে গ্রহণ করার প্রতীক। সামবেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে ‘ছাদোগ্য ব্রাহ্মণ’ ও ‘সামবিধান ব্রাহ্মণ’-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সামবিধান ব্রাহ্মণে রাত্রিবেদীকে শবরী মূর্তিতে ধ্যান করা হইয়াছে,

ও রাত্রিঃ প্রপত্তে পুনর্ভূঃ ময়োভুং কনাম্।

শিখণ্ডিনীঃ পাশহস্তাঃ যুবতীঃ কুমারিণীম্ ॥ [সা. বি. ব্রা. ৩. ৮.২]

অথর্ববেদের বহুখ্যাত ব্রাহ্মণ ‘গোপথ ব্রাহ্মণ’। ইহা পূর্ব ও উত্তর—এই দুইভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে পাঁচটি, উত্তর ভাগে ছয়টি প্রপাঠক। এই ব্রাহ্মণে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই, তবে ইহাতে অথর্বাক্ষিরার উৎপত্তি-কাহিনী বিস্তৃতভাবে

বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও বা অথর্ব-সংহিতাকে বলা হইয়াছে ‘ভৃষঙ্গিরসঃ’। অথর্ববেদে যে বেদের সারভূত, এ সত্যটিও প্রতিপাদিত হইয়াছে :

যে অঙ্গিরসঃ স রসঃ। যে অথর্বাণ স্তদভেষজম্। যদ্ ভেষজং
তদমৃতম্। যদমৃতং তদ্ ব্রহ্ম। [গো. ব্রা. পূর্ব. ৩]

“ব্রহ্ম” সংক্রান্ত কর্ম হইতে সম্ভবতঃ ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটির উৎপত্তি। ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, ‘ব্রাহ্মণ’ হইতেই বর্ণব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা। ‘ব্রাহ্মণ’ পরবর্তীকালে ‘ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। উত্তরকালে যে সকল ক্রিয়াকর্ম হিন্দুদের সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে, ‘ব্রাহ্মণই’ তাহার মূল উৎস। প্রতিটি ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের উপযোগিতা, যজ্ঞকর্মে পুরোহিত নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণের প্রশস্তি ও সদক্ষিণা যজ্ঞকর্মের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যেমন ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তেমনই কালক্রমে বহু সংস্কার, আচারসর্বস্বতা এবং ক্রিয়াকর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াই চার্বাকগণের কটুক্তি নিষ্কিপ্ত হইয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ‘ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি’—এইরূপ কটাক্ষ গীতাতেও আছে। তথাপি ব্রাহ্মণ মন্ত্রপদের ভাষ্য, ‘ব্রাহ্মণ’ বৈদিক শব্দের ‘নিরুক্তি’, ব্রাহ্মণ প্রাচীনতম গল্পের নিদর্শন, ‘ব্রাহ্মণ’ বিবিধ আখ্যায়িকার ভাণ্ডার। ‘ব্রাহ্মণ’কে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় অগ্রতম দর্শন—কর্ম-মীমাংসা।

ব্রাহ্মণের নিরুক্তি অংশগুলি কৌতূহলোদ্দীপক, যেমন, ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণের এই উক্তি :

স যোহয়ম্ মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবৈন্দ্রঃ। তান্ এষ প্রাণান্ মধ্যতঃ ইন্দ্রিয়েন ঐন্ধ।
যদ্ ঐন্ধ তস্মাদ্ ঐন্ধঃ। ঐন্ধো হ বৈ তমিন্দ্র ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। পরোক্ষকামা
হি দেবাঃ। [শ. ব্রা. ৬. ১. ১]

—ইহাদের মধ্যে যিনি মধ্য প্রাণ, তিনি ইন্দ্র। তিনি মধ্যস্থ হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণবর্গকে প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রন স্বরূপ হওয়ায় তিনি ইন্ধ। ইন্ধকেই পরোক্ষে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়।

ব্যুৎপত্তিনির্দেশে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট বাক্য,—‘পরোক্ষকামা হি দেবাঃ’ শঙ্কিং বা ‘পরোক্ষপ্রিয়া হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ’। দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়, তাঁহারা পরোক্ষ অর্থেই পছন্দ করেন, স্থূল বা বাচ্যার্থ তাঁহাদের অপ্রিয়। মনে হয়, বাক্যার্থের এই

পরোক প্রিয়তাকে কেন্দ্র করিয়াই পুরাণে ও সাহিত্যে রূপকহষ্টির বীজ উদ্ভূত হইয়াছে

চিরকালাগত কতকগুলি প্রথারও কৌতুকপ্রদ ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। মাহুঘের জন্মগ্রহণ করিতে এক বৎসর সময় লাগে, কারণ স্বয়ং প্রজাপতি সম্বৎসরে নিজে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এক বৎসর পরে শিশুরা কথা বলিতে শিখে, প্রজাপতি এক বৎসর পরে কথা বলিয়াছেন [‘তন্মাদ উ সম্বৎসরে এব কুমারো ব্যাজিহীর্ষতি সম্বৎসরে হি প্রজাপতি ব্যাহরৎ’—শ. ব্রা. ১১. ১. ৬]। ‘হারিয়ে মারিয়ে কাশপ গোত্র’ প্রবাদটির বীজও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় :

স যৎ কূর্মো নাম এতদ্ বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অমৃজত।

যদমৃজত অকরোৎ তদ্ যদকরোৎ তন্মাতৃ কূর্মঃ। কশপো বৈ

কূর্মন্তন্মাদাঃ সঃ প্রজাঃ কাশপ ইতি। [শ. ব্রা. ৭. ৪. ৩]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সম্বোধনের পূর্বে স্ত্রীলোক যে অত্যাধি ভোগ্য প্রার্থনা করে, তাহার একটি মৌল কারণ বিবৃত হইয়াছে। প্রজাপতি সোমরাজকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে তিনটি বেদ প্রদান করেন। সাবিত্রী সীতা সোমকে কামনা করেন। কিন্তু সোমের প্রিয়া ছিলেন শ্রদ্ধা। সীতা তখন প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রজাপতি তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া গন্ধ দ্রব্যে চর্চিত করিয়া সোমের নিকট প্রেরণ করেন। সোম তাহাতে সীতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। সীতা বলেন, ভোগের দান দাও। সোম তখন তাঁহাকে ত্রিবেদ প্রদান করেন। সেইজন্ত আজও পর্যন্ত স্ত্রীলোক মিলনের পূর্বে স্বামীর নিকট ভোগ্য প্রার্থনা করিয়া থাকে [‘তন্মাদ উ হ স্ত্রিয়ো ভোগমেব হারয়ন্তে’—তৈ. ব্রা. ৩. ১০]।

ব্রাহ্মণের কাহিনীগত আকর্ষণ অপরিসীম। এই কাহিনীর বৈচিত্র্যও অসাধারণ। পরবর্তী কালের বহু লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী ব্রাহ্মণেই অঙ্কুরিত হইয়াছে। কতকগুলি কাহিনীতে জীবনের সুউচ্চ আদর্শের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। মনে করি, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের [৩. ১০] ইন্দ্র-ভরদ্বাজ সংবাদ। ভরদ্বাজ তিনজন ব্রহ্মর্ষ পালন করিয়া বৃদ্ধ হইলেন। ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘ভরদ্বাজ যন্তে চতুর্থমায়ুর্দত্তাম্ কিমেতেন কুর্ধা ইতি’—আমি যদি তোমাকে চতুর্থ জন্মের আয়ু

১। এই কাহিনীই পরবর্তীকালে পুরাণে রোহিণীপ্রিয় সোমের কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রদান করি, তাহা দিয়া তুমি কি করিবে? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, ‘ব্রহ্মচর্যমেব এনেন চরেষ্যমিতি’। ব্রহ্মচর্য পালনের প্রাপ্তি অগ্নিসাবিত্রী বা বেদ। ইন্দ্র ভরদ্বাজকে সেই অমূল্য রত্নই দান করিয়াছিলেন।

জীবনে চলার মহিমাও জীবন্ত ভাষায় কীর্তিত হইয়াছে ব্রাহ্মণে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখি, রাজপুত্র রোহিত বরুণের ক্রোধ এড়াইবার জন্য অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘোষণা করিলেন পথচলার দিব্য মন্ত্র; হে রোহিত, থামিও না, চল, চল—‘চরৈবেতি’। চলাই জীবন, যে চলে সেই সৌভাগ্যবান, যে চলে সেই অমর,

নানা শাস্ত্রায় শ্রীরস্তি রোহিত শুশ্রুম।

পাপো নৃষধরো জন ইন্দ্র ইচ্ছরত সখা

চরৈবেতি ॥

পুষ্পিণ্যো চরতো জজ্যে ভৃক্ষুয়াত্মা ফলগ্রহিঃ।

শেরেহস্ত সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপণে হতাঃ

চরৈবেতি ॥

আশ্তে ভগ আসীনস্তোদ্ধাশ্রিত্তি তিষ্ঠতঃ ॥

শেতে নিপত্তমানস্ত চরাতি চরতো ভগঃ

চরৈবেতি ॥

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্ত দ্বাপরঃ।

উত্তিষ্ঠঃ স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পত্ততে চরন্

চরৈবেতি ॥

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাতুমুদ্বসরম্।

স্বর্যস্ত পশু শ্রেমাণঃ যো ন তদ্রয়তে চরন্

চরৈবেতি ॥

—হে রোহিত, আমরা শুনিয়াছি, নানা শ্রমে শ্রান্ত জনের শ্রী আছে। অলস জন পাপী। যে চলে, ইন্দ্র তাহার সখা। চল, পথ চল।

চলমান ব্যক্তির জজ্যায়ুগল পুষ্পিত; তাহার বর্ধিষ্ণু আত্মা ফললাভের যোগ্য, তাহার পাপ শ্রম দ্বারা হত হইয়া পথে শুইয়া থাকে। চল, পথ চল।

বলিয়া থাকিলে ভাগ্যও বসিয়া থাকে, উঠিয়া দাঁড়াইলে ভাগ্যও উঠিয়া দাঁড়ায়। শুইয়া থাকিলে ভাগ্যও শুইয়া পাকে ; যে চলে তার ভাগ্যও সচল। চল, পথ চল।

যুমন্ত ব্যক্তি কলি, ভাগ্যত ব্যক্তি ছাপর, উখিত ব্যক্তি ত্রেতা যুগ, যে চলে, তাহার সত্য যুগ। চল, পথ চল।

চলমান ব্যক্তিই মধু লাভ করে, চলাই স্নাত ফল। লক্ষ্য কর সূর্যের ক্রী, যিনি চলার পথে অস্তিত্ব। চল, পথ চল।

বেদের ব্রাহ্মণ-অংশ এই ধরনের বহু বিচিত্র কাহিনীর ভাণ্ডার। সংহিতা ভাগেও কাহিনী-বীজ আছে। ব্রাহ্মণে সেই বীজ অঙ্কুরিত। পুরাণাদিতে এই অঙ্কুরই বিস্তৃত বনস্পতি। বর্ণনাত্মক প্রাঞ্জল গল্পও কাহিনীর উপযুক্ত বাহন। এই সকল দিক হইতে ব্রাহ্মণ কেবল কর্মকাণ্ড বা কর্ম-মীমাংসা নয়, ইহা গজ-বাহিত সাহিত্যের পাচীনতম প্রবর্তে নিদর্শন।

৬. বেদান্ত বা উপনিষৎ

বৈদিক সাহিত্যের অন্ত বা শেষ ভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষৎ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক বেদের যে দুইটি প্রধান ভাগ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট উপনিষৎ। ইহা বৈদিক যুগের স্তউচ্চ দার্শনিক চিন্তার বাহন। সকল ক্রিয়া-কর্ম, যাগযজ্ঞের দ্বারা জীবনের চরম প্রাপ্তি কি, বেদান্ত বা উপনিষৎ তাহারই উত্তর। শব্দটির ব্যুৎপত্তি উপ-নি-মদ্ ; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—‘যাহা সত্ত্বের নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায়’। উহার ব্যঞ্জিত অর্থ—‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ বা ‘পরাবিজ্ঞা’ বা ‘বিজ্ঞা’ বা ‘জ্ঞান’। উপনিষদ্-মতে এই জ্ঞান বা বিজ্ঞাই নিঃশ্রেয়স।

অনেকেই মনে করেন, মূল সংহিতা হইতে উপনিষদের কালগত ব্যবধান প্রায় সহস্র বৎসর এবং উহা সংহিতা-ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত একটি নতুনতর চিন্তার প্রকাশ [‘A new start’—Maxmüller]—একথা ঠিক যে, কালক্রমে নবতর উপনিষৎ বোদ্ধিত বা রচিত হইয়াছে—তথাপি উপনিষৎ সম্পর্কে এ মন্তব্য সর্বথা প্রযোজ্য নয়। উপনিষৎ স্বতন্ত্র নয়, উহা বেদেরই একটি অংশ। বেদের অংশ বলিয়াই ভারতীয় দর্শনের উপজীব্য উপনিষৎ-শ্রুতি। উপনিষদও বেদ, বেদ-পাদপের ফল ; এই ফলটি

ফুটাইবার জ্ঞানই মন্ত্র ও মন্ত্র-বিনিয়োগের আয়োজন, স্তুতি ও যজ্ঞের ভূমিকা। সংহিতার ‘ব্রহ্মোক্ত’ বা ভাববৃত্তিমূলক হৃদ্যাবলীতে বা অন্ত্যন্ত অংশে উপনিষৎ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেও উপনিষদের আলোচনা আছে। বিচার যে বীজ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে নিহিত, বেদান্তে তাহাই পল্লবিত ও পুষ্পিত। উপনিষৎ কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ নয়, বরং কর্ম উপনিষৎ-পুষ্প চয়নের আঁকশি। দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, ‘বস্তুতঃ প্রকৃত বেদ ও প্রকৃত বেদান্ত এক, একই তত্ত্বের দুইটি দিক মাত্র।’ [বেদমাতা গ্রন্থাবলী-৩]।

উপনিষৎ বেদজ্ঞানের নিষ্কর্ষ। মনোজ্ঞ কাহিনীর মধ্য দিয়া গুরু-শিষ্যের কথোপকথনহলে কিংবা সংহিতোক্ত ‘ব্রহ্মোক্ত’ হৃদয়ের আকারে এই জ্ঞান পরিবেশন করা হইয়াছে। উপনিষদের প্রকাশ-মাধ্যম গজ ও পত্ন উভয়ই। পত্নাংশে মূল সংহিতার বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গত্যাংশের ভাষা ব্রাহ্মণের সমগোত্রীয়; কোন কোন স্থলে উহা ব্রাহ্মণেরই প্রতিধ্বনি। ভাব ও ভাবার দিক হইতে মন্ত্র-ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদের মিল থাকিলেও উপনিষদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। মন্ত্র-ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ বেদের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দিক, আর উপনিষৎ উহার তত্ত্বের দিক।

বৃক্ষের যেমন শাখা, পল্লব ও পুষ্প—তেমনই বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। প্রত্যেক বেদের যেমন একাধিক সংহিতা, একাধিক ব্রাহ্মণ—তেমনই একাধিক উপনিষৎ। উপনিষদের সংখ্যা অসংখ্য। তন্মধ্যে ক্রীমৎ শঙ্করাচার্য অর্ধে মত প্রতিপাদনের জ্ঞান যে বারখানি উপনিষদের উল্লেখ করিয়াছেন (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কোষীতকি), সেইগুলিই সমধিক প্রচলিত। এগুলি ছাড়া আরও বহু উপনিষদের অস্তিত্ব আছে। বহু উপনিষৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদের উপনিষদগুলির মধ্যে (১) কোষীতকি ও (২) ঐতরেয় উপনিষদ প্রধান।—কোষীতকি উপনিষদের ইন্দ্র-প্রতর্দন সংবাদ প্রসিদ্ধ; সত্যই যে ইন্দ্র, এই তত্ত্বটি এই কাহিনীতে ঘোষিত হইয়াছে। ঐতরেয় উপনিষদে কোন কাহিনী নাই; আত্মার ঈক্ষণে কি প্রকারে সৃষ্টি পত্তন হইয়াছে, তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। একটি মাত্র শ্লোক ‘গর্ভে হু সন্’ ব্যতীত ইহার সমস্ত অংশই গজ। নিজেকে পরমাত্মারূপে অহুভব করাই জ্ঞান, ইহাই এই উপনিষদের প্রতিপাত্ত।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতার মূল উপনিষৎ ‘তৈত্তিরীয়’ উপনিষৎ। ইহা তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত; শীকাবলী, ব্রহ্মানন্দবলী ও ভৃগু বলী। প্রথম বলী উপদেশায়ুতে পূর্ণ। শিষ্যের প্রতি আচার্যের আদেশ :

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্না প্রমদ। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব।
 আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্ত্রনবন্তানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি।
 নেতরানি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম্। [তৈ. উ. ১. ১১. ১—৩.]

ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় : ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’, ‘রসো বৈ সঃ’।
 তাঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উদ্ভিত হয়, ‘স্বত্বাধাবতি পঞ্চমঃ’ (পঞ্চম স্থানীয় স্বয়ং
 কার্যে প্রসূর হয়)। এই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি অভয় : ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
 ন বিভেতি কদাচন’ [তৈ. উ. ২. ৪.]। এই উপনিষদের শেষ অধ্যায় ‘ভৃগুবল্লী’।
 ইহাতে আনন্দ-ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভৃগু ছিলেন বরুণের
 পুত্র। তিনি বরুণ সমীপে উপনীত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। বরুণ কহিলেন,
 ‘তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।’ তপস্যা করিয়া ভৃগু ক্রমে ক্রমে অন্ন,
 প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইলেন, অবশেষে জানিলেন :

আনন্দাদ্যেব গচ্ছিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি
 জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি [তৈ. উ. ৩. ৬.]

—আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং
 অবশেষে আনন্দে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দে বিলীন হয়।

এই উপনিষদে এই আনন্দ-ব্রহ্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব। অন্ন হইতে আনন্দ পর্যন্ত সবই ব্রহ্ম।
 অন্নও নিন্দিত নয়, উপেক্ষণীয় নয় [‘অন্নং ন নিন্দ্যাত্’, ‘অন্নং ন পরিচক্ষীত’], অন্নকে
 বর্ধিত করিতে হইবে [‘অন্নং বহু কুবীত’]। সূক্ষ্মের দিকে যাঁহাদের যাত্রা, স্থূলকেও
 তাঁহার অবজ্ঞা করেন না। ইহাই উপনিষদের শিক্ষা।

কুষ্ম যজুর্বেদের অপরাপর উপনিষদগুলির মধ্যে বহুখ্যাত ‘কঠোপনিষৎ’ ও ‘শ্বেতাশ্বতর
 উপনিষৎ’। কঠোপনিষদের কাহিনী প্রসিদ্ধ যম-নচিকেতা সংবাদ। নচিকেতা ছিলেন
 বাজ্রশব উদালকের পুত্র। পিতার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দান দেখিয়া বালক নচিকেতার
 মনে প্রশ্নের উদয় হইল। তিনি পিতাকে প্রশ্ন করিলেন, আমাকে কাহাকে দান
 করিলেন? বার বার একই প্রশ্ন করায় পিতা বলিলেন, ‘মৃত্যুবেদে দদামীতি।’
 নচিকেতা যমালয়ে উপনীত হইলেন। যম উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া নচিকেতাকে
 তিনদিন অপেক্ষা করিতে হইল। তিনদিন পরে যম আসিয়া নচিকেতাকে সমাদরে
 বরণ করিলেন, তিন রাত্রি অনাহারে প্রতীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে তিনটি বয়

দিতে:চাহিলেন। নচিকেতা প্রথমে প্রার্থনা করিলেন, পিতা যেন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যম তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা, অগ্নি-বিভাসহায়ে যে অভয় স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার বিষয় জানিতে চাহিলেন। যমরাজ নচিকেতার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আরও একটি বর দিলেন যে, সেই অগ্নিবিভা নচিকেতার নামেই পরিচিত হইবে এবং অবশেষে কহিলেন, ‘তৃতীয় বরঃ নচিকেতো বৃগীষ।’ নচিকেতা বলিলেন :

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুস্তে অস্তুতীত্যে নায়মস্তুতীতি চৈকে।

এতদ্বিছ্যামনুশিষ্ট স্তয়াহং বরাণামেষ বরন্তৃতীয়ঃ ॥ [কঠ, ১. ১. ২০]

—মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি না—মানুষের এই যে সংশয়, আপনি তাহাই নিরসন করুন। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।

মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি না—এই জিজ্ঞাসাই সকল জিজ্ঞাসার চরম। ইহাই আত্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ইহা চিরকালের রহস্য। এ রহস্যের উত্তর কঠিন, জটিল ও সূক্ষ্ম। যম তাই নচিকেতাকে বলিলেন, তুমি অল্প বর প্রার্থনা কর। তুমি শতায়ু প্রার্থনা কর, ধন-জন-ঐশ্বর্য প্রার্থনা কর—হয়-হস্তী-স্ববর্ণ প্রার্থনা কর; ‘যে যে কামা তুল্লা মর্ত্যালোকে সর্বান কামাঃছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব’। [১. ১. ২৫]

কিন্তু সংকল্পে অবিচলিত শিশু উত্তর করিলেন, ‘অপি সবাং জীবিতমল্লমেব’—হে যমরাজ, এ সকলই তো অনিত্য; ‘ন বিভেন তপণীয়ো মনুস্তা’—মানুষ তো শুধু বিভ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় না। তখন যম কহিলেন, নচিকেতা, তুমি ‘শ্রেয়’কে পরিত্যাগ করিয়া ‘শ্রেয়’ প্রার্থনা করিয়াছ। সাধু তোমার জিজ্ঞাসা। এই বলিয়া মধুর শ্লোকে শ্লোকে তিনি তাঁহাকে ‘গুহাহিতং গম্মরেষ্ঠং পুরাণম্’ যে দুজ্জৈয় তত্ত্ব, তাহাই বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, পরম তত্ত্ব হইল ব্রহ্ম বা আত্মা; ইহা ‘অক্ষয়’—ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—‘অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণঃ’। ইহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, আবার মহৎ হইতেও মহত্তর—‘অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্’। শরীর-রথে তিনিই রথী—‘আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু’ [১. ৩. ৩.]। ‘যদেবেহ তদমৃত্র যদমৃত্র তদম্বিহ,—যাহা ইহকালে, তাহাই পরকালে—যাহা পরকালে, তাহাই ইহকালে [২. ১. ১০.]। তিনিই ‘হংসঃ শুচিষদ্ বহুরন্তরিক্ষসদ্ হোতা বেদিষদ্ অতিথির্হৌগসৎ’ [২. ২. ২.]। উপরন্তু সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে যিনি এক, বাহিরের রূপে তিনিই বহু :

‘একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিক্রপোবহিচ্’ ॥ [২. ২. ৯.]

এই যে অমর আত্মা, ইহাকে শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না, ধীর ব্যক্তি তপস্বী দ্বারা হৃদয় মধ্যে সেই শুদ্ধ শুভ্র জ্যোতির্ময়কে অনুভব করেন। তাঁহাকে ‘জ্ঞানার পথ অতি দুর্গম’। ক্রান্তদর্শী কবিগণ বলেন, সে পথ কুরুর ধারের ত্যায় দুর্ভাবক্রমণীয়। অতএব, হে নচিকেতা, তুমি ওঠ, জাগো, বরণীয় লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও,

উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

কুরুর দ্বারা নিশিতা দুর্ভায়া দুর্গং পথস্যং কবয়ো বদন্তি ॥ [কঠ. ১. ৩. ১৪]

ভারতবর্ষের শিশুও যে একদিন ‘প্রেম’ ভোগ্যকে পরিহার করিয়া ‘শ্রেয়কে’ জীবনে কামনা করিত, শিশু নচিকেতা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। কঠোপনিষদের শ্লোকগুলি মধুর অমৃতবর্ষী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই উপনিষদের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে।

‘শ্বেতাশ্বতর’ উপনিষৎ আগাগোড়া শ্লোকে নিবদ্ধ। বৈদিক সাহিত্যের বহু ঋক্ ইহাতে সমাহৃত হইয়াছে। ‘ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি’—এই বাক্য দ্বারা ইহার সূচনা। ইহাতে কোন কাহিনী নাই। কয়েকটি দিক ইহাতে ইহার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ইহাতে শৈব ও শাক্ত দর্শনের মূল ভিত্তি শক্তি-বিশিষ্টাদৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ যজুর্বেদীয় শতরুদ্রিয়শোভের দেবতা ঈশান রুদ্র ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তৃতীয়তঃ ইহাতে যোগ-মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে, ‘বিদ্বান্ মনো ধারয়েতা-শ্রমজ্ঞঃ’—২. ২.; চতুর্থতঃ মহর্ষি কপিলকে আদিজাতক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—‘ঋষিঃ প্রসূতং কপিলং যশ্মমে’—৫. ২.; পঞ্চমতঃ প্রকৃতিই মায়া এবং মহেশ্বর মায়াধীশ—এই তথ্যটিও এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত.

মায়াঃ ভূ প্রকৃতিঃ বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।

উস্মাবয়ব ভূতৈস্তস্য ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ [শ্বেত. ৪. ১০]

শক্তিযোগে ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশ ঘটে—ইহাই এই উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য :

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্

বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ।

বি চৈতি চাস্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ [শ্বেত. ৪. ১]

—যিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও শক্তিযোগে বহুকে প্রকাশ করেন, প্রলয়ে বাহ্যতে বিশ্ব বিলীন হয়, তিনি আমাদের কাছে শুভ শুদ্ধির সহিত যুক্ত করুন।

শ্রুতবজ্রবেদের শেষ অধ্যায় (৪০ অধ্যায়) ‘ঈশোপনিষৎ’ নামে খ্যাত। ১৮টি শ্লোকে সমাপ্ত এই উপনিষদে ধর্ম ও কর্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এবং সৃষ্টি ও অসৃষ্টির সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম ও কর্ম এক শৃঙ্খলে গ্রথিত। বিশ্বজনগতকে ঈশ্বরময় জ্ঞান করিয়া ত্যাগশূন্য ভোগকেই ভারতবর্ষ স্বীকার করে। ঋষি তাই বলেন,

ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং তৎ ॥

তেন তান্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধ কস্তৃষিদ্ধনম্ ॥ [ঈশ. ১]

বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান—উভয়কেই জানিতে হইবে। অবিদ্যা ও বিজ্ঞান দ্বারা যত্নকে জয় করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত আশ্বাদন করিতে হইবে—‘অবিদ্যা যত্নং তীৰ্ণা বিদ্যায়ামৃতমমুতে’ [ঈশ. ১১]। পরম সত্যের মুখখানি অতি উজ্জল হিরন্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত, এই চোখ-ধাঁধানো উজ্জল্য অপসারিত হইলেই সত্যকে দেখা যায়। তাই ঋষির প্রার্থনা,

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্ ।

তদ্বৎ পুষ্পপাবুণ সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ [ঈশ ১৫]

গুরু ঋজুর্বেদের আর একখানি উপনিষৎ ‘বৃহদারণ্যকোপনিষৎ’। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায় এবং আয়তনে স্তব্ধবৃহৎ। ইহা তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত—মধুকান্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকান্ড ও খিলকান্ড। প্রত্যেক কাণ্ডে দুইটি করিয়া অধ্যায়। মধুকান্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব; এই কাণ্ডেরই অন্তর্গত বহুখ্যাত মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ^১ [বৃঃ আঃ ২. ৪]। মৈত্রেয়ী ভারতীয় নারী-জীবনের একাদর্শ। একদিন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে পাখিব সম্পৎ ভাগ করিয়া দিয়া সন্ন্যাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মৈত্রেয়ী বলিলেন, পৃথিবী বিত্তদ্বারা পূর্ণ হইলেও আমি কি অমর হইতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায় না। তখন মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিলেন, ‘যেনাহং নামতা স্তাং কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্’—যাহা দিয়া আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহা দিয়া কি করিব? আপনি আমাকে অমরত্ব লাভের উপায় বলুন। প্রিয়র প্রিয় প্রপ্নে যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দিত হইলেন, পত্নীকে উপদেশ করিলেন ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম বা আত্মার প্রয়োজনেই পতি জায়ার প্রিয়, জায়া পতির প্রিয়া; আত্মার প্রয়োজনেই পুত্র, বিত্ত, লোক—সব কিছু প্রিয়। এই আত্মারই নিশ্বাস ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাকিরস, ইতিহাস,

১. এই সংবাদটি যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডের—অর্থাৎ ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণে পুনরুক্ত হইয়াছে।

পুরাণ, বিজ্ঞা, উপনিষৎ, শ্লোক, স্তত্র, অমৃত্যুখ্যা।^২ মধুকাকের 'মধুব্রাহ্মণ' [২. ৫] কবিশ্বে ও তত্ত্বগাভীরে স্তমধুর। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়, 'বোহয়মাআ ইদমমৃতমিদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম্'—আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই সর্ব। এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই পৃথিবীর পক্ষে মধু; জল সর্বভূতের মধু, সর্বভূত জলের মধু; এইরূপে বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, বিহ্বাৎ, স্তনয়িত্ব (মেঘবর), আকাশ, ধর্ম, সত্য ও মাহুষ—সবই সকলের পক্ষে মধু। এই মধুর সার 'আত্মা'—ইনি সকলের অধিপতি, সকলের রাজা।

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। এই কাণ্ডের প্রধান নায়ক যাজ্ঞবল্ক্য। বিদেহ-সম্রাট জনকের বহুদক্ষিণ বজ্রাতুষ্ঠানে স্তবর্ণশূক্ৰ সহস্র গাভী দক্ষিণার্থে সংগৃহীত হইয়াছে। জনকের ইচ্ছা, শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ এই দক্ষিণা গ্রহণ করেন। নানা দিগ্দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছেন। কেহই গাভী গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। আসিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি অশ্বেষাসী সামশ্রবাকে গাভী মোচন করিতে বলিলেন। অগ্ন্যগ্ন ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র হইয়া উঠিলেন। একে একে সকলে যাজ্ঞবল্ক্যকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—অখল, আতভাগ, ভূজ্যা, উৎসি, কহোল, আকুণি, বাচরুণী গার্গী ও আরও অনেকে। সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া মূনিগণকে নিরস্ত করিলেন ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য। বচরুহিতা গার্গী এই সভার অগ্ন্যতম গৌরব; তিনি নারী, তিনি জিজ্ঞাস্ত্র, তিনি নির্ভীক; অক্ষরব্রহ্ম বিষয়ক প্রশ্নটি তাহারই। সে প্রশ্ন স্বতীক্ৰ তীরের জায় সপত্ন-ভেদী। যাজ্ঞবল্ক্য তাহারও উত্তর দিলেন, অক্ষরব্রহ্মই চরম তত্ত্ব:

এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধুতো তিষ্ঠত

এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি জ্বাবা পৃথিব্যে বিধুতে তিষ্ঠত

এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি নিমেষা মুহূতো অহোরাত্রাণ্য-

ধমাসা মাসাখতবঃ সংবৎসরা বিধুতাস্তিষ্ঠতি। [বৃ. আ ৩. ৮. ৯]

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে 'জ্যোতিঃ ব্রাহ্মণ' অংশটিও [৪. ৩] অতি সুন্দর:

জনক প্রশ্ন করিলেন, কিং জ্যোতিঃ ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সূর্য প্রভাই জ্যোতিঃ।

জনক : সূর্য অস্তমিত হইলে জ্যোতিঃ কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য : তখন চন্দ্রই জ্যোতিঃ।

২, 'অরেহস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃস্মিতমেতদ্ যদৃথেনো যজুর্বেদঃ সামবেদোহর্থবাক্সিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ স্তত্রাণ্যমৃত্যুখ্যানানি ব্যাখ্যানানি' [বৃ. আ: ২. ৪. ১০] —এই বাক্য হইতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের তালিকা সংগ্রহ করা যায়।

জনক : চক্রে অভাবে জ্যোতি কি ?

বাজবল্য : অন্ধকারে অগ্নিই জ্যোতি ।

জনক : অগ্নি নির্বাণিত হইলে জ্যোতি কি ?

বাজবল্য : অগ্নির অভাবে জ্যোতি শব্দ । অন্ধকারে
যেখানে আলো নাই, সেখানে শব্দজ্যোতি পথ দেখায় ।

জনক : শব্দেরও যখন অভাব হয়, তখন জ্যোতি কি ?

বাজবল্য কহিলেন, আত্মাই তখন জ্যোতিঃস্বরূপ ।

এই আত্মাই ‘হিরণ্ময় পুরুষ একহংসঃ’

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় ‘খিলকাণ্ড’ । ইহাতেও কয়েকটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে দ-উপাখ্যানটি উল্লেখযোগ্য । প্রজাপতির তিন সন্তান—দেবতা, মানুষ, অশ্বর । ব্রহ্মচর্যে বাস করিয়া তাঁহারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন । দেবগণ বলিলেন, উপদেশ দিন । প্রজাপতি বলিলেন, ‘দ’ । দেবগণ বুঝিলেন, প্রজাপতি বলিতেছেন, ‘দাম্যত’ (দমন কর) । মহুগণকেও প্রজাপতি উপদেশ করিলেন, ‘দ’ । মানুষেরা বুঝিল, প্রজাপতি বলিতেছেন, ‘দন্ত’ (দান কর) । অশ্বরগণও অতুরূপে প্রজাপতি হইতে ‘দ’ উপদেশ পাইলেন । তাঁহারা বুঝিলেন; প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিতেছেন, ‘দয়ধম্’ (দয়া কর) । দম, দান, দয়া এই তিনের প্রতীক তিন ‘দ’ । আজও পর্যন্ত মেঘগর্জনে এই তিনটি দৈবী বাক্ উচ্চারিত হয়, ‘দ দ দ ইতি দাম্যত দন্ত দয়ধমমিতি’ । [বৃ. আ. ৫. ২] ।

সামবেদের বিখ্যাত উপনিষৎ ‘ছান্দোগ্য উপনিষৎ’ । এই উপনিষৎখানিকে প্রাচীনতম উপনিষদের মধ্যে একখানি বলিয়া গণ্য করা হয় । ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রকৃতি অন্তান্ত উপনিষৎ হইতে স্বতন্ত্র । ইহাতে উপাসনার গুরুত্ব । আটটি অধ্যায়ের ভিতর প্রথম তিন অধ্যায়ে বিবিধ উপাসনার বিষয়, যথা, উদগীথোপাসনা, স্তবোপাসনা ও মধুবিজ্ঞা । আরও একটি বিষয়ে এই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : দেহই যে ব্রহ্মপুত্র এবং উহার অভ্যন্তরে ‘দহর পুণ্ডরীকবেশ্ব’ (হৃদয়পদ্মরূপ গৃহ), তাহা উক্ত হইয়াছে । দেহস্থ রসবাহী নাড়ীর উল্লেখও ইহাতে পাওয়া যায় । দেহতত্ত্বের এই সকল কথা উপনিষদে নূতন । উপনিষদের মর্মবাণী—আত্মাই জিজ্ঞাস্ত—এ বিষয়েরও অসম্ভাব নাই । এই আত্মাই ‘ভূমা’, উহাই স্মৃৎ—‘যো বৈ ভূমা তং স্মৃৎ নাঙ্গে স্মৃৎমসি । ভূমৈব স্মৃৎম্’ [ছা. উ. ৭. ২৩] ।

কাহিনীর অবতারণাতেও এই উপনিষদের ক্রটি নাই । চাক্রায়ণ (চক্র-ভ্রমণ) উষস্তির উপাখ্যান, শ্বेत কুব্জের উপাখ্যান, জানশ্রুতি ও যৈক্বের উপাখ্যান,

কৌতূহলোদ্দীপক। জাবাল সত্যকামের কাহিনী [৪. ৪. ১] অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। সত্যকাম ছিলেন ‘পরিচারিণী’ জবালার পুত্র। তিনি একদিন মাতাকে বলিলেন, আমি গুরুগৃহে বাস করিতে চাই, আমার গোত্র কি—‘কিংগোত্রো বৃহমন্সিতি?’ মাতা উত্তর করিলেন, তুমি যে কোন্ গোত্র, তাহা ত জানি না। যৌবনে আমি বহুচারিণী পরিচারিণী ছিলাম [‘ব্রহ্মহং চরন্তী পরিচারিণী’]। সেই সময় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। তুমি নিজেকে জাবাল-সত্যকাম নামে পরিচয় দিও। সত্যকাম হারিদ্ৰম্ গোতমের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচর্যে বাস করিব। তিনি কহিলেন, সোমা তোমার কি গোত্র? সত্যকাম মাতার উক্তির প্রতীক্ষা করিলেন। গোত্ৰম্ কহিলেন, ‘নৈতদব্রাহ্মণো বিবর্তুঃ মর্হতি, সর্মিধঃ সোম্যাহর। উপ যা নেম্যে ন সত্যাদগা ইতি।’—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ এরূপ বলিতে পারে না, হে সোম্য, তুমি সত্যব্রহ্ম হও নাই, সর্মিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব। সত্যকাম গোচারণে বহির্গত হইলেন: চারিশত দুবল গাভী সত্যকামের পরিচর্যায় সহস্র গাভীতে পরিণত হইলে তিনি আচার্যসদনে চলিলেন। ফিরিবার কালে তিনি দুষভ, অংগ, হংস ও মদগু (একপ্রকার জলচর পাখী) হইতে ব্রহ্মের চতুষ্কল চারিটি তত্ত্ব অবগত হইয়া গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গুরু প্রশ্ন করিলেন, তুমি ব্রহ্মবিদের ত্রায় দীপ্তি পাইতেছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন? সত্যকাম উত্তর করিলেন, মনুস্মৃতির প্রাণী হইতে আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, এখন আপনি আমাকে উপদেশ করুন। গুরুও তাহাকে সেইরূপই উপদেশ করিলেন।

শ্বেতকেতু-আরুণি সংবাদটিও সুন্দর। আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন আমাদের কূলে কেহই ‘ব্রহ্মবন্ধু’ (ব্রাহ্মণবংশজাত হইয়াও যে আচার-বর্জিত) নয়, তুমি গুরুকূলে গিয়া অধ্যয়ন কর। শ্বেতকেতু বার বৎসর বয়সে গুরুকূলে গিয়া চব্বিশ বৎসরের সময় ফিরিয়া আসিলেন। পিতা দেখিলেন পুত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াও ‘মহামনা’ (অহংকারী), ‘অনুচানমানী’ (জ্ঞানাভিমानी) ও ‘স্তুক’ (অবিনীত) হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, যাহাযারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমন্তব্য মন্তব্য হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, সেই আদেশটি পাইয়াছ কি? শ্বেতকেতু কহিলেন, নিশ্চয় গুরুগণ তাহা জানেন না, তাই আমাকেও বলেন নাই; আপনি আমাকে বলুন। পিতা তখন ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট সৃষ্টিরহস্ত ব্যাখ্যা করিলেন, বুঝাইলেন, সৃষ্টির আদিতে ছিলেন ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব ‘তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়য়েতি’—[ছা. ৬. ২. ৩]—তাহার ফলে সৃষ্টি পত্তন হইল। পিতা পুত্রকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া শিক্ষা

দিলেন, এক আত্মাই বহু হইয়াছেন। সমস্ত জগৎ সেই আত্মারই প্রকাশ, সেই আত্মাই সত্য। হে খেতকেতু, ‘তুমিই সেই’—‘তত্ত্বমসি’। ‘তত্ত্বমসি’—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উপনিষদের শিক্ষা।

নারদ-সনৎকুমার সংবাদে [ছা. উ. ৭.] ‘যো বৈ ভূমা তৎ স্তখং নান্নে স্তখমন্তি’—এই তত্ত্বটি পরিবেশন করা হইয়াছে। সনৎকুমারই ইন্দ্র। তিনিই ‘মৃদিতকষায়’ (রাগদেযাদি বিমুক্ত) নারদকে অন্ধকারের পরপার দর্শন করাইয়াছিলেন। এই উপনিষদ হইতে তৎকালপ্রচলিত অপরা বিদ্যার একটি তালিকা পাওয়া যায়; সেগুলি হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্বণ, পঞ্চমবেদ ইতিহাসপুরাণ, ‘বেদানাং বেদঃ’ (ব্যাকরণ), ‘পিত্র্য’ (শ্রাদ্ধকল্প), ‘রাশি’ (গণিত), ‘দৈব’ (উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা), ‘নিধি’ (অর্থশাস্ত্র); ‘বাকোবাক্য’ (তর্কশাস্ত্র), ‘একায়ন’ (নীতিশাস্ত্র), ‘দেববিদ্যা’ ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ ‘ভূতবিদ্যা’, ‘ক্ষত্রবিদ্যা’ (ধর্মবেদ), ‘নক্ষত্রবিদ্যা’ (জ্যোতিষ), ‘সর্পদেবজনবিদ্যা’ (গারুড় ও গান্ধর্ব শাস্ত্র) [ছা. উ. ৭. ১. ২]। সকল বিদ্যার সার আত্মজ্ঞান।

‘ছানোগ্য’ উপনিষদের সর্বশেষ আখ্যান—ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ। ইন্দ্র দেবরাজ, বিরোচন অহুরপতি। যে আত্মাকে লাভ করিলে সকল কাম্য লাভ করা যায়, তাহাকে জানিবার জন্য উভয়ে প্রব্রজ্য। অবলম্বন পূর্বক সম্মিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, অন্ধিতে (চক্ষুতে) যে পুরুষ হয়, তিনিই আত্মা। বিরোচন বুঝিলেন, দেহই আত্মা; তিনি অস্বরগণের নিকট গিয়া প্রচার করিলেন, দেহই আত্মা, দেহই ‘মহাযা’ (পূজনীয়), দেহই ‘পরিচর্য’ (পরিচর্যার যোগ্য); ইহাই আত্মার উপনিষৎ। এইজন্ত যে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, অযজ্ঞা—তাহাকে অশ্রজিও বলা হয় আত্মার। পথে যাইতে যাইতে ইন্দ্র চিন্তা করিলেন, দেহ আত্মা হইতে পারে না, কারণ, আত্মা বিজর, বিষতু, রিশোক, ক্ষুধা-পিপাসাহীন—কিন্তু দেহ নশ্বর, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসার অধীন। তিনি প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ‘নাহমত্র ভোগ্যঃ পশ্চামি।’ তখন প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্যে বাস করাইলেন; এইরূপ আরও বত্রিশ বৎসর করিয়া শতবর্ষে ইন্দ্রকে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। দেবগণ তাই আত্মবিদ।

সামবেদের আর একখানি উপনিষৎ ‘কেনোপনিষৎ’। ‘কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ’—কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন কার্য করে—এই প্রশ্ন লইয়া ইহার সূচনা।

উদ্ভব হইল, ‘তদেব ব্রহ্ম’। এই ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত, অথচ বাক্য-মন ইহা দ্বারা উদ্ভাসিত। আত্মবিজ্ঞাই ব্রহ্মবিজ্ঞা। ইহা দ্বারাই অমৃত লাভ হয় [‘বিত্তয়া বিম্বতে অনৃতম্’—২. ৪.]। উমা-হৈমবতার মনোজ্ঞ কাহিনী দ্বারা [কেন. ৩. ৬.] এই সত্যই সমর্থিত হইয়াছে। অশ্বরদের জয় করিয়া অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ব-শক্তির মহিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলে মহন। এক বক্ষ প্রাহুভূত হইলেন। অগ্নি জ্ঞানিতে গেলেন, কে এই বক্ষ। বক্ষ অগ্নিকে ‘জাতবেদা’ জানিয়া তাঁহাকে একগাছি তণ দ্বন্দ্ব করিতে বলিলেন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নি উহা দ্বন্দ্ব করিতে পারিলেন না। তাহার পর আনিলেন ‘মাতরিখা’ বায়ু। সমস্ত শক্তি দিয়া তিনিও তণগাছিকে বিচালিত করিতে পারিলেন না। তখন আসিলেন স্বয়ং ইন্দ্র। বক্ষ তখন অচর্চিত হইয়াছেন। সেই আকাশে বিরাজ করিতেছেন, ‘বহ শোভমানা’ স্বীয়মূর্তি উমা হৈমবতী। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, ‘কিমেতদ্যক্ষম্’। তিনি উত্তর করিলেন, ‘ব্রহ্মজিৎ’; এই ব্রহ্মের বিজয়েই দেবগণ মহিমাষিত হইয়াছেন। কাহিনীটি ব্রহ্মতত্ত্বের দিক হইতে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, শক্তি-তত্ত্বের দিক হইতেও তেমনই ইঙ্গিতগত। উমা-হৈমবতীই ব্রহ্মবিজ্ঞা।

অথর্ববেদের প্রায় একশত কুড়িখানি উপনিষৎ আবিস্কৃত হইয়াছে : কোন কোনটি অতি অপ্রাচীন। মৃগক, মাণ্ডুক্য ও প্রশ্ন—এই তিনখানি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। মৃগকোপনিষদের জিজ্ঞাসু শৌনক, উদ্ভর-কতা ঋষি অস্বির। ইহা শৌনক শাখার উপনিষৎ। এখানে দুইটি বিচার কথা বলা হইয়াছে, ‘যে বিত্তে বেদিতব্যে... পরাচৈবাপরা চ’ [মৃ. ১. ১. ৪.]। বেদ-বেদান্তাদির বিজ্ঞা অপরা বিজ্ঞা। কর্মফলকামী অপরা বিজ্ঞার উপাসনা করেন। অগ্নিহোত্রাদি কর্মও অপরা বিজ্ঞার অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে অগ্নির সপ্তাঙ্কস্বরূপে—কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, স্তম্ভস্রবণা, ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বকর্টার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কর্মদ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও বিচ্যুতি আছে। ব্রহ্মজ্ঞানই পরাবিজ্ঞা। ‘ব্রহ্ম অমৃতঃ’, ‘পরতঃ পরঃ’—তিনি ‘আনন্দরূপমমৃতম্’; তাহা সত্ত্ব—জ্যোতিরও জ্যোতি, তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ বিশ্ব জগৎ : ‘তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তস্মৈ ভাসা সর্বমিদং বিভাতি’। [মৃ. ২. ২. ১০.]

সত্য দ্বারা এই আত্মা লাভ হয়। সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা নয়—সত্য দ্বারা দেবদান পথ বিতত (আন্তীর্ণ) : ‘সত্যমেব জয়তি নানৃতঃ সত্যেন পশ্বা বিততো দেবদানঃ’ [মৃ. ৩. ১. ৬.]। এই আত্মাকে শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, মেধা দ্বারা বা ঈশ্বরি দ্বারা লাভ করা যায় না—বলহীনের দ্বারাও আত্মা লাভ হয় না [‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’—৩. ২. ৪.]; বিদ্বানই ইহাকে লাভ করিতে পারেন।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে ‘ওঙ্কার-মহিমা’ কীতিত হইয়াছে ; ‘ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্’। উপনিষদখানি আকারে অতি ক্ষুদ্র। ওঙ্কার আত্মার প্রতীক। আত্মা ‘চতুষ্পাং’, অর্থাৎ উহার চারিটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্বযুগ্ম, চতুর্থ বা তুরীয়। চতুর্থ অবস্থা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য—উহা ‘শান্তং শিবমমৈতম্’; মাত্ৰাহীন (অমাত্ৰ) ওঙ্কার সেই চতুর্থ অবস্থা। যিনি ইহা জানেন, তিনি স্বয়ং আত্মায় প্রবিষ্ট হন।

প্রশ্নোপনিষদও পরব্রহ্ম-জ্ঞাপক। স্বকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়ণি, কৌসল্য, বৈদর্ভী, ও কবন্ধী প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি ভগবান পিঙ্গলাদকে ‘প্রশ্ন’ করিয়া উপনিষৎ জ্ঞাত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ‘প্রশ্নোপনিষৎ’। ইহা পৈঙ্গলাদ শাখার উপনিষৎ। ছয়জনের প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর ইহার ছয়টি অধ্যায়। এখানেও ব্রহ্মই যে পরম, ‘নাতঃ-পরমস্তি’—এই সত্য বিদ্যোষিত হইয়াছে। প্রশ্নকৃতঃ ইহাতে দেহস্থ নাড়ী ও প্রাণ-বায়ুর কথা বিবৃত হইয়াছে। এই উপনিষদের বাণী : ‘তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যাথা’ [প্রশ্ন. ৬. ৬.]—সেই বেদ্য পুরুষকে জান, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে না পারে।

এই তিনখানি উপনিষৎ ব্যতীত অথর্ববেদের আরও অনেক উপনিষৎ আছে। সেগুলি যোগ ও তন্ত্রোপাসনার কথায় পূর্ণ। ‘তারকোপনিষৎ’, ‘জ্বালোপনিষৎ’ ‘তেজোবিন্দুপনিষৎ’, ‘হংসোপনিষৎ’ প্রভৃতি উপনিষদে যোগাচার এবং ‘কৌলোপনিষৎ’ ‘ত্রিপুরোপনিষৎ’ প্রভৃতিতে শাক্তাচারের কথা পাওয়া যায়। অথর্ববেদ ও তাহার শাখা-প্রশাখার সহিত যোগ ও তন্ত্রের গূঢ় সংযোগ রহিয়াছে।

ব্রহ্ম বা আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই উপনিষদের প্রধান লক্ষ্য। ব্রহ্মবাদ বা আত্ম-বাদ উপনিষদের নিজস্ব বলিলেও অতীক্ৰি হয় না। বেদের সংহিতা ভাগে সকল দেবতার অন্তরালে যে পরম এক আছেন, তাহা আভাসিত হইয়াছে। ‘একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি’ [ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬.], ‘দেবানাং নামধা এক এব’ [ঋ. ১০. ৮২. ৩.], ‘একং বা ইদং বিবর্ত্ব সর্বম্’ [ঋ. ৮. ৫৮. ২.]—এইরূপ একেশ্বরবাদ, কিংবা যে কোন দেবতার ‘মহী’ রূপে প্রতিষ্ঠা, যেমন, ইন্দ্র ‘একো বিশ্বস্ত ত্বনস্ত রাজা’ [ঋ. ৬. ৩৬. ৪.], ‘স্বর্ঘ্য আত্মা জগতন্তম্বুশ্চ’ [ঋ. ১. ১১৫. ১. ১.], ‘বট্ মহী অসি স্বর্ঘ্য’ [সা. ২. ; অ. ১৩. ২. ২২] থাকিলেও, পরমেশ্বর রূপে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের প্রয়োগ সেখানে নাই; ব্রাহ্মণে ব্রহ্মের কথা বীজাকারে আছে [‘ব্রহ্মণঃ সাত্ব্যতাম্’—শত. ব্রা. ১১. ৫. ৬.]। উপনিষদে ব্রহ্মই এক এবং ‘অদ্বিতীয়’; ব্রহ্মই শ্রোতব্য, মন্তব্য, জ্ঞেয়; ব্রহ্মজ্ঞানই

পর্যাবধি ; তাহাই নিঃশ্রেয়স্। উপনিষদে পাণ্ডিত্য, মেধা ও শ্রুতিজ্ঞানকেও নিয় আসন দেওয়া হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, আত্মচৈতন্যিক ধর্ম ও শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনাত্মক মনোভাব আরণ্যক-উপনিষৎ হইতেই সূত্র হইয়াছে।^১ ব্রহ্মকে জানাই জীবনের চরম লক্ষ্য তাঁহাকে জানিলেই অমৃত ও অভয়ে প্রতিষ্ঠা। উপনিষদের যুগে এই জ্ঞানের জ্ঞাত উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ—নয় ও নারী—রাজা ও সাধারণ গৃহস্থ। চিন্তার দিক হইতে প্রাগসর এই জীবন নিঃসন্দেহে গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।

স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, উপনিষদের মানুষ কি কর্ম-বিমুক্ত হইতে চাহিয়াছে ? সাহিত্য ও ব্রাহ্মণে যে জীবন রসিক মাতৃশবের কথা পাওয়া গিয়াছে, উপনিষদের মানুষ কি তাহা হইতে স্বতন্ত্র ? স্বতন্ত্র নয়, জীবন-পলাতকও নয়। উপনিষদের কাহিনী-গুলিই তাহার প্রমাণ। যে ব্রহ্ম-স্বাদ লাভের জ্ঞাত মানুষ ব্যাকুল, তিনি রসধন [‘রসো বৈ সঃ’], তিনি আনন্দরূপ অমৃত [‘আনন্দরূপমমৃতম’]। এই রসকে লাভ করিয়া জীবও আনন্দ-স্বরূপ হয়—‘রসং হেবায়ং লক্ষানন্দীভবতি’ [তৈ. উ ২. ৭.]। ‘ঈশাবাস্তামিদং সবম্’ এই জ্ঞানে ‘ত্যক্তেন ভুক্তাথা’—ত্যাগ দ্বারা ভোগ—ইহাই উপনিষদের আদেশ। জগতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র পথ। সত্যকে ষাঁহার জীবনের ধ্রুবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মকে ষাঁহার সর্বব্যাপী দেখিয়াছেন, আনন্দ ও অমৃতকে ষাঁহার বিশ্বময় ছড়ানো দেখিয়াছেন, তাহার জীবন-প্রেমিক। ষাঁহাদের দৃষ্টিতে সবই পূর্ণ, ‘পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং’—প্রেম, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহারাই বলিতে পারেন, ‘সহ বীথং করবাবহৈ...মা বিধিবাবহৈ’। ঋতে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে বলিষ্ঠ জীবন, সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে আনন্দে ও অভয়ে স্থপ্রতিষ্ঠ যে জীবন, উপনিষদের মানুষ সেই জীবনের প্রত্যাশী।

৭. অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য : বেদাঙ্গ, সূত্র ও উপবেদ

বেদ বলিতে সাধারণতঃ চতুর্বেদ ও তাহাদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলিকেই বুঝায়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের ব্যাপ্ত আরও বিরাট। বেদাঙ্গ, সূত্র, অঙ্কুরমণী ও পাঠ—এগুলিও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

১. The earliest trace of heterodoxy and criticism in the history of Indian religious thought is to be found in the Aranyakas and the Upanisadas—Obscure Religious cults. Chap. III, Dr S. B. Das Gupta.

বেদাঙ্গ

বৈদিক সাহিত্যের একটি মূল্যবান অংশ ‘বেদাঙ্গ’। বেদ বুঝিবার পক্ষে বেদাঙ্গ অপরিহার্য। লোকে বলিতেও বলে, ‘বেদ-বেদাঙ্গ’। বেদাঙ্গ ছয়টি : শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কল্প। বেদ-পুরুষের ছয়টি অঙ্গ, অর্থাৎ ‘ষড়ঙ্গ’। ‘ছন্দ’ বেদ-পুরুষের পদ, তাহার হস্ত ‘কল্প’, ‘জ্যোতিষ’ তাহার চক্ষু, ‘নিরুক্ত’ শ্রোত্র, ‘শিক্ষা’ জ্ঞান, আর ‘ব্যাকরণ’ তাহার মুখ। কল্পনাটি হৃদয়। বস্তুতঃ অঙ্গ লইয়া যেমন মানুষের পরিপূর্ণতা, তেমনি বেদাঙ্গ লইয়া বেদের পরিপূর্ণতা।

। শিক্ষাশাস্ত্র ॥ বৈদিক মন্ত্রগুলি যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতভেদে স্বরের উচ্চারণ-রীতি, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ভেদে স্বরের নাদ-বৈচিত্র্য এবং অক্ষরের মাত্রা ও বল (উচ্চারণের প্রযত্ন) প্রভৃতি জানা আবশ্যিক। এইগুলি ‘শিক্ষা’র আলোচ্য বিষয়। আচার্য শৌনক বলেন, ‘শিক্ষা শিক্ষাতেহনয়েতি বর্ণাভ্যুচ্চারণ’। শিক্ষাশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে বেদের ধ্বনি-বিজ্ঞান। এই ধ্বনি-বিজ্ঞান জানা না থাকিলে মন্ত্রোচ্চারণে প্রমাদ ঘটিতে পারে এবং তাহা যজ্ঞমানের পক্ষে ক্ষতিকর। এইজন্তই শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজনীয়।

॥ ব্যাকরণ ॥ পদের সাধু জ্ঞানের জন্ত প্রয়োজন ‘ব্যাকরণ’। ইহা দ্বারা কিভাবে একটি পদ গঠিত বা সাধিত হয়, তাহা জানা সম্ভব। বেদপাঠে স্বরের যেমন গুরুত্ব, পদেরও তেমন গুরুত্ব। প্রতি চরণে পদগুলি স্থনির্দিষ্ট নিয়মে স্থাপিত। পদ-সাধন জ্ঞান না থাকিলে পদের মর্মার্থ অধুধাবন করা দুষ্কর। এইজন্ত ব্যাকরণ বেদ-জ্ঞানের আর একটি অঙ্গ।

শিক্ষা ও ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য শৌনক ঋক্ প্রাতিশাখ্যে সংক্ষেপে শিক্ষার নিয়ম আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমানে মহর্ষি পাণিনি-কৃত শিক্ষা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রকেই প্রাচীনতম বলিয়া মনে করা হয়। পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ‘অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি’ বলিয়া তিনি শিক্ষাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পাণিনি-ব্যাকরণ অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহার আর এক নাম ‘অষ্টাধ্যায়ী’। বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার দিক হইতে অষ্টাধ্যায়ী প্রাচীন হিন্দুমনীষার একটি অমর কীর্তিস্তম্ভ। ইহা কতকগুলি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ার্থবোধক সূত্রের সমষ্টি। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া আরও পরবর্তীকালে কাত্যায়ন (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক) একখানি ‘ব্যাক্তিক’ এবং পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) ‘মহাভাষ্য’ রচনা করিয়াছিলেন।

॥ **নিরুক্ত** ॥ বৈদিক মন্ত্রপদের অর্থজ্ঞানের জ্ঞাত 'নিরুক্ত'। নিরুক্ত এক হিসাবে বৈদিক শব্দাভিধান বা মন্ত্রভাষ্য। বৈদিক ঋষিগণ কোন্ শ্লোকে, কি অর্থে, কোন্ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরুক্ত-গ্রন্থে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৈদিক শব্দার্থ নিরূপণের জ্ঞাত একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল, তাহাকে বলা হইত 'নৈরুক্তবাদী'। মন্ত্রের পদার্থজ্ঞানের নিমিত্ত নৈরুক্তবাদীদের মতের ও ব্যাখ্যার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। স্বপ্রাচীন নিরুক্তকার হিসাবে শাকপুনি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি আচার্যের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের কিছু কিছু মত পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন নিরুক্তগ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য যাস্ক-প্রণীত 'নিরুক্তই' [গ্রী: পৃ: ৮০০] এ বিষয়ে এখন একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। বৈদিক শব্দাবলীর অতি প্রাচীন ব্যাখ্যারূপে নিরুক্ত-ভাষ্যের মূল্য অসাধারণ। 'সমাম্নায়: সমাম্নাত:। স ব্যাখ্যাতব্য'—এইরূপ সূচনা সহ যাস্কের নিরুক্ত ষাটশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে শুধু বৈদ্যার্থ নিরূপণ নয়, বৈদ্যোক্ত দেবতা, দেবতা ও পদার্থ বিষয়েও মূল্যবান আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাস্ক প্রণীত 'নিঘণ্টু' পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত বৈদিক শব্দকোষ। নিরুক্ত প্রকৃত পক্ষে এই শব্দকোষেরই অর্থবিচার।

॥ **ছন্দ** ॥ বৈদিক মন্ত্রগুলি পাদবদ্ধ। এক এক পাদে পরিমিত অক্ষর সন্নিবিষ্ট হয়। পাদের এই অক্ষর-পরিমাণকেই ছন্দ বলে। যাস্ক বলেন, 'ছন্দাসি ছান্দনাত'—অর্থাৎ ছন্দ পাপকর্মকে আচ্ছাদন করে। ছন্দদ্বারা মন্ত্রের উচ্চারণ-দোষ ক্লান্তি হয়। যজ্ঞ-মন্ত্রে এইজন্ত ছন্দের স্থান অতি উচ্চ। বৈদিক মৌলিক ছন্দ প্রধানতঃ সাতটি—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অমৃষ্টপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। এগুলিকে অলৌকিক ছন্দ বলে। এ ছন্দ অক্ষরসংখ্যাত ও পাদবদ্ধ। যেমন গায়ত্রী ছন্দ: ইহা ত্রিপদা ও প্রতিপাদে আঁটি করিয়া অক্ষর। তিন পাদে মোট ২৪টি অক্ষর। প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি এই ছন্দে গ্রথিত,

তৎসবিতুর্ভরগেণ্যং

ভর্গোদেবশ্চ ধীমহি।

ধियो যো ন: প্রচোদয়াৎ ॥^২

বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে গায়ত্রীই স্বল্লক্ষণ। গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা চার করিয়া বৃদ্ধি করিলে ক্রমাহুসারে পরবর্তী ছন্দের অক্ষর-সংখ্যা পাওয়া যায়।

১। 'Yaska lived between 700—500B.C.'—Winternitz.

২। বাংলা দীর্ঘ ত্রিপদী বা লাচাড়ী ছন্দ অনেকটা গায়ত্রীর অমুরূপ।

কথিত আছে, সৈতব, কাশ্যপ কাত্যায়ন, মাণ্ডব্য প্রভৃতি মুনিগণ ছন্দশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। বর্তমানে পিঙ্গলমুনি বিরচিত ছন্দ গ্রন্থই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়, যদিচ পিঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের। পিঙ্গলছন্দ ‘ধী ক্রী’ প্রভৃতি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে আলৌকিক বৈদিক ছন্দগুলির আলোচনা, অপর পাঁচ অধ্যায়ে পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যের উপযোগী লৌকিক ছন্দের প্রসঙ্গ।

॥ জ্যোতিষ ॥ কালচক্র বা জ্যোতিষচক্রের জ্ঞানই জ্যোতিষ শাস্ত্র। বৈদিক দর্শনাগ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি যাগযজ্ঞের জ্ঞান কাল-জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। কারণ, এক এক যজ্ঞ এক এক কালে অনুষ্ঠিত হইত—যেমন, দর্শনাগ কৃষ্ণপক্ষে, পৌর্ণমাস শুক্লপক্ষে, চাতুর্মাস্য ঋতুর অন্তে এবং পশুমেধ অয়নান্তে। যজ্ঞকাল নিরূপণের জ্ঞান তাই প্রয়োজন হইত জ্যোতিষ।^{১০} রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচারে ভারতীয় জ্যোতিষ সভ্য জগতে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছে। বেদাঙ্গরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রই—ইহার মূল। এই শাস্ত্রের প্রবর্তক স্বয়ং সূর্যদেব। সৌর জ্যোতিষ কালের কবলে গ্রস্ত। পরবর্তীকালে গর্গাদি মুনি কর্তৃক যে গ্রন্থগুলি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমান ভারতীয় জ্যোতিষের ভিত্তি।

॥ কল্পশাস্ত্র ॥ বৈদিক কর্মানুষ্ঠান-ক্রমের নির্দেশ। ইহা বৈদিক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। ইহাকে বলা চলে সংক্ষেপিত ব্রাহ্মণ। কিভাবে হোত্র, আম্রর্ষ ও ঐন্দ্রগাত্র পয়োগ করিতে হয়, কল্পশাস্ত্রে তাহারই বিধান। অশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষি কল্পশাস্ত্রের প্রণেতা।

॥ সূত্র সাহিত্য ॥

কল্পশাস্ত্রের প্রসঙ্গে সূত্রসাহিত্যের নাম করিতে হয়। সূত্রসাহিত্যও বিস্তীর্ণ এবং নানাদিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রসাহিত্যই বেদ ও বেদান্তের সাহিত্যের যোগসূত্র। শুধু তাই নয়। ইহা বেদের ব্রাহ্মণাংশের প্রতিনিধি। শ্রুতির কর্মকাণ্ড এক সমঃ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল। যাগ-যজ্ঞের সংখ্যা এবং তাহাদের বিধি ও বিধান ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর এবং বিস্তৃততর হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মণের স্ববিস্তৃত বিধি ও বিধানকে সংক্ষেপে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখার উদ্দেশ্যেই সূত্র সাহিত্যের সৃষ্টি।

৩. বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রকৃতাঃ কালানুপর্য্য বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ

তস্মাদিৎ কালানুষ্ঠান-শাস্ত্রং যো জ্যোতিষঃ বেদ স বেদ যজ্ঞম্ ॥ [শব্দকল্পদ্রুম]

সহ্র সাহিত্যও নানান্যূগে বিভক্ত—ধর্মসহ্র, শ্রোতসহ্র, গৃহসহ্র ও শুদ্ধসহ্র। এই চারিটির সাধারণ নাম ‘কল্লসহ্র’। সহ্রগুলির মধ্যে প্রধান শ্রোতসহ্র ও স্মার্তসহ্র।^১ শ্রোতসহ্রগুলি ঋতি-মূল। ঋতির ষাগ-যজ্ঞের বিধানগুলি সহ্রাকারে প্রথিত। সহ্র ‘ব্রাহ্মণ’-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও উহার প্রধান বিশিষ্টতা সংক্ষিপ্ততা। ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা বিস্তৃত, সহ্রের নির্দেশ সংক্ষিপ্ত। ‘স্মার্তসহ্র’গুলি গৃহজীবনের ‘স্মৃতি’: এগুলি সহ্রাকারে গৃহজীবনের পালনীয় বিধান। তাই এগুলির পরিচিত নাম ‘গৃহসহ্র’।^২ আপসহ্র, অশ্বলায়ন, হিরণ্যকেশী প্রভৃতি সহ্রগ্রন্থ বহুবিখ্যাত।

বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও কর্মজীবনের ধারক অমর গ্রন্থ ‘মনুসংহিতা’র নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ‘স্মৃতি’। স্মৃতিরূপ ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তকরূপে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, দক্ষ প্রভৃতি ঋষির নাম পাঠ করা হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মনু ও মনুসংহিতাই শীর্ষস্থানীয়। মনুসংহিতা সমগ্র সহ্র সাহিত্যের একটি চন্দ্রাবদ্ধ সার সঙ্কলন : বিশেষতঃ বৈদিক গৃহসহ্র ও ধর্মসহ্রের ভিত্তিতে ইহা রচিত—“The sources of the metrical treatise known as Manusamhita are to be traced to the Dharma sutras, partly to the Brahmins and also to the Grihyasutras” (preface to Manusamhita. Prof. B. Goswamee)। মনুসংহিতার রচনাকাল লইয়া মতভেদ থাকিলেও, ইহা যে খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০-২০০ শতকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে জগতের সমুৎপত্তি, সংস্কারবিধি, দীক্ষা, বিবাহ, জীবিকা, স্ত্রীধর্ম, বর্বাশ্রম, রাজধর্ম, শাস্তিবিধি, চতুর্বর্ণের অন্তর্গত কর্ম, তাপসধর্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি ও নিঃশ্রয় বা আশ্রয়ধর্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই নিয়ম দ্বারা ই হিন্দুসমাজের আচার-বিচার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম—এক কথায় সমগ্র জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত।

॥ উপবেদ ॥

বৈদিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে উপবেদগুলির নামও উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় উপবেদ চারিগণি : আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। ভারতীয় জীবনের কাম্য

১. পিতামহেন বিশ্রাণাম্ আদৌ অভিহিতঃ শুভঃ।

ধর্মোবিমুক্তয়ে সাক্ষাৎ শ্রোতা-স্মার্তো দ্বিধা পুনঃ ॥ [কৃষ উপরিভাগ, ২৪ অ.]

২. গৃহ সহ্র : ‘ceremonies to be celebrated at birth, before birth, at marriage, at death and after death’—Weber ; এক কথায় গৃহসহ্র হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের বিধি-নির্দেশ। পৌরোহিত্য কর্মে ‘ব্রাহ্মণ’ অপেক্ষা ‘সহ্রের’ প্রয়োগ বেশি।

চতুর্বর্গ: ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তন্মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লোকহিতের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। উপবেদ প্রধানত: এই ত্রিবর্গ-সাধক। উপবেদগুলি অথর্ববেদমূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(১) **আয়ুর্বেদ** চিকিৎসাশাস্ত্র। রোগ-নির্ণয় ও রোগের উপশম করাই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপদেষ্টা অশ্বিনোকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি প্রভৃতি। কথিত আছে ধন্বন্তরি কাশীরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে সূক্ষ্মত আয়ুর্বেদের উপদেশ লাভ করেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ‘সূক্ষ্মত-সংহিতা’ একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। চরক-প্রণীত ‘চরক-সংহিতা’ও আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেরই অন্তর্গত কামশাস্ত্র।^১ কিন্তু কালক্রমে এই শাস্ত্র একটি স্বতন্ত্র ও বাহ্যব্যাপক শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়। কামসূত্রে^২ আছে, মনু এই শাস্ত্রের একাংশ লইয়া ধর্মাদিকারিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, বৃহস্পতি এই শাস্ত্রের একাংশ লইয়া অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। কামশাস্ত্রের আদি আচার্য নন্দী। তৎপরে শ্বেতকেতু উদ্দালক, বাভ্রব্য, দত্তক, চারায়ণ, ঘোটকমুখ, গোনদ, গোণিকাপুত্র, স্ববর্ণনাত ও কুচুমার এই শাস্ত্রের কোন-না-কোন অংশ প্রচার করেন। এই সকল আচার্যের শাস্ত্রগুলি সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া বাংস্ত্রায়ন কামসূত্র প্রণয়ন করেন। বর্তমানে বাংস্ত্রায়নের কামসূত্রই বহু প্রচলিত। এই বাংস্ত্রায়ন কে, তাহা লইয়া বিতর্ক আছে। কেহ মনে করেন, কোটিল্য চাণক্যই বাংস্ত্রায়ন। তাহা হইলে কামসূত্রকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু অধুনা-প্রচলিত কামসূত্রকে আরও পরবর্তী মনে করিবার কারণ আছে। কামসূত্রের সংগ্রহ যত অপ্রাচীনই হউক, ইহার মূল আত প্রাচীন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে ইহার স্বীকৃতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংস্ত্রায়ন-প্রণীত কামসূত্র—সাধারণ, কন্যাসম্ভুক্ত, ভাষাধিকারিক, বৈশিক, পারদারিক, সাম্প্রায়োগিক ও উপনিষদিক এই সাতটি অধিকরণে বিভক্ত। ‘ধর্মার্থ-কামেভ্যো নমঃ’ বলিয়া ইহার সূচন।। যৌবনই কামসেবার কাল [‘কামঞ্চ যৌবনে’ ১. ২. ৩.]। সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ের অনুকূলে যে প্রবৃত্তি, তাহাই কাম; কিন্তু বিশেষার্থে ‘স্পর্শবিশেষবিষয়স্বস্তাভিমানিকস্বথনিবিন্ধাকলবত্যার্থ প্রতীতি: প্রাধাত্ম্যং কামঃ’ [সূ. ১. ২. ১২.]—স্পর্শবিশেষকে আশ্রয় করিয়া স্মৃতিদির যে প্রতীতি, তাহাই কাম। শরীর রক্ষার জন্য কামের প্রয়োজন, ইহা ধর্ম ও অর্থের কলস্বরূপ। বাংস্ত্রায়ন-মতে, ত্রিবর্গের অবিরোধী যে কাম, তাহাই সেব্য। এই

১. ‘কামশাস্ত্রমপ্যায়ুর্বেদান্তর্গতমেব তদ্রৈবসূক্ষ্মতেনবাক্তীকরণাথ্যকামশাস্ত্রাভিধানাং’—প্রস্থানভেদ।

২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ‘সমগ্র কামসূত্র’।

কামের অঙ্গ চতুষ্টয় কলা। কামশাস্ত্রে বৈধী ও অবৈধী কাম এবং সম্ভোগ-শৃঙ্গারের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

২। ধনুর্বেদ যুদ্ধবিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র। কথিত আছে, ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রথমে এই শাস্ত্র প্রচার করেন। পরে ঋষি বিশ্বামিত্র এই বেদ রচনা করেন। প্রস্থানভেদে গ্রন্থে বিশ্বামিত্রকৃত ধনুর্বেদের আলোচনা আছে : উহা দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ এই চারিপাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে অস্ত্রাদির লক্ষণ। অস্ত্র চারি প্রকার—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। যে সকল অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা মুক্ত, যেমন চকাদি ; যাহা তল হইতে মক্ হইয়া না তাহা অমুক্ত, যথা খড্গা : শূলাদি মুক্তামুক্ত—উহা নিক্ষেপও করা যায়, হাতেও রাখা যায় ; যন্ত্রযোগে যাহা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যন্ত্রমুক্ত যথা শর চাপাদি। সাধারণ ভাবে মুক্তাযুধের নাম অস্ত্র, আর অমুক্তের নাম শস্ত্র। যুদ্ধের বল চারিপ্রকার হয়, কক্ষী, রথী ও পদাতি—উহাই যুদ্ধের চতুরঙ্গ। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম। ইহার প্রয়োজন সম্পর্কে বলা হইয়াছে, ‘দুঃশত্রু দণ্ডঃ চৌরাদিভ্য প্রজ্ঞাপালনং চ ধনুর্বেদঙ্গ প্রয়োজনম’ [প্রস্থানভেদ]। প্রাচীন ভারতে এই যুদ্ধবিজ্ঞান যে একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞা ছিল, বেদের কতিপয় সূক্ত হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

৩। গান্ধর্ববেদের বিষয় গীতা, বাদ্য, নৃত্যাদি। এই শাস্ত্রে বিশেষতঃ গান্ধর্ব-গণেরই অধিকার, এইজন্য নাম গান্ধর্ববেদ [‘গান্ধর্বাণাং চ যস্মাচ্ছি তস্মাদ্ গান্ধর্ব-মুচ্যতে’—নাট্যশাস্ত্র. ২৮. ২]। গান্ধর্ব দেবযোনি বিশেষ—তাহারা গীত-বাদ্য কুশল। গান্ধর্বের সহিত অম্বরী ও কিন্নর-কিন্নরীর নামও উল্লেখযোগ্য। অম্বরী স্বরেশা ও নৃত্য-গীত-পটীয়াসী ; কিন্নরও সঙ্গীতজ্ঞ। ইহারাই গান্ধর্ববেদের ধারক। এই বেদ ভারত মুনি-প্রণীত। ভারত মুনির কাল লইয়া বিতর্কের অবসান হয় নাই। পণ্ডিতগণের মতে, তিনি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের মধ্যে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন।^১ কিন্তু পুরাণ-মতে তিনি আরও প্রাচীন।

গান্ধর্ববেদের আদি নিদর্শনরূপে ভারত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রই^২ প্রধান অবলম্বন। ইহা প্রধানতঃ দৃশ্যকাব্য বা অভিনয়-প্রয়োগের আলোচনা। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ ইহাতে গীত, বাদ্য, নৃত্য, নেপথ্যপ্রয়োগ, ছন্দ, অলঙ্কার ও শ্রব্যকাব্যদির বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। ইহা ৩৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত : ১ নাট্যোৎপত্তি ২. মণ্ডপবিধান (নাট্যমঞ্চ-নির্মাণ) ৩. রঙ্গদেবতার পূজা ৪. তাণ্ডবলক্ষণ তাণ্ডব নৃত্যাদি) ৫. পূর্বরঙ্গ (নান্দী-প্রস্তাবনা) ৬. রস-প্রকরণ ৭. ভাব-ব্যাঞ্জন (বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী প্রভৃতি)

১. Sanskrit Poetics—Dr. S. K. De.

২. Bompay Ed. [কাব্যমালা. ৪২]

৮. উপাঙ্গাভিনয় ৯. অঙ্গাভিনয় ১০. চারী (পদচারণ-বিধি) ১১. মণ্ডলকল্পন
১২. ষড়্-প্রচার (স্থিতিবিধি) ১৩. করযুক্তধর্মব্যঞ্জন ১৪. ছন্দোবিধান ১৫. ছন্দোবৃত্ত-
বিধি ১৬. অলঙ্কার-লক্ষণ (কাব্যালঙ্কার) ১৭. বাগভিনয়ে কাকুত্সরবিধান ১৮. দশরূপ-
লক্ষণ (অভিনয়ের নাটক-প্রকরণ-অঙ্ক-ব্যায়োগ-ভাণাদি রূপভেদ) ১৯. নাট্যসঙ্কি
(মুখাদি পঞ্চসঙ্কি) ২০. বৃত্তি-বিকল্প (সান্বতী, কৈশিকী, আরভটী প্রভৃতি) ২১. আহাৰ্য-
অভিনয় (নেপথ্যবিধান) ২২. সামান্যভিনয় ২৩. বৈশিক (কামশাস্ত্রোক্ত বৈশিক
নায়ক-নায়িকা লক্ষণ) ২৪. স্ত্রী-পুরুষোপচার ২৫. চিত্রাভিনয় ২৬. প্রকৃতি-বিকল্প (স্ত্রী-
পুরুষের প্রকৃতি) ২৭. নাটকীয় সিদ্ধি-লক্ষণ ২৮. আতোত্ত্ব বিধি (গীত-বাগ্য বিধি)
২৯. বাগ্যবিধি ৩০. শুধিরাতোত্ত্বাধিকার ৩১. তালবিধান ৩২. ধ্রুবাধ্যায় (নাট্যবিষয়ের
সহিত সংবদ্ধ একপ্রকার গানকে ধ্রুবা বলে) ৩৩. গুণাধ্যায় (গীতের গুণ) ৩৪. পুঙ্করবাগ্য
৩৫. ভূমি বিকল্প ৩৬. নাট্য শাপ-কথা ৩৭. গুহ বিকল্প (শাস্ত্র-প্রশংসা) ।

নাট্যশাস্ত্র শূদ্রাদিরও শ্রবণযোগ্য এক নব বেদ [‘নব্যবেদবিহারোহয়ং সংশ্রাণ্যঃ
শূদ্রজাতিষু’ ১ ১২.] । ইহা ভারতীয় রস-প্রস্থানের আদি গ্রন্থ ।

(৪) অর্থশাস্ত্র চতুর্থ উপবেদ । প্রস্থানভেদের মতে—নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র
স্থপকার শাস্ত্র ও চতুঃষষ্টিকলা এই বেদের অন্তর্গত । কিন্তু চতুঃষষ্টিকলা^১ প্রধানতঃ
কামশাস্ত্র ও গান্ধর্ববেদের অঙ্গ । মনে হয়, কারুকলাগুলির অর্থশাস্ত্রের অঙ্গ,
চারুকলা গান্ধর্ববেদ বা কামশাস্ত্রের । অর্থশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় রাজতন্ত্র
ও রাজ্যশাসন-নীতি । এই গ্রন্থেই বিভিন্ন বৃত্তি বা শিল্পের আলোচনা । বৃহস্পতি-
নীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের মূল । পরবর্তীকালে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ বিষয়ে
একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । পররাষ্ট্রনীতি, রাজ্যশাসন নীতি ও মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে এই
গ্রন্থে মূল্যবান আলোচনা আছে ।

উপবেদগুলি বেদ-মূল বলিয়া অভিহিত হইলেও বস্তুতঃ এগুলি লোকসাত্ত্বানির্বাহ-
বিষয়ক বিদ্যা । উপবেদ লৌকিক, উহা লৌকিক জীবনের বেদ ।

১. চতুঃষষ্টি কলা—১. গীত ২. বাগ্য ৩. নৃত্য ৪. আলেক্য (চিত্রাঙ্কন বিদ্যা) ৫.
বিশেষকচ্ছেত্ত্ব (তিলকরচনা) ৬. তণ্ডুলকুস্তম্বলিবিচার (তণ্ডুল ও কুস্তম্ভচূর্ণ
মণ্ডলাদি রচনা) ৭. পুষ্পাস্ত্রর ৮. দশন-বসন-অঙ্গরাগ ৯. মণি-ভূমিকা (মণি দ্বারা
গহতল ভূষিত করার শিল্প) ১০. শয়ন-রচনা ১১. উদকবাগ্য ১২. উদকাঘাত (জলকেলির
হস্তকৌশল) ১৩. চিত্রযোগ (বেশাদির পরিবর্তন বিদ্যা) ১৪. মাল্যগ্রন্থন
১৫. শেখরাপীড়যোজন (শিরোভূষণযোজন) ১৬. নেপথ্যপ্রয়োগে (বেশভূষা
রচনাকৌশল) ১৭. কর্ণপ্রভঙ্গ ১৮. গন্ধযুক্তি (গন্ধ-বিলেপন) ১৯. ভূষণ-যোজন
২০. ঐন্দ্রজাল ২১. কোচুমার যোগ (আয়ুর্বেদোক্ত বাজীকরণ) ২২. হস্তলাঘব

৮ বৈদিক দেবতা

বৈদিক যজ্ঞ ও স্তবস্তুতির প্রধান লক্ষ্য ‘দেবতা’। দেবতাই হবনীয়, দেবতাই স্তবনীয়। ইহজীবনের অভ্যুদয় ও পরজীবনের অভীষ্ট কলদাতা দেবতা। সংহিতার স্তোকে স্তোকে তাই অস্তহীন দেব-বন্দনা।

এই দেবতা কে, তাহার উৎপত্তির হেতুই বা কি—ইহা চিরকালের প্রশ্ন। প্রত্যক্ষ প্রয়োজন দেব-কল্পনার মূল ভিত্তি। ভয়, বিশ্বয়, সৌন্দর্যবোধ হইতেও দেবসত্তার কল্পনা করা হয়। প্রয়োজন-প্রেরণাই মুখ্য। ভুলোকে প্রয়োজনীয় অগ্নি, সোমলতা, জল অপ্। তাই অগ্নি, সোম, আপ দেবতা। ছালোকে অতি প্রত্যক্ষ সূর্য ও মৌর জগৎ স্বর্গের অয়নে আনির্ভূত হয় রাত্রি, উষা—তাই সূর্য, রাত্রি, উষা দেবতা। অস্তরীক্ষ লোকে প্রবহমান মাতরিখা বায়ুর প্রভাবও অপরিমীম, তাই তিনি দেবতা। কিঞ্চ ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, বরুণ, অশ্বিনয় ? তাহারও প্রয়োজন-সাধক, কিঞ্চ তাহার কিসের প্রত্যক ? মহশ্রশীশ পুরুষ, প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ, ঋষ্টা বিশ্বকর্মা, দেবমাতা অদিতি - ইহারও দেবতা।

বস্তুতঃ ঠিক কোন্ স্ত্রে, কে, কখন দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা দুক্ল। বেদ-ব্যাখ্যাতরূপে নানা সম্প্রদায় বর্তমান ছিলেন—ঐতিহাসিক যাজ্ঞিক, নৈরুক্ত, আশ্বাবিদ। সম্প্রদায়ভেদে দেবতার ব্যাখ্যাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ঐতিহাসিকগণ দেবতার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী, যেমন অশ্বিনয় সম্বন্ধে তাহার বলেন, ‘রাজানো পুণ্যকৃতো’—পুরাকালের দুই পুণ্যকীর্তি রাজাই দুই অশ্বিনীকুমার।

(হাতছাপা) ১৩. বিচিত্র শাক্যয ভিক্ষুবিচারক্রিয়া ২৪. পানকরম-রাগাসব যোজন ২৫. সূচাবান্ কর্ম (সূচা শিল্প) ২৬ স্ত্রক্কাড়া ২৬. বীণাভরুককবাণ ২৮. প্রহেলিকা (ধাঁধা) ২৯. প্রতিমালা (কবিতায় উত্তরপ্রত্যুত্তর) ৩০. দুর্বাচকযোগ (দুর্বোধ্য শ্লোকাদির প্রয়োগ) ৩১. পুস্তকরচন ৩২. নাট্যাখ্যায়িকা দর্শন ৩৩ কাব্যানুশ্রুতি পূরণ ৩৪. পট্টিকা বেত্রবান যোগ (বেতস দ্বারা পট্টিকাদি নির্মাণ) ৩৫. তন্তু-কর্ম ৩৬ লক্ষণ ৩৭. বাস্তবিত্তা ৩৮. রূপারত্ন পরীক্ষা ৩৯. ধাতুবাদ ৪০. মণিরাগাকর জ্ঞান ৪১. বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগ ৪২. মেঘকুটলাবক যুদ্ধবিধি ৪৩. শুকসারিকা প্রলাপন ৪৪. উৎসাদন-সংবাহন-কেশমর্দন কৌশল ৪৫. অক্ষরমুষ্টিকাকথন (মুষ্টি-সঙ্কেত জ্ঞান) ৪৬. শ্লোচিত বিকল্প (শ্লোকভাষার জ্ঞান ৪৭. দেশভাষাজ্ঞান ৪৮. পুষ্পকটিকা (পুষ্পময় শকটনির্মাণ) ৪৯. নির্মিত্তজ্ঞান ৫০. যন্ত্র-মাতৃকা. (যন্ত্রচালন জ্ঞান ৫১. ধারণ-মাতৃকা ৫২. ছলিতক যোগ ৫৮. বস্ত্র গোপন বিদ্যা ৫৯. দ্যুত বিশেষ ৬০. আকর্ষকক্রীড়া ৬১. বালকক্রীড়ক ৬২. বৈনায়িকী (বিনয়াচার) ৬৩. বৈজায়িকী (বিজয়বিদ্যা) ৬৪. বৈয়ামিকী (ব্যায়ামাদ ক্রীড়া দক্ষতা) [শব্দ কল্পমঞ্জুভূত শিবপুরাণোক্ত বাক্য ; কামসূত্রেও (১. ৩. ১৬) এই তালিকা আছে। ‘মহাবাস্তব’ অন্তর্গত কুশজাতকের রাজচক্রবর্তী কুশের এই সকল কলা আয়ত্ত ছিল]।

হইতে পারে, পাখিব স্বকৃতকর্মা কালক্রমে দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছেন। সাংখ্যের ঈশ্বরসংজ্ঞা এই মতের পরিপোষক। যাজ্ঞিকগণের সংস্কার অনেকটা চিরকালের পূজক-পুরোহিতের অনুরূপ। আশ্ববিদ্ সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দার্শনিক পন্থায়ের, সকল দেবতাই তাঁহাদের মতে এক দেবতার রূপভেদ। দেবসত্তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও অনেকটা এই ধরনের ; যেমন শতপথ ব্রাহ্মণের ইন্দ্র শব্দের ব্যাখ্যাটি। (৬. ১. ১. ১ ;)

দেব-কল্পনার ব্যাখ্যায় নৈরুক্ত সম্প্রদায় নিসর্গবাদী। তাঁহারা মনে করেন, ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ লোকের প্রাকৃতিক লীলায় বিমুক্ত ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অগ্নির প্রয়োজন-সাধক কর্ম, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দ্যাবাপৃথিবীর বৈশ্বকর অবস্থান, দোখায়েছেন সূর্যকেন্দ্রিক সৌরলোকের অরূপ লীলা, আয়তা রাত্র ও ভাষতী উষার আবির্ভাব, আর অন্তরিক্ষে মেঘ-মকুৎ-বায়ু-বিত্যতের খেলা। এই নিসর্গ-লীলাই ঋষি-দৃষ্টিকে দেবকল্পনায় উদ্ভুদ্ধ করিয়াছে। নিরুক্তবাদীদের মতে দেবতা প্রধানতঃ তিন—ভূলোকে অগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য, অন্তরিক্ষলোকে ইন্দ্র বা বায়ু। অত্যান্ত দেবতা এই ত্রয়ীরই রূপভেদ। তাঁহাদের মতে দেবগণও তিনঃ ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ।

বৈদিক ঋষিদের দেবকল্পনার ব্যাখ্যায় কোন সম্প্রদায়ের মতই অগ্রাহ্য নয়। ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মূল্যকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে নৈরুক্তসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা প্রকৃতির কোলে পুষ্ট মানব সমাজের পক্ষে অধিকতর গ্রাহ্য।

ঋষি-কল্পনায় দেবমাত্রই চিন্ময়। বিগ্রহ-দেবতারূপে পূজিত না হইলেও প্রত্যেক দেবতা মানবীয় রূপে রূপিত ও মানবীয় ভাবে ভাবিত—এমন কি তাঁহারা অনেকস্থলে লৌকিক সম্পর্কের সূত্রে সম্পর্কিতঃ কেহ পাত, কেহ জায়া, কেহ পিতা, কেহ পুত্র বা সখা। পুরুষ ও স্ত্রীভেদে বৈদিক দেবতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর।

পুরুষ দেবতা

বেদে পুরুষদেবতার প্রাধান্য। পুরুষই ‘পুরুষসূক্তে’র সহস্রশ্লোকী বিরাট। পরম দেবতার স্বরাট রূপ ক-দেবতা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ; ইনিও পুরুষ। যজ্ঞায় অন্যান্য দেবগণের মধ্যে ঐহারা বহুস্তত, সেই অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্রও পুরুষ।

অগ্নি : ভূলোকস্থ দেবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান অগ্নি। যজ্ঞকর্মে অগ্নিই প্রধান সহায়। মর্ত্যে দেবতার দূত অগ্নি, দেবোদ্দেশে অর্পিত স্তুতি-হবি-সোম অগ্নিই দেবলোকে বহন করিয়া লইয়া যান। অগ্নিই একাধারে যজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক ও হোতা।

অগ্নি অভীষ্টবর্ষী, অগ্নিই ‘রত্নধাতা’। মাতার জ্ঞায় তিনি সকলকে ভরণ করেন [‘মাতেব যৎ ভরসে পপ্রথানো জনং জনং’ ঋ. ৫. ১৫. ৪] : তিনি দম্যহস্তা, রণে ধনঞ্জয় [‘ধনংজয়ঃ রণে রণে’—ভৃ. য. ১১. ৩৪]। আর্ঘ্য-কল্পনায় এই অগ্নি ‘হরিশ্রুশ্র’, ‘তিগ্ন জন্ত’ (ভয়ঙ্কর মুখ), ‘চিত্রভাঙ্গ’ (উজ্জ্বল শিখ) ও ‘সুক্রবর্ণ’। অগ্নির পত্নী ‘অগ্রায়ী’। ঋষি-দৃষ্টিতে অগ্নি জ্যোত্স্বিনী ব্যাপ্ত : জ্যলোকে তিনিই সূর্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, জলধিতে বাড়বানল। অগ্নি ‘কবিকৃতু’, তিনি অকবিগণের মধ্যে ক্রান্তদর্শী কবি। অগ্নিই সূর্য্যবৃদ্ধির প্রেরক—‘ধিয়ঃ হিমানঃ’। মত্যা অগ্নির নানারূপ : যজ্ঞিয়াগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ক্রবাদ্যাগ্নি প্রভৃতি। ব্রহ্মরূপে অগ্নিদেবের প্রতিষ্ঠা বেদে হয় নাই।

সোম : পৃথিবীস্থ অপর দেবতা ‘সোম’। সোমরস বৈদিক ঋষিদের পরম প্রিয় পানীয়। ইহা একপ্রকার ‘বক্রবর্ণ’ লতা। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ। ইহার মাদক শক্তিও অদ্ভুত। এই শক্তি একদিকে যেমন দেহে বলাধান করিত, অপরদিকে তেমনই মনে অপরিমেয় আনন্দ সঞ্চার করিত। যজ্ঞে সোম নিবেদন করা হইত ; এই বিশেষ যজ্ঞীয় অঙ্কুষ্ঠানটির নাম ছিল ‘সোমযাগ’। সমগ্র বেদে সোম-বন্দনায় মুখ্য, বিশেষতঃ ঋগ্বেদের নবমমণ্ডলে ‘পবমান সোম’ই একমাত্র দেবতা। সোম ‘বিশ্বস্ত ভুবনস্ত রাজা’। ধন, অন্ন, বল, মেধা, কবিত্ব—সবই সোমের অধিকারে। ইহার প্রভাবে ঋষিগণ শাস্ত্র জ্যোতির্ময় ধামে যাইতে পারেন [২. ১১৩.]। ঋষি বলেন,

অপাম সোমমমৃতা অভূম

অগ্নয় জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্। [ঋ. ৮. ৪৮. ৩]

—সোম পান করিয়া অমৃত হইব, পরে জ্যোতিমান স্বর্গে গমন করিব, ও দেবগণকে অবগত হইব। [রমেশচন্দ্র দত্ত]

বেদে ‘সোমতত্ত্ব’ একটি রহস্যময় তত্ত্ব। এক সোম মাহুষ পান করে, আর এক সোম জ্যলোকে অবস্থান করেন [‘দিবি সোমো অধিষ্ঠতি’—অ. ১৩. ১১]। সূর্য্যাস্তক্কে বলা হইয়াছে, ‘সোমঃ যৎ ব্রহ্মাণো বিহূর্ন তত্ত্বাশ্রাতি পাথিবঃ’—যে সোমকে ব্রাহ্মগণ জানেন, মাহুষ তাহাকে পান করে না। জ্যলোকের এই সোম সোমচন্দ্র। রূপে ও গুণে সোমলতা ও চন্দ্র অভিন্ন। সোম ছিলেন মুক্তবৎ পর্বতে, স্তূপর্ণ তাঁহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে [১. ২৭] আছে, সোম গন্ধর্বগণের অধিকারে ছিলেন, স্ত্রীরূপধারিণী বাগদেবতার সহায়তায় দেবগণ তাঁহাকে ক্রয় করেন। মনে হয়. সোমতত্ত্বের সহিত স-উমা = ‘উময়া সহ বর্তমানঃ’-শিবতত্ত্বের সম্পর্ক রহিয়াছে।

সূর্য : ছ্যালোকের দেবগণের মধ্যে প্রধান বিশ্বচক্ৰ সূর্য। যাক্শের মতে ছ্যালানের প্রতিনিধি সূর্য। সবিতা, পুষা, মিত্র এই সূর্যেরই প্রকারভেদ। ‘সূর্যচক্রঃ হিরণ্যম্’ সূর্যচক্র হিরণ্য—ইহা ঋষিদের বিশ্বয়। সহস্ররশ্মি সূর্য যেন সহস্র শৃঙ্গবিশিষ্ট বুধভ [‘সহস্র শৃঙ্গো বুধভঃ’ ঋ. ৭. ৫৫. স্ম.]। সপ্তাংগ বাহিত রথে ইনি ভুবন পরিভ্রমণ করেন, যেন সপ্তভগ্নীরূপ সপ্ত হরিৎ (অথ) জগতের কল্যাণার্থ সূর্যকে রথে বহন করেন। অপরিমেয় সূর্যের বিভূতি; কেহ ইহাকে বন্ধ করিতে পারে না, কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারে না। শ্রোত্বের মত সূর্যের গতি। দেবী উষা সূর্যের প্রিয়া [‘সূর্যশ্চ ষোষা’ ঋ. ৭. ৭৫. ৫.]। অতি অপূর্ব উদয়-সূর্যের বর্ণনা—

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং

চক্ৰমিত্রশ্চ বরুণস্তাগ্নেঃ।

আপ্রা ছাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষঃ

সূর্য আত্মা জগতস্তদুষ্ণশ্চ ॥ [ঋ. ১. ১১৫. ১]

—বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ—মিত্রা বরুণ ও অগ্নির চক্ৰস্বরূপ সূর্য উদ্ভিত হইয়াছেন : তিনি স্বীয় ক্রিয়ণে ছাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়াছেন। সূর্য জন্ম ও হাবর বস্তুর আত্মা।

সূর্যের এই অমেয় মাহিমা দোঁখিয়া ঋষি বলেন, ‘বট্ মহী অসি সূর্য’ [অ. ১৩. ২. ২২]। বৈদিক দেবগণের মধ্যে সূর্য সত্যই মহান।

এই সূর্যের আর এক রূপ দেব ‘সবিতা’। সায়ণ বলেন, ‘উদায়াৎ পূর্বভাবী সবিতা’—সূর্যোদয়ের পূর্বেক্ষণের অবস্থাই সবিতা। বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্র, এই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজের ধ্যান। সবিতা বিশ্বের অকল্যাণ দূর করেন, যাহা ভদ্র তাহা প্রেরণ করেন। তাই ঋষির প্রার্থনা :

বিধানি দেব সবিতহুঁরিতানি পরাশ্রব।

যদ্ ভদ্রং তন্ন আশ্রব ॥ [ঋ. ৫. ৮২. ৫]

অথর্ববেদে : [অ. ১৩. ১] ‘উগ্নভাহু’র নাম ‘রোহিত’। ইনিও ‘সহস্রশৃঙ্গ বুধভ’, যুবা কবি’, -ও ‘হবীর’। স্বপর্ণা রোহিণী ইহার অল্পভ্রতা। রোহিত বিশ্বরূপের জনয়িতা [‘বিশ্বরূপাণি জনয়ন’, ‘বিশ্বমিদং জজ্ঞান’-অ. ১৩. ১. ১]। সৃষ্টিতত্ত্বে রোহিতের স্থান অতি উচ্চে। তিনি ছাবাপৃথিবীকে দৃঢ়রূপে ধারণ করেন, তাঁহার দ্বারা দেবগণ অব্যত লাভ করেন।

বিষ্ণু : অনেকের মতে বিষ্ণুও সূর্যের প্রকারভেদ। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, ‘প্রাচীন হিন্দুগণ সূর্যকে বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন।’ এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ, ‘বৈষ্ণবী সংহিতা’র প্রথম ঋক্,

ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ত্রেধা নিদধে পদম্।

সমুচনস্তা পাংস্তরে ॥ [ঋ. ১. ২২. ১৭]^১

—বিষ্ণু সমগ্র জগৎ পরিক্রমণ করেন। তিনি তিন স্থানে পদক্ষেপ করেন। তাঁহার (এই তিন) ধলিঙ্গালে আবৃত।

বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপের বিষয় বেদে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও মতে এই তিনটি পদক্ষেপ যথাক্রমে উদায়মান, মধ্যাহ্নকালীন ও অস্তগামী সূর্যের তিনটি স্থান। ইহাই বিষ্ণুর ও সূর্যের অভিন্নতার সূত্র। বিষ্ণুর মহিমা অন্তহীন। বিষ্ণুর ‘পরমপদ’ সকলে দৈর্ঘিতে পায় না; অতত চক্ষু মেলিয়া স্মরণ সেই পদ দর্শন করেন। পুরাণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর উল্লেখ বেদে নাই। তবে ত্রিধা পদক্ষেপই পরবর্তীকালে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। [দ্রষ্টব্য, শ্রীমদ্ভাগবত]

ইন্দ্র : অস্তুরিক্ষলোকের দেবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ইন্দ্র। কেবল অস্তুরিক্ষলোকের নয়, বৈদিক দেবসঙ্ঘের পুরোধা ইন্দ্র। বৈদিক সংহিতায় ইন্দ্র বহুস্তত। সংখ্যায় ইন্দ্রস্ততি অগ্ন্যন্ত দেবস্তাত হইতে অনেক বেশি। ইন্দ্র মহাবলবান্ বীর; জন্মমাত্র তিনি উগ্র ও মহাভয়ঙ্কর। তিনি বিশ্ববীর্যের আধার—‘বজ্রহস্ত’, বজ্রবাহু’। সিংহের ন্যায় তিনি ভয়ঙ্কর, হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত। সবাপেক্ষা বড় কথা, তিনি ‘বৃত্রহা’। সোমপান করিয়া তিনি যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন ‘উভে ভয়েতে রজসী অপারে’—উভয়লোক ভীত হয়। হিরণ্যকশা, হস্তে তিনি ‘রথে হিরণ্যয়ে’ বিচরণ করেন। তিনি কেবল বীর্যবান্ নহেন, বুদ্ধিমান। তাঁহার জঠরে সোম, দেহে প্রচণ্ডশক্তি, হস্তে বজ্র, মস্তিষ্কে বুদ্ধি [জঠরে সোমং তস্মৈ সহোমহে হস্তে বজ্রং ভরতি শীঘ্রাণি ক্রতুম্’—ঋ. ২. ১৬. ২]। তিনি ‘একো বিশ্বস্তা ভুবনস্তা রাজা’। ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন,

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্

দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।

যস্তা শুয়াদ্রোদসী অভাসেতাং

নৃমণ্ডা মহা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ [ঋ. ২. ১২. ১]

১. এই মন্ত্রটি প্রত্যেক বেদেই গৃহীত হইয়াছে [সা. ১. ২২২, শু. য. ৫. ১৫; অ.

—যিনি আদি ও জ্ঞানী—যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—বাহার নিবাসে ছায়া-পৃথিবী ভীত হয়, যিনি অমিত বলশালী—হে জনগণ, তিনি ইন্দ্র।

ঋষি-দৃষ্টিতে ইন্দ্র পরমাত্মা ‘ঈশান’। বিশ্বামিত্র বলেন, ‘রূপং রূপং মন্ববা বোভবীতি’—মহান ইন্দ্র। যেখানে যে রূপ; তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঋষি গর্গ, ‘ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে’ [ঋ. ৬. ৪৭. ১৮]—ইন্দ্র মায়্য-প্রভাবে নানারূপে বিচরণ করেন। তিনি শুভবুদ্ধিরও প্রেরক।

রুদ্র : অন্তরিকালোকের আর একজন ভীষণ দেবতা ‘কপদী’ (জটাধারী) ‘রুদ্র’। বেদের রুদ্র-বন্দনায় একটি ভয়ানক সন্ত্রস্ত ভাব। ভয়ঙ্কর বলিয়াই তাহা হইতে রক্ষা প্রার্থনা। রুদ্র ‘উগ্র’, ‘ক্ষয়দবীর’ (অতিবলী), ‘গোম্ব’, ‘পুরুষম্ব’। তিনি দৃঢ়াঙ্গ, দীপ্যমান, ‘স্থিরধ্বা’, ‘ক্ষিপ্রেম্বু’ (দ্রুতগতি ইম্বু যাহার), ‘তিগ্মায়ুধ’ (তীক্ষ্ণ আয়ুধধারী)। রুদ্রের পত্নী ‘রোদসী’। রুদ্রের সন্তান মরুৎগণ—বাহাদের গর্জনে পৃথিবী ও মায়াব কম্পিত হয়। যাস্ক বলেন, যিনি রোদন করেন বা রোদন করান—তিনি রুদ্র [‘রুদ্রো রোতীতি সতঃ রোক্ষয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তেবা’]; আচার্য সায়ণও রুদ্রের এই অর্থ করিয়াছেন, ‘রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ’। রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, ‘রুদ্র শব্দের অর্থ বজ্র অথবা অগ্নির রূপবিশেষ।’ কেহ মনে করেন, রুদ্র অন-আর্য দেবতা ; কারণ যজুর্বেদের ‘শতরুদ্রিয’ স্তবে রুদ্রকে—‘স্তেনানাং পতয়ে নমঃ’, ‘তায়ুনাং পতয়ে নমঃ’, ‘তঙ্করাণাং পতয়ে নমঃ’, ‘নমো ত্রাতোভাঃ’—বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে। রুদ্র যিনিই হউন, ঋগ্বেদে রুদ্রের কল্যাণতম রূপের কল্পনাও আছে ; তিনি ‘শ্রষ্ঠো দেবানাং বসুঃ’ (ধনের ভাণ্ডার), তিনি ‘গাথপতি, মেধপতি, ভেষজপতি’। তাঁহার হস্তে শোভা পায় বরণীয় ওষধী—‘হস্তে বিভ্রদ্ ভেষজা বার্ষাণি’ [ঋ. ১. ১১৪]। আচার্য সায়ণ রুদ্র শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কহিয়াছেন, ‘রুৎ সংসারাখ্য দুঃখ, সেই দুঃখকে যিনি বিনাশ করেন, তিনিই ‘রুদ্র’ ; তিনি আরও বলেন, ‘রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী তৎপ্রতিপাত্তা আত্মবিজ্ঞা বা’। রুদ্র যে বন্ধনমুক্তিরও হেতু, বনিষ্ঠের ‘ত্র্যম্বক মন্ত্রে’ তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ঋগ্বেদে রুদ্রের ওষধি-পতি রূপেরই প্রাধান্য—যজুর্বেদের ‘শতরুদ্রিয’ স্তবে রুদ্র পৌরাণিক শিবের মহিমায় ভূষিত। বৈদিক রুদ্র দেবতায় অবৈদিক দেবতার চিহ্ন বর্তমান।

অশ্বিনীমুখ : অশ্বিনীকুমারদ্বয় রূপবান্ (‘মধুবর্ণা’) যুবাপুরুষ (‘যুবান্’)। তাঁহাদের কণ্ঠে ‘পুরুষজ’ (পদ্মমালা)। তাঁহারা নানাপ্রকার লোকহিতকর কর্মে নিযুক্ত। তাঁহারা কাহারও অসুস্থ, কাহারও খঞ্জ স্ব মোচন করেন। কৃশকে যুবক করেন, মৃতকে

সম্ভাবিত করেন। তাঁহারা মায়াবী ('মায়িনা') ভিক্ ('ভিষজা')। যাদুচ্যর্ষ অশ্বিনয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি মত উদ্ধার করিয়াছেন। কাহারও মতে অশ্বিনয় 'অহরাত্রৌ', কেহ বা মনে করেন তাঁহারা প্রাচীন নরপতিদ্বয়। বস্তুতঃ অশ্বিনয়ের স্বরূপ অস্বচ্ছ। পরবর্তীকালে রূপবান্ দৈববৈষ্ণৱ রূপেই অশ্বিনয়ের প্রতিষ্ঠা।

বরুণ : বরুণ দেবতার স্বরূপও অস্পষ্ট। তিনি প্রায়শঃ 'মিত্র' দেবতার সহিত একসঙ্গে আহুত হইয়াছেন। কাহারও মতে 'মিত্র' অহরাভিমানী দেবতা, আর 'বরুণ' রাজাভিমানী। মায়ণের মতে, অঙ্গগমনশীল স্বর্ষই বরুণ। মিত্র ও বরুণ উভয়েই ওষধী বর্ণন করেন, বৃষ্টি সঞ্জন করেন [পৃ ৫ ৬২]। বরুণ অনন্ত শক্তিদ্রঃ, তিনি রাজা, উরুচক্ষু, ধৃতব্রত। জলাধিপতি বরুণের প্রসঙ্গও বেদে হুল্লভ নয়।

অত্যাগত পুরুষ দেবতার মধ্যে দেবশিল্পী 'স্বষ্টা', মস্তজিহ্ব বৃহস্পতি, বৈবস্বত যম উল্লেখযোগ্য। স্বষ্টা 'স্বগভাস্ত', 'স্বকৃৎ' ('Skilful handed', 'Skilful worker'—Muir)—তিনি ইন্ডের বজ্র-নমাতা। যম পরলোকের রাজা : মরণশীলদের মধ্যে তিনিই প্রথম মৃত, প্রথম পরলোকগত ['যো মমার প্রথমো মত্যানাং যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোকমেতম্'—অ ১৮ ৩. ১৩] ; বেদে ও পুরাণে যমই অবমান-কর্তা।

স্ত্রী দেবতা

বেদে পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য। স্ত্রীদেবতার স্বীকৃতি থাকিলেও তাঁহারা পুরুষ দেবতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পুরুষই অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত সৃষ্টির মূল। এই পুরুষদেবতার ছায়ারূপে—স্ত্রীদেবতা পুরুষের জননী, জায়া, প্রেমিকা বা দুহিতা। 'অদिति' দেবমাতা, 'পৃথিবী' গৌম্পিতার সঙ্গিনী, 'সরস্বতী' সরস্বান নদের স্ত্রী, আর রাত্রি ও উষা 'দুহিতদ্বিঃ', উষা 'স্বর্ষস্ত্র যোষা'। অবশ্য দেবত্ব তাঁহাদেরও আছে ; তাঁহারাও 'জ্যোতনশীল', 'অভীষ্টবর্ষী' এবং অন্ন-বল-মেধার জনয়িত্রী ; তথাপি প্রেম ও সৌন্দর্যের নায়িকারূপে তাঁহাদের যেমন প্রতিষ্ঠা, দেবতারূপে তেমন নয়। এই সকল দিব্য নায়িকা-দর্শনে ঋষির সৌন্দর্য-দৃষ্টি অব্যবহিত হইয়াছে, কবিত্বের উৎস-সংগ খুলিয়া গিয়াছে। কবিত্ব ও সৌন্দর্যচেতনার অন্তরালে তাই স্ত্রীদেবতার দেবত্ব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। পুরুষ-প্রধান সমাজের পুরপ্রাসাদের বাতায়ন-পথে যেমন ক্ষণে ক্ষণে শুদ্ধান্তঃপুরিকার দর্শন-হুল্লভ রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনই অগণিত পুরুষ-স্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ-চমকের মত স্ত্রীদেবতার আবির্ভাব। তাঁহাদের প্রকাশ ক্ষণেকের, কিন্তু প্রভাব স্থিরকালের। স্বল্প সংখ্যক স্ত্রীর দেবতা হইয়াও তাঁহারা বহুমাঙ্গা, 'বহু শোভমানা' ও 'বহুব্র প্রজাবতী'।

ঋগ্বেদের সৃচনাতেই তিনটি দেবী উল্লেখিত হইয়াছেন, ‘ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্য়মোভুবঃ’ [ঋ. ১. ১৩. ২]; শুরু যজুর্বেদের বহুমুখে আছেন ‘সরস্বতী ভারতী ইড়া’। আচার্য মহীধরের মতে, এই তিন দেবী যথাক্রমে তিনটি দেবস্থানের প্রধান প্রতীক—‘সরস্বতী মধ্যস্থানা ভারতী দ্যস্থানা ইড়া পৃথিবীস্থানা’ [শু. য. ভাষ্য. ২০. ৬৩]। তাহা ছাড়া আছেন, দেবমাতা ‘অদিতি’, ইন্দ্রানী ‘শচী’, রুদ্রপত্নী ‘রোদসী’, অগ্নিপত্নী ‘অগ্নায়ী’, বরুণপত্নী ‘বরুণানী’, ‘রাকা’, ‘অমুমতি’, ‘কুহ’, ‘সিনীবালী’ ‘শ্রদ্ধা’, ভাস্বতী নেত্রী ‘উষা’, আয়তী ‘রাত্রি’, মাতা ‘পৃথিবী’, ‘বার্ষিকী আপদেবতা’ ‘হবণাবর্ণা’ ‘শ্রী’, পাপদেবতা ‘নিষ্কাতি’ প্রভৃতি।^১

আপদেবতা : প্রত্যক্ষদৃষ্ট রসরূপে জল বা আপদেবতা বেদে বহুস্তত। জলের অনন্ত মহিমা। সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, সরস্বতী, পরুক্ষি প্রভৃতি রসবাহিনী নদী এই দেবতার মহিমা ঘোষণা করে [ঋ. ১০. ৭৫]। মাতার ত্রায় এই দেবতা সকলকে পরিশুদ্ধ করেন। অথর্ববেদে জলদেবতাগণের মাহাত্ম্য উচ্চ বিঘোষিত। কূপে-তড়াগে, ওষধিতে, নদীতে, সমুদ্রে এই দেবতার অধিষ্ঠান। দেবগণ ছালোকে ইহাদের সারভূত অমৃত উপভোগ করেন, অন্তরিক্ষে ইহার। বৃষ্টিাদিরূপে বহুপ্রকার হন। হিরণ্যবর্ণা পাবত্রকারিণী জলেই সবিতা ও অগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন, রাজা বরুণ জল হইতে জনগণের সত্য-মিথ্যা দর্শন করেন [অ. ১. ৩৩]। সোম বলিয়াছেন, জলের মধ্যেই সকল ভেষজ অবস্থান করে [‘অপ্স মে সোমোহব্রবীদ অস্তবিশ্বানি ভেষজা’—অ. ১. ৬. ২] আপদেবতা ‘ময়োভুব’ (স্বত্বকর), তাহার রস ‘শিবতম’। তাই ঋষির প্রার্থনা,

শিবেন মা চক্ষুষা পশতাপঃ

শিবয়া অহোপস্পৃশত শুচং মে ।

ঘৃতশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকা-

স্থান আপঃ শং শ্রোনা ভবন্তু ॥ [অ. ১. ৩৩. ৪]

—হে আপদেবতা, শিবময় চোখে আমাকে দর্শন কর, কল্যাণকর স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ ও ত্বক্ স্পর্শ কর ; ঘৃতশ্চুত শুচি পাবকরূপিণী যে জল, তাহা আমাদের পক্ষে শাস্তিকরী ও শুভকরী হউক ।

সরস্বতী : জলদেবীগণের মধ্যে অত্যন্ত ‘সরস্বতী’। সরস্বতী স্বনামধন্য নদী, ইনি সরস্বান নদের পত্নী। এই সরস্বতী-তীরে বৈদিক যজ্ঞ অচ্যুত হইত। ঋষিদৃষ্টিতে

১. গোপথ ব্রাহ্মণে দেব-পত্নীগণের নিম্নলিখিত তালিকাটি পাওয়া যায় : ‘পৃথিবী অগ্নেঃ পত্নী বাগ্ বাতস্য পত্নী সেনা ইন্দ্রস্য পত্নী ধোনাবৃহস্পতেঃ পত্নী ত্রিষ্টপ্ কহানাস পত্নী জগতী আদিত্যানাঃ পত্নী অমৃতপ মিত্রস্য পত্নী বিরাড্ বরুণস্য পত্নী পংক্তি বিষ্ণোঃ পত্নী দীক্ষা সোমস্য রাজঃ পত্নীতি [গো. ব্রা. উত্তর ভাগ. ২. ২]

সরস্বতী ‘সুহৃদা সুধারা’, তিনি ‘নদীনাং শুচিঃ’ [ঋ. ৭. ৩৬ ; ৭. ২৫]। কিন্তু এই সরস্বতী নদী মাত্র নহেন, ইনি স্ততির প্রেরয়িত্রী, সত্যবাক্যের নেত্রী, বুদ্ধির প্রকাশিকা [‘ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি’—শু. য. ২০. ৮৬. ‘সর্বজন্তুবুদ্ধে প্রকাশয়তি’—ঐ ভাষ্য মহীধর]। সায়ণ বলেন, ‘দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদেবতা নদীরূপা চ’ [ঋ. ভাষ্য. ১. ৩. ১২]। মনে হয়, নদীরূপা দেবীই দেবমর্বাদায় ভূষিতা হইয়া ‘ধীনামবিত্রী’ (বুদ্ধির পালয়িত্রী) পৌরাণিক বিত্তা দেবীতে পরিণত হইয়াছেন। যেমন মধুচ্ছন্দা ঋষির এই সরস্বতী-বন্দনা,

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী ।

যজ্ঞঃ বষ্টু ধিয়া বস্তুঃ ॥

চোদয়িত্রী স্ননুতানাং চেতন্তী স্মমতীনাম্ ।

যজ্ঞঃ দধে সরস্বতী ॥ [ঋ. ১. ৩. ১০-১১ ; শু. য. ২০. ৮৪-৮৫]

—পবিত্রকারিণী, অন্নবতী, প্রজ্ঞাবতী সরস্বতী অন্নসহ আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। সত্যের প্রেরয়িত্রী, স্মৃতিদাত্রী সরস্বতী যজ্ঞ ধারণ করেন।

পৃথিবী : মর্ত্যলোকের প্রধান প্রতীক ভূদেবী বা মাতা পৃথিবী বা মহী। বেদের অধিকাংশ স্তোত্রে ‘ভাবাপৃথিবী’ একমঙ্গে স্তব হইয়াছেন। ত্যো পিতা, আর পৃথিবী মাতা। আকাশ আর পৃথিবী—এই দুয়ের মিলনেই সৃষ্টি; তাই তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী—সৃষ্টির জনক-জননী। পরিকল্পনাটি সুন্দর ও কবিত্বময়। এই ত্যোম্পিতা ও পৃথিবীমাতা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান আছেন : ‘ঋবা ত্যো ঋবা পৃথিবী’। তাঁহারা মধুচ্ছন্দা, মধুভ্রতা, ঋতবৃধা, ঘৃতবতী, পয়স্বতী ও বহলা। ঋষি দীর্ঘতম্য বলেন,

ত্যো য়ে পিতা জনিতা নাভিরত্র

বন্ধু নো মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ । [ঋ. ১. ১৬৪. ৩৩]

—ত্যো আমার পিতা জনক, তিনিই বন্ধনরজ্জু—আর মাতা আমার

মহীরূপা এই পৃথিবী, তিনি বন্ধু।

বেদের পৃথিবী-স্ততির মধ্যে ঋষিদের মর্ত্য-মমতা প্রতিফলিত। জীবনে এই পৃথিবী যেমন প্রধান আশ্রয়, মৃত্যুর পরও এই পৃথিবী শেষাশ্রয়। ঋষির প্রার্থনা—এই পৃথিবী দৃঢ় হউক, তিনি আত্মরী মায়ার স্বস্তি বিধান করুন—‘দৃংহস্ব দেবি পৃথিবী স্বস্তয় আত্মরী ময়া’ [শু. য. ১১. ৬২]। পৃথিবী-বন্দনা চরমে উঠিয়াছে অথর্ববেদের পৃথিবী-স্তোত্রে।

অরণ্যানি : মর্ত্য-প্রেমিক কবির দৃষ্টিতে অরণ্যদেবতা অরণ্যানি এক সজীব নারীযুতি। অরণ্যানি নির্ভয়। সায়ংকালের অরণ্য এক অপার বিশ্বয়। কেহ

ধেয়ুগুলিকে ডাকিতেছে, কেহ বৃক্ষ কর্তন করিতেছে—মনে হয়, অরণ্য নিজেই যেন ক্রন্দন করিতেছেন। অরণ্য কাহাকেও হিংসা করে না, অরণ্যের স্বাদুফলে মানুষ পূর্ণকাম। ঋষিকণ্ঠে তাই অরণ্যদেবীর বন্দনা,

অঙ্গনগন্ধাং সুরভিঃ বহুব্রহ্মকুম্ভীবলাম্ ।

প্রাঃ যুগানাং মাতরমরণ্যানিমসংসিশম্ ॥ [ঋ. ১০. ১৪৬. ৬]

উষা ও রাত্রি : এই দুইজন দ্ব্যলোক দেবতা। দ্ব্যলোকের অধিকাংশ দেবতা সৌরমণ্ডলের প্রাকৃতিক সত্তা। সূর্য, সবিতা, রোহিত, পুষা, চন্দ্রমা—সকলেই সূর্যমণ্ডল-ভুক্ত। সূর্যের আফ্রিক গতির ফলে যে উষা ও রাত্রির আবির্ভাব—তাঁহারাও দ্ব্যলোক দেবতার অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক ঋষিদের প্রকৃতি-দৃষ্টি অভিনব ও কবিত্বময়। ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি-প্রেম আৰ্য সাহিত্য হইতেই আগত। ভারতবর্ষের উদার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি মেলিলে স্বভাবতই কল্পনার দ্বারা খুলিয়া যায়। এই প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে পুরাতন ঋষি-কবিদের হৃদয়কে আপ্মুত করিয়া তুলিত। অমৃতত্বের বাস্তু প্রকাশে ‘অপৃথগ্‌যত্রে’ বাণী স্বাভাবিকভাবেই শব্দ ও অর্থালঙ্কারে ভূষিত হইত। প্রাকৃতিক সত্তাকে ঋষিগণ অচেতন মনে করিতেন না। সর্বত্রই চৈতন্তের গূঢ় সঞ্চারণ, সবকিছুই প্রাণময় ও অশুভব সম্পন্ন। কবি-মানসের এই ভাবটি সর্বাপেক্ষা স্মৃতি লাভ করিয়াছে উষা ও রাত্রি স্তবগুলিতে।

ঋগ্বেদের প্রায় প্রত্যেক ঋষিই উষার বন্দনা গাহিয়াছেন। উষা ‘দুহিতাঃ’—স্বর্গের দুহিতা, তিনি দিব্য ঘোষা—দেববালা। অপূর্ব তাঁহার রূপ তিনি ‘সুন্দরী’—সুন্দরী, তিনি শুক্রবসনা যুবতি—‘যুবতিঃ শুক্রবাসা’, তিনি ‘ভাস্বতী’—আশ্রয় দীপ্তিমতী। কৃষ্ণবর্ণ অঙ্ককার বিদূরিত করিয়া তাঁহার আবির্ভাব। স্বয়ং সূর্যদেব এই উষার প্রাণী। এই উষার দেবসত্তাও অগ্নান। ইনি ‘নেত্রী সুনৃতানাং’, ইনি ‘ঋতাবরী’—সত্যাবতী :

বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী

বিশ্বস্ত বাচম্ অবিদং মনায়া। [ঋ. ১. ৯২. ৯]

—সকল জীবকে ইনিই জাগ্রত করেন : মানুষ ইহারই

প্রভাবে ব্যবহারোপযোগী বাক্ লাভ করিয়াছে।

সপ্তম মণ্ডলে ঋষি বসিষ্ঠের উষা-স্তবগুলি [৭. ৭৫, ৭. ৭৬] অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ।

‘রাত্রি’ দেবীও আকাশ-দুহিতা—‘দুহিতাঃ’। দেবী উষা ইহার ভগ্নী। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৭ স্তব্ধে ‘আয়তী’ (আগমনকারিণী) রাত্রির এক চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রাত্রি আসিতেছেন, চতুর্দিকে দৃষ্টি বিস্তার করিয়া রাত্রি আসিতেছেন। তাঁহার জ্যোতিতে অঙ্ককার বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে—‘জ্যোতিষা বাধতে তমঃ’।

গ্রামগুলি নিদ্রায় : গবাদি পশু, পক্ষী ও কামার্থী ভ্রূগে শয়ন করিয়া আছে। এই রাত্রির নিকট ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,

যাবয়া বৃক্যং বৃকং স্তেন মর্যো ।

অথ ন স্ততরা ভব ॥

—হে রাত্রি, হিংস্র বৃককে দূরে লইয়া যাও, চোরকে

দূরে লইয়া যাও, আমাদের পক্ষে শুভকরী হও । [ঋ. ১০. ১২৭. ৬]

ঢালোকের অন্ত্যান্ত দেবীগণের মধ্যে আছেন ‘রাকা’, ‘অহুমতি’, ‘কুহ’ ও ‘সিনীবালী’। রাকা পূর্ণচন্দ্রের প্রতীক, ‘অহুমতি’ চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা; ‘কুহ’ পূর্ণ অমাবস্যা ও সিনীবালী চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যার প্রতীক। এই সকল দেবতা গর্ভাধান ও স্তন্যদানের জন্য আহৃত হইয়াছেন।

অস্তুরিগ্গ লোকের নারী দেবতাগণের মধ্যে আছেন ইন্দ্রপত্নী ‘ইন্দ্রানী শচী’ ও রুদ্রপত্নী ‘রোদসী’ [রোদসী মতান্তরে মরুৎ-পত্নী : ‘রোদসী মরুৎ-পত্নী বিদ্বাং বা’—সায়ণ]। বেদে ইহাদের নাম মাত্র আছে, প্রকৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নাই।

বেদের খিল-সূক্তে একটি দেবী উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছেন, তিনি ‘শ্রী’দেবী। ইনি ‘হিবগয়ী লক্ষ্মী’—যিনি সব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী। ইনি পদ্মে স্থিতা পদ্মবর্ণা পদ্মমালিনী—সর্বকালস্তির আধার, অপর দিকে ইনিই প্রভূত অন্ন ও পশুর নেত্রী [‘যন্তাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্তোহস্থান’]। পরবর্তীকালের কমলালয়া লক্ষ্মীর বন্দনা-উৎস এই শ্রী-সূক্ত। মনে হয়, সূক্তটি অপরকালের ধোজন।

বেদে স্ত্রী-দেবতা পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। যত উচ্চ প্রশংসাই বর্ণিত হউক না কেন, তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্য ইন্দ্রাদি দেবতার মত সর্বব্যাপী নয়। তবে ঋগ্বেদেরই ‘দেবী সূক্তে’ এক স্ত্রী-দেবতা পরমাত্মা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সূক্তটির দ্বিতী ব্রহ্মবাদিনী ঋষি বাক্ ; ইনি অজ্ঞ ঋষির কণ্ঠা। এই সূক্তে দেবী স্বয়ং স্বমহিমা ঘোষণা করিতেছেন,

অহং রুদ্রেভির্বস্তুভিশ্চরাম্যাহম্

আদিতৌরুত বিশ্বদেবৈঃ ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি

অহমিন্দ্রায়ী অহমশ্বিনোভা ॥ [ঋ. ১০. ২৫. ১]

—আমি রুদ্ররূপে, বরুণরূপে, আদিত্য ও বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ

করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি।

ইহাই প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের প্রথম ঋক্। সূক্তটি অষ্ট ঋকের সমষ্টি। প্রত্যেকটি

কেই দেবাত্মের মহিমা। তিনি বলেন, ‘অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং চিকিতুষী প্রথম যজ্ঞিয়ানাম্’ [১০. ১২৫. ৩]—আমি রাষ্ট্রশক্তি, ঐশ্বৰ্যের জননী, সর্বদর্শী, যষ্টবাগণের প্রথমা; ব্রহ্মবেষ্টা শব্দকে হননের জন্ত আমিই রুদ্রহস্তে ধম্ব বিস্তার করিয়াছি [‘অহং রুদ্রায় ধম্বরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্তবা উ’ ১০. ১২৫. ৬]; আমার মহিমা সর্বব্যাপী [‘পরো দিবা পরো এনা পৃথিব্যোতাবতী মহিমা সংবভূব’—ঋ ১০. ১২৫. ৮]

এই সূক্তটি চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ করা হয় এবং ধারণা এই যে, এই দেবী পরাশক্তি। অবশ্য শৈব বা শাক্তের পরমাদেবীর উল্লেখ বেদে না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম-কর্মে লৌকিক ও বৈদিক এই—দুইটি সংস্কৃতি এত সন্নিবিষ্ট যে, একটির প্রভাব অত্রটিতে কখন যে সংক্রামিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃকর। এই মিশ্রণের ফলেই লৌকিক জগতের শক্তি দেবী ও রুদ্র বৈদিক সাহিত্যে আসন করিয়া লইয়াছেন। এবং রুদ্র-পত্নীও ক্রমে প্রতিষ্ঠার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী প্রকারান্তরে স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা।

অবৈদিক দেবতা কিরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদিক জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, পাপদেবতা ‘নিষ্ক’তি’ তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ঋগ্বেদে নিষ্ক’তিকে দূর করিবার জন্তই অত্র দেবতার আবাহন। কিন্তু যজুর্বেদে বা অথর্ববেদে নিষ্ক’তি নমস্কৃত। তিনি রুচ্ছাপতি বা ভূমিদেবতা [‘নিষ্ক’তিঃ রুচ্ছাপতিঃ ভূমি বা’—মহীধর]।

বৈদিক সাহিত্যে অসংখ্য দেবতা। ঋগ্বেদের প্রকৃতি, শক্তি ও মগ্ন ভিন্ন ভিন্ন। ঋগ্বেদেই কোথাও দেবতার সংখ্যা বলা হইয়াছে ৩৩, কোথাও ৩৩৩৩। কোথাও আবার সকল দেবতাই এক দেবতার প্রকাশ, এরূপ উক্তিও দুর্লভ নয়। বস্তুতঃ বৈদিক দেবতা কয়জন [‘কতি দেবতা’]—ইহা একটি সমস্যা। যাজ্ঞিকগণের মতে দেবতা অনন্ত, যত নাম তত দেবতা। নৈরুক্তমতে দেবতার সংখ্যা মূলতঃ তিন : পৃথিবীর দেবতা ‘অগ্নি’, অন্তরিক্ষের দেবতা ‘ইন্দ্র’ বা বায়ু’ এবং দ্যুলোকের দেবতা ‘সূর্য’ : অন্ত্যাত্ম দেবতা এই তিন দেবতারই রূপভেদ।^১ আত্মবিদ দার্শনিকগণ দেবতার একত্বে বিশ্বাসী। তাঁহারা এই বেদবাক্যটি উদ্ধার করিয়া বলেন, ‘একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি’। উপনিষদে এই একত্বেরবাদের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

বৈদিক যুগের দেবকল্পনার জটিলতা লক্ষ্য করিয়া আচার্য Maxmuller সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ‘If we must have a general name for the earliest form

১. ‘তিন্ত্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুরিত্তোবাস্তরিত্তস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাং একৈকশ্চাপি বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি’—যাঙ্ক, নিরুক্ত ৭. ৫.

of religion among the vedic Indians, it can be neither monotheism nor Polytheism, but only Henotheism'.—অর্থাৎ বৈদিক ভারতবাসীর ধর্মসম্পর্কে যদি সাধারণ কোন নাম দিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, উহা একেশ্বরবাদও নয়, বহু-ঈশ্বরবাদও নয়, উহা বহু একেশ্বরবাদ। Henotheism সংজ্ঞাটি নূতন। হয়তো তিনি বলিতে চান, ভারতবর্ষ বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহুকে দেখিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। একই আত্মা নানাভাবে, নানারূপে বিশ্বজগতে লীলা করিয়া চলিয়াছেন; বহু একেরই প্রকাশ, আবার বহুর অন্তরালে এক। এইজন্য বৈদিক ঋষিগণ যখন যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন তাঁহাকেই 'ঈশান' (মহেশ্বর) বলিয়াছেন, আবার বিশাল বিশ্বের প্রাতিটি বস্তুতে—আকাশে, অন্তরিক্ষে, সাগরে, বনস্পতিতে, মূষলে, উদ্ভূলে বা অন্তরের ভাববৃত্তিতে পৃথক দেবসত্তার অস্তিত্ব দেখিয়াছেন। ভারতীয় দৃষ্টিতে—দেবতা যেমন এক, তেমনই বহু—যেমন অনন্ত, তেমনই সান্ত। স্বপ্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবাসী এই বিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

৯. বৈদিক সমাজ

বৈদিক যুগের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম একটি পরিণত যুগের স্বাক্ষর বহন করে। সভ্যতার দিক হইতে যখন বিপুল ধরিত্রীর অগ্ন্যাণু অঞ্চল শৈশব স্তর অতিক্রম করে নাই, তখন জ্ঞান-গরিমা ও সমাজব্যবস্থা, কর্ম ও দার্শনিক চিন্তার দিক হইতে ভারতবর্ষ প্রোঢ়। বৈদিক সভ্যতা মাত্র কয়েক বংশের গড়িয়া উঠে নাই, উহা বহু কালাতত। এই সভ্যতা একটি অবিমিশ্র জাতির রচনা বলিয়াও মনে হয় না, উহার অনেক উপাদান বিমিশ্র।

তখন ভারতবর্ষে মাহুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে। বনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকিলেও তখন গ্রাম, বিশ, জনপদ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শক্তিমান (ক্ষত্র) ছিলেন রাষ্ট্রশক্তির ধারক। রাজা একজন ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজার অস্তিত্ব ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। যুদ্ধে অশ্ব, রথ ও অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। কোন রাজা অসমত্ব অধিকার লাভ করিয়া 'একরাট' (একচ্ছত্র সম্রাট) হইতেন।

দৈবশক্তির উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ঈষ্টদেবতা অভীষ্টদাতা, আর মাহুষ প্রতিগ্রহীতা। ধন, জন, অন্ন, আয়ু, শস্ত্র, গোসম্পদ দেবতার অধিকারে। দেবতা তুষ্ট হইলে অভীষ্ট বর্ষণ করেন। দেবতার তুষ্টবিধানের উপায় যজ্ঞ। যাগ-যজ্ঞ

ছিল প্রধান ধর্মাহুষ্ঠান, কর্ম ছিল ধর্মনিষ্ঠ। রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধযাত্রায়, দুনিমিত্ত নিরোধে, কৃষিকর্মে, পুষ্টি ও শাস্তিবিধানে এবং গার্হস্থ্যকর্মে যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হইত। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন ব্রাহ্মণ। তাহারাই বংশাহুষ্ঠ্যে মন্ত্র ও ক্রিয়া রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন গোষ্ঠি ছিল। এক এক গোষ্ঠির ব্রাহ্মণের জন্ম যজ্ঞমানও ছিলেন পৃথক। যজ্ঞমান যজ্ঞকালে প্রচুর দান করিতেন। বৈদিক ‘নারাশংসী’ এই দান-ধ্যানের প্রশংসায় মুগ্ধ। এই নারাশংসীগুলিই পরবর্তী কালের কুলপঞ্জী ও বংশস্তুতির ঠিকুজী।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—সমাজে এই দুই সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠা ছিল। উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনও ছিল। বর্ণভেদ প্রথা তখনও ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। কর্মাহুস্তারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং ধনাধিকার অহুস্তারে ‘ভোজ’ ও ‘ভিক্ষু’—এই দুইটিই ছিল প্রধান শ্রেণীবিভাগ, তাহা ছাড়া ছিল দস্যু, অশ্বর, অত্রঙ্গা, অত্রতা নামে একটি সম্প্রদায়। মনে হয়, তাহারাই ছিল যজ্ঞবিরোধী। এই দলের যাহারা ব্রাহ্মণ-বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারাই পরবর্তী কালের তথ্যাকথিত ‘শূদ্র’। আবার যাহারা ছিলেন অদীক্ষিত ও সাবিত্রী-হীন—তাঁহাদিগকে বলা হইত ‘ব্রাত্য’। ব্রাত্যগণও সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতেন। [অথর্ববেদ. ১৫]

সমাজে নানাপ্রকার বৃত্তি প্রচলিত ছিল, ‘নানানাং বৈ উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্’ [ঋ. ২. ১১২]: কেহ ‘তক্ষা’ (স্তম্ভধর), কেহ ‘ব্রক্ষা’ পুরোহিত), কেহ ‘ভিষক্’, কেহ ‘কর্মার’ কেহ ‘কারু’ (শিল্পী)। শূদ্র যজুর্বেদে [৩০ অধ্যায়] পুরুষমেধ যজ্ঞ-প্রসঙ্গে আটচল্লিশ প্রকার বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।^১ এই তালিকা যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহা হইলে শিল্পকর্মে ও চতুঃষষ্টি কলায় বৈদিক যুগেও এ দেশে অনেক উন্নত ছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। সেকালে চর্মশিল্প, তন্তুশিল্প, রূপশিল্প ছিল—ছিল ভল্লুক শিকারী ‘নিবাদ’, ব্যাঘ্রশিকারী ‘হর্মদ’, সাপুড়ে ‘সর্পদেবজন’, অক্ষত্রীড়াসক্ত ‘কিতব’, বিদলকার (বংশপাত্কারী) ও কণ্টকীকার। দ্যুতক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ কোন কিছুই অভাব ছিল না। সমাজে ‘দহ্মা’, ‘তক্ষর’, ‘স্তোন’ প্রভৃতি দুষ্টতাকারীরও অবস্থান ছিল।

১. ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণঃ কত্রায় রাজন্ত্যং মরুস্ত্যো বৈশং তপসে শূদ্রং তমসে তক্ষরং নারকায় বীরহং পাপ্মনে ক্রীবাং আক্রায় অযোণ্ডঃ কামায় পুশলং অতিক্রুষ্ঠায় মাগধম্। [শু. য ৩০. ৫]

নৃতায় স্ততং গীতায় শৈলুষং ধর্মায় সভাচর্যং নরিষ্ঠায়ৈ ভীমলং নর্মায় রেভঃ হস্যায় কারিং আনন্দায় স্রীষথং প্রমদে কুমারীপুত্রং মেধায়ৈ রথকারং ধৈর্যায় তক্ষণম্ [শু. য. ৩০. ৬]

তৎকালে অপর। বিচারপে বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, 'রাশি' (গণিত), নিদি (অর্থশাস্ত্র), বাক্যোবাক্য (তর্কবিজ্ঞা), একায়ন (নীতিশাস্ত্র) ও জ্যোতিষ প্রভৃতির চর্চা হইত [ছা. উ. ৭. ১. ২.; বৃ. আ. ২. ৪. ১০]। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞা হইতে প্রধান বলিয়া গণ্য হইত পরাবিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিজ্ঞা অর্জন করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য ছিল গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের সোপান। জীবনের বনিয়াদ গঠিত হইত গুরুগৃহে। গার্হস্থ্য আশ্রম মধ্যম হইয়া উঠিত শিক্ষা-মহিমায়। ধর্মবিজ্ঞা ও কর্মবিজ্ঞা-সুষ্টি জীবনই ভারতবর্ষের জীবন।

গৃহাশ্রমে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান (ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদাদি পাঠ, নৃযজ্ঞ বা আতিথ্যধর্ম, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ-তর্পণ, দেবযজ্ঞ বা দেবারাধন এবং ভূতযজ্ঞ বা ইতর প্রাণীর সেবা) ছিল নিত্য কর্মের অঙ্গাঙ্গী। বিবাহাদি সংস্কারও গার্হস্থ্যধর্মের অঙ্গ। সমাজে বহু বিবাহও প্রচলিত ছিল। অনেকস্থলে সপত্নার উল্লেখ ও সপত্নী-বিনাশের মন্ত দৃষ্ট হয়। মন্তদ্বারা বশীকরণাদি ক্রিয়ার উল্লেখও দেখা যায়। তথাপি গৃহে দাম্পত্য-বন্ধনের সমাদর ছিল। পুত্র ও পুরুষ উভয়েরই কাম্য ছিল 'সংজাম্পত্য'। সংসারে বধূর ভূমিকা 'স্বমঙ্গলা' গৃহলক্ষ্যের ভূমিকা। বধূর প্রসন্ন দৃষ্টিই গৃহের কল্যাণ; বধূই গৃহের সমাজী। পুত্র-জনন পটুতি কর্মও ছিল ধর্মের অঙ্গ। বেদের 'অগ্নিচয়ন' মন্তগুলি গভীরান ও পুত্র-সমনেরই মন্ত। সন্তান ক্ষণিক বিলাসের জলবৃদ্ধ মাত্র নয়, সন্তান দ্বিতীয় আত্মা। পরিবারের সকলে 'সমনা' হউক, বৃদ্ধ সকলের কল্যাণকারিণী হউক, পুত্র পিতার অঙ্গগত হউক, মাতার সাহিত্য সমন্য হউক, ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে ঘেঁষ না করে—এইগুলিই ছিল প্রিয় কামনা। সমাবর্তন কালে গুরুও এই উপদেশ দিতেন, 'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব'।

বৈদিক সমাজে নারীর উচ্চাধিকার ছিল। তাঁহারাও উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বিশ্বারা, ঘোষা, বাক্, সূর্য্য—উপনিষদের বাচস্পতী গার্গী ও মৈত্রেয়ী নারী-মহিমার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ঋষি শ্রাবাশ্ব বীর তরস্তের পত্নী শশীসীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন [ঋ. ৫. ৬১]। একটি ঋকে অবশ্য নারীর প্রতি তির্যক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে :

ইন্দ্রশিক্কা তত্রীং সিয়া অশাশ্র মনঃ

উতো অহ ক্রতুং লঘুম্। [ঋ. ৮. ৩৩. ১৮.]

—ইন্দ্র বলিয়াছেন, নারীর মন অশাশ্র; তাহার বুদ্ধি কম।

বৈদিক নারীসমাজ সম্পর্কে এই উক্তি সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য নয়। সমাজে পুণ্যলোক ও পাপাত্মা, সাধু ও অসাধু নানা প্রকারের লোকই বর্তমান ছিল। স্ত্রী ও অস্ত্র, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা, অকাম ও কামনাবান্, স্ত্রী ও পুরুষ, ধনী ও ভিক্ষু—নানা প্রকার ভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। একটি স্মৃতিচ মানদণ্ড দ্বারা মানুষের বিচার হইত—তাঁহা হইতেছে ‘সত্য’ ও ‘ঋত’। নীতির বিশ্বকেন্দ্রিক রূপটিকে বলা হইত ‘ঋত’। এই ঋতের নেতা বরুণ, ‘অয়ং হি নেতা বরুণ ঋতস্ত’ [ঋ. ৭. ৪০. ৪], সূর্য হইতেছেন এই ঋতদেবের উজ্জ্বল চক্ষু। যিনি ঋতবৃধা, তিনিই ঋষি। ঋতত্বই মানবত্ব। এই ঋত-পথে চলিয়া স্বর্গের সরমা (শুনী) পণি-অপহৃত গাভীর সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন [‘ঋতস্ত পথা সরমা বিদং গাঃ’—ঋ. ৫. ৪১. ৭]। সত্যের মানদণ্ডে মানবত্ব বিচারের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাবাল সত্যকামের আখ্যান। সত্যই মানবত্ব, সত্যই ব্রাহ্মণত্ব; দেবগণও সত্যকে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতা।^১

বৈদিক যুগেও নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল। বশীকরণাদি মন্ত্রে বিশ্বাস, মন্ত্রদ্বারা মৃত মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার, মন্ত্রদ্বারা দুর্দৈব নিবারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে যুগের মানুষ স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণকে বর্জন করেন নাই। মৃত্যুকে সে যুগের ঋষিরা জীবনের অবশ্যস্বাদী পরিণতি রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ‘শতাত্মা চ ন জীবতি’। কিন্তু মৃত্যুতেই যে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহা মনে করিতেন না। মৃত্যুর পর সত্তা দূর দিগন্তে মরুৎ-বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া কর্মানুসারে শুক্লা বা কৃষ্ণা গতি প্রাপ্ত হয়। দেবযান পথে যাইবার ইচ্ছাই মানুষের প্রবল, কখনও পিতৃগণ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরলোকে বিশ্বাসী হইলেও, কিংবা দেব-নির্ভর হইলেও পরলোক ও দেবতা সম্পর্কে তাঁহাদের মনে সংশয় প্রশ্নও ছিল। কেহ কেহ যে ইন্দ্রের অস্তিত্বে সংশয় করিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্বাভাস যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, একথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে [ঋ. ১০. ১২২. ৭] :

১. শতপথ ব্রাহ্মণে [২. ৫. ১] এই কাহিনীটি আছে : দেবতা ও অস্ত্রের পূর্বে এক প্রকারই ছিলেন ; উভয়েই সত্য ও অনৃত বাক্য বলিতেন। তখন দেবগণ অনৃতকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিলেন এবং সত্যকে পাইলেন ; অস্ত্রগণ সত্যকে ত্যাগ করায় অনৃতই লাভ করিল। সত্যকে লাভ করিয়া দেব দেবত্ব লাভ করিলেন।

ইয়ং বিসৃষ্টিৰ্ত্ত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন ।

যোহস্মাধ্যাক্: পরমে যোমন স অক্ বেদ যদি বা ন বেদ ॥

—এই সৃষ্টি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছে কি না, যিনি পরম যোমে ইহার অধ্যাক্, হয়তো তিনি জানেন, হয়তো তিনিও জানেন না ।

দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক একটা অন্ধ বিশ্বাস বা আবেগ-প্রসূত ভক্তির ব্যাপার ছিল না । দেবতার সঙ্গে ছিল বলিষ্ঠতার সম্পর্ক, ভক্তি ছিল জ্ঞান-প্রহরায় সংযত । বৈদিক যুগে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির পথ ছিল উন্মুক্ত ।

বৈদিক সমাজে লোক-সংস্কার

বৈদিক সমাজ অবিমিশ্র সমাজ নয় । উহাতে প্রাগাৰ্য জাতির নানা প্রকার বিশ্বাস আচার-আচরণ ও সংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে । বৈদিক সাহিত্যে অবৈদিক কয়েকটি গোষ্ঠির নাম রহিয়াছে—অসুর, পণি, দস্যু । অসুরগণ দানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন [‘অদদানমশ্রদ্ধানমযজ্ঞমানমাহুরসুরো’—ছা. উ. ৮. ৮. ৫]; পণিগণও অশ্রদ্ধা, অবৃদ্ধা ও অযজ্ঞা, উপরন্তু তাঁহারা ‘মৃধবাচঃ’ (যাগাদের বাক্যে মৃগতৃধ্বনির প্রোধাত্মক) । অসুর ও পণি উভয়েই দস্যুদলভুক্ত । বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বেদে এই সকল অবৈদিক বা লৌকিক গোষ্ঠি কয়েকটি দিক হইতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ।

১. বৈদিক বরুণ ও রুদ্র দেবতার প্রকৃতি বিমিশ্র । বরুণ নিজেই ‘অসুর’ । অবশ্য বেদে অসুর শব্দটি প্রাণশক্তির প্রতীক ; এই অসুরত্ব প্রায় সকল দেবতারই আছে । অসুরগণ ‘মায়াবী’ ; ‘মায়’ও বেদে দেবশক্তির প্রতীক । মনে হয়, ‘অসুরত্ব’ ও ‘মায়’—অসুরসমাজের এই দুই বৈশিষ্ট্য বৈদিক সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে । এই আসুরীমায়ী সর্বাধিক বরুণের ; ‘অসুরস্ত মায়য়া’ তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন [ঋ. ৫. ৬৩. ৩] । ঋগ্বেদে রুদ্রও ভীষণ । তিনি পশুপালক ও ওষধিপতি । যজুর্বেদের ‘শতরুদ্রিয়ে’ রুদ্র ‘ঈশান’ অর্থাৎ মহেশ্বর হইয়াও তন্দ্রর, তেন ও তায়ুদের পতি । অথর্ববেদে ব্রাতা (অদীক্ষিত গায়ত্রী পতিত অনু-আৰ্য) ঈশান রুদ্রের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ।

২. পণ্ডিতগণ মনে করেন, বেদের সমাজ পুরুষ-তন্ত্রের অধীন । এইজন্যই বেদে পুরুষদেবতার প্রাধান্ত । কোন স্ত্রীদেবতাই ইন্দের মত মহত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই । কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ‘দেবী স্তোত্র’ একটি দেবী পরমাত্মা দেবতার

১. নি অক্রতুন্ গ্রথিনো মৃধবাচঃ পণিন্ ।

অশ্রদ্ধান্ অবৃদ্ধান্ অযজ্ঞান্ । [ঋ. ৭. ৬. ৩]

পর্বায়ে উন্নীত হইয়াছেন। ইহা নিশ্চিত মাতৃ-তাত্ত্বিকতার প্রভাব। ঋগ্বেদের রাত্রিসংক্রান্তিও তাৎপর্য পূর্ণ। এই রাত্রি নিসর্গ-প্রকৃতি রজনীর প্রতীক মাত্র নহেন; ইনি যে অন্-আর্য দেবী, সামবিধান ব্রাহ্মণের শবরীরূপিণী রাত্রির মূর্তি তাহার প্রমাণ। ঋগ্বেদের সাধারণভাষ্যে [১. ৮২, ৩]—‘ক্রয়তে চ বারুণী রাত্রিরিতি’ উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিতগত।

৩. বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ অথর্ববেদে যে বশীকরণ-মারণাদি মন্ত্র ও অদ্ভুত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, আচার্য Winternitz এর মতে তাহার অধিকাংশ ‘popular belief’ হইতে সংগৃহীত। আথর্বণ উপনিষদগুলিতে যে যোগাচার ও তন্ত্রাচারের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাও লৌকিক জগৎ হইতে সমাহৃত।

৪. বৈদিক সাহিত্যে ‘নিষ্কৃতি পাপদেবী। ঋগ্বেদ এই নিষ্কৃতি অপসারণের জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছে; ‘পরাতরং স্ত নিষ্কৃতির্জিহিতাম্’ [ঋ. ১০. ৫২]—নিষ্কৃতি দূরদেশে চলিয়া যাউক। কিন্তু যজুর্বেদে পাই নিষ্কৃতি বন্দনা: ‘নমো দেবি নিষ্কৃতে তুভ্যমন্ত্ৰ’ [শু. য. ১২. ৬২]। দেবসঙ্গে পাপদেবতার এই প্রতিষ্ঠা অবৈদিক প্রভাবের সূচক।

৫. C. Kunhan Raja মনে করেন,^১ বৈদিক সাহিত্যে অরণ্য-জীবনের ক্রমিক প্রভাব এবং আরণ্য পশু-ও বনরক্ষদির দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা প্রাণার্থ সমাজ হইতে সমাহৃত। বৈদিক আর্য ছিলেন প্রধানতঃ গ্রাম ও জনপদবাসী; বৈদিক দেবগণের মণ্ডনকলা ও যুদ্ধসজ্জা রাজার মত। তাহার অলঙ্কৃত, স্ত্রবাসা, বজ্রহস্ত, রথারূঢ়। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, দেবগণ অরণ্য ও যুগ্মার সহিত যুক্ত। রাত্রিদেবী ‘পাশহস্তা শিখণ্ডিনী’; ‘অঙ্গনগন্ধা অরণ্যানি’ যুগ্মমাতা, যজুর্বেদের ওষধি-বন্দনাতেও বন-ভেষজের মহিমা। ওষধী ‘অশ্বাবতী’, ‘সোমাবতী’, বলকারক ও ওজোবর্ধক [‘অশ্বাবতীং সোমাবতীম্ উর্জয়ন্তীমুদোজসম্’। শু. য. ১২. ৮১]। তাই এই বন-ভেষজের উদ্দেশ্য ঋষির প্রার্থনা,—

যাঃ ফলিনীর্ষা অফলা অপুষ্ণা যাশ্চ পুষ্ণিনীঃ।

বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত অহংসঃ ॥ [শু. য. ১২. ৮২]

—যে সকল ওষধী ফলিনী বা অফলা, পুষ্ণিনী বা অপুষ্ণা বৃহস্পতি-সন্ততি সেই ওষধি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।

শুধু তাই নয়, আরণ্যক-উপনিষদের যুগে রহস্যবিজ্ঞা আলোচনার কেন্দ্রও অরণ্য।

৬. ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন বৈদিক সাহিত্যের কূট; কদলী, ময়ূর, পূজা প্রভৃতি শব্দ অন্-আর্থ। মূৰ্ছা ধ্বনিগুলিও দেশজ ধ্বনি বলিয়া গণ্য : এগুলি ‘মুখবাচঃ’ অর্থজ্ঞাদেরই ধ্বনি-সম্পদ। ধ্বন্যাত্মক অস্ফুট শব্দগুলিকেও ভাষাবিদগণ দেশজ লৌকিক ভাষারের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন : বৈদিক সাহিত্যে নিম্নলিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি পাওয়া যাইতেছে,

(i) ‘অললা’ : ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, জলবতী নদীগণ ‘অললা’—এইরূপ তৰ্পচ্চক শব্দ করিতে করিতে গমন করিতেছে [‘এষা অৰ্ঘন্ত্যাললাভবন্তী ঋতাবরোরির সংক্ৰোশমানাঃ—ঋ. ৪. ১৮. ৬]

(ii) ‘চিচ্চিক’ : ১০ মণ্ডলের ‘অরণ্যানি-সূক্তে’ অরণ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে [‘বৃষারবায় বদতে যদ্ উপাবতি চিচ্চিকঃ’। এখানে চিচ্চিক চিচ্চিক-ধ্বনিকারী পাখী।

(iii) শুক্লজুর্বেদের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আছে ‘আহলগতি’ (হলহলা) ও ‘নিগল্গল্’—এই দুইটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

(iv) ‘গর্গরা’ : অথর্ববেদে [৪. ১৫. ১২] বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলা হইতেছে, ‘আপোনিষিক্শস্তুঃ পিতা নঃ শসন্ম গর্গরা অপাঃ বরুণ’—হে বরুণ, জল সিক্তন করিতে করিতে আমাদের পিতৃগণ গর্গর নিশ্বাস ত্যাগ করুন।

(v) ‘উল্ললব’ : উল্ললুধ্বনি। ‘ছন্দোগ্য উপনিষদে [৩. ১১. ৩] আদিত্যের জন্মপ্রসঙ্গে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে : ‘তং জায়মানঃ যোষা উল্লবোহনুদতিষ্ঠন্ ...তস্মোদয়ঃ প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি যোষা উল্লবোহনুদতিষ্ঠতি’—তাহার জন্ম হইলে উল্ললুধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, এইজন্ত আজিও সূর্যের উদয় বা অস্তগমনকালে উল্ললুধ্বনি উত্থিত হয়।

বেদাদির সাহিত্যিক মূল্য

ময়, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, বেদাদি সহ বৈদিক সাহিত্যের বিপুল আকার। কিছু অংশ ক্রিয়া-কর্মের বিধান, কিছু অংশ জ্যোতিষ-কল্প শিক্ষাশাস্ত্রের বিবরণ, কিছু ব্যাকরণ, কিছু অভিধান। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আগাছা বাদ দিয়া বিশাল বেদ-পাদপ-কাননে প্রবেশ করিলে পুষ্পিত কাব্য-লভিকার শোভা এবং ফলিনী অরণ্যানির ঐশ্বর্য যে-কোন বেদচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পণ্ডে ও গণ্ডে বৈদিক সাহিত্য বহুবিচিত্র। সংহিতা ভাগের ছন্দ-বিলসিত কবিতা, অক্ষর-পরিমিত মন্ত্র, ব্রাহ্মণভাগের প্রাজ্ঞল গম্ভীর কথা এবং উপনিষদের সংলাপাত্মক

কাহিনীর কাব্যমূল্য কোনক্রমেই অল্প নয়। বৈদিক সাহিত্যই পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্য—দর্শন, পুরাণ, কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, গান, ছন্দ, ও অলঙ্কার শাস্ত্রের আদি উৎস। উৎসমুখে যাহা বিন্দু, পরবর্তী সাহিত্যে তাহাই সিদ্ধ। বেদের ছায়াপথ পরিয়াই অবরকালীন ভারতীয় সাহিত্যের যাত্রা। বেদোত্তর কালের কবি-মনীষী ক্রাশ্বদংশী বৈদিক কবির দায়ভাগ লইয়াই সমৃদ্ধ হইয়াছেন।

বেদে পুরাণ-প্রসঙ্গ

ইতিহাস-পুরাণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ অংশ। এই ইতিহাস-পুরাণের মূল বীজ বেদ। পুরাণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সৃষ্টিকল্প ও বংশবর্ণনা। এই দিক হইতে ইতিহাস-পুরাণ বেদেরই ‘উপবৃংহণ’। বেদের সৃষ্টি-বিষয়ক সূক্তাবলীতে যে সকল তত্ত্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং ব্রাহ্মণ-অংশে যাহার ঈমং বিস্তার—পুরাণে তাহাই বিপুলাকার সর্গ-বর্ণনায় পরিণত হইয়াছে। ‘নাসদীয় সূক্তের’ রহস্যঘন শূতা, ‘পুরুষ সূক্তের’ বিরাট; ‘হিরণ্যগর্ভসূক্তের’ স্রষ্টা প্রজাপতি, অঘর্ষণ সূক্তের সৃষ্টিক্রম সবই পুরাণে আছে। আদি সৃষ্টিকল্পে দেবাসুরের উদ্ভব, দেবাসুরের সংগ্রাম, অদ্বিতীয় হইতে দেবতা ও দক্ষাদির জন্ম—বৈদিকসূক্তে ও ব্রাহ্মণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ পুরাণ।

পুরাণের বংশ ও বংশাঙ্কচরিতের বীজ বেদের ‘আখ্যান-সূক্ত’ বা ‘সংবাদস্তোত্র’ এবং ‘নারাণসী’। বেদের মন্ত-উষ্টা ঋষি-বিশ্বামিত্র, অত্রি, বামদেব, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরাস, ভৃগু—পুরাণ-ঋষির অগ্রতম। এই সকল ঋষিদের লইয়াই পুরাণে ‘নব ব্রহ্মা’র পরিকল্পনা। পৌরাণিক কাহিনীগুলিরও আকর বেদ-ব্রাহ্মণ। অগস্ত্য-লোপাম্ভার কাহিনী, পুরুষা-উর্বশীর উপাখ্যান, দেববৈভব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিচিত্র কথা, মন্ত-মন্ত সংবাদ প্রভৃতি বেদে-ব্রাহ্মণে ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। ইন্দ্রের বৃত্তবধের কাহিনী পুরাণের একটি বহুখ্যাত প্রসঙ্গ। বৈদিক সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটি ‘ঐন্দ্র’সূক্তে এই কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দ্রের জন্মই বৃত্ত বধের জন্ম ‘ঘনং বৃত্তাপাং জনয়ন্ত দেবাসঃ’ [ঋ ৩. ৪২. ১]। ইন্দ্রের ‘হন্তে বজ্রম্’, এই বজ্র ষ্ট্রা কর্তৃক নির্মিত—‘উষ্টা অশ্বৈ বজ্রং স্বর্ঘং ততক্ষ’ [ঋ ১. ৩২. ২]। পুরাণে ইন্দ্র শচী-পতি। বেদে শচীই স্বভগা ইন্দ্রাণী কিনা, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ন’ থাকিলেও, ইন্দ্র যে শচী-পতি তাহার ইঙ্গিত আছে,—‘হস্তা দহ্যনামভবং শচি-পতিঃ’ [অ. ৩. ১০. ১২]।

পুরাণের ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ঠিক যে রূপে ইহার পৌরাণিক দেবতা, সে রূপ বেদে না থাকিলেও, উহাদের অস্তিত্ব বেদেও ছিল। পুরাণের ‘ব্রহ্মা’ বেদে

‘প্রজাপতি’। ব্যাকৃত সৃষ্টিতে তিনিই প্রথম মূর্ত পুরুষ, এবং তিনি প্রপঞ্চ সৃষ্টির কর্তা। বৈদিক হস্তাবলীতে তিনি হিরণ্যগর্ভ, ধাতা, ক-দেবতা [‘কশ্ম দেবায় হবিষা বিধেম’ ঋ. ১০. ১২১] নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই প্রজাপতিই পুরাণের প্রজাপতি ব্রহ্মা। অবশ্য পুরাণে ব্রহ্মা-সম্পর্কে যে সকল কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলির উল্লেখ বেদে-ব্রাহ্মণে নাই, তবে ‘পিতা যৎ স্বাঃ দুহিতরমধিক্শন’ [ঋ. ১০. ৬১. ৭] মন্ত্রটিতে তাঁহার স্ব-দুহিতার প্রতি আসক্তির ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পুরাণের একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান।

‘বিষ্ণু’ও বেদের একজন প্রধান দেবতা। অবশ্য পৌরাণিক বিষ্ণু-কাহিনীর প্রসঙ্গ বেদে নাই। তবে ‘বিষ্ণু গোপা’ পদাংশটি তাৎপর্য বোধক। বেদে ‘গোপা’ শব্দের অর্থ ‘পালয়িতা’। পুরাণেও স্থিতির কর্তা বিষ্ণু। কেহ আবার এই অংশ হইতে বিষ্ণুর গোপকুলের সহিত সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। উহা অবশ্য কষ্টকল্পন। বিষ্ণু-হস্তে আছে, ‘ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্’ [ঋ. ১. ২২. ১৭]। বিষ্ণুর এই ত্রিপদক্ষেপের প্রসঙ্গ হইতে যে পৌরাণিক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু ও বলি-বামনের উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। পুরাণ-মতেও ধ্যেয় বিষ্ণুর পরমপদ, উহাই পরমস্থান। ইহা বৈদিক বিষ্ণু-স্মরণ মন্ত্রেরই স্মারক।

পৌরাণিক ত্রিমূর্তির তৃতীয় দেবতা উমাপতি মহেশ্বর। পুরাণের বিচিত্র শিবো-পাখ্যান, পৌরাণিক শিবের রূপ ও বিভূতি বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে রুদ্র ওষধিপতি, ভেষজ-দেবতা এবং তিনি অতি ভয়ঙ্কর। রুদ্রের রুদ্রত্ব পুরাণেও রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ওষধিপতির বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বেদের রুদ্র ‘কপর্দী’ (জটাধারী) ও ‘সুধখা’ (পিণাক-পুণি)—পুরাণের রুদ্রও জটাজুটধারী ও পিণাক-পাণি। যজুর্বেদের শতরুদ্রিয়ের রুদ্র অবশ্য পৌরাণিক শিবের মহিমায় ভূষিত। যজুর্বেদের আর একটি মন্ত্রে—‘এষ তে রুদ্র ভাগ, সহ স্বশ্রা অম্বিকয়া’—রুদ্র ভগ্নী অম্বিকার সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আহৃত হইয়াছেন; পুরাণে শিব অম্বিকা-পতি।

বৈদিক প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র পরবর্তীকালে পুরাণের ত্রিমূর্তি হইলেও, রূপ, গুণ ও লীলায় তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, দেবসত্তায় ব্যক্তিস্বের আরোপ। বেদের এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারীদের বলা হইত ‘ঐতিহাসিক’। তাঁহারা দেবতার প্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাস করিতেন না। তাহারা মনে করিতেন, অতীতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিই দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। দেবসত্তায় অলৌকিক কীর্তি-কলাশের ঘোষণা, প্রকৃতির রূপকে দেবতাকে মানুষের মত আশা-কামনার অধীন করিয়া চিত্রিত করিবার কীর্তি তাঁহাদেরই। বেদের ব্রাহ্মণাংশেও ইহাদের

হাত ছিল বলিয়া অহুমিত হয়। এইরূপেই সংহিতার বীজ ব্রাহ্মণে অঙ্কুরিত হইয়া পুরাণে পল্লবিত হইয়াছে। পুরাণ-সাহিত্যের উৎসরূপে বেদের মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

কথা সাহিত্যে বেদের দান

জাতক, পঞ্চতন্ত্র ও জৈন 'কথা' ভারতীয় কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার। পুরাণ-ইতিহাসেও বহু কথা স্থান লাভ করিয়াছে। এগুলি হইতেও প্রাচীন কোন কথা-ভাণ্ডারের বিষয় যদি উল্লেখ করিতে হয়, তাহা বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ। অবশ্য জাতক-পঞ্চতন্ত্রাদি কথা-সাহিত্যে যে ধরনের কথা পাওয়া যায়, বেদে-ব্রাহ্মণে তাহা নাই। বেদের আখ্যায়িকা বেশির ভাগ পুরাণ-ঘেঁষা; ইতিহাসের জড়ও কিছু কিছু আছে। তথাপি ইহারই মধ্যে লৌকিক জীবনের স্বাদ যেটুকু পাওয়া যায়, জীবন-কথার দিক হইতে তাহাদের মূল্য অল্প নয়। সংহিতার 'সংবাদ স্তোত্র' এবং 'নারাশংসী'গুলি এইরূপ কথার আদি বীজ। কয়েকটি কথার আভাস দেওয়া যাইতেছে:—

১. নারী-হৃদয়ের শাখত আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হইয়াছে অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সংবাদে [ঋ. ১. ১৭২]। লোপা বলিতেছেন, সেবায় কতকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এখন জরা আসিরা তুম্ব-শ্রী গ্রাস করিতে উদ্ভূত, পুরুষ এবার স্বীর নিকট গমন করুন। পুরাতন সত্যপালক ঋষিগণও প্রাণকে রক্ষা করিয়াছেন, নিঃশেষ হইয়া যান নাই, পত্নী এবার পুরুষের সহিত মিলিত হউক।

অগস্ত্য উত্তর করিতেছেন, দেবতা যাহাদের রক্ষা করেন, তাহারা শাস্ত হয় না। জপ ও সংযমে নিযুক্ত থাকিলেও কাম আজ অব্যবহিত। লোপামুদ্রা আজ সমর্থ পতিতে সঙ্গতা হউক।

যিনি এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছেন, পরিশেষে মন্তব্য করিতেছেন, 'প্লুকায়া হি মর্তাঃ'—মায়াব কামনাবান্। ঋষি অগস্ত্য অবশ্য উভয় কুলই রক্ষা করিয়াছেন, অপত্যও লাভ করিয়াছেন, দেবতার আশীর্বাদ হইতেও বঞ্চিত হন নাই। ১

২. কবচ-দৃষ্ট একটি স্তোত্রে [ঋ, ১০. ৩৩.] পাই পিতার মৃত্যুতে শোক-কাতর পুত্রের মর্মবিদারী চিত্র, আর সেই সঙ্গে তৎকালীন পুরোহিতের সাস্থনাবাগী। কবচ ছিলেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে) ব্যাধ জাতীয় দাসীর পুত্র, তিনিই আবার রাজা ব্রহ্মদত্ত ও তৎপুত্র কুরুশ্রবণের যাজক। পিতার মৃত্যুতে কুরুশ্রবণ শোকবিহ্বল। কবচ তাঁহার দানজ্ঞতির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সাস্থনা দিতেছেন: আমি যদি মৃত্যু বা অমৃতের অধীশ্বর হইতাম, তাহা হইলে আমার ধনদাতাকে নিশ্চয় জীবন দান

করিতে পারিতাম। দেবতার মৰ্যাদা অতিক্রম করিয়া শতাব্দ্য ব্যক্তিও বাঁচিতে পারে না, এই জন্তাই তো প্রিয়-বিয়োগ হয় :

ন দেবানামতিব্রতঃ শতাত্মা চ ন জীবিত ।

তথা বৃজা বি ববৃতে ॥ [ঋ. ১০. ৩৩. ২]

একজন পুরোহিতের পক্ষে এই নির্মম মতের স্বীকারোক্তি প্রশংসনীয়। হুক্তটির ভিতর একটি কাহিনীও সংক্ৰান্তিত।

৩. অক-হুক্তে [ঋ. ১০. ৩৪.] পাই একটি জুয়ারীর আত্মকাহিনী। এই হুক্তটিরও ঋষি কবয়। হুক্তটির মধ্যে পাশার নেশায় প্রমত্ত মাহুঘের সর্বনাশা পরিণামের একটি চিরকালীন সামাজিক চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পাশার আকর্ষণ মোহকর। এই আকর্ষণে ঘরের সখীসমা ঘরণী অনাদৃত হয়। শাণ্ডড়ী নিন্দা করে, বৌ বাধা দেয়, বাবা, মা, ভাইয়েরা বলে—জানিনা উহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাও, জুয়ারীর বোকে অন্ত্রে স্পর্শ করে ['অন্ত্রে জায়াং পরিমুঘস্তি']। জুয়ারী ভাবে, আর পাশা খেলায় যোগ দিবে না, কিন্তু পাশখেলার দানের শব্দ 'জারিণী'র মত আকর্ষণ করে। পাশার শব্দ যেন 'মধ্বা সম্পৃক্তাঃ'। জুয়ারী সেই মধুতে আকৃষ্ট; ফলে জুয়ারীর জায়া দুঃখ কষ্ট পায়, মাও কষ্ট পান। পাওনাদারের ভয়ে জুয়ারীকে রাত্রিতে অন্ধের বাড়িতে আত্ম গোপন করিতে হয়। তাই সে বলে,

অন্ধৈ র্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ রুঘম্ব

বিস্তে রমম্ব বহুমন্ত্রমানাঃ ।

—পাশা খেলিও না, কৃষিকর্ম কর—আপন ধনই যথেষ্ট মনে করিয়া সুখী হও।

বৈদিক সাহিত্যে এই ধরনের বহু কথা আছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের কাহিনী-গুলির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশ জীব-জন্তু কাহিনী। বেদে-ব্রাহ্মণে-উপনিষদে সে কাহিনীরও অঙ্কুর রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সরমা ও পর্ণিগণের কাহিনী [ঋ. ১০. ১০৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বর্গের স্তনী (কুতুরী) সরমা। তাহার নিলোভ চরিত্র নিলোভ মাহুঘেরই চরিত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবাল সত্যকাম ঋষভ (যশ) হংস ও মদু (জলচর পাখী) প্রভৃতির নিকট ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ লাভ করিয়াছেন। মহুগ্ধেত্তর প্রাণিকে নায়ক সাজাইয়া এই প্রকারের বহু-কাহিনী পরবর্তী কথাসাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে। কথাসাহিত্যে কোন কোন উপাখ্যানে সেই উপাখ্যানের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত একটি বীজ-শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়। বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ কথা-বীজ জাতীয় শ্লোকের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,

১. ঙা স্বর্ণা সযুজা সখায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্তঃ পিপ্ললং স্বাতৃ অস্তি

অনন্তন্ অন্ত অভিচাক্ষীতি ॥ [ঙ ১. ১৬৪. ২০]

—দুইটি শোভন-গমন সমানযোগ পাখী একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া লগ্নে বাস করে ; তাহাদের মধ্যে একটি স্বাতৃ পিপ্লল ভক্ষণ করে, অন্তটি ভক্ষণ না করিয়া শুধু দেখে ।

সায়ণ বলেন, ‘অত্র লৌকিক পক্ষিদ্বয় দৃষ্টান্তেন জীব পরমাশ্রয়নো ভূয়তে’। লৌকিক পক্ষীর এই দৃষ্টান্ত একটি কথার সঙ্কেত ।

২. অজামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাং

বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হেকা জুষমানোহুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ ॥ [খেত. উ. ৪. ৫.]

—নিজের অহরূপ বহু প্রজা সৃষ্টি কারিণী রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা একটি অজাকে একটি অজ আসক্ত হইয়া ভোগ করে, অপর একটি অজ ভুক্ত ভোগা অজাকে ত্যাগ করে ।

শ্লোকটির মধ্যে প্রকৃতি এবং বন্ধ ও মুক্ত পুরুষের গূঢ়তত্ত্ব নিহিত থাকিলেও উহাতে প্রাণী-কাহিনীর একটি বীজও রহিয়াছে ।

কথা সাহিত্যের প্রধান বাহন গল্প । বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদোক্ত গল্পগুলিরও বাহক প্রাঞ্জল গল্প । এই গল্পই প্রাচীনতম ভারতীয় গল্পের নিদর্শন । গল্পের এই ধারা সূত্র-সাহিত্যের ক্ষীণ সূত্রে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল । ভাণ্ড্য-টীকার ভিতর উহার গতি মন্থর ও প্রকৃতি নীরস হইয়া পড়িয়াছিল । কিন্তু কাহিনীবর্ণনায় বা ঘটনার বিবৃতিতে এই গল্পের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত ছিল, তাহারই পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করি পালি জাতকাদির মধ্যে ও পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কথাসাহিত্যের গল্পে । গল্প রচনায় গল্পই যে শ্রেষ্ঠ বাহন, এ আবিষ্কার বৈদিক যুগের । উদাহরণ স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য-গল্পের একটি অংশ উদ্ধার করা বাইতেছে ।

প্রজাপতিঃ সোমং রাজানমসৃজত । তং ত্রয়ো বেদাশ্বসৃজন্ত । তান্ হন্তে কুরুত । অথ হ সীতা সাবিজ্ঞী সোমং রাজানং চকমে । প্রধাম্ উ স চকমে । সা হ পিতরং প্রজাপতিম্পসসার । তং হ উবাচ নমস্তে অস্ত ভগবঃ । উপ স্বা অয়ানি প্র স্বা আপত্তে । সোমং বৈ রাজানং কাময়ে প্রধাম্

উ স কাময়তে ইতি । তস্মৈ উ হ স্বাগরমলঙ্কারং করায়িত্বা...অলঙ্কৃত্য অস্ত
অর্কঃ বভাজ । তাম্ হ উদীক্য উবাচ উপ মা বর্তস্ব ইতি । তং উবাচ
ভোগন্ত মে আচক্ষ এতন্মে আচক্ষ যন্তে পার্ণবিত্তি । তস্মৈ উ ত্রীন্ বেদান্
প্রদদৌ । তস্মাদ্ উ হ স্নিয়ো ভোগমেব হারয়ন্তে । [তৈ, ব্রা. ২. ৩. ১০]

—প্রজাপতি সোমরাজাকে সৃষ্টি করিলেন । তাহার পর তিন বেদ সৃষ্টি করিলেন ।
(সোম) উহাদিগকে হস্তে গ্রহণ করিলেন । অতঃপর সাবিত্রী সীতা তাঁহাকে
কামনা করিল । তিনি (সোম) শ্রদ্ধাকে কামনা করিলেন । সে (সীতা) পিতা
প্রজাপতির নিকট গেল । তাঁহাকে বলিল, হে ভগবন, প্রণাম । আপনার নিকট
অভিযোগ করিতেছি । আমি সোম রাজাকে কামনা করি, তিনি শ্রদ্ধাকে কামনা
করেন । (প্রজাপতি) তাহার জ্ঞান অলঙ্কার নির্মাণ করাইয়া মন্ত্রপুত্র করিয়া সাজাইয়া
দিলেন । (সীতা) তাঁহার (সোমের) সম্মুখে দীপ্তি পাইতে লাগিল । তাহাকে
দেখিয়া তিনি (সোম) বলিলেন, আমার কাছে আইস । সে তাঁহাকে বলিল,
ভোগের মূল্য দাও । তোমার হাতে যাহা আছে, তাহাই দাও । তিনি (সোম)
তাহাকে তিন বেদ প্রদান করিলেন । এইজন্ত এইরূপে স্বীলোকেরা ভোগ্য আদায়
করিয়া থাকে ।

মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, পালি গন্ত এবং পঞ্চতন্ত্রাদিতেও এই গন্তভঙ্গিই
অনুসরণ করা হইয়াছে । অবশ্য কথাসাহিত্যের গন্ত কিছুটা অলঙ্কৃত, ব্রাহ্মণের
গন্ত নিরাভরণ ।

বেদে নাট্য ও ছন্দ শাস্ত্রাদির উপাদান

নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, বেদে তাহা নাই । কিন্তু কয়েকটি সংবাদ-সূক্ত অপূর্ব
নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ । তন্মধ্যে যম ও যমী সংবাদ [ঋ. ১০. ১০] এবং পুরুষবা-
উর্বশীসংবাদ [ঋ. ১০. ২৫] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যম ও যমী সংবাদে একদিকে
উদ্ঘাটিত হইয়াছে নীতিভ্রষ্টা ভগ্নীর নগ্ন লালসার চিত্র, অত্রদিকে ধর্মধীর ভ্রাতার
নীতিজ্ঞান । কথার দ্বন্দ্ব নাটকীয় দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হইয়াছে :

যমী বলিতেছে, ‘ও চিং সথায়ং সথ্যা ববৃত্যাম্’—আমি সথাকে সথ্যে

বরণ করিব ; যম উত্তর দিতেছেন, ‘ন তে সথা সথ্যং বষ্টি’—

সথা তোমার সথ্য কামনা করে না ।

যমী বলিতেছে, ‘দিবা-পৃথিব্যা মিথুন্য সবন্ধু’—ত্বাপা পৃথিবীতে

মিথুনগণ সকলেই বন্ধু ; যম উত্তর করিতেছেন, ‘অম্মিচ্ছস্ব

সুভগ্নে পতিং মৃতং—আমাকে ছাড়া, হে সুভগ্নে, অথ কাহাকেও পতিত্বে কামনা কর।

যমী সংখেদে বলে, ‘কিং ভ্রাতা অসদ্ যদনাথং ভবাতি’—ভ্রাতা থাকিতে

ভগ্নী কি অনাথ হইবে? যম উত্তর করেন, ইহা যে পাপ।

কুরু যমী বলে, যম, তুমি ভীকু, তোমার মন বা হৃদয় বলিয়া কিছু আছে,

দেখিতে পাইতেছি না [‘বতো বত অসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ঞ্চ

অবিদাম’]; তথাপি যমের একই উত্তর, ‘অন্তম্ উষু স্বং যমি।’

পুরুষা ও উর্বশী-সংবাদের নাটকীয় সম্ভাবনাকে কালিদাস ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন। বৈদিক সংবাদটি এক পূর্ণাঙ্গ প্রেম-কাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশ। পুরুষা স্বরূপী উর্বশীর প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। উর্বশী পুরুষার প্রিয়াকারে কিছুকাল বসবাস করিয়া যখন পুরুষার তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে। উর্বশী আকাশ পথে ছুটিয়া চলিয়াছেন। পিছনে উম্মাদের মত ডাকিয়া তাঁহাকে ফিরাইতে চাহিতেছেন পুরুষা। সংবাদটি প্রাচীন, ভাষাতেও প্রাচীনত্বের জটিল বন্ধন, ভাবও মাঝে মাঝে অস্পষ্ট। সংক্ষেপিত তর্জমায় সংলাপটি এইরূপ দাঁড়ায় :

পুরু : হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ বোরে

বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ হু।

ন নৌ মন্তা অহুদিতাস এতে

ময়ঙ্করন্ পরতরে চনান্ ॥ [ঋ. ১০. ২৫. ১]

—ওগো বোরা জায়া, দাঁড়াও, উভয়ে একটু কথা বলি। সুখকর ‘মনের কথা’ শেষবারের জন্ত বলা হয় নাই।

উর্ব : কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং

প্রাক্রমিষমুখসামগ্রিয়েব।

পুরুষঃ পুনরন্তং পরেহি

দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি ॥ ঋ. ১০. ২৫. ২]

—তোমার কথা শুনিয়া কি করিব? আমি এখন প্রথম উষার মত চরনশীলা। পুরুষা, ঘরে ফিরিয়া যাও, আমি এখন বাতালের মত দুরাপনশীলা।

পুরুষা বলিলেন, মাছুষ হইয়া আমি অমাছুষীতে প্রেম অর্পণ করিয়াছি, এখন আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।

উর্বশী বলিলেন, মর্ত্য মানব অমর নারীতে আসক্ত হইলেও অমরী কখনও মাছুষকে হৃদয় দান করে না, হাব-ভাবে তুলায় মাত্র।

পুরুষা বলিলেন, তবু তুমি আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছ। তোমাকে যে গন্তান রহিয়াছে সে জন্ম গ্রহণ করুক, তখন যাইও।

উর্বশী উত্তর করিলেন, বৃথা অশ্রু নয় করিও না। মূৰ্খ, ফিরিয়া যাও।

পুরুষা বলিলেন, ফিরিয়া যাইবে, ‘পরাবতঃপরমাং গন্তবা উ’—যাইবে চির দূরের দেশে, সে মরিবে, তাহার দেহ হইবে বুকের ভক্ষ্য।

উর্বশী কহিলেন, পুরুষা, মরিও না, মনে রাখিও, স্ত্রীদের সখ্য নাই তাহাদের হৃদয় শৃগালের মত :

ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি।

সালাবৃকাণাং হৃদয়ানি এতা ॥ [ঋ. ১০. ২৫. ১৫]

পুরুষা বলিলেন, ওগো আকাশকামিনি, তোমাকে তবু অশ্রু নয় করি, নিবৃত্ত হও। আমার হৃদয় শোকে সন্তপ্ত হইতেছে—‘নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপাতে মে’—[ঋ. ১০. ২৫. ১৭]।

আঠারটি শ্লোকের সমষ্টি এই সংলাপ, শেষ শ্লোকটি দেবগণের সান্ত্বনা-বাক্য। পুরুষা উর্বশীকে ফিরিয়া পান নাই। বিরহের সন্তাপ-বেদনা লইয়া সংবাদের পরিসমাপ্তি। কারণে ও প্রেমের আকুলতায় সৃজিত একটি সুন্দর নাট্যকাব্য।

এই প্রকারের নাটকীয় উপাদান ব্রাহ্মণ-আরণ্যকেও দুলভ নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ইন্দ্র-রোহিত সংবাদ বা কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাটকীয় ছন্দের দিক হইতে না হউক, জীবন-কেন্দ্রিক সংলাপের দিক হইতে বৈদিক সাহিত্যের সংলাপগুলির মূল্য অপরিমীম।

ভারতীয় ছন্দ-শাস্ত্রেও বৈদিক ছন্দের দান অল্প নয়। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিক গায়ত্রী-উষ্ণিগাদি ছন্দ ব্যবহৃত হয় নাই বটে, কিন্তু অমৃত্যুপ্, ছন্দটি প্রচুর পরিমাণেই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণগুলির প্রধান ছন্দ অমৃত্যুপ্। আদিকবি বাণ্মীকির ‘মা নিষাদ’ শ্লোকে অমৃত্যুপ্ ছন্দই লৌকিক ছন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল [দ্রষ্টব্য উত্তর রাম-চরিত নাটক, ২য় অঙ্ক]। বৈদিক ছন্দ অক্ষর-সংখ্যাত, সংস্কৃত ছন্দও প্রধানতঃ অক্ষর সংখ্যাত, পার্থক্য এই যে, সংস্কৃতে অক্ষরের লঘু-গুরু বিচার ছিল, বেদে উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরের।

ভারতীয় সঙ্গীতের আদি নির্ধার ‘সামবেদ’।

বৈদিক সূক্তের কবিত্ব

কবিতার দিক হইতে বৈদিক সূক্তাবলীর একটি স্বকীয় মূল্য আছে। গভীর অম্লভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসাবে, কোন কোন সূক্ত বা সূক্তের কোন কোন অংশ এক একটি নিটোল গীতিকবিতা ['Pearls of lyric poetry'—Winternitz]। অধিকাংশ স্তোত্রই স্ততিমিশ্র প্রার্থনা। এই প্রার্থনার অংশেই অম্লভূতির অভিব্যক্তি। ঐহিক অভ্যাসের জন্ত ধন চাই, অন্ন চাই, ভোগ্য চাই—ভোগ্য ভোগ করিবার জন্ত শতায়ু চাই, বীৰ্য চাই, স্বাস্থ্য চাই। বৈদিক সূক্তাবলীতে এই কামনা অস্বহীন। 'দেহি-ধেহি' রবে ঋষিকণ্ঠ সোচ্চার। কামনা ছোট, নিতান্তই ঐহিক—কিন্তু অসঙ্কোচ প্রকাশের সারল্য নয় শিশুর মতই মনোহর। রক্ষা-প্রার্থনায় কম্পকণ্ঠের করুণ ধ্বনি যে-কোন হৃদয়কে স্পর্শ করে। 'মৃড়া সূক্ষত্র মৃড়য়', 'যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ', 'মা নঃ প্রিয়া ত্বম্বো রুদ্র রীরিষ', 'মা মা হিংসীঃ' প্রভৃতি ধ্বনি বড় করুণ। ইহারই সঙ্গে আছে শান্তি, সৌম্যনস্ত ও সৌভাগ্যের প্রার্থনা। উদার হৃদয়ের এই উদার প্রার্থনা মানবতার একাদর্শ। 'শং নো দিব্যাঃ পাথিবঃ শং নো অপ্যা', 'স্ব গা ঋতস্ত পত্বাঃ', 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম', 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্', 'সং বো মনাসি সংব্রতা', 'সমাগী প্রণা সহ বোহুভাগঃ'—প্রভৃতি প্রার্থনা চিরকালীন সাম্য ও শাস্তির কামনায় পূর্ণ। আৰ্ষ প্রার্থনা আরও উদার, আরও উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনায়। সংখ্যায় অল্প হইলেও মন্ত্রের ব্যঞ্জনা মর্ম-প্রসারী, যেমন,

১. উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতিঃ পশুস্ত উত্তরম্।

দেবং দেবত্রা সূর্যমগম জ্যোতিকস্তমম্॥ [ঋ. ১. ৫০. ১০]

—তমসার পারে জ্যোতি দর্শন করিতে করিতে, দেবলোকে সূর্য দেবতা, তাহারও উপরে উত্তম জ্যোতিলোকে গমন করিব।

২. যত্র আনন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।

কামস্ত যত্রাপ্তাঃ কামান্তত্র মামমৃতং কৃধি॥ [ঋ. ২. ১১৩. ১১]

—যেখানে আনন্দ, আনন্দ, কেবল আনন্দ—যেখানে সকল কামনা

পূর্ণকাম—সেইখানে আমাকে লইয়া অমৃতময় কর।

বৈদিক ঋষির প্রকৃতি-দৃষ্টি অনন্ত সাধারণ। এই প্রকৃতি বর্ণনা ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব। পরবর্তীকালের কবিগণ আৰ্ষ নয়নাঙ্গন পরিয়াই প্রকৃতির শ্রুতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দেবসত্তা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিষয় বিমুক্ত দৃষ্টিতে তাঁহারা ভূলোকে দেখিয়াছিলেন সিদ্ধু-সরিতে আপদেবতার লীলা, অরণ্যানির সৌন্দর্য—দ্যুলোকে দেখিয়াছিলেন সূর্য-চন্দ্রের গতি, কালের আবর্তন,

রাত্রি ও উষার অতুলন—অন্তরিকে দেখিয়াছিলেন মেঘের খেলা, বৃষ্টির ধারাপতন, বিদ্যুতের প্রদীপ্ত বিকাশ, মরুৎ-মাতরিরবার হাহাধ্বনি। বেদের নিসর্গ-সুন্দারলী অপূর্ব কবিত্বে মণ্ডিত। প্রকৃতির মধ্যে জোর করিয়া প্রাণ আরোপ করিতে হয় নাই, লীলা চঞ্চল সূন্দরী প্রকৃতির ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বৈদিক কবি ‘অপৃথগ্‌ষত্বে’ সমাসোক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকৃতির জগতকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা মর্ত্য জগতের অমূরুপ আর একটি হাসি-কান্নার, প্রেম-সোহাগের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—সেখানে জীবাপৃথিবী আদি জনক-জননী, রুদ্র-রোদাসী পতি-পত্নী, রাত্রি ও উষা দুই দ্যুলোক দুহিতা, দুই ভগ্নী-উষা সূর্য—প্রিয়া, বিষ্ণু ‘ইন্দ্রস্ত যুজ্যো মখা’, অশ্বিনয় সূর্যের সারথী। শোভনহরু বজ্রহস্ত ইন্দ্র এই জগতের রাজা, তিনি শক্রহা, বুদ্ধিমান; তাহারও গৃহ আছে, কল্যাণী জায়া আছে [‘কল্যাণী জায়া সুরাণাং গৃহে তে’-ঋ, ৩. ৫৩. ৬]। বরুণ এই জগতের সত্যানুত্তোর দ্রষ্টা। রূপবান্ অশ্বিনয় উহার বৈজ্ঞ [‘ভিষজা’]। এখানেও যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, জয়-পরাজয় আছে। পিতা কন্ধ্যার বিবাহে প্রচুর ব্যয় করেন, কুমারী কন্ধ্যা বিবাহের পর সূমঙ্গলী বধুরূপে পতিগৃহে পদার্পণ করেন [দ্রষ্টব্য সূর্য্য-সুত্ৰ]। বৈদিক ঋষির কল্পনা অব্যবহৃত হয় উজ্জ্বল-ভাষার উদয়ে, সবিস্ময়ে তাহারা বলিয়া উঠেন, ‘চিত্রং দেবানামুসাদনীকম্’। ‘আয়তী রাত্রি’র আবির্ভাব আর এক বিস্ময়। ঋষির সৌন্দর্য-চেতনার প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটয়াছে আকাশ-কন্ধ্যা উষার রূপাঙ্কনে।^১ জ্যোতির্ময় প্রভাতের সূচনা করিয়া উষা আবির্ভূতা হন : তিনি ‘সুন্দরী’ (সুন্দরী), ‘সুবতিঃ শুক্রবাসা’ (শেতবসনা যৌবনবতী), ‘ভাস্বতী নেত্রী’ (দীপ্তিমতী নায়িকা), ‘সূর্য্যস্ত যোষা’ (সূর্য-প্রিয়া)। এই নায়িকার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া একটি বাসিষ্ঠ সূক্তে অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে : কবিত্বের দিক হইতে ইহা অমূল্যম :

উপো রুরুচে যুবতির্ন যোষা

বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী চরায়ে।

অভূদগ্নি সমিধে মাহুমাণাম্

অকর্জ্যোতি বাধমানা তমাংসি ॥

বিশ্বং প্রতীচী মপ্রথা উদহ্বাৎ

রুশদ্বাসো বিল্লতী শুক্রমশ্বৈঃ।

১. The hymns which are addressed to these divinities, the two Asvins and to Ushas (The Dawn), at least those which salute the arrival of the latter, do not spring from devotion alone, but are the product of a deep poetical feeling, and a delicate imaginative power [Original Sans. Texts. Vol V—Muir]

হিরণ্যবর্ণী হৃদশীক সংদৃক্

গবাং মাতা নেত্রী অহামরোচি ॥ [ঋ. ৭. ৭৭. ১-২]

—যৌবনবতী নারী সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছেন। বিশ্বলোক জাগিয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞার্থে অগ্নি সমিদ্ধ হইয়াছেন। (উষা) প্রকাশ করিতেছেন অন্ধকার-নাশা জ্যোতি।

দিগ্গণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বের অভিমুখে উষা আসিতেছেন। দীপ্ত বসন হইতে শুক্লজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। শোভা পাইতেছেন হিরণ্যবর্ণী আনন্দদায়িনী লোকমাতা দিবসের নেত্রী (উষা)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ঋষিদের পৃথিবী-প্রেম। অরণ্য-বনস্পতি-ওষধি-পর্বত-মুক্তিকা মণ্ডিতা পৃথিবী ‘মাতা’। বসুন্ধরা আদি জননী—এ কল্পনা বৈদিক। মায়ের স্নেহধারায় পুষ্ট কবি শুধু পৃথিবীর সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া ধৃত্য হন নাই, মাতৃ-মমত্বের গভীরতাও অনুভব করিয়াছেন। তাহারা ধরণীর ধূলিকেও বলিয়াছেন, ‘মধুমৎ পাথিবং রজঃ’। ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি-প্রেম ও মর্ত্য-মমতার আদি গন্ধোদ্রী বেদ-উপনিষৎ।

বৈদিক সাহিত্যে অলঙ্কার

বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়, ঋষিগণ দ্রষ্টা বা স্মৃতা। দৈবশক্তির প্রেরণায় ঋষিগণের মাধ্যমে যে মন্ত্রগুলি প্রকাশিত হইত, তাহা ছন্দস্পন্দিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিত। এইজন্ত ঋষিকে বলা হইত ‘মন্ত্রকৃৎ’ বা ‘শ্লোককৃৎ’। এই মণ্ডনকলা ছিল স্বভাবসিদ্ধ, অর্থাৎ ‘অপৃথগ্‌যত্নে’ নির্বাহিত। সাহিত্যে সৃষ্টির প্রকাশ বা অলঙ্কারের প্রয়াস ঠিক কোন স্ত্রুত ধরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হয়তো মানুষের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-চেতনা ইহার অত্যন্ত কারণ। বৈদিক সাহিত্যেও সৌন্দর্য-নির্মাণে প্রেরণা বাহিরের কোন অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া আসে নাই। এখানেও প্রচুর অলঙ্কৃত বাক্য রহিয়াছে। রহিয়াছে প্রৌঢ়োক্তি, রহিয়াছে ভঙ্গিমায় উক্তি-বৈচিত্র্য; কিন্তু সেগুলি অনুভবের সহজাত। প্রকৃতির রাজ্যে লালিতা বনবালাকে কেহ বনফুলে সম্বিজত হইতে নির্দেশ দেয় না, কিন্তু সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে বনকল্যাণ কর্ত্তে পুষ্পমঞ্জরি গুজিয়া দিয়াছে, কণ্ঠে পরিয়া আসিতেছে বনফুলের মালা। অলঙ্করণ-প্রবৃত্তি সহজাত। এই সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-এষণারই প্রকাশ ঘটয়াছে বৈদিক সাহিত্যের সু-উক্ত সৃজ্যবলীতে।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে কতকগুলি শ্রুতিমধুর স্মরণীয় শব্দ ও স্মলিত বিশেষণ বা আরোপিত গুণ বা ধর্ম। দেব-দেবতা অথবা যে কোন বস্তুই হউক, তাহা

নিছক বস্তু মাত্র নয়, তাহা বিশেষিত বস্তু। অগ্নি শুধু অগ্নি নহেন, তিনি 'স্বতবোনি', 'ধৃমকেতু', 'শুক্লশোচি' (শুক্ল জ্যোতির্ময়), 'চিত্র-ভানু' (দর্শনীয় দীপ্তি); তেমনই জল 'বাধিকী' (বর্ষণকারিণী), 'রেবতী' (প্রবমানা), 'পাবকা' (পবিত্রকারিণী)। স্বর্ষ 'বিশচকু', 'দূরদক',—মরুৎগণ 'শুক্লজ্যোতি' (শুক্লতেজা), 'চিত্রজ্যোতি' (দর্শনীয় দীপ্তি), 'সবাজ্যোতি', 'ঋতপা' (ঋতপাতা) [স্ত. স্ব. ১৭. ৮০]—উষা 'সুন্নরী' (শোভনা রমনী), 'শুক্লবাসা' (শুক্লবসনা)—সোম 'পবমান' (পবিত্রকারক)—আর পৃথিবী 'মধুমতী'. 'মধুহুবা', 'স্বতবতী', 'অগ্নিবাসা'। দেবগণের মধ্যে কেহ 'সুন্ধত' (বলবান), কেহ 'অশ্বর' (অমেয় প্রাণশক্তি সম্পন্ন), কেহ 'মারী' (অলৌকিক মায়াক্রিয় অধিকারী); দেবীগণের মধ্যে কেহ 'ঋতাবরী' (সত্যবতী), 'বিভাবরী' (দীপ্তিমতী), 'সুন্নতবতী', 'পাবকা', 'বাজিনীবতী' (অন্নশালিনী)—সকলেই 'সুভগা'। একমাত্র নিষ্কৃতি ইহার ব্যতিক্রম; তিনি পাপদেবতা।

এই বিশেষণ বা আরোপিত ধর্মগুলি শুধু বিশিষ্ট নয়, সুন্দর। মনে হয়, ভাষায় রূপ-রচনায় বিশেষিত শব্দের প্রয়োগই অলঙ্কারের প্রথম স্তর। প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য-চেতনা বিশেষিত শব্দগুলির মধ্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য বিশেষণ-প্রয়োগের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত। যখন সৌন্দর্য-এষণা সচেতন হয়, তখন সুনির্বাচিত বিশেষণ কবি-প্রতিভার প্রৌঢ়ত্ব ও সূচনা করিয়া থাকে; তখন বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া বিশেষণ ব্যঞ্জনাধর্মী হইয়া উঠে। বৈদিক স্তোত্রের বিশেষণগুলি প্রথম স্তরের। প্রত্যক্ষ রূপই ঋষিদের নয়নে রূপাঙ্জন মাথাইয়া দিয়াছে, বিশেষণগুলি বাচ্যার্থের পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া অভিধেয় অর্থকেই প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও এই বিশেষণ বাক্য-প্রৌঢ়ির সুন্দর নির্শন। এগুলি আর্ষজগতের নিজস্ব সম্পদ। পরবর্তী সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের বিশেষণ প্রয়োগ দেখা যায় না।

কেবল বিশেষিত শব্দ নয়, বৈদিক সাহিত্যে অন্ত্যন্ত প্রসাধন-কলাও লক্ষণীয়। এখানে দেবগণই শুধু 'অরুত' (অলঙ্কৃত) নহেন, বাক্যও অরুত। যাস্ক মুনি তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থপাদে বৈদিক অলঙ্কার লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় 'উপমা'। বৈদিক সাহিত্যে 'উপমা' বা উপমাগর্ভ বাচনই প্রধান অলঙ্কার। শুধু বৈদিক সাহিত্য কেন, ভাষায় মাহুঘের আদি সৃষ্টি 'উপমা'। সাদৃশ্যবোধ মানব মনের একটি সহজাত পুরাতনী বৃত্তি। বস্তুব্যকে স্পষ্ট করিবার জন্ত, সমর্থন করিবার জন্ত বা সুন্দর করিবার জন্ত কথায়-বার্তায় বা কবি-কর্মে উপমা-দৃষ্টান্তের প্রয়োগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নয়। যাস্ক মুনি দেখাইয়াছেন,

সাদৃশ্য-বাচক ‘বৎ,’ ‘বর্ণ,’ বা ‘রূপ’ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর উপমা সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেমন, ‘স্বতবৎ হবিঃ’, ‘হিরণ্যবর্ণা’ উষা, ‘শুক্রবর্ণ’ অগ্নি ইত্যাদি।

উপমা-সৃষ্টির কৌশল যাহাই হউক, এই সকল উপমার বৈচিত্র্য অসাধারণ। উপমান-চয়নে ঋষি-দৃষ্টি ভুলোক-দ্যুলোক সঞ্চারী। ভুলোক-সম্পৎ বর্ণনা করিতে আসিয়াছে দ্যুলোক-অস্তরিক্ষের উপমান, আবার দ্যুলোক-অস্তরিক্ষের বর্ণনায় আসিয়াছে মাটির কল্লনা। উর্বশী মর্ত্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ‘উষসামগ্রিয়েব’—আদি উষার মত, তিনি বায়ুর ন্যায় ছুস্রাপ্যা ‘চুরাপনা বাত ইব’ [ঋ. ১০. ১৫]; অগ্নি হইতেছেন অস্তরিক্ষলোকের স্তম্ভ দূত [‘স্তম্ভমস্তদূতঃ রোদসী’—ঋ. ৭. ২. ৩]; আকাশ-মেঘের ন্যায় তাঁহার গর্জন [‘অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়স্বিয ছোঃ’—ঋ. ১০. ৪৫. ৪]; স্বরগণ বিষ্ণুর পরম পদকে দেখেন ‘দিবীব চক্ষুরাততম’—আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায়। আবার আকাশ-অস্তরিক্ষের বর্ণনায় মাটির পৃথিবীর তুলনা : রুদ্র হইতেছেন ‘দিবো বরাহঃ’—আকাশ-বরাহ, ইন্দ্র হইতেছেন অস্তরিক্ষের ‘বৃষভ’—তিনি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত, সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

বৈদিক উপমা প্রায়শঃ সমাসোক্তি বা অন্তরোপাশ্রিত; অথবা বলা যায়, ইহা উপমার আর এক দিক, অর্থাৎ ‘প্রতীপ’, (Inverted simile)। বৈদিক দেবতা প্রাকৃতিক সত্তা। এইজন্ত প্রসিদ্ধ উপমানগুলিই এখানে উপমেয়, আর প্রসিদ্ধ উপমেয়গুলি উপমান। ফলে প্রাকৃতিক দেবজগতে মর্ত্যালোকের কলরোল। ধর্ম, কর্ম, গুণে, আচারে-আচরণে প্রকৃতি মাতৃষের অঙ্কুরূপ। আপ দেবতা এখানে জলধারা বর্ণন করেন তেমনই ভাবে, প্রীতিযুক্তা মাতৃগণ যেমন সন্তানকে স্তন্যপান করান [‘উশতীরিব মাতরঃ’—ঋ. ১০. ২. ২]; স্বর্ঘ ছোতনশীলা উষার পশ্চাতে গমন করেন তেমনই ভাবে, মর্ত্যনায়ক যেমন গমন করে নারীর পশ্চাতে [‘স্বর্ঘো দেবীমূষসং রোচমানাং মর্ষোন ঘোষামভোতি পশ্চাৎ’—ঋ. ১ ১১৫. ২]; পুত্রের প্রতি পিতার মত সোমদেব অঙ্কুরূপ হউন [‘পিতেব স্ননবে বি বো মদে মৃড’—ঋ. ১০. ২৫. ৩]।

উপমা প্রয়োগে এই বিপরীত রীতির মধ্যে ঋষিদের বস্তু দৃষ্টির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঋষি-দৃষ্টি যেমন অবোধে বিচরণ করিয়াছে প্রকৃতি-জগতে, তেমনই বিচরণ করিয়াছে প্রাকৃত জগতে। প্রকৃত জগতের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ বৈদিক উপমা। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জায়া, পতির সম্পর্ক তো বটেই, পার্থিব জগতের অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জীবন-দৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম ঘটনাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বক্তব্যকে স্পষ্ট ও দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়েই আর্ষ উপমার অবতারণা, কিন্তু ইহারই মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রস্ফুট হইয়াছে বস্তু-দর্শনের সৌন্দর্য। দিগ্‌দর্শন স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :

১. অপ ত্যো তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্তি অজুভিঃ ঋ. ১. ৫০. ২.
—স্বর্ষশ্রির সম্মুখে নক্ষত্রগুলি চোরের মত পলায়ন করে।

২. উত স্ম এবং বঙ্গমধিং ন তায়ুম্
অনুক্রোশন্তি ক্ষিত্যো ভরেয়ু।--ঋ. ৪. ৩৮ ৫.
—বঙ্গাপহারী তন্ত্রকে দেখিয়া লোকে যেমন চিৎকার করে, তেমনই
(দধিক্রাকে) দেখিয়া লোকে চিৎকার করে।

৩. পব্যেব রাজন্ অঘশংসমজর
নীচা নি বৃশ্চা বনিং ন তেজসা। ঋ. ৬. ৮. ৫.
—(হে অগ্নি) দুহৃতকারীকে বিদ্যুতাহত বৃক্ষের ছায়া পাতিত কর।

৪. ধন্বনিব প্রপা অসি অগ্নে—ঋ. ১০. ৪. ১.
—হে অগ্নি তুমি মরুভূমির জলের ছায়া।

৫. ব্রহ্মগম্পতি এতাসং কর্মার ইবাধমং—ঋ. ১০. ৭২. ১.
—ব্রহ্মগম্পতি ইহাদিগকে কর্মকারের ছায়া গড়িয়াছেন।

৬. স্তোমমগ্নৌ দিবাব কল্পং—শু. য. ১৫. ২৫.
—আকাশে আদিত্যের ছায়া অগ্নিতে অপিত (স্বরাদিবিশিষ্ট) স্ততি।

৭. মাতেব পুত্রং বিভূতাম্পদে—শু. য. ২২. ৪১.
—মাতা যেমন পুত্রকে উৎসঙ্গে ধারণ করেন (তেমনই ধনু শরকে কোলে নেয়)

৮. অতি ত্বা শূ নোহুমঃ অদৃশ্বা ইব ধেনবঃ—শু. য. ২৭. ৩৫.
—হে শূ (ইন্দ্র), অদৃশ্বা গাভী যেমন বৎসর নিকট নমিত হয়, তেমনই
তোমার নিকট নমিত হইতেছি।

৯. অহিরিব ভোগৈঃ পর্যতে বাহুং—শু. য. ২২. ৫১.
—সাপ যেমন ফণা ঘুরায় (শঙ্গধারী তেমনই) বাহু নাচায়

১০. ইহ ইমৌ ইন্দ্র সংযুদ চক্রবাকো দম্পতী—অ. ১৪. ২. ৬৪.
—হে ইন্দ্র, এই দম্পতীকে চক্রবাকের ছায়া প্রেরিত কর।

উপমা কেথাও কোতুক-দীপ্ত, কোথাও গম্ভীর। স্ততি ভিক্ষুণীর মত অন্ন ভিক্ষা করে [ঋ. ৪. ৪১. ৫], সংবৎসর শয়ান থাকিয়া বৃষ্টি পাইয়া ভেকগুলি ব্রাহ্মণের মত বেদ পাঠ করিতে থাকে [ঋ. ৭. ১০০], সায়ংকালে মনে হয়, অরণ্য চিৎকার করিতেছে [ঋ. ১০. ১৪৬] প্রভৃতি উপমায় লঘুচপল কোতুক ; আবার কোথাও উপমায় মহালাগরের বিপুল গাম্ভীর্য। যেমন ঋষি বসিষ্ঠের এই স্নগম্ভীর-মালা উপমা :

স্বর্ষস্তেব বক্ষধো জ্যোতিরেবাং সমুদ্রস্তেব মহিমা গভীরঃ

বাতস্তেব প্রজ্ববো নান্তেন স্তোমো বসিষ্ঠা অশ্বতবে বঃ ॥ [ঋ. ৭. ৩৩.৮]

—হে বাসিষ্ঠগণ, তোমাদের স্তব স্বর্ষের জ্যোতির ত্রায় ; তাহার মহিমা সমুদ্রের ত্রায় গভীর এবং বায়ু-বেগের ত্রায় অশ্বের দূরধিগম্য ।

বেদের সূক্তি

বৈদিক সূক্তির এক নাম ‘সূক্ত’ (= সু + উক্ত) ; বেদ সু-উক্তির সমষ্টি । কিন্তু যে প্রচলিত অর্থে ‘সূক্তি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, বেদের সকল উক্তিই সেরূপ নয় । সুভাষিতাবলীরও প্রকার-ভেদ আছে । কোন কোন সুভাষিত কালের কপোলে অক্ষয় তিলক ; মানুষ প্রবাদে-প্রবচনে শেগুলি ধরিয়া রাখে । শেগুলি চিরন্তন সত্যের প্রতীক । পূর্ণ প্রজ্ঞা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব সত্যের বাহন এই সকল সূক্তির সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য—মূল্য সত্য বিশ্লেষণের দিক হইতে, জ্ঞানের গভীরতা ও বুদ্ধির উজ্জ্বলতার দিক হইতে । নিম্নে কয়েকটি বৈদিক সূক্তির দ্বিত্ব প্রদর্শিত হইল :

১. তরগি ইং জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি

ন দেবাসঃ কবত্ববে । [ঋ. ৭. ৩২. ২]

—স্বরিত্ত্বকর্ম্য ব্যক্তিই জয়লাভ করে, বাসস্থান পায় ও পুষ্ট হয় । কুৎসিতকর্ম্য ব্যক্তির দেবতা (দীপ্তি) নাই ।

২. ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুমন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি [ঋ. ৮. ২. ১৮]

—ক্রিয়াবানকেই দেবতা কামনা করেন । স্বপ্নালুকে নয় ।

৩. অক্ষেত্রবিং ক্ষেত্রবিদং হি অপ্ৰাট্

স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদা অহুশিষ্টঃ

এতদ্বৈ ভদ্রমহুশাসনস্তোত

ক্ষতিং বিন্দতি অঞ্জসীনাম্ ॥ [ঋ. ১০. ৩২. ৭]

—অক্ষেত্রবিদ ক্ষেত্রবিদকে জানিয়া ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয় ; অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ দ্বারা গন্তব্য পথ লাভ করা যায় ।

৪. ন দেবানামতি ব্রত শতাত্মা চ ন জীবতি [ঋ. ১০. ৩৩. ২]

—শতাত্ম থাকিলেও দেবগণকে অতিক্রম করিয়া কেহ চিরকাল বাঁচে না ।

৫. (ক) যুবানং সন্তং পলিতং জগার ।

(খ) অশ্ব মমার স হুঃ সমানঃ । [ঋ. ১০. ৫৫. ৫]

—যুবা বৃদ্ধ হয় । কাল যে জীবিত, অশ্ব সে মৃত ।

৬. (ক) ন বৈ উ দেবাঃ স্নুধমিদং বধং দদুঃ ।

—দেবগণ স্নুধায় মরিবার বিধান দেন নাই ।

(খ) ন স সথা যো ন দদাতি সখে ।

—যে বন্ধুকে দান করেনা, সে বন্ধু নয় ।

(গ) ও হি বর্তন্তে রথ্যা ইব চক্রা অন্তমগ্ন্যুপতিষ্ঠন্ত রায়ঃ ।

—রথচক্রের মত ধন আবর্তিত হয় ; আজ সে একজননের, কাল সে অপরের ।

(খ) সমো চিদ হস্তো ন সমং বিবিষ্টঃ

সম্যতরা চিদ সমং ন দুহাতে ।

সমশ্চিদ ন সমা বীৰ্য্যপি

জ্ঞাতি চিং সন্তো ন সমং প্রীগীতঃ ॥ [ঋ. ১০. ১১৭]

—দুই হাত সমান হইলেও সমান কাজ করে না, দুইটি গাভী এক মায়ের শিশু হইলেও সমান দুধ দেয় না, যমজ হইলেও দুইজনের একপ্রকার শক্তি হয় না, জ্ঞাতিরাও সকলে সমান দাতা হয় না ।

৭. অক্ষয়া দেবো দৈবতমশ্রুতে

অক্ষা প্রতিষ্ঠা লোকস্ত দেবী ।

[তৈ. ব্রা. ৩. ১২]

—অক্ষা দ্বারা দেবতার দেবত্ব ; অক্ষা দেবীই লোকের প্রতিষ্ঠা ।

৮. দক্ষিণা অক্ষামাগ্নোতি অক্ষয়া সত্যমাপ্যতে

[শু. ব. ১২. ৩০]

—দক্ষিণা (দান) অক্ষাকে (আন্তিক্যবুদ্ধি) লাভ করে, অক্ষা দ্বারা সত্য লাভ হয় ।

৯. ঋতং সত্যম্ অমৃতং সত্যম্

[শু. ব. ১১. ৪৭]

—বস্তু সত্য, আর সত্য অমৃত ।

১০. প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ [অ. ১১ ৬. ১৫]

—প্রাণেই সকল কিছু প্রতিষ্ঠিত ।

১১. (ক) ব্রহ্মচর্যেণ রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি

—ব্রহ্মচর্য তপ দ্বারা রাজা রাষ্ট্র রক্ষা করেন ।

(খ) ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্ ।

—ব্রহ্মচর্যদ্বারা কন্যা যুবা পতি লাভ করে ।

[অ. ১১. ৭. ১৭-১৮]

শুধু সংহিতা নয়, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদও স্বজ্ঞি-সাগর ।

বৈদিক ব্রহ্মোক্ত'

উত্তরকালে যে সকল ধাঁধা-প্রহেলিকা ও রহস্য-গভীর ছড়া লোকসাহিত্যের একাংশ জুড়িয়া আছে, তাহারও দৃষ্টান্ত মিলে বৈদিক 'ব্রহ্মোক্ত' শ্লোকগুলিতে। ব্রহ্মোক্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক সংবাদ।^১ এগুলির সাহিত্যিক মৌলিক তির্যক প্রশ্নের রহস্যময়তায় ও কূট প্রশ্নের সমাধানে। শ্লোকগুলি স্তম্ভীক বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর। যেমন,

১. প্রশ্ন : কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানম্
আরস্তগং কতমং স্বিং কথাসাং ।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা
বি ছামোর্গদ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥

—বিশ্বকর্মা যখন ছাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহার অধিষ্ঠান কি ছিল, আরস্ত-কারণ কি ছিল, ক্রিয়াই বা কি ছিল ?

উত্তর : বিশ্বতশ্চক্ষুরত বিশ্বতোমুখে
বিশ্বতোবাহুরত বিশ্বতস্পাং ।
সং বাহভ্যাং ধমতি সং পতঃদ্রৈঃ
ছাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ [ঋগ্বেদ. ১০. ৮১. ২-৩]

—সর্বত-চক্ষু, সর্বত-মুখ, সর্বত-বাহু, সর্বত পাদ সেই এক সহায় দেব ধর্মার্থ নিমিত্ত কারণ ও ভূতাদিরূপ উপাদান কারণের সংযোগে ছাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

২. প্রশ্ন : কঃ স্বিদেকাকা চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ ।
কিং স্বিদ হিমস্ত ভেষজং কিম্ আবপনং মহং ॥

—কে একাকী চলেন ? কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন ? শীতের ঔষধ কি ?
বিস্তীর্ণ বপন-স্থানই বা কি ?

উত্তর : সূর্য একাকী চরতি চক্সমা জায়তে পুনঃ ।
অগ্নি হিমস্ত ভেষজং ভূমিরাবপনং মহং ॥

—সূর্য একাকী চলেন, চক্স পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন ; শীতের ঔষধ আগুন,
আর ভূমি স্তম্ভব বপন-স্থান।

১. 'উত্তর-প্রত্যুত্তরৈঃ পরস্পরং সংবাদঃ ব্রহ্মোক্তম্' [যজু টীকা ২৩. ৪৫—উব্বট.]

প্রশ্ন : কিং স্বিং স্বর্গসমং জ্যোতিঃ কিং স্বিং সমুদ্রসমং সরঃ ।

কিং স্বিং পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ঃ কস্ত মাত্রা ন বিদ্যতে ॥

—স্বর্ষের মত জ্যোতি কাহার সমুদ্রের মত বিস্তৃত কি? পৃথিবী হইতে কে বয়সে বড়? কাহার পরিমাণ নাই?

উত্তর : ব্রহ্ম স্বর্ঘ্য সমং জ্যোতি দ্যৌ সমুদ্র সমং সরঃ ।

ইন্দ্রঃ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ান্ গোস্ত মাত্রা ন বিদ্যতে ॥

[শ্রু. ম. ২৩. ৪৫. ৪২]

—ব্রহ্ম স্বর্ষের মত জ্যোতিষ্মান, আকাশ সমুদ্রের মত বিস্তৃত, ইন্দ্র পৃথিবী হইতে বর্ষীয়ান্, পৃথিবীর পরিমাণ নাই ।

৩. প্রশ্ন : কুত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতোহগ্নিরজায়ত ।

কুত ঋগা সমভবং কুতো ধাতা অজায়ত ॥

—ইন্দ্র কোথা হইতে জন্মিলেন? সোম কোথা হইতে জন্মিলেন? অগ্নি, ঋগা ও ধাতাই বা কোথা হইতে জন্মিলেন?

উত্তর : ইন্দ্রাদিन्द्रঃ সোমাং সোমোহগ্নেরজায়ত ।

ঋগা হ জজ্ঞে তুষ্ণু ধাতু ধাতা অজায়ত ॥

—ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র, সোম হইতে সোম, অগ্নি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন ।

ঋগা হইতে ঋগা এবং ধাতা হইতে ধাতা জন্মিয়াছেন ।* [অ. ১১. ১০. ৮-৯]

৪. বৃহদারণ্যকোপনিষদেও এই ধরনের বহু ‘ব্রহ্মোক্ত’ আছে । তন্মধ্যে গার্গী-ব্রাহ্মবক্ষ্য সংবাদটি উল্লেখযোগ্য ।

১১. বৈদিক সাহিত্য ও বাংলা

বঙ্গদেশ বহুদিন বেদ-বহির্ভূত দেশ বলিয়া গণ্য ছিল । এদেশে ও এদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেদ-বিরোধী জাতি বসবাস করিত । বৈদিক সাহিত্যে [ঐ. আ. ২. ১. ১. ৫] তাহার ‘বয়ংসি’ নামে উল্লেখিত হইয়াছে । মনুসংহিতায় প্রয়াগের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলিকে আৰ্য্যবর্তের সীমার মধ্যে ধরা হয় নাই, বরং বেদাচার-ভ্রষ্ট হওয়ায় অনেকে এদেশে নিবাসিত হইয়াছেন, এরূপ উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও মহাতারতে [মহা. আদি. ১০৪] পাওয়া যায় । ঐতিহাসিকগণ অহুমান করেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশে আৰ্য্যাদিকার বিস্তৃত হইয়াছিল ।

আৰ্য্যাদিকার প্রসারিত হইলেও এদেশে বৈদিক ধর্মকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । ফলে বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বর্ণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেই

* ১. উক্তরের তাৎপৰ্য্য এই যে পূর্বকল্পের ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেই ষথাক্রমে বর্তমান-কল্পের ইন্দ্রাদি দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছে [তুঃ—‘ধাতা ষথা পূর্বব্রহ্মকল্পয়ৎ’ ঋ. ১০. ১২০]

সীমাবদ্ধ ছিল। এদেশের ব্রাহ্মণগণ উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণের সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশে আসিলেই ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন, বেদ ভুলিয়া যাইতেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব অস্বীকার্য হওয়ায় তাই বারবার কাত্তকুজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জীরের মতে রাজা আদিশূর খ্রীষ্টীয় ৭৪৬ অব্দে কাত্তকুজ হইতে পাঁচজন বেদবিদ্যার ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বলেন, গোড়াধিপ শ্রীমলবর্মার সময় [১০৭২ খ্রীঃ] যশোধর মিশ্র প্রমুখ বেদবিদ্যা-জুয়িত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন।

কুলমঞ্জীরের মত অবশ্য প্রমাণ-গ্রাহ্য নয়। গুপ্ত, বর্ম, পাল ও সেন রাজত্ববর্গের যে সকল তাম্রশাসন, শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঞ্চে যে বেদচর্চা হইত না, এ মত সমর্থিত হয় না। দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর তাম্রশাসন গুলি হইতে জানা যায়, গুপ্ত শাসনকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এদেশে ‘অগ্নিহোত্র’ ও ‘পঞ্চ মহাযজ্ঞ’ অহুষ্ঠিত হইত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে অথবা ষষ্ঠ শতকের প্রথমে উত্তর-পূর্ব বঞ্চে বর্মরাজগণ রাজত্ব করিতেন। ভাস্করবর্মার তাম্র-শাসন হইতে জানা যায়, এদেশে কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদী, সামবেদী ও বাস্বত্যা (ঋগ্বেদী) ব্রাহ্মণগণ বসবাস করিতেন। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধল গ্রামনিবাসী ভবদেব ভট্ট। তিনি বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

পালরাজাদের সময়েও এদেশে বেদচর্চা হইত। ধর্মপাল দেবের সময় বরেন্দ্র ভূমির করঞ্জগ্রামে ‘ঋতি-স্মৃতি-পুরাণপদপ্রবীণাঃ...স্ব বদন্তি বিপ্রাঃ।’^১ দেবপাল দেবের মন্ত্রী দর্ভপাণি বেদ চতুষ্টয়ে পারদর্শী ছিলেন। দর্ভপাণির পৌত্র কেদারমিশ্র চতুর্বিদ্যা পয়োনিধি পান করিয়া উদগীর্ণ করিতে পারিতেন। কেদার মিশ্রের পুত্র ভট্ট গুরব মিশ্র ছিলেন ‘বেদার্থ চিন্তা পরায়ণ’।^২

সেন রাজারাও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিজয় সেনের রাজ্ঞী বিলাস-বতীর ‘কনক তুলাপুঙ্খ দান’ ও ‘হেমাম্বদান’ যজ্ঞ ইতিহাস-বিশ্রুত। বজ্রাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বেদার্থ ও স্মৃতির ব্যাখ্যাকার বলিয়া খ্যাত। বজ্রাল সেনের অপর সভাপণ্ডিত ছিলেন ভট্ট গুণবিষ্ণু। ইনি ‘ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্যের’ রচয়িতা। লক্ষণ সেনের ধর্মাদ্যক্ষ হল্যুধ ভট্ট ‘ব্রাহ্মণসর্বস্ব’ গ্রন্থে যজুর্বেদীয় ক্রিয়া-কর্মের মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু ষোড়শ শতকের পর হইতে বাংলাদেশ বেদচর্চার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। পণ্ডিতপ্রবর দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, ‘ভক্তিরসের

১। চতুর্ভূজ-বিরচিত ‘হরি চরিত’। ২। ভট্টগুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপি।

উন্মাদনায় বা নব্য জ্ঞানের উদ্দীপনায় বা অন্য কারণে এই সময়ে বেদবিজ্ঞান হ্রাস হইয়াছিল।^১ ষাটশ হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে কেবল স্মার্ত রঘুনন্দনের ‘অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে’ এবং রামনাথ বিজ্ঞাবাচস্পতির ‘সামগ্ৰ মন্ত্র ব্যাখ্যানে’ ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী বেদ তুলিয়াছে, বেদের দোহাই দিয়া শত শত কুসংস্কারের অধীন হইয়াছে। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে পণ্ডিত ছিলেন, টোলও ছিল—কিন্তু তাহাতে প্রধানত চর্চা হইয়াছে স্মৃতি, ত্রায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের। ঊনবিংশ শতকে বাংলার পুনর্জাগরণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত বর্গের ‘Oriental Researches’ স্তম্ভিময় জাতির প্রাণে নব চেতনা সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় কদ্বকণ্ঠে আশ্রয় করিয়া দেশকে বেদ-মুখী করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফলে আধুনিক কালে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নব্যযুগ পর্যন্ত বঙ্গে বেদ-চর্চার কথা স্মরণ করিলে, একটি বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গে বেদচর্চা ক্রিয়া-ব্রাহ্মক ব্রাহ্মণ এবং কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদের যে অংশ লইয়া চর্চা করিয়াছেন, তাহা সংহিতা নয়, কর্মকাণ্ড। প্রাচীন তাত্ত্বশাসনাদিতে ‘বেদাধ্যায়ী’ ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল প্রয়োগ-বিধানের মধ্যে। হিন্দুর দশবিধ সংস্কারে অর্থাৎ পোরোহিত্য কর্মে যে মন্ত্রগুলি প্রয়োগ করা হয়, বাংলাদেশে তাহাই অর্থসহ বিচারিত হইয়াছে। ‘ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব’-প্রণেতা হলায়ুধ ইহা স্বীকার করিয়াছেন, “রাষ্ট্রীয় বারৈক্ৰেস্ত্রাধ্যয়নং বিনা কিয়দেক বেদার্থস্ত যজ্ঞৈতিকতব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে।”

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও বলেন, “In Bengal, however, the Brahmanas never memorised even one of the Vedas. They memorized only such of the Mantras as were used in their religious performances, but insisted on knowing their meaning.”^২

‘But insisted on knowing their meaning’—শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি প্রাচীন বঙ্গের বেদার্থবিদ পণ্ডিতগণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আধুনিক কালের

১। প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা—হুর্গামোহন ভট্টাচার্য [হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড]

২। ‘প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা’ প্রবন্ধের পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত।

সাধারণ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একথা খাটে না। হিন্দুর জাতকর্মে উপনয়নে, বিবাহে, পূজাহোমে ও শ্রাদ্ধাদিতে যে সকল বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, কর্মজ্ঞ পুরোহিতগণের অনেকেই তাহাদের অর্থ জানেন না, যজমানও না বুঝিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বাংলার জনসাধারণের জীবনে ও সাহিত্যে বেদের তেমন প্রভাব নাই। জনসাধারণ বেদের দোহাই দেয়, কিন্তু তাহারা বেদজ্ঞানশূন্য। যাহারা নিত্য মন্ত্যামন্ত্রে বেদ উচ্চারণ করেন, তাহারাও অনেকেই না বুঝিয়াই তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বৈদিক ভাব

বাংলা দেশের ধর্মে, সংস্কারে ও সাহিত্যে বহুযুগের বহুধারার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণে লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাবই গুরুতর। এই লৌকিক ও পৌরাণিক ধারার মাধ্যমেই বৈদিক ভাব বাংলা দেশে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

ক. দেব সন্তার একত্ব, এককত্ব ও বহুত্ব কল্পনায় বৈদিক ঋষিদের দেব-কল্পনার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙালী কবি যখন ধূয়া ধরেন, ‘ভেদ জহু ভেদ জহু যো হরি সো হর এক তহু’ [কবিকঙ্কণ], কিংবা কবি যখন বলেন, ‘যেই জন ভগবতী সেই বিবহরী’ [বিজয় গুপ্ত], কিংবা শাক্ত কবি যখন গান করেন, ‘অভেদে ভাবরে মন কালা আর কালী’—তখন দ্রষ্টা ঋষির অমর বাক্য ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’ [ঋ. ১. ১৬৪. ১৬], কিংবা ‘দেবানা’ নামধা এক এব’ [ঋ. ১০. ৮২. ৩] প্রভৃতির প্রতিধ্বনি কানে বাজে। অবশ্য দেবতা সম্পর্কে এ দেশবাসীর এই ধারণা বহুকাল পূর্বেই একটি স্থিরবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

খ. বাংলার কাব্য-সাহিত্যে শক্তি দেবীর যে রূপটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে বেদের ‘দেবীসূক্ত’, ‘রাত্রিসূক্ত’ বা ‘পৃথিবী-সূক্ত’ের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করা হয়। দেবীসূক্তের সর্বাঙ্গিক দেব-জননীর মূর্তি তন্ত্র-পুরাণের মধ্য দিয়া বাঙালীর শক্তিভাবনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। অথর্ব-বেদের ‘ইন্দ্রা য়া দেবী স্তভগা হুজান সা ন তু বর্চসা সংবিদানা’ [অ. ৬. ৩৮]—এই ধ্রুবপদাস্তক সূক্তটির প্রভাবও কম নয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, বেদের পৃথিবীসূক্তে বা জ্বা পৃথিবীর যুক্ত স্ততিতে কিংবা অরণ্যানীসূক্তে যে ‘বসুধানী’, ‘বিশন্তরা’, ‘অরুণিবলা’, সকল জীবের আশ্রয়দাত্রী কল্যাণময়ী রূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাংলার মঙ্গল চণ্ডীর কল্যাণদায়িনী রূপটি তাহারই প্রকার ভেদ।^১

১। ‘ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য’—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

গ. কেহ কেহ মনে করেন, বেদের 'বিশ্বগোপা' বৈষ্ণব সাহিত্যের গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন। ডঃ দাশগুপ্ত দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদীয় শ্রীহস্তের ভিতরেই 'বৈষ্ণবগণের বিশ্বশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর উৎপত্তি'।^১ এই শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীই নানাপ্রকার লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মিশ্রণে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে মহাভাবময়ী রাধারূপে পরিগ্রহ করিয়াছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদীয়, বাংলার দেবদেবীর সহিত বেদের এই যোগাযোগ কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ নয়। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে বাংলার মঙ্গলচণ্ডী ও রাধা এতই স্বতন্ত্র, এতই পরিবর্তিত যে বৈদিক দেবতার সহিত তাহাদের সাদৃশ্য-কল্পনা গবেষণাগারেরই বিষয় মাত্র। বাঙালী কবি বেদের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, 'বাহা লিখি বেদবিধি মতে'—কিন্তু উহা কথার কথা মাত্র। বাংলাকাব্য প্রকৃতপক্ষে লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির বাহন। বেদমূল সংস্কার এখানে ষে রূপে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাও লৌকিক বা পৌরাণিক।

ঘ. বাংলার বাউলদের 'মনের মাহুষ' যে উপনিষদের 'ষদয়মস্তরতর আত্মা'—এই সত্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ। বস্তুতঃ বাউলের অদ্বৈতব্য মনের মাহুষটির সহিত উপনিষদের ব্রহ্ম ও আত্মার মিল আছে। শুধু তাই নয়, উপনিষদের 'আত্মানাং বিদ্ধি', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাণীর সহিত বাউলিয়া ভাবেরও বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একদিন সূক্ষ্মধর্ম উপনিষদের এই ভাব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাউল গানে উপনিষদের ভাব সূক্ষ্মমতের মাধ্যমে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

শুধু মনের মাহুষের ব্যাপারে নয়, বাউল গানের সনাতন মানবধর্মের তত্ত্বটির সঙ্গেও মরমিয়া মতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, বৈদিক হস্তাবলী মরমিয়া ভাবে পূর্ণ (বাংলার বাউল)। 'পুরুষ স্তুত হইল' বাউলদের মূলমন্ত্র, 'বাউলিয়া মতের গোরখনাথী ধাঁধা' যজুর্বেদেও প্রচুর আছে, 'অথর্ববেদে বাউলিয়া মতের অজস্র ধারার মূল উৎস ও ভাণ্ডাগারের পরিচয় পাই', বাউলদের কথা 'যা আছে ভাঙে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে'—'অথর্বেরও সেই একই কথা'। কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, বেদের এই সকল মত 'আর্যেতর সব মতবাদীদের দান।

ঙ. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, বৌদ্ধ চর্চাগানে, সহজিয়া সাহিত্যে কিংবা বাউল সঙ্গীতে শুধু পাণ্ডিত্য ও আত্মগোষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে যে তির্যক সমালোচনাত্মক মনোভাব দৃষ্ট হয়, তাহার মূল রহিয়াছে উপনিষদে^২। কিন্তু আত্মগোষ্ঠানিক

১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২. Obscure Religious cults—Chap. III. Dr. S. B. Dasgupta.

ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে এই সমালোচনাত্মক মনোভাবটিও বেদের নিজস্ব নয়। যে লোকায়ত চিন্তাধারা চিরকাল বেদাদির বিরোধী—বাংলার সহজিয়া সঙ্গীতে তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে। চার্বাক দর্শন বৈদিক কর্মমুগ্ধতার প্রতি অতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ‘বেদবিধিপর’ বা ‘অবৈধী’ ভক্তি বা আচারে বেদ অপেক্ষা এই লোকায়ত ভাবের প্রভাবই গুরুতর বলিয়া মনে হয়।

৮. এই প্রসঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি মন্ত্র—মনসামঙ্গলের ‘বিষ ঝাড়ন মন্ত্র’ ধর্মমঙ্গলের ‘নিহুঁটিমন্ত্র’, চণ্ডীমঙ্গলের ‘বলীকরণ’-পদ্ধতি ও ধাঁধা-প্রহেলিকা স্বভাবতই বৈদিক সাহিত্যের কতকগুলি মন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

১. মনসামঙ্গলের ‘বিষ অপনয়ন মন্ত্র’ গুলিতে বিষকে দূরে, তাহার জন্মস্থানে পাঠাইবার ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়,

যা রে কালকুটি বিষ অশেষ পাতাল ॥

যা রে কালকুটি বিষ গুল্মা আত্ম কথা ॥

—বৈদিক মন্ত্রেও অনুরূপ ইঙ্গিত—

সূর্যে বিষমাসজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে ।

সো চিরু ন মরাতি নো বয়ং মরাম

আরে অন্ত যোজনং হরিষ্ঠা মধু স্বা মধুলা চকার ॥ [ঋ. ১. ১০১]

—সুরা ব্যবসায়ীর গৃহে চর্মপুটক নিক্ষেপ করার ছায়া এই বিষকে

সূর্যে প্রেরণ করি ; সে যেন না মরে, আমরা যেন না মরি। বিষ এখন

যোজন যোজন দূরে—মধু তোমাকে মধুময় করিয়াছে।

বেদে যে-কোন বস্তুর মূল জ্ঞানার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। ‘ষ এবং বেদ’, সেই জয়লাভ করে, অমর হয়, অভীষ্ট অর্জন করে—এই ধরনের কথায় ‘ব্রাহ্মণ’ পূর্ণ। হুনিমিত্ত দূর করার মন্ত্রেরও একই অভিপ্রায়, যেমন, নিষ্কৃতি-অপসারণের মন্ত্রে যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি—‘ষাং স্বা জনোভুমিরিতি প্রমদন্তে নিষ্কৃতিং স্বাহং পরিবেদ বিবন্তঃ’ [শু. ব. ১২. ৬৪]—চতুর্দিকে নিষ্কৃতির যে সকল জন ও ভূমি প্রিয়, আমি তাহাদিগকে জানিয়াছি। ঠিক এই সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে, বাংলা বিষ-ঝাড়নের মন্ত্রগুলিতে।

২. ঋগ্বেদে [ঋ. ৭. ৫৫] এবং অথর্ববেদে [অ. ৪. ৫] একটি নিহুঁটি মন্ত্র আছে, তাহাতে নিত্রা-মাত্রা বিস্তারের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়,

সহস্র শৃকো বৃষভো যঃ সম্ভ্রাদ্ভাচরৎ ।

ভেন সহশ্চেন বন্ধঃ নি জনান্ স্বাপয়ামসি ॥

প্রোষ্টেশয়া তল্লেশয়া নারী ধাবাহ শীবরী ।

স্থিয়ো যাঃ পুণ্যগঙ্ঘয়ন্তা সৰ্বা স্বাপয়ামসি ॥

য আশ্বে যশ্চরতি যশ্চ তিষ্ঠন্ বিপশ্চতি ।

তেষাং সংদগ্ধো অক্ষণি যথেনং হর্য্য তথা ॥ [ঋ. ৭. ১. ৩-৫]

—সহস্র-শৃঙ্গ সূর্য, যিনি সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হন, শক্রর অভিভবকারী

সেই সূর্যের দ্বারা আমরা জনগণকে নিদ্রামগ্ন করাইব ।

পালঙ্কে শয়ানা, তল্লে শয়ানা, বাহে শয়ানা নারী—যে নারী

পুণ্য গন্ধা, তাহাদিগকে নিদ্রামগ্ন করাইব ।

যে বসিয়া আছে, যে চলিতেছে, যে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে—দৃশ্যমান

হর্য্য যেমন দৃষ্টিশক্তিহীন, সেইরূপ আমরা তাহাদের চক্ষু নিম্নীলিত করাইব ।

ঠিক এই ধরনের ‘নিদ্রা-মগ্ন’ পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে । কালী-ভবানীর দোহাই থাকায় এই মন্ত্র যে তত্ত্বের মাধ্যমে আসিয়াছে, তাহা স্পষ্ট—তথাপি বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনিটি লক্ষণীয় :

ইন্দ্র যন্তিক। বাছা আমি নিদ্রে চোর ।

ময়না নগরেতে লাগাও নিদ্র ঘোর ॥

শয়নে যেজন থাকে বসে ঘেবা খায় ।

কালীর দোহাই আছে আগে ধর তায় ॥

দোকানী পসারী ঘেবা পথে ফেরী যায় ।

দোহাই ভবানীর আছে আগু পাড় তায় ॥

যুবতীর দুই চক্ষু ধর দড় করি ।

মনের আগুনে রাতি জাগে প্রহর চারি ॥ [অনাদিমঙ্গল—রামদাস]

৩. বেদে সপত্ন (শক্র)-বিনাশের মন্ত্র আছে, সপত্নী-বিনাশের মন্ত্রও আছে—বিশেষতঃ আছে স্ত্রী-বশীকরণ-মন্ত্র [অ. ৩. ২৫] । কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ব্রাহ্মণী লীলাবতীর সহায়তায় লহনার পতি-বশীকরণের মন্ত্রণা । বৈদিক মন্ত্রপদের সহিত উহায় মিল না থাকিলেও, উদ্দেশ্যের দিক হইতে সাদৃশ্য আছে । লোক সাহিত্যেও [পূর্ববঙ্গ গীতিকা] এই প্রকারের প্রচুর মন্ত্রের সমাবেশ দেখা যায় ।

ছ. প্রহেলিকা বা ধাঁধার আদি উৎস কি, তাহা আজ গবেষণার বিষয় । বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞ-প্রসঙ্গে বা তত্ত্ব-বিচার প্রসঙ্গে ‘ব্রহ্মোক্ত’ জাতীয় প্রহেলিকার অবতারণা করা হইত । প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও প্রচুর ধাঁধা আছে : চর্যাপ্তিকার ‘হুলি ছহি পিটা ধরণ ন জাই । ঋতের তেজলি কুন্তীরে খাঅ ॥ [চর্যাপ্তি নং ২] ;

গোর্থনাথের প্রহেলী—‘পুকুরেতে জল নাই পাড় কেনে বুড়ে। বাসাঘরে ডিঘ নাই ছাও কেনে উড়ে।’ কিংবা কবিকঙ্কণের :

বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা।

না চলে সারথি তার পসারিয়া গা ॥

হিঁয়ালী প্রবঞ্চে হে পণ্ডিত দেহ মতি।

অস্তরিক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথী ॥^১

এই সকল প্রহেলিকা অবশ্য লোক-জগতের মাধ্যমেই প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। প্রহেলিকাকে আমরা লৌকিক সাহিত্যের সামগ্রী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-উপনিষদের একটি উক্তি অবশ্যই স্মরণীয় : ‘পরোক্ষেন পরোক্ষপ্রিয়া হি দেবাঃ প্রত্যক্ষধিষঃ’—দেবতাগণ পরোক্ষ-প্রিয়, প্রত্যক্ষ ঠাহাদের প্রিয় নয়। সাহিত্যের প্রহেলিকা কি সেই পরোক্ষ-প্রিয়তার ফল ?

বৈদিক ভাবের সহিত এই প্রকারে কতকগুলি দিক হইতে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রাচীন বাংলায় বেদের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। তন্ত্র, পুরাণ ও লোকসংস্কৃতির দ্বারা ধরিয়া কিছু কিছু বৈদিক ভাব সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার একটি কাব্য-ধারায় বেদের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তাহা ধর্মঠাকুরবিষয়ক কাব্য—বিশেষতঃ ধর্মপূজাবিধানবিষয়ক কাব্য। ‘ধর্মপূজা পদ্ধতি’, ‘শৃষ্ঠ পুরাণ’ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকৃতি অনেকটা বেদের ‘ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থের অনুরূপ। ইহাতে একদিকে আছে ‘বিধি’ আর এক দিকে ‘পুরাকাহিনী’। বাংলা গণের ভক্তি ও ব্রাহ্মণ-সদৃশ। যেমন,

‘এক ফুলে কি হইল ? সস্ব রজতম ত্রিগুণ সৃজিল।

সেই ফুলে ধর্মের পূজন করিল। থাকিল ধর্মের এক

ফুল হইল দুফুল।’

[ধর্মপূজা বিধান]

এই ধর্মঠাকুর কে, তাহা লইয়া বিতর্কের অবসর আছে। তবে প্রায় সকলেই বৈদিক কোন-না-কোন দেবতার সহিত ইহার যোগাযোগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পণ্ডিতবর বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, ধর্ম সম্প্রদায় সুপ্রাচীন ‘রোহিত’ দেবতার উপাসক ‘লৌহিত্য সম্প্রদায়’।^২ অথর্ববেদে ‘রোহিত’ একটি প্রধান দেবতা [অ. ১৩]। আচার্য সায়ণের মতে ইনি ‘উত্তম সূর্য’। ডঃ স্কুয়ার সেন বলেন, ‘ধর্ম ঠাকুরের মধ্যে যম ও বরুণ দুজনেই আত্মগোপন করে রয়েছেন... তাঁর পূজায় কূর্মদেবতা-পূজা এসে মিশেছে। কূর্মদেবতা সূর্যদেবতা এবং জলদেবতা। ধর্ম ঠাকুরও অনেকটা তাই।’^৩

১। কবিকঙ্কণের এই হেয়ালিটির উত্তর ‘মন’।

২। রামদাস আদকের অনাদি মন্ডলের ভূমিকা—ত্ৰীবসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

৩। রূপরামের ধর্মমন্ডলের ভূমিকা—ডঃ স্কুয়ার সেন।

বস্তুতঃ ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুর যে রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাতে বৈদিক ষম, বরুণ, সূর্য ও বিষ্ণুর রূপ-গুণের মিলন আছে।

ধর্মপূজা-বিধানে রুদ্র ও সূর্যেব যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার মূলেও বেদের প্রভাব বিদ্যমান। বেদে রুদ্র ওষধিপতি, ‘হস্তে বিজদ্ ভেষজা বাধাণি’ [ঋ. ১১৪. ৪]—হাতে শোভমান ববর্ণীয় ভেষজ। শূত্র পুরাণে (বাংলা শিবায়নেও) রুদ্রের এই মূর্তিটি লক্ষ্যীয়। শূত্র পুরাণের সূর্যস্ববেও বৈদিক সূর্য-সূক্তগুলির প্রভাব বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, ধর্মবিষয়ক কাব্যেব সৃষ্টি বর্ণনায়—‘নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বস চিন্’—প্রভৃতিতে ঋগ্বেদের ‘নাসদীয় সৃষ্ক’র ধ্বনি রহিয়াছে।

শূত্র পুরাণে ও ধর্মমঙ্গল কাব্যাদিতে হরিচন্দ্র-লুইচন্দ্র কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই কাহিনী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্র-রোহিত কাহিনীরই প্রকারভেদ [ঐ. ব্রা. ৩৩]। বরুণ-বাগের অঙ্গীকার করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র রোহিত নামে পুত্র লাভ করিয়াছিল এবং পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন : ধর্মমঙ্গলেও হরিশ্চন্দ্র ধর্মের ‘মাননা উপদেশ’—‘পুত্র হলে লুইচন্দ্র নাম তার ধুবে। প্রথমত ধর্মের সেবায় বলি দিবে ॥’—স্বীকার করিয়া পুত্র লাভ করিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে পৌবাণিক দাতাকর্ণের কাহিনীর সংযোগ ঘটয়াছে।

ধর্মপূজা-বিধানে বৈদিক ‘ব্রহ্মোত্তে’র প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। বৈদিক ষজ্ঞে যেমন হোতা-অধ্যবু-উদগাতা-ষজ্ঞমানের উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক সংবাদ পরিবেশন করা হইত, ধর্মপূজা-বিধানের সেইপ্রকার প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন। যেমন,

প্রশ্ন। বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ।

কন্ যুতি ধ্যান কর কন্ দেবে পূজ ॥

কন্ মুখে পূজা কর কন্ বেদ পড়।

শিঙ্গগতি কহিলাম চতুরালি ছাড় ॥

উত্তর বাড়ি মোর বন্ধুকার। পূজি শ্রী নৈরাকার।

সুস্ত্র যুতি ধ্যান করি। সাকার যুতি ভজি ॥

পূর্বমুখে পূজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি।

শিঙ্গগতি কহিলাম চতুরালি ছাড়ি ॥০০০

প্রশ্ন। যে নাঞ্চি দেহারি নাঞ্চি চালে নাঞ্চি খড়।

যজিয়ার ধর্ম নাঞ্চি কাখে করিবে গড় ॥

যে নাঞ্চি দেহারি আছে চালে আছে খড়।

যে নাঞ্চি দেহারি করিবে গড় ॥ [ধর্মপূজা বিধান]

মোটের উপর ধর্মমঙ্গলাদি কাব্য নানাদিক হইতে বৈদিক সংস্কারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ইহার কারণ, ধর্মপুজার আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিত ছিলেন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। তিনি দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নহেন, গায়ত্রী-পতিত ব্রাত্য। কিন্তু আখৰ্ণ ব্রাত্যের মতই তাঁহার অপরিণীত প্রভাব।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বেদ

বৈদিক সাহিত্য এদেশে স্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে নব্যযুগে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সৃষ্টিময় জাতির মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চাব করিয়াছে। আত্মমর্ধাদাবোধে প্রবুদ্ধ বাঙালী সেদিন স্বদেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নতন আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। সমাচার দর্পণে প্রকাশিত খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের বথাবোগ্য মূল্য বিচার করিতে গিয়া যুগন্ধর রাজা রামমোহন বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বকে নতন করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। তিনি 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্তসার' রচনা করিলেন, বাজসনেয় সংহিতা, তলবকার সংহিতা, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। বৈদিক কর্ম অপেক্ষা গুরুত্ব দিলেন জ্ঞানের উপর। রামমোহনের এই প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় ইতিমধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রাচ্যবিজ্ঞা লইয়া আলোচনা শুরু করিলেন। ইহাও জাতির অন্তরে নব প্রেরণা সঞ্চার করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেন। ঋগ্বেদের অনুবাদে ইনিই প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন; এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। মহর্ষির প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম সূদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। বেদ-উপনিষদ মনন করাইয়া সে যুগের ব্রহ্ম-প্রতিপাদক যন্ত্র ও ধর্ম-নীতির সার সংগ্রহ করাইয়া দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম'-রত্ন সঙ্কলন করাইলেন। এই বৈদিক যন্ত্র কেবল ব্রাহ্মসমাজকে পুষ্ট করে নাই, বাংলা সাহিত্যকে নানাদিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়াছে। চিন্তায় ও কর্মে, অতীত ধারার আবিষ্কারে বঙ্গীয় শিক্ষিক সমাজে তখন বেদ-চর্চার এক অভিনব প্রেরণা। রামকৃষ্ণলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বেদের আলোচনা প্রকাশ করেন; সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক 'ব্রহ্মধর্ম' রচনা করেন। রামদাস লেন 'ঐতিহাসিক ব্রহ্ম' ও 'ভারত ব্রহ্ম' এবং ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের মহিমা-সংগ্রহ বেদ, যোগ-সংহিতা, হিন্দুধর্ম ও বঙ্গীয় সাহিত্যের আলোচনা করেন। রামকৃষ্ণলাল মিত্র 'ব্রহ্মধর্ম' রচনা করেন। 'ব্রহ্মধর্ম' ও 'ভারত ব্রহ্ম' পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত। 'ব্রহ্মধর্ম' ও 'ভারত ব্রহ্ম' পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত। 'ব্রহ্মধর্ম' ও 'ভারত ব্রহ্ম' পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত।

সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি সমগ্র ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়াও ‘হিন্দুশাস্ত্র’ নামে দুইখণ্ড পুঁথিতে তিনি ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র ও কল্পসূত্র প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্রের নিকট বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ। রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের অনুবাদ বাঙালীর বেদ-চক্ষু। দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের ঋগ্বেদ সংহিতা ও তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। মহেশচন্দ্র পাল, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও দ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা বাঙালীকে নতুন করিয়া বেদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। এইরূপে নব্যবাংলা একটি অবিচ্ছিন্ন সনাতন ধারার সহিত যুক্ত হয়।

অতীতের সহিত পরিচিত হওয়া এবং অতীত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া অতীতকে মর্মে গ্রহণ করা ঠিক এক কথা নয়। অতীত-অবগাহনের ফলে মনের আনন্দ ও স্মৃতি সম্পাদিত হয়, অতীত-গৌরববোধে হৃদয় উদ্দীপিত হয়—কিন্তু অতীতকে যতক্ষণ অন্তরে গ্রহণ করিতে না পারি, ততক্ষণ স্বাভাব্য উন্নতি হয় না। জীবনেরও উন্নয়ন সম্ভব হয় না। বৈদিক সংস্কারকে মর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ও কৃত্ত্ব তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের। হৃদয়ের ক্ষেত্রে বেদ-বীজ বপন করিয়া তাঁহারা ই বেদ-পুষ্প-কাননের কুসুম-সৌরভ ও ফলিনা বৃক্ষের ঐশ্বর্য বঙ্গবাসীকে বিতরণ করিয়াছেন। ঠাকুর বাড়ীর দান এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। রাজা রামমোহন বেদের ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ তাহাতে বীজ বপন করিয়াছেন, আর সেই ক্ষেত্রে পুষ্পবতী ও ফলিনী হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতি। নব্যবেদে ববীন্দ্রনাথ বেদপাদপ-কাননের কুসুম-সৌরভ। তিনি কোন বিশেষ সংহিতা বা উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বেদোপনিষদের রসদৃষ্টি তাঁহার রচনায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিচিত্র ভাব-রস সৃষ্টি করিয়াছে।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও বেদোপনিষৎ ॥

রবীন্দ্র-মানস গঠনে যে কয়টি উপাদান বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেদোপনিষৎ একটি। তিনি আবাল্য উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট ও পরিবর্তিত। মহর্ষির সাহচর্য, গায়ত্রী-দীক্ষা, ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশ, ব্রাহ্মধর্মমন্ত্রের নিয়মিত অনুশীলন ও ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার সহস্রতন্ত্রী হৃদয়-বীণার তারে একটি মহনীয় ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই ঝঙ্কারের প্রকাশ দেখি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সঙ্গীতে প্রবন্ধে—কবির আদর্শ ভারতের কল্লনায়, কর্মপ্রেরণায়, শান্তিনিকেতন আশ্রম গঠনে, শিক্ষার ব্যবস্থাপনায়, জীবন-দর্শনে, অধ্যাত্মচিন্তায়, প্রকৃতিদৃষ্টিতে, পৃথিবীপ্রেমে

ও বিশ্বাত্মাত্মত্বভিত্তি। উপনিষদের ভাব ভাষার প্রতিধ্বনিই রবীন্দ্র-সাহিত্যে বেশি এবং স্বভাবতই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের রসপুষ্ট। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথে কম নয়। অবশ্য সাহিত্য-স্বরভীর স্বীর-নির্ধাস উপনিষৎ : উপনিষৎ বেদ-জ্যোতি, উপনিষৎ সমগ্র শ্রুতির প্রতিনিধি। উপনিষদ্-দৃষ্টি মন্থন করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-স্বত্রে রবীন্দ্র-রচনায় উপনিষদ্-বাণীর অনুরণন বেশি উঠিয়াছে। কিন্তু ঋক্-সংহিতা ও অথর্ব সংহিতার সহিত তাঁহার যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ঋক্-মন্ত্র ও আত্মবর্ণ মন্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপনে।^১ ঋগ্বেদের ‘দেবীসূক্ত’, ‘হিরণ্যগর্ভসূক্ত’, ‘মধুশ্লোক’, উষা ‘সূক্তাবলী’, অথর্ববেদের ‘পুরুষসূক্ত’, [অ. ১০. ২], ও ‘পৃথিবীসূক্ত’ [অ. ২১. ১] প্রভৃতি রবীন্দ্র রচনায় বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেও বড় কথা, রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-দৃষ্টি ও পৃথিবীপ্রেমে প্রথমতঃ অজ্ঞাতসারে, পরে জ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সাহিত্যের ঋষি-কবির প্রকৃতি-প্রেম ও মর্ত্য-মমতা।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতির আদি কবি বৈদিক সূক্তের দ্রষ্টা ঋষিগণ। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য, বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণ-লীলা, দেবভূমিকায় প্রকৃতি-জীবনে মানবীয় ভাবের বিচিত্র প্রকাশ তাঁহাদের নয়নেই প্রথম মোহাজন মাথাইয়া দিয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ রিক্তস্বত্রে শৈশব হইতেই সেই প্রকৃতি-দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। উদয়স্বর্গের সৌন্দর্য, মেঘের খেলা, বর্ষার আবির্ভাব, ঝটিকার তাণ্ডব শিশু কবির মনে অজ্ঞাতসারে সেই বহু যুগাতিত বৈদিক ঋষির বিশ্বয় ও জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেছেন,

When I look upon those days, it seems to me that
unconsciously I followed the path of my Vedic ancestors,
and was inspired by the tropical sky with its suggestion
of an uttermost Beyond. [The Religion of Man-chp. VI]

তখন বোধের সহিত বুদ্ধির যোগ অস্পষ্ট। তখন শুধুই বিশ্বয়, শুধুই জিজ্ঞাসা। কিন্তু এই অস্পষ্ট বোধ একদিন স্পষ্ট বুদ্ধির আলোকে ধরা দিয়াছিল। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত ঋষি কবির অন্তরাত্মার যে যোগাযোগ, সেই একই যোগকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, ‘আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নি-বায়ু-সূর্য চন্দ্র-মেঘবিদ্যাতকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্যদিয়া সজীব ভক্তি ও বিশ্বয় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের

১. দ্রষ্টব্য ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’, ‘আত্মপরিচয়’, ‘বাহুবল্লভ’ প্রভৃতি

অন্তর-বীণায় নব নব শব্দ-সংগীত কংকত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে’ [আত্মপরিচয়]

উত্তরকালে তাই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লীলা তিনি সচেতন ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; শাস্ত্র প্রকৃতি তাহার মনে অনন্তের গূঢ় ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুপর্ধ্যায়ের গানগুলিতে ও ঋতু বিষয়ক নাটকগুলিতে এই প্রবৃদ্ধ উপলব্ধির স্পষ্ট চিহ্ন আছে।

রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীপ্রেমের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পৃথিবী বিশ্বপ্রকৃতির একটি বিশেষরূপ, অথবা বলা যায়, ধরিত্রী-মাতা বিশ্বপ্রকৃতির সন্ততি। বৈদিক সাহিত্যায় ভাবা-পৃথিবী সৃষ্টির আদি জনক-জননী [‘ভাবা পৃথিবী জনিত্রী’ ‘দৌম্পিতা পৃথিবীমাতা’]। মাতা পৃথিবী অনন্ত স্নেহের আধার ; সন্তানের জন্ম তিনি ‘বহলা’ ‘গভীরা’ ‘ঘৃতবতী’ ‘পয়স্বতী’। স্নেহে প্রেমে তিনি ‘বিশস্তরা’। ঋষি কবির এই লকল বিশেষণ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথেও অজ্ঞাতসারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে : তাহার দৃষ্টিতেও ‘পৃথিবী জীবধাত্রী জননী’। গোপন অন্তঃপুরে নীরবে এই পৃথিবী ‘ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধাত্তরূপে’ [অহল্যার প্রতি] ; ‘বহলা’ পৃথিবীর রূপ দেখি ‘বহুঙ্করা’ কবিতায়—পৃথিবী সেখানে মরুময়ী, শৈলাবৃত্তা, মেরুদেশে কুমারী-ব্রত-ধারিণী, অটবীতে মহাভয়ঙ্করী। পৃথিবীর বহু বিচিত্র মাতৃমূর্তি চিত্রিত হইয়াছে অথর্ববেদের ভূমিস্বস্ত্রে। উত্তরকালে এই স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনে স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবি যখন বলেন, ‘আমি পৃথিবীর কবি’—তখন তাহা আত্মবর্ণন ঋষির ‘মাতা ভূমিঃ পুত্রোহং পৃথিব্যাঃ’র অবিকল প্রতিধ্বনির মত শুনায় ; আর ‘পৃথিবী’ কবিতার [পত্রপুট] ‘অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী’, ‘মেঘলোকে উধাও পৃথিবী’ পংক্তিগুলি যেন ভূমিস্বস্ত্রেরই প্রতিলিপি। মধুম্রোকের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে ‘আরোগ্য’ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় : ‘এ দ্যালোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।’

শুধু পৃথিবীর রূপগুণের আকর্ষণ নয়, রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী-প্রেমের বীজটিও যে বৈদিক সাহিত্যায়, রবীন্দ্রনাথই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন :

‘একদিন আমি বলেছিলুম :

মরিতে চাহিনা আমি স্বপ্নের ভুবনে।

ঋগ্বেদের কবি বলেছেন :

অস্বনীতে পুনরস্মাস্ত চক্ষুঃ

পুনঃ প্রাপমিহ নো ধেহি ভোগম্।

জ্যোক্ত পশ্চেম স্বর্ঘ্যমুচ্চরন্তম্

অল্পমতে বৃড়য়া নঃ ঋত্তি ॥

প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিও প্রাণ, দিয়ো ভোগ,
উচ্চরস্তু হৃদকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।’ [আত্মপরিচয়]

এই স্তম্ভের প্লোকটি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের অঙ্গগত ৫২ নং স্তব্ধের ষষ্ঠ মন্ত্র। পৃথিবীকে ভালবাসা, এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য গভীর আকৃতি বৈদিক সংহিতার বহু মন্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। স্বর্গ-কামনা বা মুক্তি-কামনা বৈদিক স্তব্ধে অতি অল্প, অধিকাংশ স্ততি পাথিব কামনায় পূর্ণ। অন্ন, ধন, জন, স্বস্তি, বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়-গ্রাম সহ শতায়ু ঋষির প্রার্থনীয়। উপনিষদে ঠিক এ ধরনের কামনা নাই; সেখানে আছে ‘ন হি বিস্তেন তপনীয়ো মনুষ্যঃ’ কিংবা ‘যেনাহং নাস্তুতং শ্রাম তেনাহং কিমু কুৰ্য্যাম্’। রবীন্দ্রনাথের মর্ত-প্রেমে ত্রী-কাম ঋষির আকৃতি। শৈশবের অবচেতন মনে যে কামনা অজ্ঞাতসারে ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, ‘মরিতে চাহিনা আমি স্তম্ভের ভুবনে’, জীবনের শেষযুগে পর্যন্ত সেই একই কামনা তিনি জানাইয়া গিয়াছেন বিভিন্ন বাণীভঙ্গিতে। উত্তরকালে সেই কামনা স্মৃদু হইয়াছে যেন ঋষিহুলভ ভাষায়,

১. দিনান্তের শেষ পলে

রবে মোর মোন বীণা মুঁছিয়া তোমার পদতলে। [আকাশ প্রদীপ]

২. আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী

মর্ম্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে স্তনিতো দাঁও। [রোগ শয্যায়]

৩. শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর

বলে যাব, ‘তোমার ধূলির

তিলক পরেছি ভালে।’

[আরোগ্য]

উনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ আরও ঘনিষ্ঠ, এই যোগ বৃদ্ধির নয় উপলব্ধির। কবি নিজেকে স্বীকার করিয়াছেন, ‘উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের প্লোক’ [আত্মপরিচয়]। এই আবৃত্তি তাঁহার বোধের রাজ্যে প্রথমে অজ্ঞাতসারে, পরে জ্ঞাতসারে যে দৃঢ় আসন পাতিয়াছিল, রবীন্দ্র-জীবনে তাহার প্রভাব স্নগভীর ও স্নদূর প্রসারী। গায়ত্রী-দীক্ষার সময় হইতেই সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্রের তাৎপর্য না বুঝিয়াও তিনি মনকে ধ্যানসম্মত করিয়া দিতেন : ‘মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি ‘ভূত্বঃ স্বঃ’ এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম’ [জীবন-স্মৃতি]।

সকল সঙ্গীর্ণতা, সকল কুসংস্কার ও সকল হীন বন্ধন হইতে মনের ও জীবনের এই সম্প্রসারণ সাধন করাই উপনিষদের মূল লক্ষ্য। উপনিষৎ বলেন, সকলের উপরে আছেন অদ্বিতীয় এক—‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’; যিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও নিগূঢ় প্রয়োজনে শক্তি যোগে পছন্দ বিধান করেন [য একোঃবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণানেকান্ নিহিতার্থো দধাতি—শ্বেতঃ ৪. ১]; বাহ্য হইতে নিখিল ভূত উৎপন্ন হয়, জীবিত থাকে এবং বাহ্যেতে প্রলয়ে লয় প্রাপ্ত হয় [যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যস্মিন্ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি—তৈ. উঃ. ৩. ১]; যিনি অগ্নিতে, জলে, অধিল ভুবনে ওষধিতে বনস্পতিতে অল্পপ্রসিষ্ট [যো দেবোঃয়ো ঘোহপ্স্ত যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ—শ্বেত ২. ১৭], যিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতেষু গূঢ়, ‘সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইনি ব্রহ্ম, ইনি পুরুষ, ইনি আত্মা—নিত্য, অক্ষয়, অক্ষর, ভূমা—একাধারে বৃহৎ ও অণু—‘মহতো মহীয়ান্ অণোরগীয়ান্’, তমসার পরপারে তিনিই আদিভাবর্ণ মহান্ পুরুষ, তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় নিখিল বিশ্ব [তমেব ভাস্ত মনুভাতি সর্বং তন্তু ভাসা সবমিদং বিভাতি শ্বেত ৬. ১৪; কঠ. ২. ২. ১]; তাঁহা হইতে নিঃসৃত বলিয়াই বিশ্বজগৎ প্রাণ-স্পন্দিত [যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—কঠ. ২. ৩. ২], তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য কিরণ বিকিরণ করেন [ভয়াদশ্মাগ্নি স্তপতি ভয়াস্তপতি সূর্যঃ—কঠ. ২. ৩. ৩]। এই অক্ষয় পুরুষেই ওতপ্রোত বিশ্বসৃষ্টি। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ [সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—তৈ. উ. ২. ১], তিনিই অমৃত ও অভয়। তিনি রসস্বরূপ, জীব এই রসকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয় [রসো বৈ সঃ। রসং হ্যোবাযং লঙ্কানন্দী ভবতি—তৈ. উ. ২. ৭. ১]। তিনি আনন্দস্বরূপ—‘আনন্দরূপমৃতং বদ্বিভাতি’। তিনিই প্রিয়তম—‘তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়োহিত্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অস্তরতরং যদয়মাত্মা’ [বৃঃ আ. ১. ৪. ৮]। এই যে মহৎ, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল, নিত্য, জ্ঞানঘন, আনন্দঘন, রসঘন, আত্মা বা ব্রহ্ম—ইহাকে জানাই উপনিষদের আদেশ। ‘তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব’, তাহাকে জানিলেই আনন্দে ও অভয়ে প্রতিষ্ঠা, ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন’ [তৈ. উ. ২. ৪. ১]; তাহাকে জানিলেই জিত মৃত্যুব্যাথা—‘তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা [প্রশ্ন. ৬. ৬], শুধু তাই নয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্ত অল্প কোন পথও নাই—‘তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নাত্যঃ পশ্বা বিত্বতেহ্যনায়’ [শ্বেত. ৩. ৮]

উপনিষদের এই সকল মহা আবাল্য রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতেন। অন্তরের অবচেতন স্তরে মন্ত্র-ধ্বনি আন্দোলন সৃষ্টি করিতে করিতে অবশেষে মর্মে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং পরিশেষে স্বকীয় মনন ও স্বীকরণের ফলে মন্ত্রের সত্য তাঁহাকে নব নব সত্য আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছিল। ভারতাত্মার মর্মসত্য উন্মোচনে, আদর্শ

মানবধর্মের উপস্থাপনে, অধ্যাত্ম ভাবনায়, সৃষ্টির রসাস্বাদনে ও সাহিত্যের প্রকাশতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে গ্রহণ করিয়াছেন। আর্ষবাণীর সহিত নিজের বাণীকে যুক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্বরণ রাখা প্রয়োজন, উপনিষদের রবীন্দ্রায়ন রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিত্ব, কবিধর্ম 'ও জীবন ধর্মের পথে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ নন, লোকোত্তর ব্যক্তি—সাধক নন, কবি—সন্ন্যাসী নন, জীবন-প্রেমিক। মন্ত্র উপনিষদের, ভাষ্য ও ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের—সত্য উপনিষদের, উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের—আদর্শ উপনিষদের, প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের।

চৈতালির যুগ হইতেই আরণ্যক-উপনিষদের শাস্ত্র তপোবন-শ্রী ও প্রাচীন ঋষির আত্মসমাহিত সরল অনাড়ম্বর জীবন সচেতনভাবে রবীন্দ্র-মানসে প্রভাব বিস্তার করিতে-ছিল। “নৈবেদ্য”-এর যুগে (১৩০৮) এই ভাব কবিচিত্তে স্পষ্টপ্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে পরাধীন ভারতের দুর্বল অসহায় মূর্তি, অপর দিকে মদমত্ত জিগীষু পাশ্চাত্য সভ্যতার লোভ-লোলুপ রূপ কবির হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিতে থাকে। ইহার মধ্যে ঘরের ও পরের আত্যন্তিক মিলন ও কল্যাণ সাধনে রবীন্দ্রচিন্তে ভাষার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় ‘একের মত্রে’ উদ্দীপিত, ধ্যানে রসসমাহিত প্রাচীন ভারতের আদর্শ। শাস্ত্র শিবময় অদ্বৈতকে হৃদয়ে গ্রহণ করায় যে জীবন আঘাত-সংঘাতে অচঞ্চল, অক্ষয় অক্ষর এক আত্মার দুর্গে আশ্রয় লাভ করিয়া যে জীবন অশোক, অভয় ও মৃত্যুঞ্জয়, স্বদেশের ভীকৃত্য-মানি দূর করিতে পারে সনাতন ভারতের সেই আদর্শ, মৃত্যু-যজ্ঞগায় মুক্তি বিধান করিতে পারে উপনিষদের সেই ‘তমেব বিদিত্বা’ মন্ত্র। ঋষির ত্রায় উদাত্ত স্বরে তাই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন,

তার পানে চাহি,

মৃত্যুরে লজ্জিতে পারি অন্না পথ নাহি। [নৈবেদ্য]

পরম, ‘এক’-এর স্বীকৃতির মধ্যেই ভারতাত্মার একৈক্যের বাণীটি নিহিত। ‘নে নানাস্তি কিঞ্চন’—এখানে ‘নানা’ নাই। বিভেদের মধ্যে অভেদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে এই বোধের তুল্য অন্না বোধ নাই। রবীন্দ্রনাথ উপনিষৎ হইতেই পারতবর্ষের এই চিরকালীন আদর্শটি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ধ্যান-তপোবন হইতেই এই আদর্শ উৎসারিত হইয়াছিল; ‘বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।’ ভারতের অধঃপতনে সেই একের মন্ত্রই ভারতকে রক্ষা করিবে, শুধু তাই নয়, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন যজ্ঞেও সেই মন্ত্রই কার্যকরী হইবে।

পশ্চিম ‘অপর। বিজ্ঞার উপাসনা করিতেছে, প্রাচীর লক্ষ্য ‘পরাবিজ্ঞা’। রবীন্দ্রনাথ বলেন, কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়—মিলনের নির্দেশ রহিয়াছে উপনিষদে :

‘পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন ;

বিজ্ঞাং চাবিজ্ঞাং যন্তুষেদোত্তরং সহ ।

অবিজ্ঞয়া যত্যাং তীর্ষা বিজ্ঞয়ায়তমঙ্গুতে ॥

যং কিঞ্চ জগত্যাং জগং—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই, ঈশাবাস্তমিদং সর্বং—এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা ঋষি বলেছেন। ‘এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্ত-পীড়িত, সে নির্জীব; আর মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্লান্ত, নিরানন্দ।’ [শিকার মিলন]

মানুষের স্বরূপ প্রকাশের তত্ত্বটিও উপনিষৎ হইতে পাওয়া। স্বরূপতঃ মানুষ একেরই প্রকাশ। এই তত্ত্বটি না জানায় পাশ্চাত্য দেশ অহমিকায়, আত্মদম্ভে, ঐশ্বর্যের লোভে উন্মত্ত; এই অজ্ঞানতা মানুষে মানুষে বিলিষ্টতার মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের সর্বগ্রাসী লোভ-প্রমত্ততা ও ভেদজ্ঞানের সম্মুখে উপনিষদের এই পরম ঐক্যের আদর্শকে স্থাপন করিয়াছেন : ‘প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন :

যন্ত সর্বানি ভূতানি আত্মত্তেবাহুপশ্চি

সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগপ্সতে ।

যিনি সর্বভূতকে আপনাবই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত।’ [শিকার মিলন]

উপনিষদের বাণী মন্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বীয় মননে নিজের অন্তর্ভবে এই যে ‘প্রকাশতত্ত্ব’টির সন্ধান পাইয়াছেন, ইহারই উপর তাঁহার মহাত্ম্যধর্ম, অধ্যাত্ম ভাবনা, রসোপলব্ধি ও সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

উপনিষৎ বলিতেছে, সৃষ্টির মূলে আছেন এক সর্বব্যাপী, সর্বভূতাস্তরাত্মা, সর্বাস্তর্ঘর্ষামী মহেশ্বর। তিনি অখণ্ড, পূর্ণ, ভূমা, অনন্ত। তিনি নিত্য, অক্ষয়, অক্ষয়। উপনিষৎ ইহাকেই বলিয়াছে ব্রহ্ম, আত্মা, পুরুষ বা ঈশ। বিশ্বসৃষ্টিতে তিনিই প্রকাশিত—অগ্নিতে, সূর্যে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে। তিনি আবার ‘সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।’ এক কথায় ‘ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগং’—উপনিষদমতে এই তত্ত্বের উপলব্ধিই মুক্তি—উপনিষদের আদেশ, ‘তং বেত্তাং পুরুষ বেদ যথা মা বো যত্যাঃ পরিব্যথাঃ’। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, এই প্রকাশতত্ত্বের বোঝেই মহাত্ম্যের উদ্বোধন, ভেদজ্ঞানের অপসারণ, নিখিল জগতকে আত্মার আত্মীয়-জ্ঞানে গ্রহণ ও ভূমার ভূমিতে জীবের সম্প্রসারণ সম্ভব। ইহাই, যত্যাঙ্গয় মন্ত্র। সেই ‘এক’ বিশেষ প্রকাশিত হইয়া বিশ্বকে পরিপূর্ণতায় দিকে চালিত করিতেছেন, মানুষের অন্তরে থাকিয়া মানুষকে মহত্তর আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে

চাহিতেছেন। ‘মা গৃধ’, ‘মা হিংসী’, ‘দৃমৈব স্তব্ধ’, ‘সত্যমেব জয়তি’, ‘পূর্ণমহঃ পূর্ণমিদং’ প্রভৃতি তাঁহারই ঘোষণা। মানুষের জীবন বাহিরের দিক হইতে অসঙ্গতিতে, অপূর্ণতায় ভরা। তাই নিগূঢ় পূর্ণ সত্যকে সে দেখিতে পায় না, তাঁহার ইচ্ছাকে বুঝিতে পারে না; কিন্তু তিনি যে অন্তরে থাকিয়া অন্তরকে মহৎকাজে প্রেরিত করিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের স্বার্থত্যাগে, আত্মবিসর্জনে ও লোককল্যাণকর কর্মে। নিজের জীবনে ঈশার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে পরিষ্কৃত করাই মানুষের ধর্ম :

The Isha of our Upanishad, the Super Soul, which permeates all moving things, is the God of this human universe whose mind we share in all our true knowledge, love and service and whom to reveal in ourselves through renunciation of self is the highest end of life [Religion of Man]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যিনি যে পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন সেই পরিমাণে তিনি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছেন, তিনি ততখানি মানব-ধর্মকে সার্থক করিতেছেন। ইহাই ভারতবর্ষের মর্মবাণী, মানবধর্ম সাধনারও গূঢ় সত্য। এই যে ‘ঈশা’ বা পরিপূর্ণত:—ইনিই রবীন্দ্রনাথের ভগবান। এই ভগবানের সহিত মানবের অব্যবহিত যোগকে আবিষ্কার করিয়া মহামানবের ধারায় নিজেকে নিমগ্ন করাই মানবতার সাধন, উহাই মোহ-মৃত্যুকে জয় করিবার একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সাধনায় ভগবান ও মহামানব এক হইয়া গিয়াছেন।

পূর্ণতার প্রকাশের এই যেমন একদিক, তেমনই আর একটি দিক আছে, তাহা আনন্দধন, রসধন আত্মার আনন্দযোগে প্রকাশের দিক। রবীন্দ্রনাথের রস-সাধনা ও নন্দনতত্ত্বের সহিত এই ভাবটির গভীর যোগ। উপনিষৎ বলিতেছেন, সেই যে আত্মা, যিনি ‘ভীষণ’, ঈহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, সূর্য কিরণ প্রদান করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, মৃত্যু আজ্ঞা পালন করিতেছে, তিনিই আবার রসধন—‘রসো বৈ সঃ’; তিনি আনন্দধন—‘আনন্দো ব্রহ্ম’, তিনি ‘মধু, অমৃত’। বিশ্বসৃষ্টিতে এই আনন্দ-রসময় প্রকাশিত হন আনন্দযোগে ‘রমণ’-ইচ্ছায়—‘স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স ত্রিতীয়মৈচ্ছত্’ [বৃ. আ. ১৪.৩]। দৈতের ভিতর অদৈতের যে প্রকাশ, তাহা রমের, আনন্দের। এই প্রকাশ যদি আনন্দের না হইত, তবে, ‘কো হেব্যাত্মাং কঃ প্রাপ্যাত্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ’ [তৈ. উ. ২. ৭]

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা ও রস-সাধনার সহিত উপনিষদের এই আনন্দ-ব্রহ্মের প্রকাশভঙ্গের গভীর সামঞ্জস্য দেখা যায়। উপনিষদের সহিত গভীর যোগাযোগ থাকিলেও রস-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাধৈতবাদী এবং চির ‘সহজিয়া’। পৌরাণিক লীলাবাদের প্রভাবও ইহাতে বিদ্যুত হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় অহুতবের ব্যাখ্যায় কবি উপনিষদের প্রসঙ্গই বিশেষ করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। বার্ষক্যে এই প্রকাশ-তত্ত্বটি চেতনার মর্মমূলে আসিন পাতিয়াছে,

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে

ঋষির একটি বাণী দিনে দিনে চিত্তে মোর হতেছে উজ্জল

আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ। [রোগ শয্যায়-২৫]

সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গ ও নন্দনভঙ্গের ব্যাখ্যাতেও কবি উপনিষদের এই রস-প্রকাশের তত্ত্বটিকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বিশেষমানে বিশ্বরূপের প্রকাশই শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা। ‘সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—রসো বৈ সঃ। রসং হেবাযং লঙ্কানন্দী ভবতি। তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।’ [সাহিত্য—সৌন্দর্যবোধ]। আরও বলেন, ‘প্রকাশই আনন্দ। এইজন্ত উপনিষদ বলিয়াছেন : আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়’ [সাহিত্য—সৌন্দর্য ও সাহিত্য]। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, সাহিত্য-সৃষ্টি একটি ক্ষণিক উদ্ভেজনার সৃষ্টি নয়, ইহা একটি অনির্বচনীয় সত্যের প্রকাশ। এই সত্যটি ‘একে’র প্রকাশ তত্ত্ব, বিশ্বজীবনের সহিত বিশ্বব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধির তত্ত্ব। আনন্দরূপ এক যখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে স্পর্শ করেন, তখন রূপদক্ষ তাঁহাকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; সেই প্রকাশই শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইরূপে নানাদিক হইতে উপনিষদের স্তূতিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-মানস গঠনে উপনিষৎ নিঃসন্দেহে একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, একটি পুষ্পের প্রস্ফুটনে একটি মাত্র উপাদানই থাকে না : সূর্য হইতে সে আলো নেয়, বাতাস হইতে নেয় গ্রাণ, মাটি হইতে রস। রবীন্দ্র-কুসুমের বিকাশ বিভিন্ন উপাদানের সমবায়। এই উপাদানগুলি স্থূল উপাদান রূপেই গৃহীত হয় নাই, গৃহীত হইয়াছে স্বীকরণের পথে। রবীন্দ্রনাথ বহুর সমবায় এক এবং অধিতীয়।

॥ দর্শন ॥

১. ভূমিকা

মানব-চিন্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দর্শন। দর্শনের একভাগে তর্ক-বিচার, অন্যভাগে চিন্তা-শক্তি। মানুষের চিন্তাশক্তি যে কত হৃদয় প্রসারী হইতে পারে, বিচার বিশ্লেষণ যে কত জটিল ও হৃদয় আকার ধারণ করিতে পারে, আবার সংশয়-আবর্তের মুখে সন্ধানী পনের মত জ্ঞান যে কিভাবে নিঃসীম শক্তির পথ দেখাইতে পারে, দর্শন তাহার দৃষ্টান্ত। সমস্তা-জটিল দুঃখরাস্তা জীবনে দর্শন একটি বিরাম-গৃহ।

‘দৃশ্’ (দেখা বা প্রত্যক্ষ করা) ধাতু হইতে দর্শন শব্দটি নিস্পন্ন। উহা নানার্থবোধক। কেহ মনে করেন, যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা যে অবধারণ, তাহাই দর্শন; কেহ বলেন, সত্যের উপলব্ধি জাত যে অহুভব, তাহাই দর্শন। যুক্তি-তর্কেই হউক বা অহুভবেই হউক, প্রত্যক্ষ করাই দর্শন। এই দর্শন একদিকে হইতেছে চর্চাচকু বা বহিরিঙ্গিয় দিয়া, দশরদিকে হইতেছে অন্তর্চকু বা অন্তরিঙ্গিয় দিয়া। বহুদর্শন, ভূয়োদর্শন ও অন্তর্দর্শনের মূলে সত্যের যে অববোধ, তাহাই প্রকৃত দর্শন।

প্রত্যেক দর্শনের মূল ‘জিজ্ঞাসা’। কোন দর্শনে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’, কোন দর্শনে ‘ধর্ম-জিজ্ঞাসা’। জন্ম গ্রহণের পর হইতেই নব নব বস্তুর সহিত পরিচয় হয়, জাগে বিশ্বয়, জাগে জিজ্ঞাসা। সুখের ঘরে দুঃখের আগুন জলিয়া উঠে, শান্তির ঘরে অশান্তির বিভীষিকা। তখন জিজ্ঞাসা আরও জটিল আকার ধারণ করে। জিজ্ঞাসা যে মনের কুধা। বিশেষতঃ জীবনের, দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান মহাভয়াল মৃত্যু-হুংস মানুষকে একটি হুহু জিজ্ঞাসার দ্বারে পৌছাইয়া দেয়,—মৃত্যু কি? মৃত্যুর স্বরূপ কি? মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব থাকে কি না? যদি থাকে, তাহাই বা কি?—এইগুলিই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার মূল। দর্শন-শাস্ত্র এই সকল জিজ্ঞাসার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, বিশ্লেষণ ও উত্তর।

মানব-চিন্তার এই সুস্বচ্ছ বিকাশ অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত দেশে যখন জ্ঞানালোক দেখা দেয় নাই, ভারতের জ্ঞান-সূর্য তখন উত্তীর্ণ শিখরে আরুঢ়।^১ স্তর উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করিয়াছেন, গ্রীক দার্শনিকগণ

১। ‘The lofty ideals they held aloft when Europe was plunged in barbarism [A Lit. Hist. of India, Chap ix, R. W. Frazer]

ভারতীয় জ্ঞান-উৎস হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজেদের জ্ঞান-নির্ভর পূর্ণ করিয়াছেন। মনীষী Maxmuller বলেন, ভারতীয় দর্শন ইউরোপীয় দর্শন অপেক্ষা অধিক জ্ঞান-গর্ভ। ‘ভারতীয় দর্শন বুদ্ধির নির্মলতা সম্পাদনের উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের নীলাক্ষেত্র, আত্মজ্ঞানের উৎস, মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুভয় রোগের অধিতীয় মহৌষধ।’^১

২. ভারতীয় দর্শনের শ্রেণী বিভাগ

এদেশের দর্শন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : আত্মিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। বহুখ্যাত ষড়্‌দর্শন—জ্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতিঞ্জল, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা আত্মিক দর্শনের অন্তর্গত। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন। সাধারণতঃ ষাহারা ঈশ্বর ও পরলোক মানেন, তাঁহারা আত্মিক—ষাহারা তাহা মানেন না, তাঁহারা নাস্তিক। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রে আত্মিক-নাস্তিকের প্রয়োগ একটু স্বতন্ত্র। ‘ঈশ্বর অসিদ্ধ’ বলা সত্ত্বেও সাংখ্য আত্মিক ; পূর্ব-মীমাংসাতেও সাবয়ব ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই—তথাপি উহা আত্মিক। আবার জৈনগণ পরলোক মানিলেও নাস্তিক এবং বৌদ্ধগণও ‘ভবচক্র’ বা জন্মান্তর স্বীকার করা সত্ত্বেও নাস্তিক। দর্শনের রাজ্যে ষাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা নাস্তিক। চৈতন্য মহাপ্রভু ঠিকই বলিয়াছেন, ‘বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক।’

ভারতীয় হিন্দু জীবনের ভিত্তি ছয়টি আত্মিক দর্শন। এই ষড়্‌দর্শন তিন যুগে শ্রেণীবদ্ধ—জ্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতিঞ্জল এবং পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা। সাধনা ও প্রাপ্তির দিক হইতে এই শ্রেণী বিভাগ যেন ক্রমবিস্তৃত, যেন নিম্ন সোপানক্রমে উপরের দিকে যাত্রা, যেন অপরাভূমি হইতে পরাভূমিতে প্রবেশের সঙ্কেত।

৩. দর্শন-পরিচয় : আত্মিক দর্শন

(i) জ্যায় দর্শন

জ্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম বা গোতম। তাঁহার অপর নাম অক্ষপাদ ; এইজন্য জ্যায়দর্শনকে অক্ষপাদ-দর্শনও বলা হয়। জ্যায়ের আর এক নাম তর্কশাস্ত্র, কারণ, তর্ক বা বাদ-বিতণ্ডা এই দর্শনের অন্ততম ভিত্তি। ইহাকে অস্বীক্ষিকীও বলে ; অস্বীক্ষা (পুশ্যাপুশ্য আলোচনা) দ্বারা সত্য বিচারিত হয় জন্য এইরূপ নাম।

গৌতম-প্রণীত জ্যায়সূত্র পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি করিয়া আত্মিক।^২ আত্মিকগুলি আবার প্রকরণে বিভক্ত। আত্মিক দর্শন মতেরই মূল

১। শ্রীগোপালবহু ফেলোশিপ লেকচার (১ম)--মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

২। ‘অহানিবৃত্তো গ্রন্থ আত্মিকঃ’ অর্থাৎ গ্রন্থের যে অংশ একদিনের রচনা, তাহাই

প্রতিপাত ‘নিঃশেষন’ বা মুক্তি। স্বভাবের প্রথম স্বভেদেই এই উপায় নির্দেশ করিয়াছেন,—

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-লিঙ্কান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প—

বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং-তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ [১.১.১]

শ্রায়মতে উপরিউক্ত প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোলটি তত্ত্বের জ্ঞানেই মুক্তি। প্রথম অধ্যায়ে সামান্তভাবে প্রথম চোদ্দটি তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে জাতি ও নিগ্রহস্থান। নৈয়ায়িকের প্রধান অবলম্বন ‘প্রমাণ’ (অবিসম্বাদি জ্ঞান)। এইজন্তু জ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুধুই প্রমাণ-পরীক্ষা। শ্রায়মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান (সাদৃশ্য) ও শব্দ। শব্দ-প্রমাণ প্রসঙ্গে বেদের প্রামাণিকতা স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রায়মতে শব্দ অনিত্য, কিন্তু বেদ নিত্য ও যথার্থবাদী। প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্বেদ যেমন প্রমাণ, তেমনই বেদের উপদেশ যথার্থ বলিয়া বেদ প্রমাণ—‘মহাযুর্বেদবৎ প্রামাণ্যম্ আশু প্রামাণ্যং’।

দার্শনিক তত্ত্বের দিক হইতে শ্রায় দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ‘প্রমেয় পরীক্ষা’ [তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়]। এই অংশেই আত্মা, প্রপঞ্চসৃষ্টি, জীবের জন্ম, বহন ও মুক্তির বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি গৌতমের মতে ‘প্রমেয়’ (প্রকৃত জ্ঞান বা প্রমাণের বিষয়) বারটি : ১. আত্মা, ২. শরীর, ৩. ইন্দ্রিয়, ৪. অর্থ, ৫. বুদ্ধি, ৬. মন, ৭. প্রবৃত্তি, ৮. দোষ, ৯. প্রেত্যভাব, ১০. ফল, ১১. দুঃখ, ও ১২. অপবর্গ। ‘আত্মা’ নিত্য ও অবিনশ্বর; উহার আদি নাই, অন্ত নাই; উহা দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র। এই আত্মা একাধারে দ্রষ্টা ও ভোক্তা [জা. স্ব. ৩. ১. ৪]। আত্মার ভোগায়তন ‘শরীর’। শরীর-ভেদে জীবাত্মা বহু। শরীরে ভোগ সাধিত হয় ‘ইন্দ্রিয়’-দ্বারে। ইন্দ্রিয়ের ভোগ-বিষয়ের নাম ‘অর্থ’—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষিত্যপ্তেজাদি ভূত হইতে উৎপন্ন। ‘বুদ্ধি’ মানে জ্ঞান, আর ‘মন’ স্মরণ, অনুমান; সংশয় ও স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষের করণ। মনঃসংযোগেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়জ্ঞান হয়। মন অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য ‘স্পৃ’ বিশেষ। তাহার গ্রাহ্য বিষয় অসংখ্য। ‘প্রবৃত্তি’ পাপপুণ্যাঙ্গি বা ধর্ম্যধর্ম সঞ্চয়ের কারণ। প্রবৃত্তির হেতু ‘দোষ’; দোষ তিন প্রকার—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। প্রবৃত্তি ও দোষ হইতে ‘প্রেত্যভাব’ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ। দোষ ও প্রবৃত্তির আর এক পরিণাম ‘ফল’—উহা সূখ-দুঃখাদির অনুভব বিশেষ। এই ‘ফল’ ‘দুঃখময়’—সুখের অনুভবও দুঃখের। এই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের নাম ‘অপবর্গ’ অর্থাৎ মুক্তি। শ্রায়মতে—দুঃখের বিনাশেই মুক্তি। শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ ও বুদ্ধির সাহচর্যে যে সকল কর্ম অস্বষ্টিত হয়, তাহাই জীবের জন্ম-মৃত্যু-ভোগের

কারণ। লৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা চুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, চুঃখ বিনষ্ট হয় তৎক্ষণাৎ। জ্ঞানের উদ্দেশ-স্বত্বোক্ত বোলটি তত্ত্বের জ্ঞান হইলে দোষ নষ্ট হয়, দোষ নষ্ট হইলে প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়, প্রবৃত্তি ধ্বংসে জন্ম-নিরোধ, জন্ম রহিত হইলেই কল অর্থাৎ চুঃখের শেষ। ইহাই অপবর্গ।

দার্শনিক প্রসঙ্গ অপেক্ষা জ্ঞানের প্রধান আকর্ষণ তর্কের সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'The Nyaya philosophy is a system of logical realism' [Chatterjee & Datta]—উক্তিটি সত্য। জ্ঞান ভাববাদী নয়, যুক্তিবাদী। সাধ্যকে সিদ্ধ করাই জ্ঞানের প্রয়োজন। এইদিক হইতে জ্ঞানের তর্কপ্রণালী বিশ্বয়ের বিশ্বয়। অজ্ঞান-প্রমাণ বিষয়ে জ্ঞানের তর্ক-পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 'পর্বতো বহিমান্'—পর্বতে বহি আছে, ইহা একটি প্রতিজ্ঞা, ইহার প্রতিষ্ঠা এই পদ্ধতিতে :

প্রতিজ্ঞা : পর্বতো বহিমান্ (পর্বতে বহি আছে)

হেতু : কস্মাৎ - ধূমাৎ (কি হেতু? ধূমহেতু।)

দৃষ্টান্ত : যো যো ধূমান্ স স বহিমান্। যথা মহানসম্।

(যাহা যাহা ধূমান্, তাহাই বহিমান্—যথা রন্ধনশালা)

উপনয় : বারুব্যাপা ধূমবানয়ম্ (বহিব্যাপা যে ধূম, পর্বত সেই ধূমে ধূমবন্ত)

নিগমন : তস্মাৎ বহিমান্ (অতএব পর্বত বহিমান্)

জ্ঞানের সিদ্ধান্ত-স্থাপন প্রণালী সর্বত্রই এইরূপ যুক্তিপূর্ণ। জ্ঞানের কচিকচি নীরস বটে, কিন্তু যুক্তির পারস্পর্য ও সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলায় যে সৌন্দর্য আছে, তাহা উপেক্ষণীয় নয়। জ্ঞানের দৃষ্টান্তগুলিও স্মরণ ও সরস।

(ii) বৈশেষিক দর্শন

কণাদ মুনি বৈশেষিক দর্শনের স্রষ্টাকার। কণাদ নামটি তাৎপৰ্যবোধক। ঋষি নাকি কৃষকগণের শাস্ত্রাহরণের পর প্রত্যাহ ক্ষেত্র হইতে শস্যকণা সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতেন। তাই তাহার নাম 'কণভুক' কণাদ এবং দর্শনের নাম 'কণাদ দর্শন'। কণাদ নামটি অল্প অর্থেও সিদ্ধ হইতে পারে। এই দর্শনে 'কণ' অর্থাৎ 'অণু'র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে; 'কণ-বাদ' (পরমাণুবাদ)-প্রচারক অর্থে কণাদ নাম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ঋষির আসল নাম 'উলুক'—এইজ্ঞা কণাদ দর্শন 'উলুকীয় দর্শন' নামেও খ্যাত। বৈশেষিক দর্শন নামটিই বহু বিখ্যাত; এই দর্শনে 'বিশেষ' নামক একটি পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় এই নামটিই রূঢ়।

কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত : প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আঙ্কিক। কুড়িদিনে কুড়িটি আঙ্কিক রচিত হইয়াছিল। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকের প্রথম তিনটি সূত্রে দর্শনকার ‘অদ্ভুত উপক্রমণিকা’ করিয়াছেন :

১. অথাতো ধর্ম্য ব্যাখ্যান্তামঃ ।
২. যতোহ্ভ্যদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্ম্যঃ ।
৩. তদ্বচনাদ্ আশ্রয়স্ত্ প্রামাণ্যম্ ।

—ইহার পর ধর্ম্য ব্যাখ্যা করিব। যাহা হইতে অভ্যদয় (ঐহিক উন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স্ (মুক্তি) সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম্য। তৎ-বচন (সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য) বলিয়া আশ্রয় (বেদ) প্রামাণ্য।

ইহার পরেই দর্শনের মূল প্রতিপাত্ত ‘উদ্দেশ্য সূত্র’ :

ধর্ম্য বিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং

পদার্থানাং সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাদ্ নিঃশ্রেয়সম্ [বৈ. স্থ. ১. ১. ৪.]

—‘ধর্ম্যবিশেষ অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্য বা নিষ্কাম কর্মোপাজিত ধর্ম্য হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্যা ও বৈধর্ম্যরূপ অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্য কোন্ কোন্ পদার্থের সমানধর্ম্য, কোন্ ধর্ম্যই বা কোন্ কোন্ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম্য তদ্রূপে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ মুক্তি হয়’ [অহুবাদ—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার]।

‘ধর্ম্য ব্যাখ্যান্তামঃ’ বলিয়া উপক্রমণিকা করিয়া সূত্রকার কতগুলি ‘পদার্থ’ উদ্দেশ্য করায় অনেকে এই চেষ্টাকে সাগর গমনেচ্ছু ব্যক্তির হিমালয় গমনের জ্বায় উপহাসাস্পদ মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, দর্শনকারের উপক্রমণিকায় ও উদ্দেশ্যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। বৈশেষিক দর্শনের ‘পদার্থ’ বহুব্যাপক ; উহাই ‘তত্ত্ব’—কারণ উহারই ভিতর সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জীবের বন্ধন ও মুক্তির বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈশেষিক মতে এই তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি [‘তত্ত্বজ্ঞানানিঃশ্রেয়সম্’]।

জ্ঞানদর্শন মতেও পদার্থ-জ্ঞানেই মুক্তি। জ্ঞান ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্তও অনেকটা একপ্রকার। তাই নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিককে ‘সমানতত্ত্ব’ বলিয়াছেন। তবে পার্থক্যও আছে। জ্ঞানে ষোড়শ পদার্থের (তত্ত্বের) স্বীকৃতি, বৈশেষিকে ছয়, মতান্তরে সাত ; জ্ঞানের প্রমাণ চারি প্রকার (প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান ও শব্দ), বৈশেষিকের দুই (প্রত্যক্ষ ও অহুমান) ; জ্ঞানে পরমাশ্রয় প্রসঙ্গ অস্বীকৃত, বৈশেষিকে স্বীকৃত ; সর্বাপেক্ষা বড় কথা—জ্ঞানে পরমাশ্রয়তত্ত্বের উল্লেখমাত্র আছে, বৈশেষিকে পরমাশ্রয় বিস্তৃত ও বিশিষ্ট। বৈশেষিক দর্শনের অপর বৈশিষ্ট্য ‘বিশেষ’ নামক পদার্থের স্বীকৃতিতে।

কণাদ মতে পদার্থ ছয়টি^১ : দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। ইহাদের মধ্যে ‘দ্রব্য’-বিচারই প্রথম, এবং একদিক হইতে প্রধানও বটে। কারণ, বৈশেষিকের সৃষ্টি, আত্মা—পরমাণু প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব, দ্রব্য-তত্ত্বের অন্তর্গত। দ্রব্যই গুণ, কর্ম ও সমবায় কারণের আশ্রয়, দ্রব্য হইতেই পরমাণু-তত্ত্বের বিকাশ। দ্রব্য নয়টি—‘পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশঃ কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি’ [বৈ. সূ. ১. ১. ৫] : পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে ‘পঞ্চভূত’ বলা হয়; উহাদের গুণগুলি স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। কিন্তু ‘আকাশ’ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দগুণ সম্পন্ন হইলেও স্বয়ং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ু—স্থূল ও সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সাবয়ব, নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার : মহৎ পৃথিব্যাদির বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম অংশই ‘পরমাণু’; অথবা ‘মহতো বিপরীতমণু’ [বৈ. সূ. ৭. ১. ৭]। এই পরমাণু মহৎ বা স্থূলের বিপরীত বলিয়াই অবিভাজ্য, নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয়; উহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। পরমাণুকে আর ভাগ করা যায় না। উহারা সৃষ্টও হয় না, ধ্বংসও হয় না, অতএব নিত্য। এই পরমাণুই ‘রূপরস-গন্ধস্পর্শবর্তী পৃথিবী’ [বৈ. সূ. ২. ১. ১.] অর্থাৎ সাবয়ব অনিত্য সৃষ্টির মূল উপাদান।

প্রশস্তপাদাচার্যের ‘পদার্থধর্মসংগ্রহে’ বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু-সংযোগে সৃষ্টির রহস্যটি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রলয়কালে যখন মহেশ্বরের সঙ্গীর্ষা (সংহারেচ্ছা) জাগে, তখন সাবয়ব সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়, শুধু অবশিষ্ট থাকে নিত্য পদার্থগুলি—পৃথিবী পরমাণু, জলপরমাণু, বায়ুপরমাণু, তেজ-পরমাণু এবং আকাশ, দিক, কাল, মন ও ‘অদৃষ্ট’-যুক্ত আত্মা। ‘অদৃষ্ট’ হইতেছে কর্মজনিত গুণ : ধর্মে শুভাদৃষ্ট, অধর্মে দুরদৃষ্ট। অদৃষ্টই কর্মের প্রেরক, ভোগের হেতু ও সৃষ্টি কারণ। প্রলয়ের অবসানে মহেশ্বরের সিসৃক্ষা-হেতু অদৃষ্ট-যুক্ত আত্মার সংযোগে বায়ু-পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয়। পরমাণু নিজে নিরবয়ব। কিন্তু একাধিক পরমাণুর মিলনে সাবয়ব পদার্থ সৃষ্টি হয়। দুইটি অণুর সংযোগে ‘দ্বাণু’ (দুইটি অণুর সমষ্টি), তিনটি দ্ব্যণুর সংযোগে ‘ত্রসরেণু’ (তিনটি দ্ব্যণুর সমষ্টি)^২—এই প্রকারে স্থূল

১। উদ্দেশ্যস্বত্রে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ থাকায়, কেহ মনে করেন, বৈশেষিক ‘ষট্ পদার্থবাদী’। কিন্তু ‘অভাব’ নামক আর একটি পদার্থের বিশদ আলোচনা থাকায় অপর দল মনে করেন, দর্শনকার ‘সপ্তপদার্থবাদী’। নব্য ত্রায়ে সপ্তপদার্থেরই স্বীকৃতি।

২। ক্ষুদ্র ছিত্রপথে সূর্য-কিরণ প্রবেশ করিলে, তাহাতে ভাসমান যে ক্ষুদ্র ধূলিকণা দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাই ‘ত্রসরেণু’। ত্রসরেণুতেই অবয়বধারার শেষ। ইহার ছয়ভাগের একভাগকে ‘পরমাণু’ বলে। উহা অদৃশ্য।

অবয়বের উৎপত্তি। প্রথমে পবন-পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ঘ্যাকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন করে। এই বায়ু কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থান করে। তাহার পর জলীর পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হওয়ায় জল-পরমাণুর সংযোগে মহান্ জলরাশি উৎপন্ন হয়। এইরূপে পৃথিবী-পরমাণুর দ্বারা পৃথিবী ও তেজ-পরমাণুর দ্বারা মহান্ তেজ উৎপন্ন হয়। তাহার পর মহেশ্বরের ‘অভিধ্যানে’ (সঙ্কল্প মাত্র) ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা মহেশ্বর কঙ্কক নিযুক্ত হইয়া জীবের কর্মাম্বসারে সৃষ্টি-পত্তন করেন। বৈশেষিক মতে পরমাণুই সৃষ্টির মূল উপাদান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Atomic Theory-র সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

কণাদমতে ঐত্যাগাত্মা (জীবাগ্না) বহু। জীবের কর্মই অদৃষ্টের জনক। পরমাণ্বার কোন ক্রিয়া প্রদর্শিত হয় নাই। সমগ্র সৃষ্টি যেন ‘অদৃষ্ট’-বশেই যন্ত্রের মত সৃষ্ট হইতেছে, ক্রিয়া করিতেছে ও সংহত হইতেছে। [‘নোদনাদভিঘাতাং সংযুক্তঃ সংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম’—৬. ১. ১.]। জায়-বৈশেষিকে দ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইলেও ভক্তিবাদ এখানে দৃঢ়-মূল নয়। এই দর্শনে ‘দৃষ্টভোজন’ নিন্দিত। হিংসাই দৃষ্ট ভোজন—‘দৃষ্টং হিংসায়াম্’ [৬. ১. ২.]। সংখম-অহুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। অসংখম অভ্যাসের প্রতিবন্ধক—‘অমতস্ত শুচিভোজনাভ্যাসয়ো ন বিহতে’ [৫. ১. ৩.]।

নব্য জায়

জায়-বৈশেষিকের মিলিত সঙ্কম নব্য জায়। গোতমে ও কণাদে যাহার উদগম, নব্য জায়ে তাহার বিস্তার। তবে ইহা বিস্তার মাত্র নয়, জায়-বৈশেষিকের উন্নয়নও বটে। এইজন্ত নব্য জায়ের আবির্ভাবে প্রাচীন জায় ও বৈশেষিকের আদর কমিয়া গিয়াছে।

নব্য জায় সপ্ত পদার্থবাদী। বৈশেষিকে ছয় পদার্থ ও ‘অভাব’-এর আলোচনা আছে। নব্য জায়ে স্পষ্ট ভাষায় ‘ভাব’ (ইহার অন্তর্গত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়) এবং ‘অভাব’ নামক পদার্থকে স্বীকার করা হইয়াছে। আবার প্রমাণ-বিষয়ে ইহা প্রাচীন জায়ের অহুসারী; নব্য মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান ও শব্দ। নব্য জায়ের প্রধান বিশেষত্ব পদার্থের বিষয়-বিশ্লেষণ। প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে যতপ্রকার সম্ভাব্য প্রতিবাদ উত্থিত হইতে পারে, নব্য জায়ে তাহার চুলচেরা বিচার। ‘পর্বতো বহিমান্’—প্রাচীন ন্যায়ের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠায় এই জায় সত্যই বহিমান্। প্রাচীন ন্যায় বলিল, ধূম দর্শনে বহির অহুমান হয়, কারণ ধূম বহিব্যাপ্য। নব্য ন্যায় আপত্তি তুলিল, হেতু থাকিলেই অহুমান হয় না, ধূম ছাড়াও বহি থাকিতে পারে। প্রাচীন ব্যাপ্তিজ্ঞানকে তাঁহারি বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে বিচার করিলেন এবং

দেখাইলেন, যে স্বত্র ধরিয়া অল্পমান করিতে হইবে, তাহা বত বিচারিত হইয়া খাটি প্রমাণিত হইবে, তাহা তত গ্রহণযোগ্য চইবে। এই বিচার-বিতর্কই নব্য ন্যায়ের প্রাণ। তাই লক্ষণ-বাক্য নির্ণয়ে ইহার অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচারবলতা বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। নব্য ন্যায়ের পরিভাষা শক্ত, কিন্তু উহা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মতই বিষয়-নির্বিষ্ট ও সত্যসঙ্গ।

নব্যন্যায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বাংলাদেশে। পূর্বে ন্যায় ছিল মিথিলার সম্পদ। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় ‘তত্ত্বচিন্তামণি’ গ্রন্থে সর্বপ্রথম ন্যায়-সংজ্ঞার্থের পরিমার্জন করিয়া নূতন লক্ষণ-বাক্য নির্ণয়ের দ্বার উন্মোচন করেন। মিথিলার নৈয়ায়িক এই গুপ্ত লিপিয়া আনতে দিতেন না। ষোড়শ শতকে মিথিলার অস্থিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন পঞ্চদশ মিশ্র। বঙ্গের কুলতিলক রঘুনাথ শিরোমণি এই পঞ্চদশ মিশ্রের নিকট ন্যায়শিক্ষা করিতে গিয়া সমগ্র শাস্ত্র কর্তৃক করিয়া ফিরিয়া আসেন^১—

কিশোর বয়সে পঞ্চদশের পক্ষশাতন করি

বাঙালীর ছোলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি। [সত্যেন্দ্রনাথ]

রঘুনাথ হইতে বাংলাদেশে নব্য ন্যায় প্রচারিত হয়। তাঁহার ‘চিন্তামণি-দীপ্তি’ বা দীপ্তি ভারত-ব্যাপ্ত। রঘুনাথের স্রোযোগ্য শিষ্য মথুরানাথ তর্কবাগীশ। তাঁহার গ্রন্থাবলী ‘রহস্য’ নামে পরিচিত। ইহাদের পর জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। জগদীশ ‘শব্দশক্তি প্রকাশিকা’ বহুখ্যাত গ্রন্থ। গদাধর ‘নব্য ন্যায়ের বিগ্রহ’। তাঁহার ‘ভট্টাচার্য টীকা’ বহুল প্রচলিত।

নব্য ন্যায় বাংলার গৌরব। ইহা বাঙালীর সূক্ষ্ম বিচার ও আত্মর্থ ধী-শক্তির পরিচয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নব্য ন্যায়ের জটিল তর্কজাল ও পরিভাষার সংশোধন ও পরিমার্জনগুলির অসাধারণ মূল্য। নব্য ন্যায়ের বিচার এমন চুলচেরা যে, কিছুক্ষণ পাঠ করিলেই নাকি মাথা ঘুরিতে থাকে। নব্য ন্যায় তর্কেরই খেলা।

১। পঞ্চদশ মিশ্রের সহিত রঘুনাথের প্রথম পরিচয়-কাহিনীটি অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। রঘুনাথ ছিলেন কাণা; তাহাকে দেখিয়া মিশ্র প্রমত্ত করেন,

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ স্নিলোচনঃ।

অন্যো ছিলোচনাঃ সর্বে কো ভবান্ একলোচনঃ ॥

একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিকের মতই রঘুনাথ উত্তর দেন,

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ স্নিলোচনঃ।

তর্কে বিলোচনা যুগ্ম তত্রাহম একলোচনঃ ॥

রঘুনাথের বক্তব্য এই যে, মিশ্রের নিকট তিনি শিক্ষার্থী।

(iii) সাংখ্য দর্শন

সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন। ইহার প্রণেতা মহর্ষি কপিল। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে মহর্ষি কপিলের নাম অক্ষর সহিত উল্লেখিত হইয়াছে। খেতাখতর উপনিষদে দেখা যায়,—মহর্ষি কপিল প্রথম জাত, পরমাত্মা তাঁহাকে জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং প্রথম দেখিয়াছিলেন [‘ঋষিঃ প্রসূতঃ কপিলঃ যন্তুমগ্রে, জ্ঞানৈবিভক্তি জায়মানঞ্চ পশ্চেৎ’—স্বৈত ৫. ২]। রামায়ণেও বাসুদেব কপিলের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; সেখানে তিনি সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্রের বিনাশকারী এবং ‘যন্তোৎপত্তি ন বিদ্যতে’ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সাংখ্যকার কপিল ভগবানের অবতার ; ইনি মহর্ষি কদ্মের ঔরসে জননী দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জননীকে সাংখ্যযোগ উপদেশ করেন [ভাগ. ৩য় স্কন্ধ]। কপিল জ্ঞানীদিগের অন্যতম এবং সাংখ্য দর্শন জ্ঞানের সার—একথা পুরাণ-সম্মত।

মহর্ষি কপিল ‘তত্ত্বসমাস’ নামক সাংখ্যসূত্র প্রণয়ন করেন। এ সূত্র কাল-কবলিত। কথিত আছে, এই সূত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয়া কপিল ইহাকে বিস্তৃত করিয়া ‘সাংখ্য প্রবচন সূত্র’ রচনা করেন। সাংখ্যপ্রবচন স্থলভ। কিন্তু অনেকেই ইহাকে অপ্রাচীন বলিয়া মনে করেন। কপিল হইতে সাংখ্য দর্শন লাভ করেন আহরী, আহরী হইতে পঞ্চশিখ। আহরী-পঞ্চশিখের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণের ‘সাংখ্য কারিকা’ সাংখ্য দর্শনের একখানি প্রামাণিক ও অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত।

‘সাংখ্য প্রবচন সূত্র’ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত : প্রথমে হেয় ও হেয়হেতু, এবং হান ও হানোপায় নিরূপিত হইয়াছে ; দ্বিতীয়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মকার্য, তৃতীয়ে প্রকৃতির স্থূল কার্যের বর্ণনা ; চতুর্থে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কতকগুলি উপাখ্যানের সাহায্যে বিবেক-জ্ঞান সাধনের উপদেশ, পঞ্চমে পরমত খণ্ডন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই দর্শনের সার সংগ্রহ। পণ্ডিতগণ মনে করেন, প্রবচন-সূত্র হইতে ‘সাংখ্য কারিকা’ প্রাচীনতর। কারিকায় কোন অধ্যায়-বিভাগ নাই, ইহাতে সাংখ্য দর্শনের আখ্যায়িকা ও বিচারভাগও বর্জন করা হইয়াছে ; ইহা ৭২টি শ্লোকের সমষ্টি। বহু স্থলে কারিকা ও সূত্র যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতিধ্বনি।

কেহ কেহ মনে করেন, ‘সাংখ্য’ হইতে ‘সাংখ্য’ শব্দের উৎপত্তি। ‘সাংখ্যোপ সংগ্রাহং’—বেদান্তভাষ্য ১. ৪. ১১]। সাংখ্যের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে কতকগুলি সংখ্যায়। প্রথমতঃ দুই তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হইতেই জড় বিষের

সৃষ্টি। মূল সৃষ্টিতে প্রকৃতির পরিণাম ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। অতএব সমগ্র সাংখ্য দর্শন পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি। সাংখ্য দ্বারা ইহার তত্ত্ব-সাংখ্যান হওয়ায় ‘সাংখ্য’ নাম হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু অপরে মনে করেন, সাংখ্য শব্দটি ‘সম্যক জ্ঞান’ অর্থেই লিখ। দ্বিতীয় দ্বিতীয় অধ্যায়েও সাংখ্যযোগের কথা বলিতে গিয়া ভগবান ‘হিরপ্রজ্ঞা’ বা ‘ব্রাহ্মী-হিতি’র কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যের সাধন জ্ঞান, না যোগ—এ বিষয়ে বিভর্ক আছে।

তত্ত্ব-সাংখ্যার বিবৃতি ও ব্যাখ্যার মধ্যেই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব পুরুষের বন্ধনতত্ত্ব ও পুরুষার্থতত্ত্ব নিহিত। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি-তত্ত্বই বিশিষ্ট। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই ‘প্রধান’, বস্তুজগতের আদিমূল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির ক্রিয়া থাকে না। গুণবৈষম্যে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে। প্রকৃতির প্রথম বিকার ‘মহৎ’ বা বুদ্ধি; মহৎ-প্রকৃতি হইতে ‘অহঙ্কার’; অহঙ্কার-প্রকৃতি হইতে ‘মন’, ‘দর্শেন্দ্রিয়’ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ); পঞ্চতন্মাত্র-প্রকৃতি হইতে মূল পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)। মূল প্রকৃতিসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই বস্তুজগতের কারণ। সকল কারণ-কারণ প্রকৃতি। সাংখ্য প্রবচন সূত্রে [১. ৬১-৬৫] অন্তলোম-প্রতিলোম ক্রমে প্রকৃতির এই কর্মাবকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে :

সব্বরজ্জন্মসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতো

হংকারোহংকারাং পঞ্চতন্মাত্রাণ্ডায়মিন্দ্রিয়ং তন্মাৎতঃ

মূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ । [প্রবচন সূত্র. ১. ৬১]

এই যেমন কারণ হইতে কার্যের ক্রম, তেমনই কার্যপরস্পরায় কারণের অনুমান। অর্থাৎ সাংখ্যকার বলিতে চাহিতেছেন, স্বপ্ন হইতে স্থলের দিকে যাও—দেখিবে স্বপ্ন প্রকৃতি হইতেই স্থলের উৎপত্তি, আবার স্থলের কাৎক্রম দেখিয়া স্বপ্নের দিকে অগ্রসর হও, দেখিবে প্রকৃতিতেই স্থলের বিশ্রাম। অতএব প্রকৃতিই ‘মূল’, প্রকৃতিই ‘প্রধান’। পরাপ্রকৃতি অব্যক্ত। প্রকৃতির বিকার বা পরিণামগুলি ব্যক্ত।

প্রকৃতি হইতে কার্য-কারণ পরস্পরায় এই যে সৃষ্টিক্রম, ইহা সাংখ্যদর্শনের একটি বিশিষ্ট দান। সাংখ্যমতে সমগ্র সৃষ্টি কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ; একটি তত্ত্ব

১. The Samkhya system possesses a unique interest in the history of thought as embodying the earliest clear and comprehensive account of the process of cosmic evolution [Positive sciences of the ancient Hindus—B. N. Seal.]

অপরটির সহিত সম্পর্কিত। সৃষ্টিটা বিবর্ত নয়, প্রকৃতির পরিণাম। এই পরিণামে একটা বিজ্ঞান-সম্মত শৃঙ্খলা বর্তমান। ইহাতে কোন ফাঁক বা ফাঁকির স্থান নাই।

সাংখ্যমতে ‘প্রকৃতি’ সৃষ্টির মূল হইলেও, ইনি অচিৎ, অন্ধ এক জড়শক্তি। অচিৎ জড়শক্তির পক্ষে ক্রিয়া করা কি সম্ভব? প্রকৃতি অব্যাক্ত, অব্যাকৃত; তিনি ব্যক্ত বা ব্যাকৃতই বা হন কি প্রকারে? ইহার উত্তরে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পর সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব ‘পুরুষ’এর স্বীকৃতি। সাংখ্যমতে পুরুষ এক বিচিত্র পদার্থ। ইনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্ত; ইনি চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু নির্বিকার উদাসীন। পুরুষের অস্ত কোন ক্রিয়া নাই; তিনি দ্রষ্টা ও ভোক্তামাত্র। এইদিক হইতে ‘সাংখ্যের পুরুষ’ নিতান্ত অপদার্থ। প্রবাদে-প্রবচনেও অকর্মী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়, ‘উনি সাংখ্যের পুরুষ’। সৃষ্টি পুরুষের নয়, কিন্তু পুরুষের ভোগের জন্ত। তাহা হইলে ব্যাপারটা ঠাঁড়ায়, প্রকৃতির সৃষ্টি পুরুষের জন্ত। শুধু তাই নয়, পুরুষ-সাম্রিধ্যে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার ব্যত্যয় ঘটে, এবং প্রকৃতির গুণগুলি ক্রিয়াশীল হইয়া সৃষ্টি শুরু করে। পুরুষ স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রকৃতি-সাম্রিধ্যে তাঁহারও ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়। এই ভোগেচ্ছা ঠিক পুরুষের নয়, পুরুষ প্রতিবিম্বিত বুদ্ধির—যে বুদ্ধি পুরুষ-চৈতন্যের চৈতন্যে আভাসিত। চূষক সন্নিধানে লৌহে যেমন চূষক শক্তির আবির্ভাব হয়, তেমনই চেতন-পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি বা প্রকৃতিজাত বুদ্ধিতে চিৎশক্তির আভাস পড়ে [‘তৎ সন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃৎ মণ্ডিবং’—প্রবচনসূত্র ১. ২০]। অথবা যেমন রক্ত জবাকুহ্মের সন্নিধানে শুভ্র ক্ষুটিক রক্তবর্ণ দেখায়, তেমনই প্রকৃতি সন্তানের সন্নিধানে পুরুষের কর্তৃত্ব আভাসিত হয়। সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই সংযোগ প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনে এই তত্ত্বটিকে হৃন্দর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্ট করা হইয়াছে। প্রকৃতি অন্ধ জড়শক্তি, আর পুরুষ অকর্মী খঞ্জ। অন্ধ ও খঞ্জ কেহই একা একা কাজ করিতে পারে না। কিন্তু খঞ্জ যদি অন্ধের স্বাক্ষারূঢ় হইয়া অন্ধকে চালিত করে, তাহা হইলে পথ চলা সম্ভব হয়।^১ ক্রিয়াটা প্রকৃতির নিয়োগ পুরুষের। পুরুষের ভোগের জন্তই প্রকৃতির উত্তম, পুরুষের ভোগান্তে প্রকৃতির বিশ্রাম, যেমন পুরুষের তৃপ্তি বিধান করিয়া নর্তকীর নৃত্য-বিরতি।^২ প্রাকৃত সৃষ্টিতে চিদ্ব্যন পুরুষের ভূমিকা নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হৃন্দর একটি উক্ত ক'রয়াছেন, ‘চৈতন্যের রোশনাই যেটা আছে বলিয়া সবই দেখা যাইতেছে,

১। ‘পঙ্কজবহুভয়োরপি সংযোগন্তুতসর্গঃ’ [সাংখ্যকারিকা, ২. ১]

২। (i) রক্তশূদ্র দর্শয়িতা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাং।

পুরুষশূ তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥ [সাংখ্যকারিকা, ৫০]

(ii) ‘নর্তকীবৎ প্রবৃত্তশূপি নিবৃত্তিশূপিতাথ্যং’ [প্রবচন সূত্র, ৩. ৬২]

যেটা না থাকিলেই সব আধার। আর সে আলোতে যা কিছু ভাসিতেছে, প্রকাশ হইতেছে বিচিত্রভাবে, সেইটা প্রকৃতির বিরূতি পরিণাম' [হিন্দু ষড়্ দর্শন]।

সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। পুরুষের দুই অবস্থা,—মুক্ত ও বদ্ধ। স্বরূপতঃ পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত; বদ্ধ অবস্থা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। এই মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হইলেই পুরুষের স্ব-স্বরূপে অবস্থান। বস্তুতঃ প্রকৃতিবদ্ধ হইতে মুক্তিই সাংখ্যের সাধনতত্ত্ব। বিবেকজ্ঞান হইলেই প্রকৃতির বন্ধন অপসারিত হয়।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় নাই। যে সূত্রগুলিতে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হইয়াছে, সেগুলিকে 'তামস সূত্র' বলে। তাহাতে আছে :

ঈশ্বরাসিদ্ধে। মুক্তবদ্যোরত্তকরা ভাবার তৎসিদ্ধিঃ

উভয়থাপ্যাসংকারত্বম্। [প্র. সূত্র. ১. ২২-২৪]

—ঈশ্বর অসিদ্ধ। ঈশ্বরের মুক্ত বা বদ্ধ হওয়া—দুইই

অসম্ভব। মুক্ত হইলে তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না,

বদ্ধ হইলেও তিনি অসর্বজ্ঞ হইয়া পড়েন।

ঈশ্বরকে অস্বীকার করায় কপিলের সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত। তবে শাস্ত্রে যে ঈশ্বর-বাচক ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা কি? সাংখ্য বলেন, মুক্তাত্মা সিদ্ধ যোগীরাই ঈশ্বর পদবাচ্য। কথাতী ভাবিয়া দেখিবার মত। বক্ষিমচন্দ্রও এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন কৃষ্ণের মানবত্ব প্রতিষ্ঠায়। 'জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে পূর্ণ মানবই ঈশ্বর।' ইহা যেন সাংখ্যোক্তিরই প্রতিধ্বনি [প্রঃ সূঃ ১. ২৫]।

সাংখ্যে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেও, বেদ সম্পর্কে তির্যক মন্তব্যও আছে। বেদ পুরুষের নিঃস্মিত—সাংখ্য ইহা মানেন না। বেদ মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষের কৃত নয়; বেদ নিত্যও নয়। তবে বেদ প্রমাণ। বেদের প্রমাণ বেদ নিজে : 'নিজশক্ত্যভিব্যক্তঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্' [প্রঃ সূঃ ৫. ৫১]।

সাংখ্যের প্রকৃতি-প্রাধান্যে, পরিণামবাদে, পুরুষবহুত্বে এবং অনাশ্রয়ত্বে অবৈদিক অনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যও বেদান্তভাষ্যে [১. ৪] সাংখ্যের অবৈদিকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনে হয়, সাংখ্য মূলে ছিল লোক-প্রচলিত দর্শন। পরবর্তীকালে ইহা বৈদিকভাব ও বেদান্তদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। প্রচলিত সাংখ্য প্রবচনসূত্র এবং সাংখ্যকারিকারও বহুল পরিমাণে বৈদিকভাবে ভাবিত। প্রবচনসূত্রের 'আবৃত্তির-সকৃৎপদেশাৎ' সূত্রটি [৪. ৩] অবিকল বেদান্তসূত্রে [৪. ১. ১] আছে। প্রকৃতি-প্রধান সাংখ্যে প্রকৃতির ক্রিয়ায় পুরুষ-চৈতন্যের-প্রভাবটিও মূল সাংখ্যের বলিয়া মনে হয় না।

উপনিষদে, পুরাণে, মহাকাব্যে যে সাংখ্যদর্শন বিবৃত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে বিকৃত বলিয়া মনে করেন।^১

পরিবর্তন বাহাই হউক, ভারতীয় সাহিত্যে সাংখ্যমতের গুরুত্ব অবিসংবাদী। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ‘হিন্দুসমাজের রূপরম্যে ইহার নানা মূর্তি বিরাজ করিতেছে’ [বিবিধ প্রবন্ধ—সাংখ্যদর্শন]। এদেশের তন্ত্র, পুরাণ নানাদিক হইতে সাংখ্যমত দ্বারা প্রভাবান্বিত। প্রপঞ্চসৃষ্টির ব্যাপারে তন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যমতানুসারী। তন্ত্রের পরিণামবাদও সাংখ্যের। পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে সাংখ্যের প্রভাব বিস্তারিত। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বই পুরাণের শক্তিয়ুক্ত দেবকল্পনার উৎস। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মত। স্ত্রী যেমন সেবাযত্ন দ্বারা স্বামীর ভোগ সম্পাদন করেন, স্বামীর সংযোগে সন্ততি উৎপাদন করেন—সাংখ্যের প্রকৃতিও ঠিক তেমনিই পুরুষের ভোগার্থ নিয়োজিত। পুরাণের ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী, বিষ্ণু-লক্ষী, শিব-শিবানী সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিরই প্রতিমা।

(iv) যোগদর্শন

ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাধন ‘যোগ’। ইহা হাতে-কলমে শিক্ষা। সাধন-বলে মাহুষ যে অপরিমেয় অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ উপায় যোগ। সুপ্রাচীন কাল হইতেই যোগের সমাদর। কঠোপনিষদে যোগের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।^২ আখর্বণ-উপনিষদে অনেকগুলি গ্রন্থ যোগ-বিষয়ক। যে দেহ ও দেহস্থ নাড়ী, বায়ু প্রভৃতি লইয়া যোগের সাধন, যজুর্বেদে ইত্যন্ততঃ তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অখর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের ষষ্ঠ স্তোত্রে পাই ‘প্রাণ’-এর বন্দনা—‘প্রাণে সবং প্রতিষ্ঠিতম্’। শুধু তাই নয়, এই কাণ্ডের দশম স্তোত্রে জীব-দেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা—যোগশাস্ত্রের ‘ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড’ এই সত্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পুরাণের দত্তাত্রেয়, কার্তবীৰ্য্যজুন ছিলেন বিখ্যাত যোগী। যোগ নিঃসন্দেহে সাধনার একটি সুপ্রাচীন ধারা।

যোগদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি। ইহাকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সহিত অভিন্ন মনে করিয়া কেহ কেহ যোগদর্শনকে খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু কঠোপনিষদে যোগের প্রসঙ্গ আছে, বুদ্ধদেব আবার কলমের নিকট স্বয়ং যোগশিক্ষা করিয়াছেন, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে যোগের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে

১। The original Samkhya came indeed to be perverted in the Svetasvatara, the Epic, and the Bhagavat Gita and later still in the Theistic yoga and the several sectarian and Vedanta-coloured Puranas—Belvalkar & Ranade (Hist. of Indian Philosophy).

২। ‘তাং যোগমিতি মন্তস্তেহিরাশিক্ষিতধারণাম্’ [কঠ. ২. ৩. ১১]।

[‘আকাশে বস্তু ইচ্ছিয়া’-ধর্মপদ. লোক. ২]। কাজেই যোগকে অপ্রাচীনকালে টানিয়া আনিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের, বিশেষতঃ ধর্মসাহিত্যের উৎপত্তিকাল গভীর ভিমির গর্ভে নিহিত।

পাতঞ্জল যোগদর্শন বহুখ্যাত। যোগ বিষয়ে অষ্টাঙ্গ গ্রন্থের মধ্যে ‘যোগী বাজবল্য’ ‘শিবসংহিতা’, ‘অষ্টাবক্র সংহিতা’, ‘গোরক্ষসংহিতা’, ‘হঠযোগপ্রদীপিকা’, ‘পবনবিজয় করোদয়’ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। পুরাণেও নানান্থলে যোগের প্রসঙ্গ আছে।

পাতঞ্জল দর্শন চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম ‘সমাধিপাদ’। যোগ কাহাকে বলে, যোগের লক্ষ্য কি, কি প্রকারে যোগ হয়—তাহা সূত্রাকারে এই পাদে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ‘সাধন পাদ’, ইহার মূল ক্রিয়াযোগ; এই অংশেই যোগের অষ্টাঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় ‘বিভূতিপাদ’; যোগপ্রভাবে কিরূপ অলৌকিক ঐশ্বর্য, শক্তি বা বিস্মৃতি লাভ করা সম্ভব, এই পাদে তাহার বর্ণনা। চতুর্থ ‘কৈবল্য পাদ’; ইহাতে সমাধির বিভিন্ন স্তর (সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি) আলোচিত হইয়াছে।

যোগের দর্শনাংশ সাংখ্যের অনুরূপ। পার্থক্য—সাংখ্য নিরীশ্বর, যোগ দেখর (=স+ঈশ্বর)। যোগদর্শন স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছে। যোগের ঈশ্বর সূত্রগুলি এইরূপ:

১. ক্লেশকর্মবিপাকশয়ৈরপরামুষ্ঠৈঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

২. তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্।

৩. পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ

[যোগ. ১. ২৪-২৬]

—‘অবিজ্ঞাদি ক্লেশ, পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম, কর্ম ফলরূপ বিপাক, বিপাকের অনুরূপ বাসনা সকল আশয়—ইহাদের দ্বারা অপরামুষ্ঠ অর্থাৎ অসংযুক্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর।

তাহাতে অতীত, অনাগত ও বর্তমান বিষয়ে যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, সেই সর্বজ্ঞ বীজ নিরতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

তিনি কপিলাদি পূর্ব পূব গুরুগণের গুরু। কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন নহে, অর্থাৎ অনাদিকালের।’

যোগদর্শনে পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। ঈশ্বরও পুরুষ-বিশেষ। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও অনাদি; ইনিই স্বরূপ পুরুষ। আর এক প্রকারের পুরুষ আছেন, তিনি বহু। প্রত্যেক লিঙ্গশরীর বা স্থূলশরীরে বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত যে পুরুষ—তিনিই এই পুরুষ। এই পুরুষ ব্যবহারিক পুরুষ; ইনি বদ্ধ হন, মুক্ত হন। ইহাকে অধ্যাস পুরুষও বলা চলে। বহু পুরুষ সম্পর্কে এই ধারণা সাংখ্যে ও যোগে একপ্রকার। প্রকৃতিতত্ত্ব

স্মৃতিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, বন্ধন ও মুক্তিতত্ত্ব সাংখ্যে ও যোগে এক। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, *Yoga is applied Samkhya*.^১

যোগের প্রধান ভূমিকা সাধন-রাজ্যে। যোগের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে ‘শাওয়া’ নয়, ঈশ্বরবৎ ‘হওয়া’—জীবের অনন্ত সম্ভাবনাকে সম্ভব করিয়া তোলা। এই যোগ কি? —পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটিই তাহার উত্তর : ‘যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’—চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম ‘যোগ’। ইহাই ‘হওয়া’র উপায়। ‘হওয়া’ তো সহজ নয়, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা অতিশয় কঠিন। পথে বহু ‘যোগবিঘ্ন’। কাজেই যোগদর্শনে সাধনার পথে যাত্রা শুরু করা হইয়াছে একেবারে নিম্নধর্ম হইতে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত নিকল্প হইতে পারে। ঈশ্বর-প্রণিধান, ‘তজ্জপস্তদ্ব্যবধানম্’ [১. ২৭], তপস্তা স্বাধ্যায় এগুলিও চিত্তনিরোধের উত্তোগ পর্ব। যোগের আসল উদ্দেশ্য ‘ব্রহ্মঃ স্বরূপে অবস্থানম্’। সেই অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে হেয় (দুঃখ), হেয়হেতু (দুঃখের কারণ), হান (কারণ দূর হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি) এবং হানোপায় (বিবেকখ্যাতি) জানিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যোগদর্শন বলে, ‘যোগাক্’ অহুষ্ঠান দ্বারা অভ্যক্তি ক্ষয়, জ্ঞানদীপ্তির প্রকাশ এবং বিবেকখ্যাতি হর [২. ২৮]।

এই ‘যোগাক্’র অহুষ্ঠানই যোগের মুখ্য ক্রিয়া। ইহা দ্বারা আচ্ছন্ন-পুরুষের কঙ্কুকাবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়, ক্রমে জীব ঐশ্বরের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐশ্বর্য ছাড়াইয়া চৈতন্যের দীপ্তভূমি। যোগাক্ অহুষ্ঠান সাধককে সেই ভূমিতে লইয়া যায়।

যোগের আটটি অঙ্গ : ‘যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োহষ্টা-বন্ধানি’ [সাধনপাদ. ২২]। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি—যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম যোগের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ বহিরঙ্গ ক্রিয়া এবং শেষের চারিটি—প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের শেষ পর্যায় অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ক্রিয়া। প্রত্যেকটি ক্রিয়ার ফল অসাধারণ।

‘যম’ বলিতে বুঝায়, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচোর্য), ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির অহুশীলন। কথায় বলে, ‘যম অভ্যস্ত হইলে যমে পায় ভয়’। যমে মহুগ্ধের প্রতিষ্ঠা।

‘নিয়ম’ও কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধন : শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান—এইগুলিই নিয়ম। নিয়মে ক্রোশাবরণ ক্ষয় হয়।

বহিরঙ্গ যোগের শেষ দুই অঙ্গ—‘আসন’ ও ‘প্রাণায়াম’। ক্রিয়াযোগে ইহাদের অপরিণামী গুরুত্ব, এমন কি যোগ-সাধনায় এই দুইটিই কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য অঙ্গ। হিরভাবে স্বখে উপবিষ্ট হওয়াই ‘আসন’ [‘হিরস্বত্বমাসনম্’]। পরবর্তী যোগশাস্ত্রে

১। The Samkhy-yoga—Dr. Stakari Mookerji [Hist. of Philo—Eastern & Western Vol I]

নানাপ্রকার আগনের উল্লেখ দেখা যায়—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি। পতঞ্জলি সুখাসনকেই আগন বলিয়াছেন। আগন হির হইলে কান-কেশ বিনষ্ট হয়, অঙ্গ হয় অচঞ্চল, চিত্ত ধীর। আগন হির হওয়ার পর ‘প্রাণায়াম’। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-বচ্ছেদের নাম ‘প্রাণায়াম’। দেহের জীবন-প্রবাহ বায়ুরই ক্রিয়া। মনের চাকলাও বায়ুর প্রভাবে। বায়ু-স্তম্ভনে অহির মন স্থির হয়। প্রাণায়ামে অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বার খুলিয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যোগের লক্ষ্য ঈশ্বরকে লাভ করাও নয়, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার নয়, যোগের লক্ষ্য—বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত আত্মার মিথ্যা-বোধের অপসারণ ও জীবের স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা। ধর্ম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম দ্বারা তাহার ভূমিকা রচিত হয়। অন্তরঙ্গ সাধনে লক্ষ্যভেদ হয় অর্থাৎ সমাধি লাভ হয়। অন্তরঙ্গ যোগের প্রথম স্তর ‘প্রত্যাহার’। যে ইন্দ্রিয় কেবল বিষয় চিন্তা করে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হয়, প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয়ের এই বৃত্তি প্রত্যাহৃত হয়। ইন্দ্রিয় তখন শুদ্ধ চিত্তের বশীভূত হওয়ার—কর্ণ আর শব্দ গ্রহণ করে না, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে না, চক্ষু রূপে আকৃষ্ট হয় না, জিহ্বা রসের জন্ত লালারিত হয় না, ত্বক স্পর্শের জন্ত ব্যাকুল হয় না; অন্তরীন্দ্রিয় মন তখন সঙ্কল্পে-বিকলে অস্থির না হইয়া ত্যাগ-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য-জ্ঞান মণ্ডিত চিত্তের বশীভূত হয়। এই অবস্থায় বাবতীয় ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়; সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, আরাম-ব্যায়াম তখন একাকার। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের ভূমিকা।

ইহার পর ‘ধারণা’। বিজ্ঞতিপাদের প্রথমসূত্র ধারণা-বিষয়ে। ‘দেশবদ্ধ চিত্তশ্চ ধারণা’—দেহের কোন কেন্দ্রে চিত্তের বদ্ধই ‘ধারণা’। ধারণার দেশ বা কেন্দ্র লইয়া তন্ত্রের ‘যটচক্র নিরূপণ’। ধারণায় চিত্তবৃত্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া একস্থানে স্থনিবিষ্ট হয়।

ধারণার পর ‘ধ্যান’। ‘তত্র প্রত্যৈক্যতানতা ধ্যানম্’ [বিজ্ঞতি পাদ. ২], বাহাতে চিত্ত বদ্ধ হয়, তাহার চিন্তায় একতানতাই ধ্যান। ধ্যানে চিন্তাধারা তৈলধারার ন্যায় অবিক্লিষ্ট। ধ্যানের পরবর্তী অবস্থা ‘সমাধি’ঃ সমাধি ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা, অর্থাৎ ধ্যানে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার স্থিরতা বা একতানতাই সমাধি। তখন স্ব লুপ্ত, প্রকাশিত স্বরূপ। জীবের পূর্ণতার প্রকাশ সমাধিতে।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একীভূত অবস্থায় নাম ‘সংযম’। সংযমভূমিতেই বিজ্ঞতির প্রকাশ। সমাহিত সাধকের বিপুল বিজ্ঞতি। তিনি প্রজ্জালোক জয় করেন, জাতিশ্বর হন, ইচ্ছামাত্র অদৃশ্য হইতে পারেন। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশ্বর্য, বশিষ্ঠ ও কামাবশাসিতা সিদ্ধযোগী এই অষ্ট ঐশ্বর্যের অধিকারী।

কিন্তু যোগীর লক্ষ্য ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি নয়, পূর্ণের যে আদর্শ জীবের চরম প্রাপ্তি, তাহার

সদৃশ হওয়াই যোগীর উদ্দেশ্য। সমাধির মধ্যোই এই পূর্ণতা। পূর্ণতারও স্তর ভেদ আছে : সমাধির তাই দুই স্তর—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (সবিকল্প সমাধি) ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি)। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যশব্দে সমাধির এই স্তরগুলির কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পুরুষ বস্তু-চেতনার উর্ধ্বে উঠিয়া যায় বটে, কিন্তু অন্তর্জগতের সহিত তখনও যুক্ত থাকে : অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের পরিপূর্ণ নিরোধ ঘটে, তখন অন্তর্জগতও লুপ্ত হইয়া যায়। তখন চিত্তও থাকে না, চিত্তের বৃত্তিও থাকে না। তখন পুরুষ স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ কেবল পুরুষের সদৃশ। এই অবস্থাতেই পরমার্থসিদ্ধি, চূঃখের অত্যন্ত নিরুত্তি।

যোগ ব্যবহারিক সাধনা, ইহার ফল প্রত্যক্ষ। এইজন্ত ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মে যোগের স্থান আছে। কিন্তু এই যোগে স্পষ্টতঃ দুইটি ধারা লক্ষণীয়। একটি ধারার পরিচয় রহিয়াছে পাতঞ্জল দর্শনে এবং ঐহিক পরিবর্তিত আকারে পুরাণে—আর একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, লোক-প্রচলিত শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও নাথধর্মে এবং হঠযোগে। দ্বিতীয় ধারাটি লৌকিক ও প্রাচীনতর। মনে হয়, যোগ মূলতঃ ছিল লোক-জগতের সামগ্রী এবং পশুপতি ছিলেন পরম যোগী। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত পশুপতি যোগীর মূর্তি তাহার একটি প্রমাণ। যোগের অধীশ্বর যোগীশ্বর শিব—ইহা ভারতবর্ষের একটি সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পাতঞ্জল যোগদর্শনে কোথাও শিবের উল্লেখ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকায়ত ধর্মগুলিতে শিবই যোগের অধীশ্বর। দ্বিতীয়তঃ পাতঞ্জল দর্শনে ‘যোগ’ মানে চিত্তের বৃত্তিগুলির নিরোধ, কিন্তু লোকায়ত ধর্মে যোগ মানে ‘মেলন’ বা ‘মিলন’। বাচ্যার্থে যোগশব্দের এই প্রয়োগ তত্ত্বের দান। আদিম সমাজে শিব ও শক্তি ছিলেন প্রধান দেবতা। শৈব ও শাক্তধর্মও ছিল শিব-শক্তির যুগল মূর্তির মত অবিনাভাবে যুক্ত। এইজন্ত শৈবধর্মে যোগ যেমন তত্ত্ব-স্পষ্ট, শাক্ত সাধনাতেও তেমনই যোগ শৈবমত দ্বারা প্রভাবিত। শৈব যোগের আসন, প্রণায়াম, দেহতত্ত্ব, ধ্যান তত্ত্বে পরিগৃহীত, তেমনই আবার যোগ-সাধনায় বট্টচক্রের কল্পনা, শিবের সহিত শক্তির মেলন বা কুণ্ডলিনীযোগ, নরনারীর দৈহিক মিলন-প্রক্রিয়ায় পরম সামরস্ত্রের উৎপত্তি প্রভৃতি তত্ত্ব হইতে আগত। যোগ-সাধনায় শিব-শক্তির এই যুগল ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে লোকায়ত ধর্মগুলিতে। নর-নারীর মিলনে ‘কামা-সাধন’ লোকায়ত যোগের মূল কথা। সেইজন্তই তাহাদের সাধন অভিযন্ত্রণ ও রহস্ত্যাবৃত। ‘কমল-কুলিশ যোগ’ (বৌদ্ধ সহজিয়া), ‘চন্দ্র-সূর্য-মেলন’ (নাথপন্থ), ‘রস-রতি যোগ’ (বৈষ্ণব সহজিয়া) প্রভৃতি গৃহ তাৎপর্যবোধক।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে রূপটি পাওয়া যায়, তাহা লোকায়ত যোগের সংকৃত রূপ। উহাতে যোগের অর্থই স্বতন্ত্র। এই যোগ বেদান্তমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। সাংখ্য প্রবচনসূত্রে বলা হইয়াছে, ‘সমাধি হুযুগ্তি মোক্ষেন ব্রহ্মরূপতা’ [৫. ১১৬]—অর্থাৎ সমাধি, হুযুগ্তি ও মোক্ষে ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়।

পরবর্তীকালে বেদান্তপ্রভাবে ‘সোহহম্’-তবে প্রতিষ্ঠাই যোগের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। পুরাণে এই লক্ষ্যটিই প্রধান, অর্থাৎ যোগী সেখানে সমাহিত স্তরে ‘পরমাত্মনি লীয়তে’। পুরাণে তত্ত্বের মিলন-যোগ তত্ত্বটিও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে পাঠ,

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা বা মনোগতিঃ ।

তত্ত্বা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ [বিষ্ণু. ৬. ৩. ৩১]

—এখানে যোগের অর্থ ‘মিলন’, ব্রহ্মে-মনে মিলন, বা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন। এখানে তত্ত্ব ও বেদান্তের সাক্ষি। পরবর্তী লোকায়ত ধর্মগুলিতেও যোগের এই মিশ্র রূপের প্রভাবই বিস্তৃত হইয়াছে।

(V) পূর্বমীমাংসা

বেদের কর্মকাণ্ড লইয়া যে দর্শন, তাহার নাম ‘পূর্বমীমাংসা’। ইহাকে ‘কর্ম-মীমাংসা’ও বলা হয়। বেদের ব্রাহ্মণভাগকে বলা যায়, ক্রিয়াকর্মবারিধি। এই অনন্ত কর্মসমূহের কতকগুলি লহরী সূত্র-সাহিত্য—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও কল্পসূত্র। এই সকল সূত্রেরই আর এক প্রকারভেদ ‘জৈমিনী-সূত্র’। ইহা বৈদিক কথের ‘বিধি-বিবেক’। ক্রিয়ার প্রয়োজন কি, ফলশ্রুতি কি, কোন্ ক্রিয়া আবশ্যিক, কোন্টি ঐচ্ছিক—কর্ম-মীমাংসা তাহারই মীমাংসা। এই মীমাংসার পূর্বতন আচার্য্য ছিলেন, বাদরি, আত্রেয়, ঐতশায়ন। মহর্ষি জৈমিনী তাঁহাদের উত্তরসূরী।

জৈমিনীসূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার শবরস্বামী (খ্রিঃ ২য় শতক); ইহা শবর-ভাষ্য নামে খ্যাত। এই ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মীমাংসকদের মধ্যে ছুইটি গোষ্ঠি গড়িয়া উঠে—ভট্ট সম্প্রদায় ও গুরু সম্প্রদায়। কুমারিল ভট্টই ভট্ট মতের প্রচারক। গুরুমতের প্রবর্তক আচার্য্য প্রভাকর। ভট্ট ও গুরুমত দ্বারা মীমাংসার ‘দর্শন’-ভাগ পরিপূষ্টি লাভ করে।

আদৌ কর্মমীমাংসার দর্শনের ভাগ ছিল অল্প, ইহা ছিল প্রধানতঃ কর্মের বিচার। জৈমিনী-সূত্রেও দর্শন অপেক্ষা ধর্মের (= কর্মের) বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিচারের দিকটাই প্রধান। এই সূত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত : ১. প্রমাণ, ২. যাগ-দানাদি কর্মভেদ, ৩. শেববিচার, ৪. পুরুষার্থ ও ক্রত্বর্থ কর্ম-প্রযুক্তি, ৫. বিধির ক্রম, ৬. অধিকার,

৭. সামান্যভিদেশ, ৮. বিশেষভিদেশ, ২. উহ [‘অপূর্বোৎপ্রেক্ষণম্’], ১০. বাধ, ১১. তত্ত্ব, ও ১২. প্রসঙ্গ।

কর্ম-মীমাংসার প্রথম সূত্র ‘অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা’। মীমাংসক ‘ধর্ম’ কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে একদিকে যেমন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মকে বুঝায়, তেমনই বুঝায় ‘কাম্যকর্ম’। ইহারই অন্তর্গত নৈতিক কর্ম, অভ্যাদয়-মূলক কর্ম। মাহুষের প্রতি মাহুষের কর্তব্য, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতি মাহুষের কর্তব্যও কর্মের অন্তর্ভুক্ত। বেদে সকলপ্রকার কর্মেরই নির্দেশ আছে। বেদ-বিধি-নির্দিষ্ট কর্মই ‘ধর্ম’ [‘চোদনা-লক্ষণোহর্থো ধর্ম’—মীঃ. সূ. ১. ২]। মীমাংসা-দর্শনের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এই কর্মেরই কথা। কর্ম অনেক প্রকার; যাগ (দেবোদ্দেশে তাগ), হোম (অগ্নি বা জলে আহুতি), দান প্রভৃতি। ইহাদের জন্ত বহু ‘বিধি’, বহু ‘নিষেধ’, নানাপ্রকার বিচার। নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য—উহা না করিলে প্রত্যাবায় ঘটে, নৈমিত্তিক কর্মাদিরও সেই বিধি। কাম্যকর্ম ঐচ্ছিক। কর্মের লক্ষ্য অহুসারেও প্রকারভেদ আছে। পুরুষের জন্ত যে কর্ম তাহা ‘পুরুষার্থ’, তাহা নিজের উপকারক। স্বজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম ‘ক্রত্বার্থ’। পুরুষার্থ ঐহিক-প্রতিকারী, আর ক্রত্বার্থ আত্মমিক। কর্মের মধ্যে কোন্টি মুখ্য, কোন্টি গৌণ, তাহা লইয়াও বিচারের অন্ত নাহি। যে কর্ম প্রধানের উপকারক তাহা ‘পরার্থ’। তাহাকে ‘শেষ’ও বলে [‘শেষঃ পরার্থত্বাৎ’ ৩. ১. ২]। ‘শেষ’এর বিচারে অনেক জটিলতা। কর্মের ক্রমভেদে বেদের নির্দেশই চূড়ান্ত। কর্মে অধিকারি-ভেদ আছে। এই দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায় অধিকারের আলোচনা।

বস্তুতঃ জৈমিনী-দর্শনে কর্মেরই প্রতিষ্ঠা। কর্ম ‘সর্বকামধুক্’। কর্মই অভ্যাদয়, কর্মই নিঃশ্রেয়স্। কর্মমাত্রই ফলপ্রসূ। কেহ যদি পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ করে, নিশ্চয় সে পুত্র লাভ করিবে; কেহ যদি বৃষ্টি কামনা করিয়া যজ্ঞ করে, নিশ্চয় সে বৃষ্টি লাভ করিবে; যিনি রাজ্য কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবেন, তিনি রাজ্য লাভ করিবেন। বেদ-বিধি অহুসারে কর্ম সম্পাদিত হইলে, তাহা হইতে ‘অপূর্ব’ (= কর্ম জন্ত শক্তি বা অদৃষ্ট) সৃষ্টি হইবেই। এই ‘অপূর্ব’-এর স্বীকৃতি কর্মমীমাংসার এক অপূর্ব বস্তু। কৃতকর্মের যে ফলদান-শক্তি, তাহাই ‘অপূর্ব’। ‘অপূর্ব’ বলেই কর্মপ্রবাহ চলে। মীমাংসামতে সৃষ্টির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই [‘ন কদাচিদনাদৃশঃ জগৎ’] ‘জগৎ চিরকাল ধরিয়া বর্তমান।’ ‘অপূর্ব’-বলেই সৃষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরিয়া

১। There is neither creation, nor destruction. The world is eternally there. This Mimamsa view is unique in Indian Philosophy’ [An Intro. to Indian Philo—Dr. S. C. Chatterjee & D. M. Dutta].

চলিয়া আসিতেছে। কর্ম সর্বশক্তিমান : 'It fully believes that 'karman' is all powerful and that even God, if He exists, can not interfere with its power'.^১

মনীষী প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্মমীমাংসার এই কর্ম-নিষ্ঠার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক মেজাজের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'কথাটা শুনলে আশ্চর্য মনে হবে, কিন্তু একথা ঠিক যে, আধুনিক যুগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চিন্তার তলে যে মনোভাব (attitude) রয়েছে, তার সঙ্গে মীমাংসার ভেতরকার মনোভাব মেলে। এককথায়, মীমাংসা একটা সায়েন্স' [হিন্দু ষড়্‌দর্শন]। অর্থাৎ তিনি বলিতে চান, বৈজ্ঞানিকগণ ক্রিয়াকে মানেন, ক্রিয়ার ফলকে হাতে হাতে পাইয়া কর্মে বিশ্বাস করেন। অপরেও সেই ক্রিয়া বুঝিয়া হউক, বা না বুঝিয়া হউক পূর্ব পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করে। মীমাংসকেরও এই বিশ্বাস। কাহার উদ্দেশ্যে করা হইল, কেমন করিয়া ফল হইল, তাহা বিচারের আবশ্যকতা নাই, বৈদিক বিধি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া যত্নের মত কর্ম করিয়া যাও, যত্নের মতই ফল পাইবে। এই বিশ্বাসটাই কর্মবাদের মূল ভিত্তি।

কর্মের এই অবিসংবাদী 'অপূর্ব' স্বীকার করার ফলে, মীমাংসাদর্শনে—শ্রুতি, স্মৃতি, ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্থান হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর প্রসঙ্গে জৈমিনী নীরব। জৈমিনী-মতে 'দেবতা'-সংজ্ঞাও অদ্ভুত। যজ্ঞকালে যাহার উদ্দেশ্যে যাগ (=ত্যাগ) করা হয়, তাহাই দেবতা। যেমন, যাগকালে বলা হয়, 'ইন্দ্রায় স্বাহা', 'অগ্নয়ে ইদম'—এই চতুর্থান্ত পদটিই 'দেবতা'। তাহা যজ্ঞের অত্যান্ত দ্রব্য ঘৃতাদির দ্বারা একটি অজ মাত্র। তাহা ভিন্ন সহস্রাঙ্গ বজ্রহস্ত ইন্দ্রের কল্পনা কেবল স্মৃতি। আত্মা-প্রসঙ্গেও জৈমিনী-সূত্রে কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তী মীমাংসকগণ অবশ্য 'আত্মা' স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মতে 'আত্মা' নিত্য, এবং উহা দেহ-ইন্দ্রিয়াদি, এমন কি জানেছা হইতে ভিন্ন। এই আত্মাই কর্মের কর্তা ও ভোক্তা। মোটের উপর কর্মমীমাংসায় কর্মই মুখ্য—ঈশ্বর, দেবতা, আত্মা প্রভৃতির প্রশ্ন এখানে নগণ্য। এইজন্য কেহ কেহ জৈমিনী-দর্শনকে লোকায়াত (materialistic) দর্শন বলিয়াছেন।

তবে জৈমিনী-দর্শন নাস্তিক দর্শন নয়, কারণ, ইহাতে বেদকে প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। মীমাংসক বেদবাক্যকে বেদবাক্যই মনে করেন। তাহাদের মতে শব্দ নিত্য। শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র অন্তের নিকট অর্থ স্থাপ্ত হয়, একই কালে উচ্চারিত

১। The Purva Mimamsa—Ram Swami Iyer [Hist. of phil. Eastern & Western. Vol I]

শব্দদ্বারা বিভিন্ন লোক একই প্রকারে অভ্রান্ত প্রত্যভিজ্ঞ। করিতে পারে, শব্দের সংখ্যা-বৃদ্ধি নাই, বিনাশ-অভ্যুমানের অবলম্বন নাই। কাজেই শব্দ নিত্য। বেদ এই নিত্য অভ্রান্ত শব্দের সমষ্টি। ইহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের অগোচর বিষয়ের প্রতিপাদক, ইহা অব্যভিচারী, স্বাভাবিক, অপৌরুষেয় ও নিত্য। বেদবাক্যের প্রতি এই একনিষ্ঠা ও সূদৃঢ় বিশ্বাস মীমাংসাদর্শনের অত্যন্ত বিশিষ্টতা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, দুইটি কথা স্মরণীয়: মীমাংসক বেদকে ‘অপৌরুষেয়’ বলেন নৈর্ব্যক্তিক অর্থে—বেদ কোন পুরুষের রচনা নয়—ইহা ঈশ্বর বা প্রজ্ঞাপতি—কাহারও রচনা নয়। দ্বিতীয়ত: বেদবাক্যের সার্থকতা ‘বিধায়ক’ বাক্যে—অর্থাৎ বেদের যে বাক্যগুলি বিধি-বিষয়ক, যাহাতে কর্মের বিধান আছে, সেইগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। বেদে বিধায়ক বাক্য ব্যতীত যে সকল ‘অর্থবাদ’ আছে, তাহা যতদূর বিধায়ক বাক্যের পরিপোষক, ততদূরই সার্থক। [মী. সূ. ১. ২. ১]

আচারনিষ্ঠ ভারতবাসীর জীবনে মীমাংসাদর্শনের প্রভাব অপরিণীম। বেদের প্রত্যেকটি বর্ণ, অক্ষর, শব্দ ও বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করার মূলে মীমাংসার প্রভাব বিद्यমান। ভারতীয় জীবনে কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যাসক্তিও মীমাংসার দান। পরবর্তীকালে ‘স্মৃতি’ মীমাংসার হলভিত্তিক হওয়ায় মীমাংসার প্রভাব অনেকটা কীর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াই মীমাংসা হিন্দু-জীবনকে প্রভাবিত করিতেছে। মীমাংসার নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মকে কেহই নশ্চাৎ করিতে পারেন নাই। যোগ ও জ্ঞানের ভিত্তিও কর্ম। ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’য় ‘অথ’ শব্দটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উহা কর্মেরই ইঙ্গিত। কর্ম ব্যতীত জ্ঞানের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

কর্মমীমাংসার দ্বারা কিছুটা গোঁড়ামি ও সংস্কার হিন্দু সমাজে বিদ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে দোষ মীমাংসার নয়। কর্মমীমাংসা কর্মের মধ্য দিয়া সাংসারিক শৃঙ্খলার প্রতিই অঙ্গুলি-সংকেত করিয়াছে। কর্মমীমাংসা ভাববাদী দর্শন নয়, প্রত্যক্ষবাদী। ইহা কর্তব্যকে অবহেলা করে নাই: It emphasises the moral duties of man that he owes to himself, to his family and relatives and to his community and nation. [Ramswami Iyer]

কর্ম জীবনের অঙ্গ, কর্মহীন বিষয়ীর কল্পনা অর্থহীন—এ সিদ্ধান্ত কর্মমীমাংসার। কর্মমীমাংসা এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, ‘শরীরষাণি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ’ [গীতা ৩, ৮]: পুরুষার্থ কর্ম দ্বারা দ্রব্যার্জন বিহিত হইয়াছে; ইহা জীবিকা-অর্জনের উপায়। শুধু তাই নয়, কর্ম কেবল ব্যক্তির জন্ত অপূর্ব প্রসব করে না, ব্যক্তির কর্ম সমষ্টির জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি এক কর্মবন্ধনে

শৃঙ্খলিত। কর্মমীমাংসার তদ্বাধ্যায়ে [১১ অধ্যায়] অর্থশাস্ত্র, রাজনীতির বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। জৈমিনী মতে যে কর্ম বহর উপকারক, তাহাই তত্ত্ব। নিজস্ব কর্মবাদের উৎসও মীমাংসা দর্শন। মোটের উপর, কর্মমীমাংসার কর্মবোধ সক্রিয় জীবনদর্শনেরই প্রতীক। কর্মপ্রেরণায় এ আদর্শ উপেক্ষণীয় নয়।

(vi) বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা

বেদের অন্তর্ভাগ উপনিষদকে বলা হয় ‘বেদান্ত’। বেদান্ত বেদজ্ঞানের নিষ্কর্ষ। বেদান্ত শব্দটি উপনিষৎ ও দর্শন—উভয়ার্থেই প্রযুক্ত হয়। উভয়ের প্রতিপাত্তও এক। তবু উপনিষদে ও দর্শনে পার্থক্য আছে। উপনিষদে জ্ঞানালোচনা বিস্তৃত, বিবিধ কাতিনী দ্বারা ব্যাখ্যাত—দর্শনে আলোচনা সূত্রিত, উগাতে কাহিনীর স্থান নাই। তাহা ছাড়া, উপনিষদে তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠায় যুক্তির স্থান অল্প, দর্শনের সিদ্ধান্ত যুক্তি-প্রধান।

বেদান্তদর্শনের অপর নাম উত্তরমীমাংসা; ইহা পূর্বমীমাংসার প্রতিযোগী। পূর্ব ও উত্তর শব্দ দুইটি কালবাচক নয়, উহা একই বেদের দুইটি দিক—একটি কর্মের, অপরটি জ্ঞানের। বেদের উত্তরাংশ জ্ঞানেরই আলোচনা, তাই জ্ঞান-প্রতিপাদক দর্শনের নাম উত্তর মীমাংসা। ব্রহ্মনিরূপণ ও ব্রহ্মোপসনাই ইহার প্রতিপাত্ত—এইজন্য ইহাকে ‘ব্রহ্মসূত্র’ও বলা হয়। ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণ ব্যাসদেবের রচনা।

এই সূত্র চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি ‘করিয়া পাদ’। ব্রহ্মসূত্রের জিজ্ঞাস্য ‘ব্রহ্ম’: প্রথম সূত্রেই সেই জিজ্ঞাসা, ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’। এই ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহারই উত্তর প্রথম অধ্যায়। সূত্রকার এই এই অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রুতি-বাক্যের সমন্বয় দেখাইয়া, তাহাদের অভিধেয় যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মই ‘শাস্ত্রযোনি’ [১. ১. ৩]—শাস্ত্রসমূহের কারণ, শ্রুতিমত্রে তাহারই গান [‘মান্ব-বর্ণিকমেব চ গীয়তে’—১. ১. ১৫]। কতকগুলি শ্রুতিবাক্যে ভেদ ব্যাপদেশ থাকিলেও, অসামঞ্জস্য নাই। যেমন বলা হইল, তিনি ‘অর্তকৌক’ [১. ২. ২৭]—অর্থাৎ তিনি অল্পপরিমিত স্থানে থাকেন। উহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব বাধিত হইল না, কারণ, যে ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে জদপদ্রে (দূহর-পুণ্ডরীকে) অবস্থিত, তিনিই আবার ‘ভূমা’, ‘ব্যোমবৎ’ (আকাশের মত বিরাট), তিনি আকাশ-অবহর ধারণ করিয়া আছেন [‘অক্ষরমহরাস্তদুভে’—১. ২. ১০]। ব্রহ্ম সর্বযুল—‘যোনিষ্ঠ হি গীয়তে’ [১. ৪. ২৭]।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে—সাংখ্য, বৈশেষিক, সেন্ধর সাংখ্য (যোগ), জ্ঞান, শৈব ও ভাগবতাদির মত খণ্ডন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ

পাদে জীব ও লিঙ্গ শরীরের উৎপত্তি বর্ণনা। প্রকারান্তরে ইহাই বেদান্ত দর্শনের ‘সৃষ্টি-প্রকরণ’। সৃষ্টি ব্রহ্মময় : ক্ষিত্যপ্তেজমরূপব্যোমে ব্রহ্ম-লক্ষণ বিद्यমান, জীবও ব্রহ্ম।

তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের সংসারগতির প্রকারভেদে জ্ঞান বৈরাগ্য সাধন ও মুক্তিকলের বিষয় সূত্রিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম অব্যক্ত [‘তদব্যক্তমাহ হি’—৩. ২. ২৩], তিনি ইঞ্জিয়গ্রাহ্য নন,—আবার ইহাও বলা হইয়াছে, আরাধনাকালে তাঁহাকে ভক্তি ধ্যান ও একাগ্রতা দ্বারা জানা যায় [‘অপি সংরাধনে প্রত্যাহ্বয়ানাভ্যাম্’—৩. ২. ২৪] এই সকল নির্দেশে কোন বৈলক্ষণ্য নাই—কারণ কর্ম ও জ্ঞানের সহযোগিতাতেই ফলোৎপত্তি। তবে বাদরায়ণমতে জ্ঞানেরই উৎকর্ষ।

চতুর্থ অধ্যায়ে এই জ্ঞান-সাধনার ফল বিচারিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্ৰাদি কর্ম দ্বারা অচিরাদি মার্গে গমন হয়, হিরণ্যগর্ভের সামীপ্য লাভ হয়—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল স্ব-স্বরূপে অবস্থান। তখন জীব চৈতন্যস্বরূপ [‘চিতিতন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাৎ’—৪. ৪. ৬], স্বাধীন [‘চান্দ্ৰমুখাধিপতি ৪. ৪. ২’]। ইহাই যথার্থ মুক্তি। এরূপ অবস্থায় আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মসূত্রের সমাপ্তি এই ফলের প্রতিশ্রুতি লইয়া—‘অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ’। দ্বিক্রতির দ্বারা সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে।

দর্শনের সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত, জটিল ও নানার্থবোধক। ভাষ্য ব্যতীত উহাদের মর্ম ভেদ করা দুষ্কর। কিন্তু ভাষ্যকারগণের স্ব স্ব ধারণা ও ধর্মবোধানুসারে ভাষ্য রচিত হওয়ায় একই সূত্রের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাহার ফলে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠে। বেদান্তের দ্ব্যর্থক সূত্রাবলী অবলম্বন করিয়াও বহু বাদ সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান—শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের ত্রৈতবাদ এবং নিম্বাচার্যের ভেদাভেদবাদ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

॥ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ॥

ভারতীয় মনীষার অত্যাঙ্ক দীপ্তি আচার্য শঙ্কর। ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অকাটা যুক্তিবলে তিনি তৎকাল প্রচলিত বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, কর্মমীমাংসা, শৈব, শাক্ত ও পঞ্চরাত্র মতবাদকে খণ্ডন করিয়া ‘কেবল’ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর তিনি যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা শারীরক ভাষ্য, বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ নামেও পরিচিত। শঙ্করাচার্যের মূল প্রতিপাদ্য—‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিথ্যম্ জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ’।

ব্রহ্ম ‘একমেবাষিভীযম্’। তাঁহার অংশ নাই, অংশী নাই—সজাতীয়, বিজাতীয় কিংবা স্বগত ভেদ নাই। তিনি অখণ্ড, এক এবং দ্বিভীযরহিত। ব্রহ্ম নিঃস্বর্ণ, অর্থাৎ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত ; তিনি নির্বিশেষ—তাহার কোন বিশেষণ নাই ; তিনি সর্বোপাধি বিবর্জিত অর্থাৎ নাম-রূপ-বিহীন । তাহার কোন ক্রিয়াও নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, এইজন্য তিনি অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয় । এই যে ব্রহ্ম, ইহাকে কোন কিছু দিয়াই বঝানো সম্ভব নয় । তিনি ‘অবাণ্‌মনসোগোচরঃ’ । ব্রহ্ম কেবল ‘সচ্চিদানন্দস্বরূপ’ অর্থাৎ তিনি সংস্বরূপ (নিত্য), চিৎস্বরূপ (চৈতন্যধন) এবং আনন্দস্বরূপ (আনন্দধন) । নিত্যত্ব, চৈতন্য এবং আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নহে । গুণে ও স্বরূপে প্রভেদ এই যে, গুণ বস্তু-ভিন্ন ধর্মবিশেষ, আর স্বরূপ বস্তুগত । স্বরূপ বস্তুর সহিত অবিনাভাবে যুক্ত । গন্ধ গুল্মের গুণ, কিন্তু মিষ্টত্ব চিনির স্বরূপ । এই যে নিগুণ, নির্বিশেষ, নামরূপহীন, অকর্তা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয়, ঈনিই শঙ্কর মতে ব্রহ্ম ।

তাহা হইলে ঋতিতে যে ব্রহ্মের সগুণত্বের কথা বলা হইয়াছে, বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, বলা হইয়াছে ব্রহ্ম সর্বকর্মা, সর্বকাম—তাহা কি ? শঙ্কর-মতে ঋতু্যুক্ত এই সকল বিশেষণ ও উপাধি ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক । ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষণ-রহিত ও নির্বিকল্প, কোনক্রমেই তাহার বিপরীত নয়, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক প্রত্যেকটি ঋতিবাক্যে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ-নিগুণ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে ।^১ শঙ্কর আরও বলেন, উপাধিযোগেও নিক্রপাধি ব্রহ্ম দ্বিরূপ হইতে পারেন না । স্বচ্ছ ক্ষটিক কখনও অলক্তাদি উপাধিযোগে অস্বচ্ছ স্বভাব হয় না । নিগুণ ব্রহ্মের সগুণত্ব কর্ত্তা কিংবা নিক্রপাধি ব্রহ্মে উপাধিসংযোগ সব কিছুই মিথ্যা ও অবিজ্ঞাপ্রসূত—‘ব্রহ্মনাত্ৰাদ্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্ত । উপাধিনাক্ষ অবিজ্ঞা প্রত্যাশ্বাপিতত্বাৎ’ [শাঃ ভাঃ—৩. ২. ১১] ।

অবৈতবাদে এই অবিজ্ঞা বা ভ্রান্তির ভূমিকা সামান্য নয় । উহা মিথ্যা হইলেও উহার অসাধারণ শক্তি । ভ্রান্তিবশেই পরম সত্য আবৃত হয়, ভ্রান্তিবশেই মিথ্যা সত্য বলিয়া অহুমিত হয় । রজ্জু ও সর্প দুইটি পৃথক বস্তু, কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রম একটি প্রাত্যহিক ঘটনা । অপ্রান্ত দৃষ্টিতে রজ্জু রজ্জুই, উহা সর্প নয় ; কিন্তু ভ্রান্তির এমনই কারসাজি যে, উহার ফলে রজ্জুকেই সর্প বলিয়া ভ্রম হয় । সন্ধে সন্ধেই মানুষ ভ্রম পায় । শিহরিয়া উঠে, চিৎকার করে । যতক্ষণ এই ভ্রান্তির খেলা, ততক্ষণ মানুষের স্বস্তি নাই, ততক্ষণ তাহার ভয়-শিহরণেরও অন্ত নাই । অবৈতবাদমতে এই ভ্রান্তির পারিভাষিক নাম ‘অধ্যাস’ । যে বস্তু বাহ্য নয়, সেই বস্তুতে তাহার যে আরোপ—‘অতন্নিঃস্বদবুদ্ধিঃ’—তাহারই নাম ‘অধ্যাস’ । অধ্যাসকে একেবারে

১ । অন্ততঃ পরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষ্যরহিতঃ নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্ । সর্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিশ্রবান্তে সমস্ত বিশেষ্যমেব ব্রহ্মোপদিষ্টতে [শা, ভাঃ ৩. ২. ১১]

মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবারও উপায় নাই; শশশব্দ, আকাশকুসুম বা বক্ষ্যায় পুঙ্খবহুর মত উহা অলীক নয়; মিথ্যা হইলেও উহা ক্ষণেকের জন্ত সত্য, এমনকি অজ্ঞানান্দ জীবের পক্ষে ইহা জ্ঞানজ্ঞানান্তর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

এই অধ্যায়ের মূলীভূত কারণ অবিজ্ঞা বা ‘মায়্যা’। শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে এই মায়্যা সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন। মূল ব্রহ্মসূত্রে মায়ার কথা বলা হইয়াছে একটি সূত্রে [‘মায়্যামাত্রান্ত কাৎ স্মোনান্দিব্যাক্ত স্বরূপত্বাৎ’-৩. ২. ৫—স্বপ্রাবৃত্তায় সৃষ্টি মায়্যা মাত্র, সত্য নহে]। শঙ্করমতে এই মায়্যাই ভ্রম বা স্বপ্ন-সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। মায়্যা মিথ্যা, কিন্তু অনাদিনিতিয়া। মায়্যা ‘অঘটন-ঘটন-পটায়সী’; ইহাই সত্যকে আবৃত্ত করে, মিথ্যাকে সত্যরূপে উপস্থাপিত করে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, ভ্রান্তিতে রজ্জুভ্রান্তিও মায়্যার রচনা। জগৎ স্বাপ্নিক মায়্যা মাত্র। [‘মায়য়া কল্পিতং জগৎ’]। মায়্যার এই বিশিষ্ট ভূমিকা হেতু শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ‘মায়্যাবাদ’ নামেও পরিচিত।

ব্রহ্ম ও মায়্যা, সত্য ও অধ্যাস, পারমাণ্বিক দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি—এইগুলিই অদ্বৈত বেদান্তের মূল কথা। শঙ্করমতে ব্রহ্ম অপরিণামী, অতএব জগৎ তাঁহার পরিণাম হইতে পারে না। তাহা হইলে জগৎ কি? শঙ্কর বলেন, উহা ‘বিবর্ত’ বা মিথ্যাবোধ মাত্র। সাংখ্যমতে জগৎ বা সৃষ্টি স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিণাম, যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তমতে সৃষ্টি ব্রহ্মের বিবর্ত, যেমন সর্প রজ্জুর বিবর্ত। রজ্জুই সত্য, রজ্জুতে সর্পকল্পনা একটা মিথ্যা ভ্রান্তি। তেমনই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ স্বাপ্নিক মায়্যা মাত্র। কিন্তু জগৎ মায়্যার রচনা হইলেও, ‘সৃষ্টি অনির্বচনীয়’। উহা সত্য না হইলেও ক্ষণেকের জন্ত সত্য, লোকব্যবহারের দিক হইতে উহা সত্য। তাই লোক-ব্যবহারের দিক হইতে এই মায়্যা-কল্পিত জগৎ কি প্রকারে সৃষ্ট হয়, শঙ্করাচার্য তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

প্রাপঞ্চ জগতের সৃষ্টিক্রমে অদ্বৈতমতে বিশেষত্ব আছে। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নাই, জড় প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টির বিস্তার। শঙ্কর সেখানে বলেন, জড় প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না, মূলতঃ ব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ [‘জন্মান্তর্য বতঃ’—ব্রঃ সূ. ১. ২]। কিন্তু ব্রহ্ম তো নিষ্ক্রিয়, অকর্তা—তাঁহার সৃষ্টির যোগ্যতা কোথায়? শঙ্কর বলেন, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নিগুণ ও অকর্তা হইলেও লোকব্যবহারের জন্ত তিনি সগুণ, কর্তা, নামময় ও রূপময়—‘অধ্যারোপিত নামরূপ-কর্মব্যয়েণ ব্রহ্ম নির্দিষ্টত্বে’ [বৃহদারণ্যকোপনিষদের শঙ্কর ভাষ্য ২. ৩. ৬]। ব্যবহারিক স্তরে উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি অনন্ত গুণাধার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন; তিনি জগৎ-স্রষ্টা ও জগৎ-পাতা, জীবের স্বকৃতি ও দুষ্কৃতির কর্মফলদাতা। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম

ও ঈশ্বর অভিন্ন, কিন্তু ব্যবহারত: ব্রহ্ম ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র : ব্রহ্ম মারাতীত, ঈশ্বর মারাতীত-উপহিত ; ব্রহ্ম এক, ঈশ্বর নাম-রূপ সংযোগে বহু ; ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ঈশ্বর উপাত্ত ।

অষ্টম বেদান্তমতে জীবও স্বরূপত: ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; জীবও ব্রহ্মের স্তায় অজ, নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন ; তহোর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই ; তাহা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ] ‘তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীবঃ । জীবস্তাপি নিত্য চৈতন্যস্বরূপম্’ শ: ভা: ২. ৩. ১৮]। তথাপি জীবের যে জন্ম-মৃত্যু কল্পনা, তাহা ঔপচারিক কল্পনা মাত্র অর্থাৎ তাহা ব্যবহারিক [‘ভাক্ষস্বৈব জীবস্ত জন্মমৃত্যু: ব্যাশদেশ:-শ: ভা: ২. ৩. ১৬]। এই ব্যবহারিক স্তরেই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, বহু ও সঙ্কচিত ; জীব অবিদ্যা-মায়ায় আচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, কর্ম ও কর্মফল ভোগ । যেদিন জীবের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, মিথ্যাবোধ বিদূরিত হয়, সেদিন জীবের স্ব-স্বরূপে অবস্থান, সেইদিনই জীবের ‘তদমসি’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, ‘মোহম্’ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা । জীবের স্বরূপজ্ঞানের অভাবই বন্ধন, অধ্যাসই বন্ধাবস্থা ; যেদিন এই অধ্যাসের ‘অপবাদ’, সেইদিন জীবের মুক্তি ।

ব্যবহারিক স্তরের দিক হইতেই জীবের সাধনা । এই সাধনার দুই অঙ্গ : কর্ম ও জ্ঞান । জ্ঞানই মুখ্য সাধন, কর্ম তাহার সোপান মাত্র । জীব দুই প্রকার : বন্ধ ও মুমুক্শু । বন্ধজীবের জন্মই ক্রিয়াকর্ম ও ঈশ্বরোপাসনা । মুমুক্শু জীবের সাধন জ্ঞান । জ্ঞানের ভূমিতেই মায়ার আবরণ উন্মোচিত হয়, অধ্যাস বিনষ্ট হয় এবং জীব-ব্রহ্মে ঐক্য উপলব্ধি হয় । অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা এই মুক্তি লভ্য । সাধন চতুষ্টয় হইতে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে । অধিকারী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্রমে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন । জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমিতে মুক্তি দুই প্রকার—জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি । জীবমুক্তির স্তরে জীবের দেহাবসান ঘটে না, সংসারে থাকিয়াও জীব তখন সংসার-বিষয়ে নিরাসক্ত থাকেন, তাহার দৃষ্টি উদার, সর্বজীবে সমভাব, স্নেহে দুঃখে সমান অবিচলিত । বিদেহমুক্তিতে পরম মোক্ষ তখন জীব ও ব্রহ্ম একাকার—জলবিশ্বের মহাসাগরে বিলয় ।

অষ্টম বেদান্তের প্রভাব ভারতীয় জীবনে অপরিমীম । সংসার মায়্যা, সত্য ব্রহ্ম—এই বোধ প্রায় সর্বত্র প্রসারিত । সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, শৈবদর্শন ও শক্তিমত অষ্টম বেদান্তের রঙে অল্পরঞ্জিত । পরবর্তীকালে প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম কেবলমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে । এই প্রভাব বহুবিস্তৃত হইয়াছে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবে ।

১. সাধন চতুষ্টয়—(i) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক (ii) ইহামৃত্যুার্থ ভোগবিয়োগ, (iii) শমদমাদি সাধন সম্পৎ এবং (iv) মুমুক্শু

অনেকে মনে করেন, অদ্বৈতবাদ দ্বারা এদেশে নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা ও সংসার-বিরক্তি প্রসার লাভ করায় ঐহিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মত ভিন্ন প্রকার। তাঁহারা বলেন, "The greatness of Samkar's metaphysical achievement rests on the intensity and splendour of thought with which the search for reality is conducted, on the high idealism of spirit with which he grapples the difficult problems of life and on the vision of consummation which places a divine glory on human life".^১

॥ আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ॥

শঙ্করাচার্যের তিন শত বৎসর পরে আর একজন প্রতিভাধর আচার্য ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন। তিনি আচার্য রামানুজ। রামানুজ শঙ্করাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বেদান্ত-ভাষ্যকার। অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়া তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। রামানুজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীভাষ্য' নামে পরিচিত। রামানুজ ছিলেন বৈষ্ণব। রামানুজের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম শ্রীমৎপ্রদায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নূতন নয়। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নন, প্রচারক। শ্রীভাষ্যের ভিত্তি বৌদ্যায়ন বৃত্তি ও প্রাচীন বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে অদ্বৈত বিশিষ্ট, অর্থাৎ qualified; ইহা চিদচিদ্বিশিষ্ট (চিং = জীব, অচিং = জগৎ) অর্থাৎ জীব-জগৎ বিশিষ্ট অদ্বৈত। এই মতে জীব-জগৎ ব্রহ্মের শরীর।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'সোহম' মত ভ্রান্ত, অতএব 'অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব'। শ্রীভাষ্যে তিনি অদ্বৈত মতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর পৃথক নছেন, ঈশ্বরই ব্রহ্ম। সর্বপ্রকার দোষবর্জিত ('নিরন্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধ'), সকল কল্যাণগুণের আকর ('সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক') মহাপ্রভুতিলসম্পন্ন সর্বেশ্বর পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ব্রহ্ম। তিনি নিগুণ নহেন। তিনি সর্বপ্রকার কল্যাণজনক উৎকৃষ্ট বিষয়ের আধার, সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, আশ্রিতবৎসল ও পরম করুণাময় [শ্রীভাষ্য. ৪. ৪. ২২]। ব্রহ্মের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে সৎ, চিং, আনন্দ গুণ প্রধান। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়ও নহেন। জগতের সৃষ্টি ও সংহার, জীবের বন্ধন ও মুক্তি তাঁহারই

১। Vedanta (Samkar)—S. Radhakrishnan (Hist. of phil. Eastern & Western Vol I)

কার্য। এক কথায় তিনিই ‘সর্ব’ [‘পরমাত্মা সর্বদা সর্বশকবাচ্য’]। সর্বাশ্ব এই পুরুষোত্তম ব্রহ্মে গুণ, বিশেষণ ও কর্মের স্বীকৃতিই রামানুজের বিশেষত্ব।

বিশিষ্টাধৈতবাদমতে জীব ও জগৎ স্বাক্রমে চিৎ ও অচিৎ। পরম কারণ ব্রহ্ম এই চিদচিদ্বিশিষ্ট [‘কার্যাবহঃ কারণাবহন্ত স্থলস্থল-চিদচিদ্বন্তশরীরঃ পরম পুরুষঃ’—শ্রীভাষ্য]; অথবা প্রকারান্তরে বলা যায়, চিদচিদ্বন্ত জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর। এইদিক হইতে ব্রহ্ম এবং জীব ও জগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন হইলেও স্বভাব বা ধর্মের দিক হইতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। কারণ জীব বা জগতের স্বভাব ব্রহ্মে সংক্রমিত হয় না। আবার জগতের স্বভাবও জীবের সংক্রমিত হয় না। রামানুজের এই মতের মধ্যেই ভেদাভেদবাদের বীজ নিহিত। ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন; কিন্তু ব্রহ্ম বিহু, জীব অণু; ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব, জীবের ভোক্তৃত্ব। দুঃখ ভোগের যোগ্য খণ্ডোততুল্য জীব-চৈতন্ত্যের উৎকৃষ্ট ও সর্বপ্রকার কল্যাণগুণের আধার ব্রহ্ম পদার্থের স্বভাব লাভ উপপন্ন হয় না। তেমনই ব্রহ্ম ও জগৎ। স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, অতি হেয় অচেতন কাঠ-লোষ্টাদি পদার্থরূপ জগৎ অনিচ্ছনীয়, সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট, চৈতন্ত্যময় ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারে না। শ্রুতিবাক্যে ইহাদের ভেদ ও অভেদ, ব্যধিকরণ্য ও সমানাধিকরণ্য দুয়েরই নির্দেশ আছে [শ্রীভাষ্য ২. ১. ২৩]।

রামানুজমতে জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকার বিশেষ। অতএব ইহা ‘বিবর্ত’ (মিথ্যাবোধ) নয়, ব্রহ্মেরই পরিণাম। পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় এখানে জীব বা জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় নাই, ব্রহ্মের সহিত উহাদের নিত্য সম্পর্ক স্বীকৃত হইয়াছে। সর্বোত্তম পুরুষোত্তম বিষ্ণু সর্বনিয়ন্তা, কাজেই তাঁহার সহিত জীবের উপাস্ত-উপাসক সম্পর্ক।

জীব দুই প্রকার—বন্ধ ও মুক্ত। বন্ধ জীবের দুই প্রকারভেদ—বুড়ু ও মুমুক্ষু। বুড়ুর সাধন সাকাম কর্ম, ফল পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও পুনরাবর্তন। মুমুক্ষুর সাধন মুক্তির লক্ষ্য, তাই তাঁহার সাধন নিকাম কর্ম। নিকাম কর্মের ফলে ঈশ্বর-ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তিই মুক্তির সাধন। ‘প্রপত্তি’ (শরণাগতি) বিশিষ্ট-সাধন। শ্রুতিতে আছে ‘যমৈবেষ আত্মা বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ’—ঈহাকে তিনি অহংগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন [‘যন্তায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবান্ত শ্রিত্যতমো ভবতি’—শ্রীভাষ্য]। ব্রহ্মরূপা ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ মুক্তি লাভ হয় না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ মুক্তিও রামানুজ মতে শঙ্কর মত হইতে ভিন্ন। অধৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই মুক্তি; রামানুজ মতে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া মানে, ব্রহ্মের সান্নিধ্যে জীবের চরম বিকাশে নিত্য বিষ্ণুপদ সেবার যোগ্যতা লাভ করা। বেহুণ্ডের পূর্বে এ মুক্তি লাভ করা যায় না।

বিশিষ্টাঐতবাদ যুক্তি ও বিশ্বাসের ধর্ম; ইহা যুক্তিগ্রাহ্য ভক্তির মার্গ। এখানে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। রামানুজের মতবাদে অঐত ও ঐত একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। রামানুজের বিষ্ণু উপনিষদের ব্রহ্ম, পাঞ্চরাত্নের বাহুদেব ও পুরাণের ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর ও রামানুজ ভারতবর্ষের দুই বিশিষ্ট গৌরব। এদেশের জীবনে উভয়মতের প্রভাবই অপরিমিত, উভয়ের মত-পার্থক্যও লক্ষণীয় :

“ইহাদের একজন অঐতবাদী, আর একজন বিশিষ্টাঐতবাদী। একজন বলেন, একমাত্র নিবিশেষ ব্রহ্মই সত্য, অপর সব অসত্য; অপর বলেন, জীব ও জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ অসত্য নহে। একজন বলেন, ধারণাধ্যানসমাধিদ্বারা সেই তত্ত্ব প্রাপন্যন ঢালিয়া তাঁহাতে গলিয়া যাও, তাঁহাতে মিশিয়া যাও; অপর বলেন, তাঁহার অসীম দয়ার কথা মরণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষস্থল সিক্ত কর, তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহার দাসত্ব করিয়া নিজেকে ধন্ত কর। একজন বলেন অভিন্নভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপতা লাভেই মুক্তি; অপর বলেন, ভগবানের চিরকৈঙ্কর্যই মুক্তি। একজন বলেন, জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম চিন্তাশুদ্ধির কারণ, স্তুত্যাং কর্ম জ্ঞানের সহায়; অপর বলেন, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই মুক্তির সাধন।” [আচার্যশঙ্কর ও রামানুজ—রাজেন্দ্রনাথ বোষ]।

॥ মধ্বাচার্যের ঐতবাদ ॥

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য বেদান্তসূত্রকে ভিত্তি করিয়া ঐতবাদ প্রচার করেন। ইনি ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের উড়ুপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর পুরাণে [৩২-৪০ অধ্যায়] মধ্বাচার্যকে শিবনিন্দক, হেতুবাদী বৈষ্ণব ও মহাদ্রষ্ট চাণাক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে [‘প্রচ্ছন্নোহসৌ মহাদ্রষ্টাচার্যকো মধুসংজ্ঞকঃ’]। মধ্বাচার্য কর্তৃক শঙ্করের অঐতবাদ খণ্ডন এবং মায়াবাদের নিন্দাই সম্ভবতঃ এই অখ্যাতির কারণ। মধ্বাচার্য প্রবর্তিত মাধ্বিসম্প্রদায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ‘ব্রহ্মসম্প্রদায়’ নামে খ্যাত। এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিও অল্প নয়। বলদেব বিচ্ছাদ্ভূষণ মনে করেন, গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই মাধ্বিসম্প্রদায়ের একটি শাখা।

শঙ্করমতে ‘ব্রহ্ম সত্য জগন্নিখ্যা’, অঐত ব্রহ্মই নিত্য তত্ত্ব; মাধ্বমতে তত্ত্ব দুইটি—স্বতন্ত্র ও অব্যতন্ত্র। সর্বশক্তিমান, স্বরাট্, সগুণ ভগবান বিষ্ণুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব—‘পরম্ব্যেকো মহান্ বিষ্ণুঃ’। তিনি পরমকারণ-কারণ। তিনিই সর্বকর্তা, স্রষ্টা ও সর্বকর্মফলদাতা (‘Doer and giver of all’); তিনিই বন্ধনকর্তা, জ্ঞাতা, মুক্তিফলদাতা। জীব ও জগৎ অব্যতন্ত্র, তাহা বিষ্ণুকর্তৃক সৃষ্ট ও বিষ্ণুর অধীন। অধীন হইলেও এই অব্যতন্ত্র

ভবও সত্য—‘তত্ত্বং সংসার ইত্যেব ন বাধ্যঃ সত্য এব হি’। এই তত্ত্বই মক্ষাচার্যের বৈতবাদের ভিত্তি। অশ্বত্থ স্বতন্ত্র হইতেও পৃথক ; বিষ্ণু বিহু, জীব অণু—বিষ্ণু কড়া, জীব কার্য—বিষ্ণু সেবা, জীব সেবক—জীব সর্বধা পরতন্ত্র। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদও এই মতে অগ্রাহ্য। ‘মিথ্যাহৃতঃ প্রপঞ্চোহয়ঃ মায়ানির্মিত ইয়তে’—এই মতে তাঁহাদের মতে ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন, ‘মায়াবাদমসচ্ছাদম্’। মক্ষাচার্যমতে বেদ নিত্য, নির্দোষ, স্বতঃপ্রমাণ অপৌকষেয়—কিন্তু পাকরাত্র শাস্ত্রই জীবের আশ্রয়। সাধন-ব্যাপারে পাকরাত্র মতকেই মক্ষাচার্য প্রাধান্য দিয়াছেন।

মাক্ষমতে স্বতন্ত্র, নিত্য, জগৎ-কারণ, সর্বশক্তিমান, সর্বকর্তা, সর্বময় বিষ্ণুই একমাত্র ধ্যেয়—‘বিষ্ণুরেকঃ পরো ধ্যেয়ো নাশ্চো দেবঃ কদাচন’ ; সুন্দর কমলাপতি বিষ্ণুই সর্বদা আরাধ্য [‘তস্মাদ্বিষ্ণুঃ সদা সেবাঃ সুন্দরঃ কমলাপতিঃ’]। সব কিছু ‘বিষ্ণুপিত’—জীব যখন এই সত্য ভুলিয়া যায়, ভুলিয়া যায় যে—জীব বিষ্ণুর দাস, তখনই বন্ধন—তখনই মনে হয়, জীব কতা। ইহাই পতনের মূল। কিন্তু জীব যখন বিষ্ণুকেই সর্বময় বলিয়া জানে, জানে যে ‘বাসুদেবঃ সর্বমিত’ , তখনই জীবের বিকাশ ; তখন ভগবানের দাস্তাই জীবের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠে। দাস্তভাবে বিষ্ণুর প্রিয়ত্ব ও প্রসন্নতা অর্জন করাই জীবের সাধন। এই সাধনে ক্রিয়া-কর্ম পরিত্যাজ্য নয় ; অন্ধন, নামকীর্তন ভজন প্রভৃতি ক্রিয়া ভগবৎ-সেবার অঙ্গ। এই সেবাই মুক্তির সাধন। মাক্ষমতে শাশ্বত মুক্তি কাম্য নয়, লয়-মুক্তির কথা কল্পনা মাত্র—সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিই পরমার্থ—উহাই জীবের অভীষ্ট। জ্ঞানমিশ্রা বৈদী ভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় এখানে ভক্তি জ্ঞান-প্রহরায় সংঘত।

॥ নিষাকের ভেদাভেদবাদ ॥

নিষাক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, অপর নাম নিষাদিত্য। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে ইহার আবির্ভাব। বেদান্ত হ্রত্বে অবলম্বন করিয়া নিষাক ভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম ‘চতুঃসন্’ বা ‘ঋষি-সম্প্রদায়’। সনকাদি মুনি ও ঋষি নারদ এই সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য।

নিষাক-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা ভক্তি ; কাজেই আচার্য রামানুজের ভায় তিনি সগুণ, সবিশেষ পুরুষোত্তমকেই ‘ব্রহ্ম’ অভিধায় অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ‘অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকগুণশক্ত্যাধিভিব্ধ হন্তমো রম্যাকান্তপুরুষোত্তমো ব্রহ্মস্বাভিধেয়ঃ’ [নিঃ ভাঃ ১. ১. ১] : ইনি স্বভাবতঃ অনন্ত অচিন্ত্য গুণশক্তিদ্বারা

সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববিকৃতির আশ্রয়। অসংখ্য নাম-রূপে তাঁহার প্রকাশ, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, সর্বজ্ঞ, অনন্ত গুণাশ্রয় ও সর্বনিয়ন্তা।

‘সর্ব ভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাহুদেবঃ’ [নিঃ ভাঃ ১. ১. ৪.]—নিষার্ক মতে ইহাই প্রধান প্রতিপাদ্য। জীব ও জগৎ তাঁহার মতে বস্তুক্রমে চিৎ ও অচিৎ ; এবং উভয়েই ব্রহ্ম হইতে সুগুণ ও ভিন্ন ও অভিন্ন। রামহৃদয়মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু ধর্মতঃ ভিন্ন। নিষার্কমতে ভগবান্ রমাকান্ত সর্বভিন্নাভিন্ন, অর্থাৎ স্বরূপে ও ধর্মে জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে যেমন ভিন্ন, তেমনই অভিন্ন। জীব-জগৎ ব্রহ্মের স্ব-গত ভেদ, কাজেই উভয়েই অংশ-অংশী সম্পর্ক ; শুধু তাই নয়—ব্রহ্ম জীব-জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ অর্থাৎ জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, অতএব উভয়ের অভেদ সম্পর্ক। কিন্তু জীব অগুণরিমাণ, ব্রহ্ম বিত্ব—জীব দুঃখভোগী, ব্রহ্ম চির সুখময়—জীব পাপভাগী, আর ব্রহ্ম ‘অপহত পাপম্’ (অপাপবিক্ত) ; কাজেই ‘জীব-পরমাত্মনোর্ভেদোহস্তি’ [নিঃ ভাঃ ১. ২. ৬.]। পুরুষোত্তম ব্রহ্মই দৃশ্য জড়বর্ণ ও জীব-চৈতন্য উভয়ের নিয়ন্তা-রূপে সর্বত্র অহুপ্রবিষ্ট, আবার তিনি উহাদের অতীত ; শক্তিমান্ ব্রহ্ম স্ব-শক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগদ্বিকারে নিজেকে পরিণমিত করিয়াও অব্যাকৃত ও জগদতিরিক্ত।

এই সর্বরূপময় অথচ সর্বরূপাতীত, সর্বজগতের আশ্রয় ও নিয়ন্তা, আনন্দময় ও রসময় ব্রহ্মকে ভক্তিদ্বারা লাভ করা সম্ভব। নিষার্ক মতে ভক্তি ‘প্রেমবিশেষলক্ষণা’। এই ভক্তিই পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। ইহাতে জগৎকে ব্রহ্মময়রূপে ভাবনা ও ব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে অতিরিক্ত সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তারূপে ভাবনা করিতে হয়। প্রথম সাধন-অঙ্গদ্বারা চিত্ত সর্বতোভাবে নির্মল হয় এবং শেষ অঙ্গদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অর্থ লয়মুক্তি নয়, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের সামীপ্য ও সাক্ষ্য লাভ করা যায়। এই অবস্থায় জীবের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং একমাত্র জগৎ-সৃষ্টাদি শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্যও লাভ হয়। দেহপাতের পূর্বে অবস্থা এই মুক্তি লাভ করা যায় না। দেহলয়ের পর ভক্ত জন্মাদিবিকারশূন্য হন এবং নিজেকে স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত গুণসাগর সর্ব বিকৃতি সম্পন্ন যেরূপ ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ মনে করেন।^১ এই অবস্থাতে মুক্তাত্মার রসরূপ ব্রহ্মলাভে রসময় আনন্দময় অবস্থায় প্রতিষ্ঠা—‘রসো বৈ রসঃ স্বেদায়াং ললানন্দী ভবতি’। এই অবস্থায় পরম জ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত, সংসার-বিমুক্ত জীবের (প্রত্যগাত্মার) আর পুনর্জন্ম হয় না।

নিষার্কমতের সহিত আচার্য্য রামাহৃজের মতের সাদৃশ্য আছে। উভয় মতেই

১। ‘জন্মাদিবিকারশূন্য স্বাভাবিকচিন্ত্যানন্ত গুণসাগরঃ সর্ববিকৃতিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোহহুভবতি’ [নিঃ ভাঃ ৪. ৪. ১২]

ব্রহ্ম লভন, জীব-জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, মুক্তি দেহলয়ের পর, আর চরম মুক্তিতে জীবের পূর্ণতা ও ব্রহ্মসাদৃশ্য অর্জন। কিন্তু বৈশাঙ্গও রহিয়াছে: স্বাভাবিকভাবে জীব-জগৎ ধর্মের দিক হইতে ব্রহ্ম-ভিন্ন, স্বরূপত: অভিন্ন—নিষার্ক হতে জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে ধর্মত: ও স্বরূপত: ভিন্নাভিন্ন। রামায়ণের ব্রহ্ম ঐশ্বর্যবান বাহুবল, নিষার্কের ব্রহ্ম রম্যাকান্ত পুরুষোত্তম—রামায়ণের সাধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, নিষার্কের সাধন প্রেমভক্তি। নিষার্কের বৈক্যধর্মই পরবর্তীকালে গোড়ীয় বৈক্য ধর্মে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

॥ নাস্তিক দর্শন ॥

বৈদিক সাহিত্যে, আন্তিক দর্শনে ও ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে এক শ্রেণীর লোকের সংসার পাওয়া যায়, তাহার। বেদ মানেন না, প্রত্যেক প্রমাণকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, দেহকেই সর্বস্ব বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ঐহিক জুড়ুক পরম সুখ এবং কারভোগকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। বৈদিক সাহিত্যে ইহার। দাস, অস্থির প্রভৃতি নামে অভিহিত। তাহার। অত্রঙ্কা, অবজ্ঞা, অমরতা। তাহার। দেবতার অস্তিত্বেও ছিলেন সশয়বাদী, পরলোকেও তাহাদের অবস্থান। মনুষ্যভিত্তি ইষ্টাঙ্গিকেই বলা হইয়াছে ‘হৈতুকান্’ [মহ. ৪. ৩০.] অর্থাৎ হেতুবাদী। ইহারাই নাস্তিক।

নাস্তিক মত অতি প্রাচীন, এমন কি উহা বেদপূর্ব। উহার প্রচলিত নাম ‘লোকায়ত’, ‘চাৰ্বাক’ বা ‘বাহ্প্পত্য’। লোকায়ত মানে ‘লোকেষু আশ্রিত’ অর্থাৎ বাহা লোক বা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। কেহ বলেন, লোকজগৎ বাহার আশ্রয়ন বা ভিত্তি, তাহাই লোকায়ত।^১ চাৰ্বাক নামটিও সুপ্রচলিত। মহাভারতে হর্ষোদনের এক বন্ধু ছিলেন চাৰ্বাক। তিনি ব্রাহ্মণবেশী হইলেও ব্রাহ্মণ্য নীতি বিরোধী, নাস্তিক। আবার কেহ বলেন, চাৰ্বাক কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়, চাক্ বাক্‌ই চাৰ্বাক, অর্থাৎ যে বাক্য আপাতমনোরম ও হৃদয়গ্রাহী তাহাই চাক্‌বাক্ বা চাৰ্বাক। আবার অনেকে বলেন, বৃহস্পতির অপরনাম ‘চাক্’; পুরানো চাৰ্বাকমত বৃহস্পতির মুখেই উক্ত হইয়াছে।^২ অতএব চাৰ্বাক দর্শন মানে বাহ্প্পত্য দর্শন। লোক্য বৃহস্পতি এই মতের আদি প্রবর্তক।

১। ‘Lokayata directed to the world of senses is the sanskrit word for materialism’—Hist. of phil. Eastern & Western Vol I.

২। পদ্ম, সৃষ্টি ১৩; বিষ্ণু ৩য় অংশ ১৮.

‘নাস্তিক দর্শন’ নামে স্বত্ত্ব কোন আকর গ্রন্থ নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় এবং উহা লইয়া গ্রন্থও রচিত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণতঃ নাস্তিকমত বলিতে বাহ্য বুঝায়, তাহার কোন স্থপরিকল্পিত গ্রন্থ নাই। বেদ ও উপনিষদের কতিপয় সংশয়-বাক্যে, নাস্তিক দর্শনকে বণ্ডন করিতে গিয়া আন্তিক দর্শনোক্ত কয়েকটি সূত্রে, বৃহস্পতি-সূত্র নামে পরিচিত কতগুলি খণ্ডিত উক্তি, রামায়ণের জাবালি-সংবাদে, মহাভারতের চার্বাক উপ-পর্বাধ্যায়ে, পুরাণের কিছু অংশে এবং সংস্কৃত কাব্য-নাট্যাদিতে এই দর্শন সম্পর্কে খানিক আলোচনা পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই মতবাদ সম্পর্কে একটি ধারণা গঠন করা সম্ভব। পণ্ডিতপ্রবর মাধবাচার্য্য তাঁহার বিখ্যাত ‘সর্বদর্শন সংগ্রহ’ গ্রন্থের আধিতে লোকায়ত ও চার্বাক মতের একটি আলোচনা দিয়াছেন। অধুনা লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন এই ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’-স্থত বাক্যগুলি দ্বারা বিচারিত হয়। তাহা হইতে জানা যায় :

১. চার্বাকগণ নাস্তিক। তাঁহারা বেদে বিশ্বাস করেন না, ঈশ্বতিকে অপৌকষের বা প্রমাণ বলিয়াও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ‘অয়োবেদস্ত কতীরো ভণ্ডুত নিশাচরাঃ’।
২. তাঁহাদের মতে স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, আত্মা নাই, পরলোক নাই—‘ন স্বর্গো নাপবর্গো নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ’। এক কথায় তাঁহারা নাস্তিবাদী।
৩. তাঁহারা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন ‘প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্’। অদৃশ্য আদৌ অগ্রাহ।
৪. তাঁহারা বলেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। দেহ-সংযোগেই জীবন। দেহের বিয়োগেই মৃত্যু। মৃত্যুর পর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, মৃত্যুর পর কেহ পুনরাগমনও করে না—‘ভস্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনঃ কূতঃ।’
৫. অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়াও ব্যর্থ—‘গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথৈয় কল্পনম্’ ; শ্রাদ্ধাদিতে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহার ভোজন হয়, তবে পথটকের পক্ষে পাথৈয় রাখিবার প্রয়োজন কি ?
৬. বর্ণাশ্রম ধর্ম বা যজ্ঞক্রিয়া কোন কিছুই ফলদায়ক নয়। যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে গমন করে, তবে যজ্ঞমান যজ্ঞে স্ব-পিতাকে বলি দেয় না কেন ? [‘পশুশ্চৈব্রিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্ঠোমে গমিষ্যতি। স্ব-পিতা যজ্ঞমানেন তত্র কশ্মার হিংস্রতে ॥’]

৭. বাণ-বজ্র, ব্রাহ্ম-ক্রিয়া লোভী ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি, জীবিকা-অর্জনের নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এই সকল ক্রিয়ার বিধান রচনা করিয়াছেন।
৮. জীবের সৃষ্টিব্যাপারে অলৌকিক কোন শক্তিই ক্রিয়াশীল নয়; ব্রী-পুং লংঘ্যোগে জীবের জন্ম হয়। ক্রিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূতের সমষ্টি দেহ। দেহে চৈতন্তের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বও নাই। সম্বায়ে মদে মদশক্তির স্তায়, 'দেহে চৈতন্তের আবির্ভাব ঘটে :

অত্র চক্ষারি ভূতানি ভূমিবায়ননানিলাঃ।

চতুর্ভূতাঃ খলু দূতেভ্য শৈচতন্তমুপজায়তে।

কিষাদিভ্যাঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যোভ্যো মদশক্তিবৎ ॥

৯. জীবের একমাত্র লক্ষ্য সুখভোগ। ঐশ্বর্য ও কামভোগ দ্বারা ঐহিক সুখভোগই এই ভোগের তাৎপর্য। এই সুখই পুরুষার্থ—‘সুখমেব পুরুষার্থঃ’ : অতএব, ‘বাবজীবেৎ সুখং জীবৎ’।

১০. এই পুরুষার্থরূপ সুখের সহিত দুঃখ মিশ্রিত থাকে। তাই বলিয়া সুখরূপ পুরুষার্থকে অবহেলা করা উচিত নয়। ধাত্তের সহিত তুঃখ থাকেই, মৎস্ত শব্দ ও কটক থাকেই—তাই বলিয়া পাত্ত ও মৎস্ত ভোগকে কে ইচ্ছা না করে! অতএব দুঃখভয়ে অহুকূল-বেদনায় সুখকে বর্জন করা অসুচিত, উহা ভাব্যতা ও মূর্খতার লক্ষণ : ‘তস্মাদদুঃখভয়ান্নাহুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তমুচিতম্। যদি কচ্চিদভীকঃ দৃষ্টং সুখং ত্যজ্যেৎ স তর্হি পশুবন্মুখো ভবেৎ’।

উপরের উদ্ধৃত মতবাদ হইতে চাৰ্বাক বা লোকায়ত দর্শনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চার্বাকগণ কোন অসুমান প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ বস্তুই একমাত্র সত্য। অতএব অসুমান-নির্ভর পরমাত্মা, আত্মা, বেদ, পরলোক, স্বর্গ, নরক, বাগযজ্ঞাদি কর্মের ফল তাঁহাদের মতে অসিদ্ধ। ‘নাস্তি নাস্তি’—ইহাই নাস্তিক্যবাদের মূল ভিত্তি। তাহা হইলে ‘অস্তি’ কি? অস্তি এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সংসার, অস্তি এই ‘অহং’। ইহাই একমাত্র সত্য। কাজেই অহংকে পরিতৃপ্ত কর। অহংএর পরিতৃপ্তি ইচ্ছিয়সুখে, ভোগে। অক্লান্ত-আলিঙ্গনের মত সুখ কোথায়? ভোগসুখের জীবনই সার্থক জীবন। ঐহিক সুখই পুরুষার্থ। অতএব ‘বাবজীবেৎ সুখং জীবৎ, ঋণং কৃদ্ধা স্তুতং পিবেৎ।’ চার্বাক মতের আর একটি বৈশিষ্ট্য সংশয়বাদ বা হেতুবাদ। এই হেতুবাদে সব কিছুই সংশয়িত।

এইজন্যই অস্তি-বাদীদের নিকট ইহারা বহু নিন্দিত। ভারতীয় সাহিত্যে—বেদে, উপনিষদে, জাস্তিক দর্শনে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, এমন কি অভিবাদী সংস্কৃত

সাহিত্যে নাস্তিকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিষ্কিপ্ত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, নাস্তিকের ব্যক্তিগ্রে অনেকস্থলে হাঙ্গরদের খোরাক পর্যন্ত জোগাইয়াছে [ঐউবা কুম্মিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক]।

কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, মহাভারতে বা সাহিত্যে যে চার্বাক মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, বা তাহার ব্যক্তিগ্রে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্বাঙ্গ চার্বাক মত প্রতিফলিত হয় নাই। প্রতিবাদিগণ এই মতের মন্দিরটিই মাত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং কোথাও বা উহার কদম্ব প্রকাশ করিয়াছেন। চার্বাকমতে স্বপ্ন, অর্থ ও কাম সম্পর্কে স্থূল চিন্তাধারা বাহাই থাকুক, ইহার কতকগুলি ভাঙ্গর দিকও ছিল। সে দিকট আঙ্গ আঙ্গ হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার ‘চার্বাক দর্শন’ গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রতি অস্থূলি সঙ্কেত করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন চার্বাকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন।

১. একদল ছিলেন বিতণ্ডাবাদী চার্বাক। ‘পরমতদূষণ ও খণ্ডনই ইহাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল। ইহাদের স্বতন্ত্র কোন আগম বা উপদেশ ছিল না। ইহারা কোন তত্ত্বকেই ‘তত্ত্ব’ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এমন কি চার্বাক মতের আদি প্রবর্তক আচার্য ব্রহ্মস্পতির উপদেশকেও ইহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, আপ প্রভৃতি ত দূরের কথা, সর্বজন স্বীকৃত প্রত্যক্ষকেও ইহারা প্রমাণ বলিয়া মনে করিতেন না।’ এই চার্বাকগণ ঘোর নাস্তিক, ইহারাই তথাকথিত বৈতণ্ডিক, হৈতুক ও তদোপপ্রববাদী।

২. আর একদল চার্বাককে বলা হইত ‘দুত’। ইহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী। ইহাদের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, দেহই আত্মা। দেহ চাতুর্তৌতিক। চতুর্ভূতের মিলনে মদে মদশক্তির ন্যায় এই দেহে চৈতন্তের আবির্ভাব হয়। দেহ-ধ্বংসেই মৃত্যু, উহাই মোক্ষ। ইহারা বসেন, জন্মান্তর, পরলোক, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর নাই—ইন্দ্রিয় ভোগরূপ স্বপ্নই পুরুষার্থ। এই স্বপ্নের লক্ষ্যেই অর্থ অর্জন করিতে হইবে ও জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। এই মতটিই প্রচলিত চার্বাকমত।

৩. বৈতণ্ডিক ও দুত চার্বাক ব্যতীত আর এক দল চার্বাক ছিলেন, তাহাদিগকে বলা হইত ‘স্বশিক্ষিত চার্বাক’। ইহারা লোকবাত্মা নির্বাহের জন্য ষতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু অগ্রহণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহারা স্বর্গ, পরলোক, ঈশ্বর কর্মকল মানেন না,—কিন্তু অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, গান্ধর্ববেদ ও গুহনীতিকে জীবনে অপ্রসিদ্ধি মানেন করেন। তাহাদের মতে অর্থ ও কাম পুরুষার্থ,—‘অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ’। স্বপ্নও ইহাদের মতে পুরুষার্থ, কিন্তু সে স্বপ্ন পাশবিক ইন্দ্রিয়স্বপ্ন মাত্র নয়, উচ্চতর

মানসিক স্বাধীনতা। ইহাদের মতে প্রত্যেক পরমেশ্বর মর্তের 'রাজা'। অর্থ ও কাম রাজার করতলগত, ঐশ্বর্য ও শক্তিতে রাজার তুল্য কে? কামোপভোগেও রাজার এককর অধিকার। রাজা 'স্বধী'। কিন্তু রাজার হস্তে দণ্ড; দণ্ড-সংযত স্বাধীনতা ও ঐহিক ভোগই রাজার স্বাধীনতা। স্বশিক্ষিত চার্বাক এই স্বাধীনতাকে বিশ্বাসী। এই স্বশিক্ষিত চার্বাক সম্বন্ধে আর্ঘসাহিত্য একরূপ নীরব। মনে হয়, ভারতীয় রাজ-নীতিতে, অর্থশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে ও গান্ধর্ব বিজ্ঞায় স্বশিক্ষিত চার্বাক মতের প্রভাব আছে। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞা এমনই পরিবর্তিত ও আধারহীন হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদের ভিতরকার লোকায়ত মতকে আর লোকায়ত বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

পরলোকে বিশ্বাসী ধর্মভীরু ভারতবাসীর নিকট চার্বাক মত কোনদিনই তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। দেহাত্মবাদ ও অনাত্মবাদ পরমাত্মবাদের ঘোর পরিপন্থী, আত্মত্যাগ চিরকাল স্বরবাদের বিরোধী। তাই বেদান্তের সংগ্রাম চিরন্তন। কিন্তু তরাঙ্গের বিবাহ চিরন্তন হইলেও আন্তরিকতা নাস্তিকতার প্রভাবে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। নাস্তিকমতের বিরুদ্ধে তির্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ হইলেও লোকায়ত তথা চার্বাক মত অনেক ক্ষেত্রেই আর্থমতের অঙ্গীভূত হইয়াছে। নাস্তিকের যুক্তি ও বুদ্ধির শৃঙ্খলা, নাস্তিকের তাত্ত্বিকতা বা হেতুবাদ, তাহার স্বাধীনচিন্তা ও বাস্তব বোধ, লোকায়ত অর্থ-কামের চর্চা, সবোপার প্রত্যক্ষদৃষ্ট সংসারে সুখে কালযাপনের নীতি ও দৈহিক সামর্থ্য ও বুদ্ধিদ্বারা কটক উন্নীলিত করিয়া বস্তুজগতের আধনায়কত্ব অর্জন করার পদ্ধতি কোনদিনই অবহেলিত হয় নাই। পার্থিব জীবন-যাত্রায় উহাদের উপযোগিতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে বাল্যই শুরু নীতি ও অশ্রদ্ধা, কামনাকী নীতি ও গান্ধর্ববিজ্ঞা আর্থসমাজেও গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে, যোগ-তন্ত্রে, সাহিত্যে ও জীবনে চার্বাক মত বা লোকায়ত মতের প্রভাব কোন ক্রমেই অল্প নয়।

বৈভাওক মত অবশ্য কোনদিক হইতেই গ্রাহ্য নয়, কারণ বিতণ্ডা নিয়মহীন কূট তর্ক, নীরস ও বিচারবাহ। কিন্তু এই বিতণ্ডাই আর এক দিক 'বাহ' বা নিয়মাহীন তর্ক। ইহাতে যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির স্থান আছে, কাহারও কাহারও মতে তাহাই ভারতীয় দর্শনের মূল। দাক্ষণ্যরঞ্জন শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, 'বৃহস্পতি প্রবর্তিত দর্শনমত দার্শনিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে যতই স্থূল বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, ইহার স্থান যতই নিম্নে হউক না কেন, ইহাই ভারতের 'আদিদর্শন'। এই দর্শন যতই ভারতে স্বাধীন চিন্তার পথিকৃৎ...ইহাকে পূর্বপক্ষ রূপে পাইয়াই অন্তান্ত দর্শনশাস্ত্রগুলি সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়াছে' [চার্বাকদর্শন—শাস্ত্রী]।

যুঁত চার্বাক মতের দানও অসামান্য। যুঁত চার্বাকের কেবল স্বাধীনতা নিন্দনীয়

হইলেও তাহাদের স্বীকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র অকাটা প্রমাণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অজ্ঞান-প্রমাণের বিরুদ্ধে তাহারা যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিতে নব্য জ্ঞায়কও গলম্বর্ম্য হইতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানদর্শনের বাদ-জল্প-বিতণ্ডার নিঃসন্দেহে হেতুবাদী চার্বাকের প্রভাব পড়িয়াছে। বেদের অন্তর্ভাগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পাণ্ডিত্য ও শ্রুতত্বের বিরুদ্ধে যে তির্যক মনোভাব দেখা যায়, তাহাতে চার্বাক মতের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। শঙ্করাচার্য সাংখ্যকে বলিয়াছেন ‘অবৈদিক’ [শ. ভাষ্য. ১. ১. ৫]। সাংখ্যের প্রকৃতি-প্রাধান্তে এই অবৈদিক্য পরিচ্ছূট। তদুপাধ্ব ও অবৈদিক। বিশেষতঃ তত্ত্বের ম-কার সাধনে ভুক্তির প্রতি যে আগ্রহ পরিমল্লিত হয়, তাহা নাস্তিক ভোগবাদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধ ও জৈন ধর্মেও নাস্তিক মতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

অশিক্ষিত চার্বাক নাস্তিক সম্প্রদায়ের গৌরব। কচি ও নীতিজ্ঞানের দিক হইতে ইহারা প্রায় অস্তিকের কাছাকাছি। ইহারা বুঝাইয়াছেন যে, পৃথিবী কেবল দুঃখময় নয়, এখানেও সুখ আছে, প্রাপ্তি আছে। বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা স্বাস্থ্য এই সুখ লাভ করিতে পারে। এই মত ঐহিক উন্নতির সহায়ক, সংগ্রামের পথে সুখ-অর্জনের প্রেরণা। ইহারা নৈরাশ্র ও উদাসীনতাকে প্রশংসা দেন নাই। তাহারা জ্ঞানেন, জীবনে দুঃখ আছে; সেই দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াই পথ-যাত্রা করিতে হইবে। দুঃখের জীবনে অশিক্ষিত চার্বাক যেন একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্রবের ধারা, বাহ্য দুঃখের উপলব্ধি লইয়া দুর্বীর বেগে জীবনের পথে অগ্রসর হয়। মাটিকে স্বীকার করিয়াই ইহারা মাটির উপর প্রত্যক্ষ স্রবের সৌধ নির্মাণে অগ্রসর হন। দুঃখ তাহাকে নিরাশ করিতে পারে না। প্রাণের উত্তম ও স্রবের নেশা তাহার দুঃখের ঘরে চিরস্রবের রঙীন মশাল জ্বলাইয়া রাখে। আঘাতে তাহার প্রাণ-চকমকিতে কোতুক-হাস্তের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে। ভোগ, সুখ ও দানি ইহাদের জীবনের প্রধান সম্পদ।

যম্মে হয়, এই সমস্ত দিক হইতে সমগ্র আর্থ সাহিত্যে চার্বাক বা লোকায়ত মতের প্রভাব গুরুতর। আর্থ সাহিত্যের ধর্মবাহু প্রেম, চটুল পরিহাসপ্রিয়তা, অর্থনীতি, গান্ধর্ববিজ্ঞা ও বস্তুতাত্ত্বিকতায় লোকায়ত মতের প্রভাব কোনক্রমেই অল্প নয়। আর্থগণ রক্ষণশীল এবং সমস্তদিক হইতেই আন্তিকতার পরিপোষক; ধর্মবিরুদ্ধ ব্যবহারী ভাব সেখানে বিস্তৃত ও বহুনির্মিত; ঐহিক উন্নতির প্রতিও তাহারা বৃত্তক। অথচ এই আর্থ সাহিত্যেই যখন ধর্ম, কামদাকী নীতি, অর্থনীতি ও গান্ধর্ব নীতি স্বীকৃত, তখন স্বীকার করিতে হয়, এই সকল নীতিসূত্র তাহারা পরিচালিত ও সুসংযুক্ত করিয়া গ্রহণ

করিয়াছেন সেই লোকজগত হইতে, বাহাদের মহাবাক্য 'কাম এৰৈক পুরুষার্থ'। চতুষ্টয়টি কলার চর্চার ও নাগরকবুত্তে স্থপিত চাণক সম্প্রদায়ের প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য।

৪. দর্শনশাস্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য

দর্শন তর্ক-প্রধান ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা। ইহাকে কাব্য-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা সম্ভব কি না? বস্তুতঃ দর্শনের বেশির ভাগ অংশ বিচারের মারপ্যাচ। বুদ্ধির অত্যাঙ্কল দীপ্তি তপ্ত নিদ্রাবের মত নীরস ও ভয়ঙ্কর; তর্কের বেড়াফালের বীধনও অত্যন্ত জটিল। এইরূপ জটিলতা ও নীরসতার মধ্যে কাব্যের রস ও মার্ঘ্য আবাদনের আশা নিতাস্তই চরাশা। তথাপি উৎসাহী দার্শনিকগণ দর্শনকে কাব্যের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক রঘুনান্য নাকি বলিয়াছিলেন,

কবিত্বং কিমহো তুচ্ছং চিন্তামণিমনৌষণঃ।

নিপীত কালকুটস্ত হরস্তেবাহিখেলনম্॥

—কালকুটপায়ী মহাদেবের পক্ষে সর্পধারণ যেমন তুচ্ছ ব্যাপার, চিন্তামণি বা স্তায় শাস্ত্রের পক্ষে কবিতা রচনা করাও তেমনি একটা খেলা মাত্র।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাকিক স্থলত বিচারের পথে দর্শনশাস্ত্রের রস-পরিণাম বিচার করিয়াছেন; এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

‘যাহাতে রস আছে, তাহা সরস; যাহাতে রস নাই, তাহা নীরস। ‘দর্শনশাস্ত্র নীরস’ এই প্রবাদাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রবাদপ্রচারণ রতে দর্শনশাস্ত্রে কোন রস নাই।...অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ‘অলৌকিক চমৎকার’ রসের প্রাণ বা সাত্র। চমৎকার একপ্রকার আনন্দ বা বিস্ময়। যাহার অপর নাম ‘চিন্তাবিস্ময়’। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার অহুশীলন বা পর্যালোচনায় স্থখাহুভব বা ‘বিস্ময়’ জন্মে, তাহা ‘সরস’, এবং যাহার অহুশীলন বা পর্যালোচনায় স্থখাহুভব বা বিস্ময় হয় না, তাহা ‘নীরস’। এইখানেই ‘দর্শনশাস্ত্র নীরস’ এই প্রবাদাংশের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল। কারণ, যাহারা দর্শনশাস্ত্রের অহুশীলন করেন, তাহারা যে ভাবেরা নির্মল আনন্দ অহুভব করিয়া থাকেন, ইহার অপলাপ করা অসম্ভব।...সত্য বটে, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কেহ কেহ স্থখাহুভব করিতে পারেন না।...রসবিষয়িনী বাসনা না থাকিলে রসের আবাদন বা অহুভব হয় না।...যাহার বোদ্ধত্ব শক্তি নাই, তাহার নিকট উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাস্যাম্পদ হইয়া থাকে।...এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, দর্শনশাস্ত্রে যদি রস আছে, তবে ঐ রস কি নামে অভিহিত হইবে?

এতদ্বারা বক্তব্য এই যে, উহা 'অদ্বৈতরস' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। বিশ্ব বা চমৎকার যে রসের স্বাস্থ্য, তাহার নাম 'অদ্বৈতরস'। স্বপ্নক স্বপ্ন ও পরপক্ষ প্রতিবেদ উপলক্ষে দর্শনকারগণ বৈরাগ্য অলৌকিক কৌশল ও অদ্বৈত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্মিত বা চমৎকৃত হইতে হয়।^১

অবশ্য দর্শনশাস্ত্র হইতে এই প্রকারে রস আহরণের চেষ্টা অনেকটা কষ্ট-কল্পনা। এই মতের সহিত অনেকেই হয়তো একমত হইবেন না। কিন্তু এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দর্শনশাস্ত্রের শুশ্রূষা বিচারপদ্ধতিতে একটা সৌন্দর্য আছে। বুদ্ধির নির্মলতা, স্বল্পগ্রাহিতা, যুক্তির পথে পরমত খণ্ডন ও স্বমত স্থাপনের সৌন্দর্য যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দর্শনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিচারের পথে, সংশয়ের নিরসন হয় যুক্তি ও তর্কে। সমালোচনা সাহিত্য হিসাবে তাই দর্শন ও দর্শনভাষ্যের দাবি উপেক্ষণীয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় দর্শন সংক্ষিপ্ত ও সংহত সূত্রাকারে গ্রথিত। এই সূত্র অগ্নি-কুলিনের মত। বুদ্ধিদীপ্ত এই বাক্য আশ্রয় দীপ্তির প্রকাশক। সূত্র স্বরাক্ষর, কিন্তু অনেকার্থ বাসক।^২ প্রমিতাক্ষর এই বাগ্‌বিত্তি দর্শন শাস্ত্রের অন্ততম গৌরব। 'সং স্বল্পং তস্মিষ্টম্'—এ উক্তিও দর্শন-সূত্র সম্পর্কে সত্য।

তৃতীয়তঃ দর্শনের জীবন-নিষ্ঠা। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, ইহা জগৎ-বিশ্ব। সত্য বটে দুঃখের উপর এদেশের দর্শনে অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইরাছে। কিন্তু জগৎ ও জীবনকে ইহা অগ্রাহ করিয়াছে, এ অভিযোগ সত্য নয়। ইহলোক ও পরলোক, অদ্বৈত ও নিঃশ্রেয়স্ দুইই দর্শনের বিচার্য। ভারতীয় কোন দর্শনই ইহকালের চিন্তাকে পরিহার করে নাই। বস্তুকে ভিত্তি করিয়াই ইহা অবস্থার আলোচনা করিয়াছে। বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দর্শনের সমীক্ষা স্বগভীর মর্ত্য-প্রীতির পরিচয় বহন করে। ভারতীয় দর্শন জীবন-ভীক, কর্ম-ভীকর দর্শন নয়, ইহা জীবন-প্রেমিকের দর্শন। সর্বোপরি দুঃখের কবল হইতে আত্যন্তিক মুক্তির লক্ষ্যে বাহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারা কর্মে, প্রেমে ও জ্ঞানে সন্দের শাস্ত্র শিবময় জীবনের প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাহ করেন নাই। সাহিত্যের লক্ষ্য যদি হয় কল্যাণময় জীবনের আদর্শ প্রচার, সে আদর্শ দর্শনশাস্ত্র যথাযথ প্রচার করিয়াছে। দার্শনিক Thoreau বলিয়া ছিলেন, 'To be a philosopher, is not merely to have subtle thoughts

১। গোপালবহুমল্লিক ফেলোশিপ লেকচার (প্রথম লেকচার)—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

২। সূত্রের লক্ষণ : লবুনি সূচিতার্থানি স্বরাক্ষরপদানি চ।

সর্বভঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহর্মণীষিণঃ ॥

nor to even found a school, but so to love wisdom as to live, according to its dictates, a life of simplicity, independence, magnanimity and trust"^১—ভারতীয় দর্শনেও শুদ্ধ, সাদিক, জ্ঞানময়, কর্মময়, প্রেমময়, উদার ও হৃদয় এই জীবনের ভূমিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই দর্শনের চরম প্রাপ্তি হওয়ার মধ্যে। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ নির্মল, চিয়য়, আনন্দধন ও অনন্ত। কিন্তু মোহকণ্ঠকে এই সত্য-বোধটি লাভ হয়। মানুষের এই মে হাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে স্ব-স্বরূপের সন্ধান দেওয়া, সাধের মধ্যে তাহা অনন্ত সত্যকে উদ্বোধিত করা: এদেশের দর্শনের চরম লক্ষ্য। দর্শনের সত্যাবোধে উদ্ধৃত্ত মানব পূর্ণ মানব। দর্শন মানুষকে এই হুউচ্চ মানবতার স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে। 'শিবের ক্ষতয়ে', 'রামাদিবং প্রবর্তয়িতব্যং ন চ রাবণাদিবং'—সাহিত্য মীমাংসার এই সকল নির্দেশ পালনের দিক হইতে দর্শনের সাহিত্যিক বুল্য তর্কাতাত।

চতুর্থতঃ প্রায় প্রত্যেক দর্শনেই স্ত্রীকাকারে কিছু কিছু কাহিনীর ইঙ্গিত আছে। কাহিনীগুলি প্রতি বা লোকগাথা হইতে সংগৃহীত; পুরাণেও এসকল কাহিনীর বিবৃতি আছে। এগুলির গল্পমূল্য অল্প নয়। সাংখ্যদর্শনের চতুর্থ অধ্যায় এই প্রকারের কতকগুলি কাহিনীর ইঙ্গিতে পূর্ণ, যেমন, 'নিরাশঃ স্ত্রী পিঙ্গলাবৎ' [সাং. সূঃ ৪. ১১], কিংবা 'তদবিস্মরণেহপি ভেকাবৎ' [সা. সূ. ৪. ১৬]। স্ত্রীকাকার এখানে দুইটি কাহিনীর ইঙ্গিত করিয়াছেন:

(১) নিরাশ হইলে স্ত্রী হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত পিঙ্গলা। পিঙ্গলা নারী এক পণ্যাশ্রম। অধিক পণ্য লাভের আশায় দয়িতের আশ্রম-প্রতীক্ষা করিয়া রাত্ৰি আগরণের ক্রোধ ভোগ করিল। আশার তাড়নায় দারুণ অ-ইরতার মধ্যে সে রাত্ৰির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিল। শেষ প্রহরে সে আশা ত্যাগ করিয়া স্বখে নিজা গেল।

(২) দ্বিতীয় কাহিনী-বীজের অবতারণা তত্ত্বজ্ঞান বিস্মরণের প্রসঙ্গে। এক ভেকী রাজকন্ডার বেশ ধারণ করিয়া বনমধ্যে বসিয়াছিল। এক রাজা বনে ভ্রমণ করিতে গিয়া সেই কন্ডাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভাব্যরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ভেকীরাপিত্তী রাজকন্ডা কহিল, জল দেখাইলেই আমি চলিয়া যাইব। রাজা সেই সত্রেই হৃদয়রূপে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন অতিক্রান্ত হইতেই রাজা সর্ব বিশ্বস্ত হইলেন। একদিন ক্রীড়াশ্রান্ত রাণী রাজার নিকট জল প্রার্থনা করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সরোবর দেখাইয়া দিলেন। রাণী অমনই ভেকারূপ ধারণ করিয়া সেই ভলে অন্তহিতা হইল।

দর্শনশাস্ত্রের 'তায়' এই প্রকারের অসংখ্য কাহিনীর কথা-বীজ। 'তায়ের' সাধারণ-অর্থ—যুক্তিযুক্ত দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তগুলি নিঃসন্দেহে কাব্যামোদীর আদরনীয়। এগুলি সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের মত উদ্ধৃত হয় : যথা অন্ধ গোলাপুলতায়, অন্ধ-পঙ্কতায়, অন্ধহস্তীতায়, উষ্ট্রকণ্টকভোজনতায় ইত্যাদি।

এই তায়গুলির আর এক দিক দর্শনের উপমাগর্ভ বাচন। এগুলিও দৃষ্টান্ত। বেদান্ত-ভাষ্যের বহুবিখ্যাত উপমা—রজ্জ্বো সর্পভ্রান্তি, শশশৃঙ্গবৎ, ধ-পুষ্পবৎ, লুতাভক্তবৎ, ইত্যাদি; বেদান্তদর্শনের উপমা—‘অবিরোধশব্দনবৎ’ [বঃ সূঃ ২. ৩. ২৩], ‘ব্যতিরেকো-গদ্যবৎ’ [ব্রঃ সূঃ ২. ৩. ২৬]; তায়-বৈশেষিকের উপমা—চালনীতায়, বাচীতরকতায়, বীজাকুরতায়, শতপত্রভেদতায়; সাংখ্যদর্শনের উপমা—কুস্থমবচ্চমণি [সা. সূ. ২ ৩৫], দেহবৎ বংসায়, [২. ৩৭], কুমারীশব্দবৎ [৪. ২] প্রভৃতি।

দর্শনের শুদ্ধ মরুভূমিতে এই ধরনের সরস দৃষ্টান্ত মনোহর মরুজানম্বরূপ। এই সকল লৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে অধ্যাত্মলোকবিহারী দর্শনকারগণের অতি সূক্ষ্ম বস্তু-দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই সম্ভবতঃ দার্শনিক বসেন;

তর্কেষু কর্কশধিষো বয়মেব নান্তে।

কাব্যেষু কোমলধিষো বয়মেব নান্তে ॥

৫. বাংলা সাহিত্যে দর্শনের প্রভাব

কিশেবজগৎ মনে করের, বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে দর্শনের চর্চা প্রচলিত ছিল। তায়-বৈশেষিক বাংলার নব্য ত্রায়ে বিশিষ্ট রূপান্তর লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে বেদান্তের চর্চাও অব্যাহত ছিল। এদেশে ‘স্বতি’ পূর্বমীমাংসার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এদেশের জনসাধারণ, তথা জনকেন্দ্রিক সাহিত্যে সাংখ্য-যোগের প্রভাবও অপরিদেয়। একে একে এই প্রভাবগুলির বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ তায়-বৈশেষিক ॥

পূর্বই বলা হইয়াছে, সেন-পূর্ববঙ্গে বাংলাদেশে তায়-বৈশেষিকের চর্চা প্রচলিত থাকিলেও, প্রাচীন তায়-বৈশেষিককে গ্রাস করিয়া এদেশে বিস্তৃত হইয়াছে নব্য তায়। নব্য তায়ের বিখ্যাত পণ্ডিত বাংলার রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ‘এদেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বহু ন্যায়ের প্রাধান্য’ [সাংখ্যদর্শন—বিবিধ প্রবন্ধ]। বাঙালী জাত-নৈয়ায়িক।

আজের চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বাংলার তায় গ্রন্থ অনুদিত

হইয়াছিল।^১ অন্ত্যবাদক কালীনাথ তর্কশঙ্করন। গ্রন্থখানি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ছল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রথম হস্তটির অন্ত্যবাদ এইরূপ :

প্রমাণ প্রমেয়গণ বাদজ্ঞ প্রয়োজন

দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তর্ক-ছল।

বিতণ্ডা জ্ঞাতি সংশয় অবয়ব বিনির্গম

হেতুভাস নিগ্রহের স্থল ॥

তায় গ্রন্থ রচনা বা তাহার অন্ত্যবাদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বাঙালীর চরিত্রে জ্ঞানের প্রভাব। জ্ঞানের অন্ত্যতম লক্ষ্য প্রতিবাদীর নিগ্রহ, অমত প্রতিষ্ঠা ও দ্বিবিজয়। ষোড়শ শতকের নবম্বাশে এই দ্বিবিজয়ের সমারোহ দেখা গিয়াছিল। জ্ঞানের ‘ছল’-এর বাংলা নামান্তর ‘কলিকাক’ বা কাকিক। স্বয়ং মহাপ্রভু পড়ুয়া অবস্থায় সহপাঠীদ্বিগকে এই কাকিক জিজ্ঞাসা করিয়া অস্তির করিয়া তুলিতেন : ‘পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সন্ধ্যায়’, কখনও দস্তুরে বলিতেন, ‘হেনজন্ম দৈপি কাকিক, বলুক আমার’ [চৈঃ ভাঃ আদি. ৭]। দ্বিবিজয়ী পণ্ডিতের নিগ্রহ ও সার্বভৌম-বিজয় মহাপ্রভুর জীবনের অন্ত্যতম কীর্তি। বাংলায় তর্ক-প্রগতি ছিল সকলের উপরে। ব্যাকরণ হউক, কবিত্ব হউক, বেদান্ত হউক বিচার হউত তর্কশাস্ত্র অনুসারে। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের যে অবশেষ ছিল তাহাও ছিল তর্ক-প্রধান। চৈতন্য চারতামুতে বলা হইয়াছে :

তর্ক প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে। তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে ॥

বৌদ্ধাচার্য নব প্রধান উঠাইল। দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল (মধ্য ১)

ষোড়শ শতকেই বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণি ও বাসুদেব সার্বভৌমের আবির্ভাব। এই শতকেই মিথিলার দর্পচূর্ণ করিয়া বাঙালী মনীষা নব্য-ন্যায়কে এদেশের নিজস্ব সামগ্র্য করিয়া তুলিল। সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়া নব্য জ্ঞান আরও হৃদয় ও জটিল আকার ধারণ করিল। কলে কুফলও দেখা দিল। বুদ্ধির স্বন্দতা শুক মারপ্যাচে পরিণত হইল, বিস্তৃত ‘বাদ’-এর স্থলে জল্প, ছল, বিতণ্ডা প্রধান হইয়া উঠিল, জ্ঞান-বৈশেষিকের তত্ত্ব ডুবিয়া গেল, মুখ্য হইয়া উঠিল তর্ক। নব্য জ্ঞানে যুক্তিতর্ক এমন কূটতর্কে পরিণত হইল যে, ‘তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল’, কিংবা ‘চিপ্ করিয়া তাল পড়ে, না তাল পড়িয়া চিপ্ শব্দ হয়’—এই অবাস্তব বিচারগুলি বড় হইয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, বিজয়ের মোহে যেন তেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষ নিগ্রহ করাই প্রধান লক্ষ্য হইল। ‘অস্তি কিন্ন বেতি’ (আছে, কি নাই) বলিয়া নৈয়ায়িকগণ তর্কে তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিতেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হাভাহাতিও বাদ বাইত না।

ঈশ্বরে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে বর্ণ-পরিচয়ের পরই

১. বাঙালীভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী [লাঃ পরিবৎ পত্রিকা, ১৩৩২, ৪র্থ সংখ্যা]।

অথবা সংকৃত ভাষায় অতি সাধারণ জ্ঞান লাভের পরই কায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করা হইত। সেইজন্য বোধ হয় ছড়া বাঁধিয়া কায়ের কোন কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। ‘বান্ বান্ বজিয়া, সাধ্য আন গজিয়া’ প্রভৃতি ছড়া আজ পর্যন্ত পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। কায়ের এই বিকৃত পরিণাম বাংলা সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের বিকৃত কচির যুগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যে তাঁড়ামি প্রচলিত ছিল, তাহার প্রধান আশ্রয় কায়ের ‘ছল’; গোপালভাঁড়ের এই ছলাশ্রয়ী তাঁড়ামিতে স্বয়ং মহারাজ পর্যন্ত বহুবার প্রতারিত হইয়াছেন। যেমন,

একবার গোপালভাঁড়ের নির্দেশে তাহার পুত্র আসিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বলিল, ‘মহারাজ, আমার পিতার ‘কৃষ্ণ-প্রাপ্তি’ হইয়াছে।’ শুনিয়া রাজা হুঃখিত হইলেন, এবং শ্রাদ্ধাদি কার্যের জন্য তাঁড়পুত্রকে অর্থ প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং গোপালভাঁড় একটি কৃষ্ণমূর্তি হাতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্তে কহিলেন, মহারাজ আমার এই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়াছে।

কায়ের ছল, জল্প ও বিতণ্ডার স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের শেখাৰ্ণে ও ঊনবিংশতকের প্রথমে প্রচলিত তরঙ্গ ও কবির লড়াইয়ে। এই সকল লড়াইয়ের দুই দল কায়-মতের দুই বাদী ও প্রতিবাদী বা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ; ইহার চাপান ও উত্তোর তর্কের পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ; বাদ-প্রতিবাদের মুখ্য আশ্রয় ছল, জল্প ও বিতণ্ডা; ইহার লক্ষ্য প্রতিপক্ষের নিগ্রহ। এই বাগ্‌যুদ্ধ কায়ের বাগ্‌যুদ্ধের মতই কৌতুকোদ্দীপক। ইহার প্রধান আকর্ষণ কথা-কাটাকাটি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। এ্যান্টনী ফিরিজি ও ভোলা ময়রার লড়াই :

এ্যান্টনী : ভদ্রন পূজন জানি না মা জেতেতে ফিরিজি।

যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গি ॥

ভোলা : তুই জাত ফিরিজি জবড়জঙ্গি—

আমি পারব না রে তুরাতে।

যীশুখ্রীষ্ট ভজ গা তুই শ্রীরামপুরের গির্জাতে ॥

এ্যান্টনী : সত্য বটে বটি আমি জাতিতে ফিরিজি।

(তবে) ইহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন

অস্তিত্বে সব একাকী ॥

অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কবিরাজদের আসরে কায়ের এই বিকৃত পরিণাম নিশ্চয়ই নৈয়ায়িক বাঙালীর তেমন গোরবের পরিচয় নয়। গ্রাম্য কায়চক্র বা তর্কপঞ্চাননগণও কায়কে দলাদলি ও কথা-কাটাকাটির অন্তরূপেই ব্যবহার করিয়াছেন [ঔষধ শরৎচন্দ্রের

‘বোড়শ’ নাটক]। কিন্তু এই জায়গায় বাঙালীকে সভ্যতার গোরবের আসন প্রদান করিয়াছে। বাঙালীর বিচক্ষণতা, হৃদয়শক্তি ও চুলচেরা বিচারের মূলে নব্য জায়েরই প্রভাব। বাঙালীর বাগ্মিতায় জায়ের যুক্তি। বীরবল প্রমথ চৌধুরী বলেন, বেঙ্গের শেষ নৈয়ায়িক রাজা রামমোহন। একথা ঠিক নয়। নব্যযুগে বাঙালী যে সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার পদ্ধতি, পরমতত্ত্বগুন ও স্বমতস্থাপনে যুক্তিবিজ্ঞান বাঙালীর চিরাগত নৈয়ায়িক-যুক্তিরই পরিচয় বহন করে।

॥ সাংখ্যমত ॥

বাংলার সাংখ্যের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, ‘যখন গ্রামে, নগরে, মাঠে, জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী পূজায় বাজ শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে’ [সাংখ্যদর্শন—বিবিধ প্রবন্ধ]। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সাংখ্যদর্শনের উৎপত্তি বহুদেশে; সাংখ্যকার কপিল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বেঙ্গের অধিবাসী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই মতে বিশ্বাসী [ঐষ্টব্য বৌদ্ধধর্ম—শাস্ত্রী]।

কিন্তু মনে হয়, বাংলায় সাংখ্যের প্রভাব সরাসরি সাংখ্য হইতে বিস্তৃত হয় নাই, বিস্তৃত হইয়াছে পুরাণ-তন্ত্রের মধ্যস্থতায়। বাংলা দেশ তন্ত্রের দেশ, বাঙালী মাতৃতান্ত্রিক জাতি। বাঙালীর চিন্তায় ও কর্মে শাক্তাচারের প্রভাব। এই তত্ত্বভাবের সহিত সাংখ্যের যোগাযোগ অতি নিবিড়। সাংখ্য প্রকৃতি-প্রধান, তত্ত্বও শক্তি-প্রধান; সাংখ্যে প্রপঞ্চসৃষ্টির মূল প্রকৃতি, তন্ত্রেও শক্তিই ক্রিয়াক্রান্তি অর্থাৎ শক্তি হইতেই সৃষ্টিপত্তন ও সৃষ্টির লীলা; সাংখ্যের পুরুষ অকর্মা ও উদাসীন—তন্ত্রোক্ত শিবও শুদ্ধ-শান্ত ও নিষ্ক্রিয়। স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মনে করেন, এদেশের কালীযুক্তি সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের আদর্শেই কল্পিত [ঐষ্টব্য ‘তান্ত্রিক গুরু’]। বাংলাদেশে সাংখ্য আসিয়াছে এই তন্ত্রের মাধ্যমে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও বলেন, The samkhya idea of Purusha and Prakriti was inherited by vernacular through the medium of Purana in a more anomalous form.

বাংলা মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিপত্তন অংশ বিশ্লেষণ করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তন্ত্রে প্রপঞ্চসৃষ্টির ক্রম অবিকল সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত; পুরাণে উহাই আবার বেদান্তাদি মতের সহিত যুক্ত হইয়া বিমিশ্র আকার ধারণ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিবর্ণনায় এই বিমিশ্র ধারারই অনুসরণ। এই বিমিশ্র ধর্মের মধ্যে সাংখ্যের ধর্মটি লক্ষ্যীয়, যেমন,

এক দেব নানা যুতি হৈল মহাশয় ।
 হেম হৈতে কুণ্ডল কতু ভিন্ন নয় ॥
 প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিল আধান ।
 রূপবান্ হৈল তাতে তনয় মহান্ ॥
 মহতের পুত্র হৈল নাম অহঙ্কার ।
 বাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার ॥
 অহঙ্কার হৈতে হৈল পঞ্চজন ।

পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥ [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]

—এখানে প্রকৃতি হইতে প্রাণক সৃষ্টির ক্রমটি অবিকল সাংখ্যের । পরিণামবাহটিও ['হেম হৈতে কুণ্ডল কতু ভিন্ন নয়'] সাংখ্যের—কিন্তু 'এক দেব নানায়ুতি হৈল মহাশয়'—ইহা বেদান্তের বিশিষ্টাধৈতবাদ । বিশুদ্ধ সাংখ্য নয়, শক্তিবিশিষ্টাধৈতবাদ ও স্মৃত্যু দুই মিলিয়া বাঙালীর সৃষ্টি করনা । ইহার প্রকাশ দেখা যায় বাংলার শাস্ত্র গীতিতে :

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী
 মহতে ত্রিগুণ দিয়া নিগুণা হলে আপনি ॥
 তুমি চিং-অভিমুখী, কার্যহেতু চিং-বিমুখী ।
 চিদানন্দে পিছে রাখি চিত্তানন্দে উন্মাদিনী ॥
 ত্যজ্য করি নির্বিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে ;
 সৃষ্টি কর সবিকারে বিকাররূপিণী ॥ [রসিকচন্দ্র রায়]

এখানে সাংখ্যের সহিত অন্তান্ত মতের মিশ্রণও লক্ষ্যীয় । বিমিশ্র সাংখ্যই বাংলার সাংখ্য । বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, এদেশের দুঃখবাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাংখ্যজাত । কিন্তু এমন সর্বাংশে গ্রহণীয় নয় । দুঃখবাদ কেবল সাংখ্যের নয়, সমগ্র আন্তিক দর্শনের । বৈরাগ্যও সাংখ্যের নয়, অধৈত বেদান্তের । বরং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদের সহিত এদেশীয় সংস্কারের মিল আছে । সাংখ্যমতে ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই ; জ্ঞান, কর্মে, ঐশ্বর্যে ও বৈরাগ্যে সিদ্ধ পুরুষই ঈশ্বরস্থানীয় । মনসামঙ্গল কাব্যের অমিত শক্তিশ্বর মহাজ্ঞানী চন্দ্রধর এই ঈশ্বর-সংস্কৃত পুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । বস্তুতঃ মাহুষ-পুরুষই ঈশ্বর,—সাংখ্যের এই মত মনুষ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক । বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনে এই সাংখ্যমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন । উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে । এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানব চরিত্রেরই সমালোচনা

করিব।' উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, 'উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র, সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিযুক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাধের, অপরাধিত, বিতৃষ্ণ, প্ৰামদ, প্রীতিময়, দয়াময়, অশ্রুচের কর্মে অপরাধমুখ, ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, কায়নিষ্ঠ, ক্ষমামূল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহঙ্কার যোগযুক্ত তপস্বী। তিনি মাহুর্ষী শক্তি দ্বারা কর্ম নিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমাহুর্ষ এই প্রকার মাহুর্ষী শক্তি দ্বারা অতিমাহুর্ষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মাহুর্ষ্য না ঈশ্বরকে অহমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবৈবেচনা অহুসারে স্থির করিবেন।' [কৃষ্ণ চরিত্র]। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি সাংখ্য মতেরই প্রতিক্রিয়া, যে সাংখ্য বলেন, ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইতেছে 'মুক্তান্যনাং প্রশংসা উপাসামিদ্ধস্য বা' [সা : সূ : ১. ২৫]। শ্রদ্ধের মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় মনে করেন, বঙ্কিম চন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বই রসযোগে 'জীবন-কাব্য' হইয়া উঠিয়াছে। 'মানব-বন্দনা'র কবি অক্ষয় কুমার বড়ালও ইউরোপীয় বিবর্তন বাদকে স্বীকার করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সাংখ্যকেই স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যের প্রভাব প্রচ্ছন্ন বস্তুধারার মত এদেশবাসীর অন্তরে প্রবাহিত—অলক্ষ্য, কিন্তু গূঢ়সঞ্চারী।

■ যোগদর্শন ■

ভারতীয় সাহিত্যে যোগদর্শনের প্রভাব অপরিমীম; এদেশের সাধন-জীবন যোগাঙ্গরী। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই যোগের দুইটি ধারা—একটি আদিমতম যোগের ধারা, অপরটি বেদান্ত-রচিত যোগের ধারা। দ্বিতীয় ধারাটিই পুরাণাদিতে স্থান লাভ করিয়াছে; আর প্রথম ধারাটি তন্ত্রাচারের সহিত যুক্ত হইয়া হিন্দুতন্ত্রে, বৌদ্ধতন্ত্রে, নাথধর্মে এবং লোকসাধারণের মর্মে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। এদেশে যে রহস্যময় গুহ্যসাধনার ধারাটি প্রচলিত, তাহাতে আদিমতম যোগ-সাধনার প্রভাবই গুরুতর।

এই আদিমতম ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য, শিব-শক্তির যোগ। আদৌ শিবই ছিলেন যোগীশ্বর, তিনিই যোগশাস্ত্রের প্রচারক। কিন্তু কালক্রমে শিব শক্তির সহিত যুক্ত হইলেন, তন্ত্রধারা আসিয়া মিলিল যোগধারার সহিত। তাহার ফলে শক্তি-সাধনায় যেমন আসন-প্রণায়াম, বায়ুধারণ প্রণালী গৃহীত হইল, তেমনই আবার তন্ত্রের ঘটচক্র, কুণ্ডলিনী শক্তি, হুক্কার বীজ ও শক্তি-সহায়ে সাধনার পদ্ধতি যোগের সহিত যুক্ত হইল। বস্তুত: পরবর্তীকালে যোগ ও তন্ত্রের স্বল্প পার্থক্য লুপ্ত হইয়া গেল। শিব ও শক্তি-

বেমন যুগল, যোগ ও তত্ত্বও ভেদনই যুগল হইল। বাংলার প্রচলিত শৈব ও শাক্ত ধর্ম এই যোগ ও তত্ত্বের মিলিত রূপ।

এই ‘যোগে’ পাতঞ্জল দর্শনোক্ত ‘যোগ’ শব্দের অর্থ-বিকৃতি লক্ষণীয়। পাতঞ্জল দর্শনে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ ; কিন্তু শৈব বা তাত্ত্বিকযোগে যোগের অর্থ ‘মিলন’। সহস্রারচিত শুদ্ধ শিবের সহিত মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনীর মিলন বা যোগই তাত্ত্বিক যোগ ; আর শৈব যোগে নাদ-বিন্দু বা সূর্য-চন্দ্রের মিলন [নাদ = সূর্য = নারায়ণঃ, বিন্দু = চন্দ্র (অমৃত) = পুরুষ বীর্য]। এই যোগে বাস্তব নয়নারী, বাহারা ষষ্ঠাক্রমে শিব ও শক্তির প্রতীক, তাহাদের দেহগত মিলনও স্বীকৃত। বেদান্ত প্রভাবে এই যোগই আবার জীবাত্মা-পরমাট্মার মিলনরূপে পরিগৃহীত। যোগের সাধনাও শুদ্ধ ও রহস্যময়। ইহার ক্রিয়া দেখকে লইয়া, দেহস্থ বায়ুকে লইয়া। প্রধান ক্রিয়া—দেহে ‘শবন বন্দী’ করা এবং বায়ু, মন ও শুক্রকে উপর দিকে চালনা করা। ইহা ‘কায়াসাধন’, ‘উলটাবাওয়া’ ‘পলটযোগ’ প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

যোগের শেষ লক্ষ্য সিদ্ধযোগী হওয়া। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকে বলা হইয়াছে স্ব-স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ জীবনবৎ হওয়া। বেদান্ত-প্রভাবে ইহাকে ‘সোহম্’ অবস্থা বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শৈব বা শাক্ত মতে ইহা ‘শিবোহম্’ অবস্থা। ইহাই ‘জ্যাস্তে মরা’ বা ‘মহাজ্ঞান’-এর স্তর। কিন্তু এই স্তর শেষ লক্ষ্য হইলেও, জনসাধারণের ভিতর পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত যোগ-বিকৃতি লাভ করাই মুখ্য লক্ষ্য। ইচ্ছামাত্র অন্তর্ধান হওয়া, যে-কোন রূপ ধারণ করা, ইচ্ছামূরূপ বস্তু লাভ করা প্রভৃতি অলৌকিক প্রাপ্তির জন্যই জনসাধারণের যোগ। ইহার অপর লক্ষ্য অমরত্ব অর্জন করা। যোগদ্বারা মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়, ইহা লোকজগতের বদ্ধমূল ধারণা।

বাংলাদেশে প্রচলিত লৌকিকধর্মে ও সাহিত্যে এই মিশ্র যোগাচারের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথ পন্থ, বাউল—সকলেই প্রকারান্তরে যোগী।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্গণ নিজেদিগকে বলিয়াছেন, ‘জোই’ বা যোগী। কাহ ‘কাপালী যোগী’ [১১ নং চর্চা], অস্তান্ত গানেও ‘জোই’ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। একটি গানে যোগীর বেশ বর্ণনা করা হইয়াছে :

আলি কালি বন্টা নেউর চরণে।

রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥

রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।

পরম মোক্ষ লবএ মুক্তিহার ॥

—নিহিতার্থ বাদ দিলে, অর্থ দাঁড়ায়,—যোগীর চরণে নৃপূর, কর্ণে কুণ্ডল,

কর্তে হুকাহার, দেহে ভ্রম । ইহাই বোঙ্গীর সাধারণ বেশ । বোঙ্গীরা যে কর্তে
হাড়ের মালা ও হস্তে ডমরু ধারণ করেন, তাহার উল্লেখও পাওয়া যায় ।

বৌদ্ধ সহজ সাধকগণ সহজ স্তম্ভ কামনা করেন । এই সহজ স্তম্ভের অথবা মহাস্তম্ভের
অবস্থা, আনন্দধন অধ্যাক্ষানের অবস্থা । ভাব ও অভাব, লৌকিক দুঃখ ও স্তম্ভ এ
অবস্থায় একাকার । যতক্ষণ চিত্ত চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ এ অবস্থায় উপনীত হওয়া
যায় না ; চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে । ইন্দ্রিয় সংযোগে চিত্ত চঞ্চল হয় ও জীব
অগ্নিবৃত্তার অধীন হয় । চর্যাকার বলেন,

কাম্মা তরুবর পঞ্চবি ডাল ।

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥ [১নং চর্যা]

চিত্তের এই চাঞ্চল্যকে দমন করিবার জগুই বোণ । যে দেহে চিত্তের অবস্থান,
তাহা বায়ুর বাহন । বায়ুই চাঞ্চল্যের কারণ । বায়ু নিষ্কল হইলে, দেহের নিরোধ হয়,
মন স্থিরীয়া যায়, চিত্ত-চাঞ্চল্য দমিত হয় তাই সরহপাদ বলেন,

জহি মন-পবন ন সঙ্করই

রবি শলী নহি পবেশ ।

তহি বট চিত্ত বিসাম কর

সরহে কহিঅ উবেশ ॥ [সরহপাদের দোহা]

—যেখানে মন-পবনের সঙ্করণ নাই, যেখানে চক্ষু স্তম্ভের প্রবেশ নাই, সরহ বলেন,
সেইখানে চিত্তকে বিশ্রাম করাও ।

এই স্থানটি দেহের অগ্ন্যুত্তীর্ণ মার্গ বা দেহস্থ মধ্যপথ (‘মঝ বেণী’) বা সোজা পথ
(‘উজুবাট’) : দেহ-মেরুর বামে ও দক্ষিণে যে নাড়ী আছে, তাহাতে বায়ু প্রবাহিত
হইলে চিত্ত স্থির হইবে না ; আঁকাবাঁকা পথে বায়ু বহিলে চিত্ত চঞ্চল হইবেই । চর্যাগানে
ডাইনে বাঁয়ের এই নাড়ীগুলি প্রায়ই খাল-বিখালের সহিত উপমিত হইয়াছে । ডাইনে-
বাঁয়ের খাল ছাড়িয়া ‘উজুবাটে’ সোজাপথে—অগ্ন্যুত্তীর্ণমার্গে চলিতে হইবে অর্থাৎ বায়ু,
শুক ও মনকে মধ্য নাড়ীতে চালনা করিতে হইবে :

বাম দাহিণ জো খাল-বিখলা ।

সরহ ভণই বাপা উজুবাট ডাইলা ॥ [৩২ নং চর্যা]

বস্তুতঃ বোণের আসন, কায়সাধন, পবন-বন্ধন প্রভৃতির উল্লেখ চর্যার বহুপদেই
দৃষ্ট হয় । একটি পদে পবন স্থিকের সহিত উপমিত হইয়াছে । সাধক বলিতেছেন,

পবন-সুবিধ দেখের অব্যত ভক্ষণ করিয়া লয়, অতএব, ‘মাররে হোইআ মুসা-পবনা’ [২১ নং চর্চা]

যৌক্তিক সহজিয়ার সহযোগী নাথপন্থ যোগী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, ‘The Nath cult is essentially a yogic cult’; উক্তিটি অতি সত্য। নাথধর্মের বিশিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ কোলজাননির্গয়, হঠযোগপ্রদীপিকা, যোগচিন্তামণি, পবন-বিজয় স্বরোদয় প্রভৃতি। বাংলা দেশে প্রচলিত নাথ-সিদ্ধাই-গীতিকাগুলিও যোগের নানা কথায় পূর্ণ। এই ধর্মের মূল লক্ষ্য যোগিক উপায়ে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা বা ‘মহাজ্ঞান’ বা মৃত্যুঞ্জয় যোগ-কৌশল আয়ত্ত করা। নাথ-গীতিকার হুচনা মহাদেবের প্রতি গোরীর এই প্রশ্ন লইয়া :

তুমি কেনে ভর গোঁসাই আমি কেনে মরি।

সেই তবু কহ গোঁসাই যুগে যুগে তরি। [গোথ’-বিজয়]

গোরীর এই প্রশ্নের উত্তরে শিব যে তব উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা যোগ। মীননাথ, গোরক্ষনাথ যোগসিদ্ধ। যোগ ভুলিয়াই মীননাথ বদ্ধ হইয়াছিলেন, যোগ-কৌশল দ্বারাই গোরক্ষনাথ গুরুকে মোহ-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মীননাথের প্রতি গোরক্ষের যাবতীয় উপদেশ যোগেরই উপদেশ,

নাচিন্তি যে গোথ’নাথ শূন্য করি ভর।

কায় সাধ কায় সাধ গুরু মোছন্দর ॥...

বারে-বাউরে প্রবোধ দিয়া বায়ু কর বন্দী।

মূল কমল মধ্যে বায়ুর বোঝ সন্ধি ॥...

মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কলা।

বন্ধনালে সাধ গুরু না করিহ হেলা ॥ [গোথ’বিজয়]

বাংলার বাউলও যোগপন্থ। এদেশের জনসাধারণের প্রত্যেকটি ধর্ম-সাধনায় অন্তর্ভুক্ত সাধনার মিশ্রণ থাকিলেও পথ মূলত যোগের। বৈষ্ণব সহজিয়া, মুসলমান ককির এমন কি ‘তিনাথের চেলা’—সকলেরই সাধন যোগ। লোকসাধারণের মধ্যে যোগের পারিভাষিক নামগুলি পরিবর্তিত হইয়াছে বটে, উহাতে তহাচার ও বেদাচারের প্রভাবও বস্তুত হইয়াছে, তথাপি যোগের মূল ক্রিয়া ও যোগ-বিকৃতি লাভের বিশ্বাস অক্ষুন্ন আছে। ‘উজান বাওয়া,’ ‘উন্টা বাওয়া’ প্রভৃতি কথা যোগেরই কথা।

যোগ সাধনার প্রভাব অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যেও স্বস্পষ্ট। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যোগ-প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট উল্লেখ দেখি। ‘রাধা বিরহে’ কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,

আহোনিশি যোগ ধোয়াই ।

মন পবন গগনে রহাই ॥

মূল কমলে করিলে মধুপান ।

এবে পাইঞা আন্ধে ব্রহ্ম গেআন ॥

বিপ্রহাসের ‘মনসা বিজয়’ কাব্যেও পদ্মার বিষঝাড়ন প্রক্রিয়ার যোগের কথাই বলা
হইয়াছে । বিষে ঢলিয়া পড়া মহাদেবকে পদ্মা বলিতেছেন,

মহাযোগী মহাকুন্ড চিন্তা যোগ’সন ।

নিরঞ্জন-আদি ব্রহ্মতত্ত্বে দেহ মন ॥

খড়্গা ভেদি উঠে বিষ স্তমেক-শিখর ।

ইন্দ্রলা পিঙ্গলা চিন্তা সমুদ্র ভিতর ॥

কেন ত্রিভুবননাথ আপনা বিন্ধর ।

মন পবনেতে জীব পরিচয় কর ॥

বিজ্ঞ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, কালকেতু-রূপী নীলাধর শাপমুক্ত হইয়া
স্বর্গে গমন করিলে শিব তাঁহাকে ‘অমরশিক্ষা’ দিতেছেন । এই শিক্ষা যোগশিক্ষা : ‘

শুন শুন কহি তত্ত্ব ওহে নীলাধর ।

আপনা শরীর চিন্তা হইয়া অমর ॥

স্বমুখা প্রধান নাড়ী শরীরেতে বৈসে ।

ইড়া পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে ॥

জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি থরশান ।

ভাটি বান্দি করিযা জোয়ারে দিবে টান ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, লোকায়ত যোগ পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগ হইতে স্বতন্ত্র । ইহাতে
একদিকে পাড়িয়াছে তন্ত্রের পঞ্চম ম-কারের প্রভাব । চন্দ্র-সূর্য-মেলন বা মহারস পান
উহার প্রকারভেদ । চন্দ্র হইতেছে রসাতলক সোম বা শিব এবং সূর্য হইতেছে ধ্বংসশীল
শক্তির প্রতীক ; বিন্দু উভয়াত্মক অর্থাৎ পুরুষবীর্ষ ও নারীরজঃ-এর (শ্বেত ও রক্তের)
মিলিত রূপ । লোকায়ত যোগে এই মেলনক্রিয়া ও তাহার ফলে মহারসোৎপত্তির উপর
গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । এই রস বাহিরের রস নয়, লৌকিকভাবে নর-নারীর
মিলনে যে বিন্দু উৎপন্ন হয়, সাধক পবন জয় করিয়া উর্দ্ধা সাধনায় তাহা সহস্রারে লইয়া
যান এবং সহস্রার-করিত সেই মহারসে সিন্ধুদেহ অভিষিক্ত করেন । লোকায়ত যোগের
এই যেমন একদিক, তেমনই উহার অপরদিক ‘মহাজ্ঞান’ বা ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ লাভ । ইহাতে

অঐত বেদান্ত যতের প্রভাব বিস্তারিত। বাংলার বৌদ্ধ-চর্চার লক্ষ্য ব্রহ্মবিহার হিতি—
উহাই ‘জ্যোত্স্না’ জীবন্তজ্ঞির অবস্থা। অলৌকিক সিদ্ধিলাভ তো আছেই।

॥ বাংলার মীমাংসাসাধার ॥

বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে বেদচর্চা প্রচলিত ছিল, তাহা কর্মকাণ্ডপ্রণী। এইজন্য মীমাংসার প্রভাব বাঙালী জীবনে খাফা অস্বাভাবিক নয়। কেহ কেহ মনে করেন, প্রভাকর বা গুরু হইতে যে উদার মীমাংসাদর্শন প্রবর্তিত হয়, বাংলাদেশে সেই মত প্রচলিত ছিল। শালিকনাথ প্রভাকরের ‘বৃহত্তী’র উপর পক্ষিকা (টীকা) রচনা করেন; শালিকনাথ ছিলেন বাঙালী।^১ কিন্তু এই মীমাংসা বাংলার ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতির রূপ ধারণ করায়, এদেশে মীমাংসা স্মৃতিশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ভারতবর্ষমাত্রিকার উদয়ন ইহার আভাস দিয়া বলিয়াছিলেন, ‘গৌড়দেশে অপৌরুষেয় বেদ ও পৌরুষেয় স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ভেদবোধ নাই।’ উক্তিটি অসত্য নয়। এদেশে মীমাংসা পৌরোহিত্য কর্মেরই অঙ্গীভূত। দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র, গুরুব মিশ্র—ভট্ট গুণবিহু, ভট্ট ভবদেব—হলায়ুধ, রঘুনন্দন, শূলপাণি—প্রত্যেকের রচনা স্মৃতি-মিশ্রা মীমাংসার স্বাক্ষর বহন করে। বাংলার নব্যজ্ঞান প্রচারিত হওয়ার আগেও মীমাংসার আদর অনেক পরিমাণে স্পষ্ট হইয়াছে : কারণ ভারতীয় মীমাংসার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে স্মৃতি, অপরদিকে জ্ঞান—এই দুয়ের চাপে পড়িয়া মীমাংসা হীনবল হইয়া স্মৃতির অধীন হইয়াছে এবং এইভাবে বাংলার মীমাংসার প্রতিটি হইয়াছে পুরোহিত-দর্পণে। ক্রিয়ার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, ক্রিয়ার প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত রত্ন, একই মন ভুল হইবার ভয়ে বারবার উচ্চারণ করিবার নিয়ম, অন্তর্ভাবে বিচারহীন আচার-নিষ্ঠতা পরোক্ষভাবে মীমাংসার মনোভাব মনে করাইয়া দেয়। ইহার ফলে সফল অপেক্ষা কুফলই এদেশে বেশি দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ইঙ্গিত করিয়াছেন,—আচারের মক্কালিরাশি এদেশের প্রাণকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা নিঃসংশয়ে বৈদিক কর্মকাণ্ড ও মীমাংসা দর্শনের পরোক্ষ প্রভাব।

॥ বেদান্তের প্রভাব ॥

ভারতবর্ষের ধর্মে, জীবনে ও সাহিত্য বেদান্ত—বিশেষতঃ অঐতবাদের প্রভাব অপরিসীম। এই দর্শন ভারতীয় জীবনের এক মহার্ঘ সম্পদ। কাজে-কর্মে যিনি যতই ঐতবাদী হউন, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অঐত মতবাদ। বহুদেবতার অন্তরালে এক দেবতার অবস্থান, সেই এক নির্দিষ্ট, নিগূর্ণ, অনন্ত, অব্যয় ও অক্ষর—এ বোধ সবই ভারতবাসীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই—পতীর হৃৎকেন্দ্রে দিনে এদেশবাসী

সাহিত্য লাভ করিতে পারে, সকল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে একের মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারে এবং কর্মজীবনেও দুর্জয় শক্তির প্রেরণায় চালিত হইতে পারে। ঐশ্বর্য ও রিক্ততা, ভোগ ও বৈরাগ্য, শক্তি ও ক্ষমতা মিলিয়া যে ভারতীয় জীবনকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মূল প্রেরণা অদ্বৈত দর্শন।

অজ্ঞাত দর্শনে অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিবাদ আছে, মতখণ্ডন আছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, তাহাদের উপরেও অদ্বৈত মতবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। যে সাংখ্যদর্শন অদ্বৈত বেদান্তের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহারও ‘পুরুষ’ বেদান্তের নিম্নলিখিত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন : নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ। যখন আমরা সাংখ্যের প্রকৃতির কার্যক্রমকে চৈতন্তের আলোকে বিচার করি, তখন অজ্ঞাতসারেই তাহার উপর বেদান্তের প্রভাব স্বীকার করিয়া লই। সাংখ্য-কারিকায় ও সাংখ্যসূত্রে বেদান্তের নিশ্চিত প্রভাব বিদ্যমান। সাংখ্যসূত্রের ‘আবৃত্তিরসকুহুপদেশাৎ’ [৪. ৩.] সূত্রটি অবিকল বেদান্তসূত্রে [৪. ১. ১] রহিয়াছে; সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, যে সাংখ্যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ থাকা অস্বাভাবিক, সেই সাংখ্যসূত্রে বলা হইতেছে, সমাধি স্মৃতি ও মোক্ষ অবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় [‘সমাধি-স্মৃতি-মোক্ষেনু ব্রহ্মরূপতা’—সা. : সং. ৫. ১১৬]। জ্ঞান-বৈশেষিকে পরবর্তীকালে ‘আত্মা’ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন—আত্মা ও পরমাত্মা। ইহাদের লক্ষণ বেদান্তের জীবাত্মা ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয়।

দর্শন-সাহিত্যে তো বটেই, পুরাণেও—যেখানে বহুদেবতার স্বীকৃতি, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শক্তি স্ব-স্ব মহিমায় ভাস্বর, যেখানে ভক্তিবাদের একাধিপত্য—সেখানেও নিম্নলিখিত ব্রহ্মের প্রভাব বিস্তৃত। দেবতার ঐশ্বর্য ও গুণাবলী যতই থাকুক, প্রত্যেকেই যে স্বরূপতঃ নিগুণ, নিবিশেষ, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম, তাহা একবাক্যে স্বীকার করা হইয়াছে।^১ তত্ত্বও বেদান্তের প্রভাব লক্ষণীয়। আদিতে তত্ত্ব বাহাই থাকুক, তত্ত্বের পরমশিবতবে বেদান্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। নিম্নলিখিত, নিম্পন্দ, নিরীহ শিব বেদান্তের ব্রহ্মদর্শন। যদিও এই শিব ‘শক্তি বিশিষ্ট অদ্বৈত’—তথাপি ইহার বহির্লক্ষণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তত্ত্বের পরাশক্তিও ব্রহ্মময়ী। তত্ত্বসাধনার শেষাবস্থা ‘শিবোহমহ’-এর সহিত বেদান্তের ব্রহ্মাবস্থা ‘সোহং’ বা ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’র মিল রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম বোধ স্বীকার করে নাই। কিন্তু বুদ্ধ যে অদ্বৈত জ্ঞানেরই অবস্থা, প্রাচীন

১। বিষ্ণুপুরাণে বাহুবল বিষ্ণু ‘তন্ ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমকমব্যয়ম্’ [১. ২. ১]। মার্কণ্ডেয়পুরাণে শক্তি হইতেছেন, নিত্য্য অক্ষরঃ, ‘পর্য পরাণাঃ পরমা’ [চণ্ডী. ১. ৯২]

বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। বুদ্ধদেবের ‘অঙ্গমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং’ [ধর্মপদ অঙ্গমাদবর্গ, ১] প্রভৃতি উক্তি বেদান্তের প্রতিধ্বনি। পরবর্তী বৌদ্ধদর্শন বেদান্তের এত নিকটবর্তী হইয়াছিল যে, নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকাকে শঙ্করমতের সহিত বিনিময় করা চলিত। নাগার্জুনের পারমাথিক সত্য ও সাংসৃতিক সত্য এবং শঙ্করাচার্যের পারমাথিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য এক। মায়ার কল্পনাও উভয়ক্ষেত্রে এক প্রকার। নাগার্জুন বলেন

যথা মায়্যা যথা স্বপ্নো গন্ধর্বনগরঃ যথা।

তথোৎপাদ স্তথা স্থানং তথা ভঙ্গা উদাহৃত্যঃ। [মাধ্যমিক কা. ৭. ৩৪,]

—যেমন মায়্যা, স্বপ্ন ও গন্ধর্বনগর তেমনই উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গ। শঙ্করাচার্য্যও ঠিক এই উপমায় মায়্যাবাদ বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই জন্তই শঙ্করের মতবাদ সম্পর্কে এই অভিযোগ উঠিয়াছিল, ‘মায়্যাবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ’।

॥ বাংলায় বেদান্ত ॥

অষ্টম বেদান্তমতের সার কথা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ও পুরুষার্থলাভ জ্ঞানে। বাংলার আচার-আচরণে যে ভাবেরই প্রকাশ হউক না কেন, বেদান্তের এই মর্মসত্য এদেশের অন্তরে গ্রথিত।

বাংলা সাহিত্যের সৃচনা বৌদ্ধ সহজিয়াগণের দোহা ও গান লইয়া। বজ্রাচার্য্যগণের শেষ প্রাপ্তি অদ্বয়জ্ঞান। এই মতের ‘শূন্যতা’ বা ‘তথতা’ বেদান্তের অদ্বৈতাবস্থা। বজ্রসত্ত্ব বোধিচিন্তের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ—নিত্য, অপরিবর্তনীয় ও প্রজ্ঞানঘন। অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহে ইহাকে বলা হইয়াছে ‘অচ্ছেদ্যাভেদলক্ষণ’, ‘অদাহী’ ও ‘অবিনাশী’। ইহা ব্রহ্মেরও লক্ষণ। নাগার্জুন-বসুবন্ধুর রচনায় এই ব্রহ্মলক্ষণের প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইহাদের প্রতীতিসমুৎপাদের মূল সূত্রটিই ব্রহ্মলক্ষণাকান্ত।

বৌদ্ধ সহজধান মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনেরই পরিণাম। কাজেই সহজিয়াদের দোহা ও গানেও অদ্বয় শূন্যতার কথা। নির্বাণরূপ ‘মহাস্থখের’ কল্পনায় বা ‘মায়ার’ কল্পনায় সহজ সাধক বৈদান্তিক। সরহ পাদের দোহায় পাই,

অদ্বয়চিন্ত তরুঅরহ গউ তিজ্জবণে বিথার।

—অদ্বয়চিন্ত একটি বিরাট তরু ; জিভুবনে তাহার বিস্তার।

এই অদ্বয় অবস্থা নিচ্চল, নির্বিকার, ‘উদয়ান্তঃ গমনঃ রহিতঃ’ [কারুণ্যের দোহা টকা ২০.]। এই অবস্থায় জন্ম-মৃত্যুও থাকে না :

জইলে জান মরণ বি তইলো ।

জীবন্তে মজলো নাহি বিসেলো ॥ [চর্য্য, ২২]

—যেমন জন্ম, তেমনই মরণ ; জীবন্ত ও মৃত অবস্থার কোন বিশেষ নাই ।

সহজ মতে ইহাই ‘সহজ স্বভাব’-এর অবস্থা । এই ‘সহজ’ স্ব-সংবেদ্য ; এই অবস্থায় জ্ঞের-জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বোধও লুপ্ত হইয়া যায় । ইহা বেদান্তের ‘আবজ্ঞানলো গোচর’ ব্রহ্মাবস্থা । অধিকন্তু চর্য্যাগানে বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টান্তগুলি পর্বন্ত হুবহু গৃহীত হইয়াছে ; যেমন, ‘উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা’ [১০ নং চর্য্যা]—জলের চাঁদ লতাও নয়, মিথ্যাও নয় ; ‘রাজসাপ দেখি জো চমকই’ [৪১ নং চর্য্যা]—রজ্জুসর্প দেখিয়া যে চমকিত হয় ; ‘বাঙ্কি স্তম্বা জিম কেলি করই’ [৪১ নং চর্য্যা]—বঙ্ক্যার পুঞ্জ যেমন কেলি করে । এই সকল উক্তি বেদান্তের ‘অতএব চোপমা স্বর্ষকামিবৎ’ [ব্র, ২, ৩, ২, ১৮], বেদান্তসারের ‘অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ’ [বে, সা, ১২] বা শঙ্কর ভাষ্যের কতকগুলি উক্তির প্রতিধ্বনি ।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সমসাময়িক কালেই বাংলাদেশে নাথপন্থ বোগীদের প্রাচুর্য্য ঘটে । নাথপন্থগণ শৈব বোগী, তাঁহাদের সাধন রহস্য বোগ । পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন বোগের শেষ প্রাপ্তি ‘স্ব-স্বরূপে অবস্থান’—পরবর্তীকালে বেদান্তের কেবলাবহার সহিত এক হইয়া গিয়াছিল । পরবর্তীকালে বোগের লক্ষ্যই হইয়া উঠিয়াছে ‘জ্ঞান’ । বাংলার নাথবোগীদের ভিতর পাই ‘মহাজ্ঞান’-এর কথা । শিব মহাজ্ঞানী । মীননাথ বসুত্রুপ ধারণ করিয়া শিবের নিকট হইতে এই ‘মহাজ্ঞান’ লাভ করিয়াছিলেন । এই জ্ঞান প্রকারান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান । এই জ্ঞানেই সিদ্ধি, এই জ্ঞান-বিশ্বরণেই ভোগ ও মুক্ত্য । গৌরচন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ মীননাথকে এই জ্ঞানের কথাই স্মরণ করাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘মায়াতে পড়িয়া গুরু হারাইলা জ্ঞান’, কিংবা ‘জ্ঞান এড়ি পাইলা গুরু তুল-কম্বলীত’ [গোখ-বিজয়] । এই মহাজ্ঞানের জের আসিয়া ঠেকিয়াছে মনসা-মদল কাব্যেও । চাঁদনদাগর ছিলেন ‘মহাজ্ঞানী’, তাঁহার শক্তি ‘মহাজ্ঞান’ । বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান বাংলাসাহিত্যে নানাভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে ।

বাংলার শাক্ত সাহিত্যও বেদান্ত-প্রভাবিত । এই সাহিত্যের কাহিনীভাগ পুরাণপ্রতিভ, সাধনভাগ উদ্ভাষরী এবং দার্শনিকতা তত্ত্ব-পুরাণ মিশ্র । তত্ত্বে ও পুরাণে শক্তির প্রধানত্বঃ চুইটি রূপ—অশরা ও পরা । পরাশক্তি ব্রহ্মময়ী । তিনি ব্রহ্মের মতই হুন্ম, নিরাকার, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য । মহাকালীর কৃষ্ণবর্ণ সেই নিরাকৃতির প্রতীক, উহাই মহাশক্তির স্বরূপ : বহ্মাশ্রমে কালী এই স্বরূপে অবস্থান করেন :

পুনঃ স্বরূপমাস্ত তমোরূপং নিরাকৃতিঃ ।

বাচাতীতং মনোগম্যং স্বমৈবৈকাবশিষ্টম্ ॥ [মহানি. ৪. ৩৩]

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর মল্লাচরণ শ্লোকেও দেবীকে ‘নিত্যা পরমাত্মস্বরূপিণী’ বলা হইয়াছে। বাংলার শাক্ত সাহিত্যেও পরাশক্তির এই ব্রহ্মময়ী রূপ স্বীকৃত। কবিকল্প চণ্ডীতে ইনি ‘আদিদেবনিত্যশক্তি’। মনসা, শীতলা, যম্ভী—বে-কোন শক্তি স্বরূপে ব্রহ্মময়ী। মহাশক্তির ব্রহ্মময়ী স্বরূপটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকট হইয়াছে বাংলার শাক্ত সঙ্গীতে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত—সকলেই ব্রহ্মময়ী মায়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন,

১. কে জানে গো কালী কেমন ।

ষড়্‌ধর্শনে না পায় দরশন ॥ [রামপ্রসাদ]

এখানে মায়ের অচিন্ত্য, অব্যক্ত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মও অব্যক্ত ও অনির্বচনীয়। রামপ্রসাদের মতে ‘কালী ব্রহ্ম’। ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি সদা মুক্ত, কেবলী পুরুষ। তাঁহার সন্ধ্যা-বন্দনা নাই, ধর্ম্যধর্মের বিচার নাই। রামপ্রসাদও বলেন, ‘আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্ম্যধর্ম সব ছেড়েছি।’

২. ‘কালী নিরাকার’—গোবিন্দ চৌধুরীর গানে পাই ইহার সুন্দর অভিযুক্তি,

ওঙ্কার যুরতি রে মন, জান না কি উহারে ?...

তাই বলি এই কার্য, কিছু নয় শুধু মায়,

ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় আবার ওঙ্কারে ।

গানটির ভিতর ‘মায়াবাদ’ ও জ্ঞান-বাদের প্রভাব স্থম্পট।

৩. অজ্ঞাতনামা কবির আর একটি গানে—শাক্ত, নিম্পন্দ, ‘অরূপা’ শক্তির অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে,

নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরূপি ।

তাই বোঙ্গী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী ॥

অনন্ত আধার কোলে মহানির্বাণ হিলোলে ।

চির শান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি ॥

কমলাকান্ত জানেন, ভ্রামা ‘ব্রহ্ম সনাতনী’, তিনি লিঙ্গ-বিবজ্জিতা—কখনও মেয়ে, কখনও পুরুষ ; তিনিই ‘পরম কারণ’। এই কালীতে বখন মন তন্নয়, তখন জীবের স্বপ্ন-দুঃখ সমান, শুধু আনন্দের তরঙ্গ [‘দেখ স্বপ্নদুঃখ সমান হল আনন্দসাগর উথলে’]।

শাক্ত সাধনার শেষ স্তর নিগুণ, নিকল, চিৎসন আনন্দময়তার স্তর। কাজেই শক্তি-সাধক যাত্রাই প্রকারান্তরে বৈশাঙ্গিক।

বেদান্ত ও গোড়ীয় বৈকবদর্শন

গোড়ীয় বৈকবদর্শনও একটি নতুন বেদান্ত ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-হ্রদ অবলম্বন করিয়া যেমন শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ এবং নিম্বাকের ভেদাভেদবাদ—তেমনই গোড়ীয় বৈকবদের ‘অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ’।

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মূল উৎস কি, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে ইহা মাধ্বমতের প্রকারভেদ। বলদেব বিজ্ঞানভূষণ তাঁহার বেদান্তের ‘গোবিন্দভাষ্যে’ এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-জীবনী হইতে এই মত সমর্থিত হয় না। ডঃ স্থলীলকুমার দে বলেন, ‘বলদেবের উক্তি ভিন্ন চৈতন্যদেব ও মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।’^১ আচার্য খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন,—মাধ্বমতে আরাধ্য হরি, পুরুষার্থ নিজস্বখাত্মভূতিরূপ মুক্তি, সাধন বিস্তৃত ভক্তি, জ্ঞানের প্রমাণ বেদ : কিন্তু চৈতন্যমতে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন তাঁহার ধাম, পুরুষার্থ প্রেম সাধন গোপীভাবে ভজন এবং প্রমাণ প্রধানতঃ ভাগবত।^২ উপরন্তু মাধ্বসম্প্রদায় শিখা-হ্রদ বর্জন করেন না, চৈতন্যসম্প্রদায় শিখা-হ্রদ পরিত্যাগী। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়া মহাপ্রভু মধ্বাচার্যের স্থান ‘উড়ুপ’ গমন করিয়া মাধ্বমত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলেন,

কর্মত্যাগ কর্মনিলা সর্বশাস্ত্রে কহে।

কর্ম হইতে রুঞ্চ প্রেমভক্তি কতু নহে ॥

কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ভাঞ্জে ভক্তগণ।

সেই দুই ছাপ তুমি সাধা সাধন ॥

প্রভু কহে কর্মী জানী দুই ভক্তিহীন।

তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ [চৈ. চ. মধ্য. ২]

মনে হইতে পারে, শঙ্করমতের সহিত চৈতন্যমতের সাদৃশ্য আছে—কারণ, ঈশ্বরীপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাওক, আর কেশব ভারতী তাঁহার সন্ন্যাস গুরু। পুরী ও ভারতী—উভয় সম্প্রদায়ই শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহা ছাড়া, চৈতন্যদেব বহুস্থলে নিজেকে ‘মায়াবাদী’ সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, রায় রামানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন,

অন্তের কি কথা মায়াবাদী সন্ন্যাসী।

আমিহ তোমার স্পর্শে রুঞ্চপ্রেমে ভাসি ॥ [চৈ চ মধ্য ৮]

কিন্তু শঙ্করমতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই মূল তত্ত্বই চৈতন্যমতে অস্বীকৃত। শঙ্করমতে সাধনায় প্রেম-ভক্তির কোন স্থান নাই, বাহ্য আছে—তাহাও পারমাধিক

১। চৈতন্য সম্প্রদায় ও মাধ্বসম্প্রদায় [হরপ্রসাদ সর্দার লেখনামা, ২য় খণ্ড]

২। বৈকব রস সাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

সাধন নয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর লিখিত বেদান্ত-বিচারে চৈতন্যদেব শঙ্করমতকে তর তর বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করমতে ব্রহ্ম নিবিশেষ নিরাকার নিগূর্ণ ও নিঃশক্তি : চৈতন্যমতে পরমতত্ত্ব বিশিষ্ট, বিগ্রহবান্, সগুণ ও সশক্তি। শঙ্করমতে জীব ব্রহ্ম, চৈতন্যমতে ঈশ্বর চিৎসন, জীব চিৎকণ ; ঈশ্বর মায়াধীশ জীব মায়াবশ। শঙ্করের নিগূর্ণ, নিরাকার, নিবিশেষ ব্রহ্মের স্থলে মহাপ্রভু পরমতত্ত্বের সগুণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জীবই ব্রহ্ম—এই মতের স্বতীত্ব প্রতিবাদ করিয়াছেন :

ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান ।
 তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥
 ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ স্বরূপ হাঁহার ।
 হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
 স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
 নিঃশক্তি করিয়া তাঁহে করহ নিশ্চয় ॥....
 বড় বিধ ঐশ্বর্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস ।
 হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥
 মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীব ভেদ ।
 হেন জীব ঈশ্বরসনে করহ অভেদ ॥ [চৈ চ মধ্য ৬]

শঙ্করাচার্যের ‘মায়াবাদ’ ও ‘বিবর্তবাদ’কেও তিনি খণ্ডন করিয়াছেন :

জীব নিস্তারের হেতু ভাঙ্গ্য কৈল ব্যাস ।
 মায়াবাদী ভাঙ্গ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥
 পরিণামবাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত ।
 অচিন্ত্যশব্দে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥...
 ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।
 বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ [ঐ মধ্য ৬]

চৈতন্য-প্রবর্তিত মতের সমর্থন আছে রামানুজাচার্যের ‘শ্রীভাষ্যে’। রামানুজ-প্রবর্তিত বৈকব সম্প্রদায়ের নাম শ্রী-সম্প্রদায়। শ্রীভাষ্যে শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ মত প্রকাশিত হয় নাই ; উহাতে শ্রীর প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীভাষ্যে বৈকব সিদ্ধান্ত একটি স্বপষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। শঙ্করাচার্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই রামানুজের আবির্ভাব।

রামায়ণমতে ব্রহ্ম স বিশেষ, সগুণ, পুরুষোত্তম; ইনি শক্তি-বিশিষ্ট; জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মের পরিণাম। বিশিষ্টাবৈতবাদে সগুণ উপাসনাও স্বীকৃত।

চৈতন্যমতের সহিত বিশিষ্টাবৈতবাদের সাদৃশ্য থাকিলেও রামায়ণ দেহশাস্ত্রের পর যে বোন্ধের কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত চৈতন্যমতের মিল নাই। রামায়ণ মূক্তির শেষস্তরে জীবের ব্রহ্ম-সাক্ষ্য স্বীকার করেন, মহাপ্রভুর ধর্মে এই ধরনের মুক্তি-কামনা অব্যাহিত।

নিখার্ক-প্রচারিত ভেদাভেদবাদের (Identity-in-difference) সহিত চৈতন্য-প্রচারিত দার্শনিক মতের সাদৃশ্য বরং গুরুতর। নিখার্কের পরম তত্ত্ব রূপাতি স বিশেষ ও সগুণ, তিনি সৌন্দর্য, আনন্দ ও করুণার উৎস। জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে ধর্মতঃ ও স্বরূপতঃ যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। নিখার্কিত্যের সহিত চৈতন্যমতের মিল প্রধানতঃ ‘লোকবন্তু লীলা-কৈবল্যম্’ [ত্র সূ ২. ১. ৩৩]—লীলা প্রকাশের জন্যই ব্রহ্মের সৃষ্টি-কার্য এবং জীবকে ব্রহ্মের শক্তিরূপে স্বীকৃতিতে। ভক্তির কলনাতোও সাদৃশ্য আছে। নিখার্কমতে ভক্তি ‘প্রেমবিশেষবলক্ষণ’। চৈতন্যমতেও ভক্তি প্রেমাপ্রায়ী।

মিল থাকিলেও চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম স্বতন্ত্র। ইহা যেন একটি পৃথক ধারা। এই ধারা প্রবাহিত হইয়াছে শতিল্যমুদ্রে, নারদ পঞ্চরাত্রে ও ভাগবতে, ইহার মিল রহিয়াছে দাক্ষিণাত্যের আলওয়ার সন্ত্রদায়ের সাধন-ভজনের সহিত এবং বিশ্বমন্ডলের প্রেমসাধনার সহিত। বাংলা বৈষ্ণব গ্রন্থে এই প্রেমধর্মের আদি সূত্রধার বলা হইয়াছে মাধবেন্দ্র পুরীকে। চৈতন্য-ধর্ম মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমধারায় পুষ্ট, যে মাধবেন্দ্র পুরী ‘মেঘনরশন মাজ হয় অচেতন’, যিনি ‘অগ্নি দীন দায়ত্র নাথ হে’ বলিয়া কৃষ্ণ-বিরহে উষ্মেল। ভারতীয় ভক্তি-সাধনার অনেক ধারা আসিয়া মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ও প্রেমসাধনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, কিন্তু ভাব ও প্রেমের স্পর্শটি চৈতন্যমতের নিজস্ব।

চৈতন্যমতের আবির্ভাবের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্ব হইতেই দক্ষিণভারতে ভাব-প্রধান ভক্তিমতের বিকাশ ঘটিতেছিল। জ্ঞান-রাজ্য হইতে ভক্তি-রাজ্যের দিকে যাত্রা শুরু হইয়াছিল। এই ভক্তি-ধারা পুষ্ট হইতেছিল ভক্তিমূলক পঞ্চরাত্র, ভক্তিসূত্র, পুরাণ ও স্তবের প্রভাবে। দক্ষিণভারতের শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক প্রভৃতি সন্ত্রদায় এই ভক্তিমতের চর্চায় ছিল অগ্রগণ্য। এই সকল সন্ত্রদায়ে জ্ঞান ক্রমশঃ ভক্তির দিকে এবং ভক্তি ক্রমশঃ প্রেমভাবের দিকে দৃষ্টি পরিবর্তন করিতেছিল। এইরূপে ব্রহ্ম ক্রমশঃ বিষ্ণু এবং বিষ্ণু ক্রমশঃ কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইতেছিলেন—এবং ব্রহ্ম-শক্তি রূপে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী এবং আরও

পরে কৃষ্ণপ্রিয়া রাবার প্রাধান্য হ্রাসিত হইতেছিল। সাধনাতেও ক্রমশঃ ‘প্রেমলক্ষণা’ ভক্তির প্রসার ঘটিতেছিল। মায়াবাদকে অস্বীকার করা, লীলাবাদকে স্বীকার করা, বিবর্তবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া পরিণামবাদকে গ্রহণ করা এবং পরিণামবাদের মূলীভূত কারণরূপে ব্রহ্ম-শক্তি, বিষ্ণু-শক্তি কিংবা অন্তরঙ্গ শক্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া বৈষ্ণব আচার্যগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিতেছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বস্তুতঃ এই সকল বিশিষ্টতার একটি সূত্র পরিণত রূপ। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমতত্ত্বে ও প্রেমধর্মে দক্ষিণী প্রভাব বিद्यমান। দক্ষিণাত্য হইতেই তিনি ‘ব্রহ্মসংহিতা’ ও বিষমকলের ‘কর্ণামৃত’ গ্রন্থ নকল করাইয়া লইয়াছিলেন; রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার সাধ্য-সাধনতত্ত্বেরও বিচার হইয়াছিল দক্ষিণাত্যে, উপরন্তু যে পুরী-ভারতী সম্প্রদায়ের নিকট তিনি দীক্ষিত, তাঁহারাও ছিলেন দক্ষিণ দেশবাসী।

চৈতন্যদেব নিজে কোন ভাষা লিখিত আকারে রচনা করেন নাই। তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যে-সকল বিচার করিয়াছেন—বিশেষতঃ বেদান্ত সম্পর্কে বান্ধদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার, রায়রামানন্দের সহিত সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনা, কিংবা ত্রীকূপ ও সনাতন-শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তি হইতে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

বেদবাক্য চৈতন্যমতে অত্যন্ত প্রমাণ [‘প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান’]; প্রমাণ কখনও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় না [‘শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কতু না হয় প্রমাণ’]। তিনি মনে করুন, বেদ ‘অর্থ বিজ্ঞ বাক্য’, তাহা সর্বদোষ বর্জিত :

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা কারণাণাটব।

অর্থ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ [চৈ, চ, আদি, ২]

চৈতন্যমতে ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্র চারিবেদ ও উপনিষদের সার; এই সূত্র ঋক্-বিষয়ের সঙ্কল্প। ব্যাসদেব স্বয়ং ভগবান, অতএব ‘বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন’। কিন্তু বচনের অর্থ অতি গভীর [‘ব্যাসসূত্রের গভীরার্থ’]। সে সূত্রের অর্থ কোন জীব অরুণাংন করিতে পারে না। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতমত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মূখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া লক্ষণায় সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষণায় অর্থ করিলে বেদের স্বভাব প্রামাণ্য হানি ঘটে :

স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।

লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ [ঐ, মধ্য ৬]

মহাপ্রভুর মতে, উপনিষৎ শঙ্কর মূখ্যার্থ ব্যাসসূত্রে অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু

আচার্য শঙ্করের ভাষ্য-স্বৰূপে সেই মুখ্যার্থ আচ্ছাদিত।^১ শুধু আচার্য শঙ্কর কেন, সকলেই স্বমত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাসসূত্রের বহুস্ত অর্থ করিয়াছেন। এ সকল অর্থ ভ্রান্ত। ব্যাসদেব নিজেও জানিতেন, সূত্রের অর্থ অতি গভীর। এইজন্য তিনি নিজেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা কোথায় আছে? — শ্রীমদ্ভাগবতে। স্বয়ং ঈশ্বর ‘প্রণবের যে অর্থ গায়ত্ৰীতে হয়’, তাহা ‘চতুঃশ্লোকী’তে বিবৃত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাৎপ্য নারদের নিকট প্রকাশ করেন। নারদ সেই ব্যাখ্যা ব্যাসদেবকে ভনাইয়াছিলেন। ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্যাখ্যার প্রকাশ।

অতএব শ্রীভাগবত ব্যাস-সূত্রের খাটি ভাষ্য। শুধু তাই নয়, শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্ভাক্য, কারণ, উহা বেদোপনিষদের শ্লোকবিগ্রহ:

চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।

তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঙ্কয় ॥

যেই সূত্রে সেই ঋক্-বিষয় রচন।

ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন ॥

অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।

ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ ॥ [ঐ মধ্য ২৫]

তাই চৈতন্যমতে শ্রীমদ্ভাগবত অবিতর্ক প্রমাণ [‘সর্ববেদসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিত্যভ্যে’]

চৈতন্যমতে কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব [‘কৃষ্ণ তত্ত্ববস্তু’]

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।

পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥২ [চৈ. চ. আদি ২]

প্রকাশ-বিশেষে তাঁহার বিভিন্ন নাম। তত্ত্ববিদগণ তাঁহাকেই বলেন, ‘ষজ্ জ্ঞানমধ্যম’। ব্রহ্মবিদ তাঁহাকে বলেন ‘ব্রহ্ম’, যোগীগণ বলেন ‘পরমাত্মা’, ভক্তগণ বলেন, ‘ভগবান্’। যদৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবন্তাই পূর্ণ। উপনিষদের ব্রহ্ম সেই ভগবানের ‘তত্ত্বতা’ (দেহকান্তি), যোগীর পরমাত্মা তাঁহার ‘অংশ-বিত্ত্ব’ (অংশ-বিস্তৃতি)।

এই ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বশেষ। শ্রীতত্ত্বে তাঁহাকে ‘নির্বিশেষ’ বলা হইলেও সর্বিশেষ লক্ষণই বলবান্,

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।

চৈতন্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান ॥ [চৈ. চ. আদি, ৭]

১। ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূত্রের কিরণ।

স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে ধরে আচ্ছাদন ॥ [চৈ. চ. মধ্য, ৬]

২। ঈশ্বর: পরম: কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ:।

অনাদিরাদি গোবিন্দ: সর্বকারণ-কারণম্ ॥

[ব্রহ্মসংহিতা, ৫, ১]

চৈতন্যমতে কৃষ্ণ সর্বিশেষ, সগুণ ও সাকার। চৈতন্যদেব বলেন, ‘জগদ্ব্যক্ত হতঃ’—ব্রহ্মস্বত্বের এই বাক্যই প্রমাণ করে, ব্রহ্ম সর্বিশেষ :

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥

অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।

ভগবান্ সাবশেষ এই তিন চিহ্ন ॥ [ঐ. মধ্য. ৬]

চৈতন্যমতে এই সর্বিশেষত্ব ভগবানের তটস্থ লক্ষণ নয়, স্বরূপ-লক্ষণ। ভগবানের ‘সুখাণ্ড’ অনন্ত ; শ্রী, ঐশ্বর্য, ষণ, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট গুণ। অতএব ব্রহ্ম সগুণ ও বিশিষ্ট। তিনি নিরাকারও নহেন : ‘ষট্ঈশ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ ষাহার’, তিনি কি নিরাকার হইতে পারেন ? মহাপ্রভু-বলেন, ‘তাঁহার বিভূতিদেহ সব চিদাকার’।

সৃষ্টি-লীলায় ভগবানের প্রকাশ বিবর্তমাত্র নয়, রজুতে সর্পভ্রমও নয়। সৃষ্টি ঈশ্বরের পরিণাম। শ্রীভগবান্ ‘অবিচিন্ত্য শক্তিস্কৃত’। এই অচিন্ত্য শক্তিবলে তিনি যেচ্ছায় জগৎ-রূপে পরিণত হন।^১ চৈতন্যমতে ‘মায়াবাদ’ ভ্রান্ত। বৈষ্ণব বৈদ্যাস্তিক মাত্রই মায়াবাদের প্রাতিবাদী। মহাপ্রভুও মায়াবাদের ঘোর বিরোধী। তিনি আরও বলেন, বস্তুতঃ ঈশ্বর নিঃশক্তি নন, তাঁহার স্বাভাবিকী তিন শক্তি [‘স্বাভাবিকী তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়’] ; অন্তরঙ্গা চিহ্নক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়। ভগবান্ মায়াদীপ ও মায়াতীত। এই মায়। হইতে জগৎ-প্রসঙ্গের উৎপত্তি। জগৎ ভগবান্ হইতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। প্রকৃত চিন্তামণি হইতে যেমন নানা রত্নরাশি হয়, অথচ চিন্তামণি অবিকৃত থাকে—তেমনই ভগবান্ ও জগৎ। জীবও ভগবান্ হইতে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। অভিন্ন এইজন্য যে, তাঁহাদের অংশ-অংশী সম্পর্ক ; জীব অংশ, ভগবান্ অংশী। কিন্তু এই অংশ-অংশী পর্বতের অংশ প্রস্তরের মত নয়, ইহা পর্বতের একদেশ। অথবা ইহা যেন অগ্নির একদেশস্থিত কিরণ :

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জলিত জলন।

জীবের স্বরূপ যৈছে ক্ষলিঙ্গের কণ ॥ [চৈ. চ. আদি. ৭]

অপর পক্ষে জীব চিংকণ, ভগবান্ চিদঘন—জীব মায়াবশ, ভগবান্ মায়াদীপ ; অতএব জীব ও ভগবান্ ভিন্ন। এই ভেদাভেদবাদের সহিত রামানুজ ও নিম্বার্ক মতের অংশত মিল আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের প্রধান বিশেষত্ব ঈশ্বরের ‘অচিন্ত্য শক্তি’র পরিকল্পনায়। পূর্বে ঈশ্বরের

১। পরিণামবাদ ব্যাদস্বত্বের সম্মত।

অচিন্ত্যশক্তে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত ॥

মণি বৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।

জগৎরূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ [চৈ, চ, মধ্য, ৬,]

যে শক্তির কথা বলা হইয়াছে, সে শক্তির প্রভাব ‘অচিন্ত্য’: How a Sva-rupa or essence which is inherently spiritual can yet appear as the insentience of a material world or how the infinite spiritual reality may yet split itself into innumerable limited spirits without prejudice to its integrity of being, is one of the mysteries of the Ultimate Reality which defies logical resolution”^১ শক্তির এই ‘অচিন্ত্য’ প্রভাবহেতু কৃষ্ণ এবং জীব ও জগৎ যুগপৎ ভেদাভেদ। চৈতন্য মহাপ্রভুর বেদান্ততত্ত্ব তাই ‘অচিন্ত্য ভেদাভেদ’ নামে বিখ্যাত।

চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মে ‘এহো বাহু’। এই প্রেমধর্মের অভিনব স্ব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের ‘সাক্ষাৎ ময়ময়’, ‘শূদার রসরাজময়’, ‘অখিল রসায়ত যুতি’র স্বীকৃতিতে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তিরূপে ‘হলাদিনী’, ‘আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতা’, ‘মহাভাব স্বরূপীণী রাধাঠাকুরাণীর স্বীকৃতিতে। সমগ্র জগৎ, এই অমর বৈততন্ময়ের প্রেমলীলা। জীবের পুরুষার্থ এই লীলার অহুভব ও আশ্বাদনে। অর্থাৎ প্রেমই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ।

॥ বাংলাদেশে লোকায়ত মত ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকায়ত মতের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। অবিরল চার্বাক মত কোনদিনই ভারতীয় জীবনকে তেমন প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। লোকায়ত প্রত্যক্ষবাদ, হেতুবাদ, ভোগবাদ—অর্থ ও কামের সেবা এবং ঐহিক সুখভোগ রূপ ক্ষুতি ধর্মভীরু আন্তিক জীবনে আত্মাস্তিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাংলাদেশেও তাহা পারে নাই।

তবে বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি ধর্মে লোকায়ত মতের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রভাবও প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট পূর্ব হইতেই নাস্তিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে একদিন বহুসংখ্যক বৌদ্ধ বাস করিতেন। সেইসময়ে এদেশে লোকায়ত মতের কিছুটা প্রসার হওয়া অসম্ভব নয়।

১. বৌদ্ধ দোহা ও গানে অতুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও আচারের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ বর্ণিত হইয়াছে, বেদ-ব্রাহ্মণের নিন্দারও অসম্ভাব নাই। কাহ্নপাদের মতে ‘বাস্ত

১। Chaitanya (Achintya Vedaved)—Dr. S. K. Moitra [Hist of phil. Eastern & western vol I]

বজ্রিমা' সহজ-স্বন্দরীকে স্পর্শ করিতে পারে না [১০ নং চর্চা]'; দুইপাদ বলেন, ঘাহার বর্ণ-চিহ্ন-রূপ নাই 'সো কইসে আগম বেএ' বখানী' [২২ নং চর্চা]; দারিকশাদ বলিতেছেন,

কিস্তো তন্তুে কিস্তো মন্তুে

কিস্তো রে বাণবখাণে । [৩৪ নং চর্চা]

এই প্রতিবাদাত্মক মনোভাব আরও স্পষ্ট ও সূত্রীত্ব হইয়া উঠিয়াছে দোহাগুলিতে । এই ধরনের প্রতিবাদ প্রথম লক্ষ্য করা যায় উপনিষদে—জ্ঞানবাদী ঋষিদের কর্ণে । কিন্তু উপনিষদেই দেখা যায়, একদল মানুষ ছিল স্বভাববাদে বিশ্বাসী, তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া মানিতেন । মনে হয়, উপনিষদের প্রতিবাদাত্মক মনোভাব সেই সকল লোকায়ত মতেরই প্রতিধ্বনি । হিন্দু মতে বৌদ্ধগণ ছিলেন নাস্তিক । কাজেই বৌদ্ধ সহজধানের এই প্রতিবাদী মনোভাবও তাঁহাদের সমানতত্ত্ব লোকায়ত দর্শন হইতেই সমাহৃত । তাঁহাদের প্রতিপাদের ভক্তি, এমনকি কোন-কোন-স্থলে ভাষা পর্যন্ত বাহ্যস্পর্শ দর্শনের অন্তসারী ।

২. সহজ সাধনায় প্রত্যক্ষ এই 'দেহে'র গুরুত্ব অসাধারণ । শুধু তাই নয়—স্বী-পুং যোগে রহস্তময় গুহ্য সাধনও স্বীকৃত । এই সাধনার শেষ প্রাপ্তি 'মহাস্থ' ।

কিন্তু মূলতঃ এগুলি লোকায়ত হইলেও, সহজ সাধনায় এগুলি আনিয়াছে যোগ ও তন্ত্রের মধ্যস্থতায়—কারণ, বৌদ্ধ সহজমত হইতেছে 'Offshoot of Tantric Buddhism.' : সহজমতে কাম রহস্তময় যোগের নামান্তর, ইহার 'পর্যাবৃত্তিতে' পরম বিভূত্ব লাভ হয় ।^১ অতএব এ কামকে লোকায়ত কাম বলা চলে না । সহজিয়াদের 'মহাস্থ'ও লোকায়ত স্তম্ভ হইতে স্বতন্ত্র ।

আনুষ্ঠিতাই সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক নিয়ম অনুসারে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক । সেন আমল হইতে এদেশে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তৃত হয়, তাহা যাবতীয় নাস্তিকতার মূলে কুঠারপাত করিয়াছিল । বাংলাদেশ হইতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির ইহা একটি প্রধান কারণ । তারপর আসিল মুসলমান আক্রমণ । অত্যাচারে, অবিচারে বিপর্যস্ত মানুষ তখন ধর্মের চুয়ারে ধরা দিল, দেবরূপায় বিশ্বাসী হইয়া উঠিল এবং দেবারাধনা ঘারা দ্বিবিধ দুঃখকে দূর করিতে তৎপর হইল । এই ধর্মোচ্চারণে প্রেরণা সঞ্চায়

১। 'মৈথুনস্ত পর্যাবৃত্তৌ বিভূত্বং লভ্যতে পরম'—মহাবান স্ত্রম্বালঙ্কার

করিল আগমবাগীশের তত্ত্বসার এবং রঘুনন্দনের স্মৃতি। এইরূপে বাংলাদেশে নাস্তিক মত প্রবেশের সকল চ্যুয়ারই রুদ্ধ হইয়া গেল।

তবে ইহারই ভিতর দেবধর্ম-বিরোধী, ভোগসর্বস্ব মাহুকের আবির্ভাব বাংলাদেশেও ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ‘পাষণ্ডী’ ও ‘নাস্তিক’-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ অবশ্য নিজধর্ম ব্যতিরিক্ত সকলকেই ‘পাষণ্ডী’ বলিয়াছেন। চাপালগোপাল, জগাই-মাধাই ‘পাষণ্ডী’র দলভুক্ত। ইহারা চিরকালের তত্ত্বন। ‘পাষণ্ডী’ ছাড়া নাস্তিকেরও অস্তিত্ব ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতের সাক্ষী গোপালের কাহিনী প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :

এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।

কেহ কেহ ঈশ্বর দয়ালু আসিতেই পারে ॥ [চৈ. চ. মধ্য. ৫]

ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাসী এই সকল লোক বস্তুতই নাস্তিক। কবিকল্প চণ্ডীতে এক শ্রেণীর স্থখী নাগরিকের বর্ণনা পাওয়া যায়,—

নগরে নাগরজনা কানে লঙ্ঘমান সোনা

বদনে শুবাক হাতে পান।

চন্দনে চর্চিত তন্ত্র হেন দেখি খেন ভাত

তসর বসন পরিধান ॥ [কালকেতু-উপাখ্যান]

চিত্রটি অনেকটা ভোগবাদী স্থখী চাৰ্ব্বাকের অন্তরূপ। কামসূত্রেও নাগরিকের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।^১

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ষড়ির নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার মনোভাব অনেকটা নৈরাজ্যবাদী। রামানন্দ তাত্ত্বিক বৌদ্ধ।

অষ্টাদশ শতক হইতে বাংলার ধর্মীয় পটভূমিতে নৈরাজ্যের ছায়া নামিয়া আসে। একদিকে বাদসাহী বিলাস, নাগরবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খল নবাবী মেজাজ, অপরদিকে নবাগত পাশ্চাত্য ভোগবাদ ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত হানিতে থাকে। ইহার ফলে নাস্তিকমূলভ সংস্কারবাদ ও অবিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই অবিশ্বাস-জনিত ব্যঙ্গ-শ্লোকের প্রকাশ দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি অসমাপ্ত চণ্ডী নাটকে বে অসুর-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভোগবাদী নাস্তিকের চিহ্ন সুপরিস্ফুট : যেমন প্রজার প্রতি মহিষাসুরের এই উক্তি :

শোনরে গোয়ার লোগ ছাড়্‌দে উপবাস ষোগ

মানহু আনন্দভোগ ভৈষরাজ ষোগমে।

আপকো লাগাও ভোগ কামকো জাগাও

ছোড় দেও যোগ গো মোক্ষ এছি লোগ মে ।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে চুধোগ আরও ঘনীভূত । তখন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় দোহুলামান জন্মচিহ্ন । ঠিক এই সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূঁই-দোড় জমিদার, তথা 'বাবু' শ্রেণীর উদ্ভব হয় । বাবুর চিত্র-চরিত্র অবিকল ধৃত চার্বাকের মত । ধর্ম্যে তাহাদের মতি নাই, ভোগে পূর্ণ আস্থা, দেহীয় সংস্কারের প্রতি বিরূপ মনোভাব । ইহা পাশ্চাত্য ভোগবাদেরই অবশ্রুতাবী ফল । এই বাবুদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বন্ধিমচন্দ্রের প্রবন্ধে, হুতোম প্যাচার নক্সার । এই বাবুদের মধ্যেই আবার একদল ছিলেন 'পক্ষী' । এই পক্ষীর দলের স্বথবাদ ও উন্নাসিক মনোভাব ধৃত চার্বাকদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । পক্ষীর দলের একটি গানের কিছুটা অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাইতেছে, ইহা বিবেক-বৈরাগ্য না কটাক্ষ, স্থধীবর্গ তাহা বিচার করিবেন :

ভাঙলো না তোর মায়া'র ঘুম ।

বিষয়মদে চক্ষু'মদে স্তয়ে আছ বেমালুম ॥

ঐশ্বর্ষের মাংসর্বে তুমি মনে কর বাদসাকুম ।

এ প্রপঞ্চ এক সঙ্গে সেজেছ ঠিক যেন ভাই হাণুম থুম ॥

নব্য বাংলায় লোকায়ত প্রত্যাক্ষবাদ, বস্তুবাদ ও নিরীশ্বরবাদের প্রভাব দেখা যায় বস্তুতাত্ত্বিক সাহিত্যে । যদিও এ সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবজাত, তথাপি উহার বস্তুতাত্ত্বিকতায় প্রাচীন লোকায়ত মতের প্রতিধ্বনি ও পুনরুজ্জীবন লক্ষণীয় ।

॥ তত্ত্ব ॥

১. সাধারণ পরিচয়

তত্ত্ব বলিতে সাধারণ ভাবে বুঝায় ‘সিদ্ধান্ত’, ব্যাপকার্থে ‘তত্ত্ব’ যে-কোন শাস্ত্র। কিন্তু সাহিত্যে ও সাধনার ক্ষেত্রে তত্ত্বের অর্থ সীমাবদ্ধ। তত্ত্ব শক্তি-সাধনা-সংক্রান্ত গ্রন্থ। এই অর্থেই তত্ত্ব শব্দ রুঢ়।

তবে অবশ্য বিবিধ পুরুষ দেবতার পূজা-অচনা বিধিও প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মূলতঃ উহার বিষয় মাতৃ বা শক্তি-উপাসনা। তৎ মতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে এক দেবতা লীলা করিয়া চলিয়াছেন, তিনি মহাশক্তি। তদ্বতঃ ইান অব্যক্ত, ঞ্গসীমার বহির্ভূত ও নিবিশেষ—কিন্তু লীলায় তিনি অনন্তরূপিণী বা বিশ্বরূপা। সৃষ্টির অন্তরে বা বাহিরে, সীমায় বা সীমার অর্ভাতে যা কিছু, সবই এই শক্তির প্রকাশ। বিশেষতঃ ক্রীমূর্তিতে তিনি সংখ্যাহীন দেবশক্তি : তিনিই শিবশক্তি শিবা, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী ও ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী—তিনিই ঐন্দ্রী ও কোমারী, তিনিই জগৎ-প্রসাবতা সাবিত্রী। পাণ্ডিবে জগতে প্রাকৃতিক শক্তিতেও তিনিই বিরাজমানা, তিনিই রাত্রি, তিনিই উষা, তিনিই বিশ্বপ্রকৃতি। মানবদেহেও তিনিই নাদরূপ শব্দব্রহ্ম কিংবা কৃণ্ডলিনী। বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি-যোনি শক্তি। তাই পৃথিবীর যাবতীয় স্থানিকবাসক অভিধাও শক্তিরই এক এক রূপ--মাতৃরূপে, ভাষ্য্যারূপে তাহারই জগৎ-লীলা। এই শক্তিই তত্ত্বের আরাধ্য।

তত্ত্ব সাধন-শাস্ত্র, শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ সাধনা বা কলিত সাধনা। ইহার ভূমিকা অনেকটা বৈদিক ‘ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থের বা কল্পগ্রন্থের। তাই যে কোন তত্ত্বের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সাধন, সাধনার ক্রম এবং সাধনার প্রণালী। যজু, মণ্ডল, আশন, ময়, ত্র্যাস, ধ্যান, যোগ, মুহুর্ত ও পূজা—এই গুলি উপাসনার অঙ্গ।

অবশ্য এই সঙ্গে দর্শনের অংশও আছে। প্রাচীনতম তত্ত্ব দর্শনের অংশ ছিল নিতাস্তই অল্প। পরবর্তী কালেও দর্শন শব্দে তত্ত্ব যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহাও ক্রিয়ারই অঙ্গ। ক্রিয়ার জগুই তত্ত্ব-দর্শন। নির্বিশেষ শক্তির তত্ত্ব কি, সেই শক্তি কিরূপে বিশেষিত হইয়া প্রাকৃত জগতে অবতীর্ণ হন, কিভাবে শক্তির ছন্দে বিশ্বজগৎ স্পন্দিত হয়—এইগুলিই শক্তি দর্শনের আলোচ্য। তত্ত্বের দর্শনভাগে রহিয়াছে, শক্তির অবরোহণ-তত্ত্ব ; ক্রিয়াভাগে আছে পুনরায় শুদ্ধ শক্তির স্তরে আরোহণের উপায়।

জীবসত্তার স্থূল বা সঙ্কচিত বা সূপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া শক্তিকে আয়ত্ত করাই তত্ত্ব সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য তাত্ত্বিকগণ যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহাতে বিশেষত্ব আছে। যেমন পঞ্চম-কার সাধন (অর্থাৎ মন্ত্র, মাংস, মজা, মূত্রা ও মৈথুন-এর ব্যবহার), যন্ত্রাঙ্কন (সাম্প্রতিক ত্রিভুজাকৃতি রেখা-চিত্র), মূত্রা প্রদর্শন (হস্তাঙ্গুলির বিবিধ বিভাগসম্বারা ইঙ্গিতগত সঙ্কেত), মন্ত্রোচ্চারণ ও মন্ত্রোচ্চারণ এবং ষট্‌কর্ম (মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়া)। এই সকল ক্রিয়া অতিশয় গুহ্য, গুরুমুখী ও রহস্যময়। প্রচলিত অসংখ্য পূজাবিধি ও সাধনা হইতে এগুলি স্বতন্ত্র এবং সাধারণ দৃষ্টিতে অদ্ভুত। অথচ এই রহস্যময় প্রক্রিয়াগুলিই তত্ত্ব সাধনার প্রাণ এবং উহার ফলও প্রত্যক্ষ।

২. তত্ত্বসাধনার প্রাচীনত্ব

তত্ত্ব-সাধনা কত প্রাচীন? ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মন্মথী স্মৃতিগুলি প্রমাণ করে, শক্তিসাধনা বৈদিক যুগের বহুপূর্বে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত।^১ আবার কাহারও কাহারও ধারণা তত্ত্ব-সাধনা বেদ-মূল্য; বেদাদিতে বিশেষতঃ অথর্ববেদে তত্ত্বাচারের বাহুল্য। তাহাদের মতে তত্ত্বমত অথর্ববেদের সৌভাগ্যাকাণ্ড হইতে পরিগৃহীত। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আবার মনে করেন, তত্ত্ব সাহিত্য বৌদ্ধদের সৃষ্টি। বুদ্ধদেব নিজে সর্বস্বরের মানুষকে স্বীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য তত্ত্বমত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে প্রচলিত যাবতীয় তত্ত্বগ্রন্থ মহাবান বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়—কালী, তারা প্রভৃতি শক্তি দেবতাও তাত্ত্বিক বৌদ্ধদের দেবতা।^২

কিন্তু তত্ত্বাচার অপ্রাচীন নয়। ড শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, তত্ত্বাচার হিন্দুদেরও নয়, বৌদ্ধদেরও নয়—ইহার উৎস অতি আদিম। সেই আদিম উৎস হইতে দর্শন বা তত্ত্ব বিরহিত তত্ত্বাচার অবিস্মরণীয় কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং যুগে যুগে প্রায় সকল ধর্মেই ইহা গৃহীত হইয়া—কোথাও বা হিন্দুত্বের কোথাও বা বৌদ্ধত্বের পরিণত হইয়াছে।^৩

বস্তুতঃ তত্ত্বাচার অপ্রাচীন নয়। বেদে-উপনিষদে তাত্ত্বিকতার স্বাক্ষর আছে।

১. Pre-historic Ancient and Hindu India—B. D. Banerjee.
২. Introduction to Sadhan mala—Dr. B. Bhattacharjee.
৩. Obscure Religious cults—Dr. S. B. DasGupta.

পুরাণে, রামায়ণে ও মহাভারতে—শক্তিতত্ত্ব ও শাক্তাচারের উল্লেখ অল্পরত। বৌদ্ধধর্ম ইহাদের পরবর্তী—বিশেষতঃ বেদ-উপনিষদের পরে ভোঁ বটেই। অতএব তত্ত্ব-সাধনার প্রাচীনতাকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কেন, তারারও বহু পূর্বে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিহস্ত বর্ষ পূর্বে স্থাপন করিতে হয়। সম্ভবতঃ ইহা আরও প্রাচীন। কিছুউপত্যকাসভ্যতার 'মন্ত্র' স্মৃতি এবং তত্ত্ব-সাধনার যন্ত্র (চিত্র), মুদ্রা (হস্তাদির দ্বারা ভাবার মুকসঙ্কেত), স্ত্রী-কীঃ প্রভৃতি বীজমন্ত্র (একাক্ষরী শব্দের ভাষা)—মানব-সৃষ্টির অতি আদিম-যন্ত্রের চিত্রাত্মক, মুদ্রাত্মক বা একাক্ষরাত্মক ভাষায় স্বাক্ষর বহন করে : বট্ কর্মাদি আভিচারিক ক্রিয়াও আদিমতম বিশাল ও ক্রিয়ার পরিচয়।

তবে তত্ত্ব নামে যে বিপুল সাহিত্য বর্তমানে পাওয়া বাইতেছে, তাহাদের বয়স খুব প্রাচীন নয়। বীজ যেমন ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া বিরাট মহীকর্মে পরিণত হয়—তেমনি মাতৃতান্ত্রিকতার আদি বীজ প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া বিপুল তত্ত্ব-কলত্ররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। কেহ ইহাতে তত্ত্ব যোগ করিয়াছেন, কেহ বা ইহাতে বিধি ও বিধান, ভাগ ও আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, কেহ বা বিশৃঙ্খল সাধন পদ্ধতিকে সুশৃঙ্খলভাবে বিস্তৃত করিয়াছেন। কালক্রমে তত্ত্বদেহ বিচিত্র আকারে আকারিত হইয়াছে। মনোমী Winternitz এই বিচিত্র মিশ্রণের ইঙ্গিত দিয়া একটি অতি মূল্যবান উক্তি করিয়াছেন : In saktism and its sacred books, the 'Tantras, we find the loftiest ideas on the Deity and profound philosophical speculations, side by side with the wildest superstition and most confused occultism ; and side by side with a faultless social code of morality and rigid asceticism, we see a cult disfigured by wild orgies inculcating extremely reprehensible morals. [A Hist. of Ind. Lit. Vol. I]

এই উক্তি হঠাৎ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একটি অতি আদিম ধারার কালক্রমে বহু ধারার মিশ্রণের ফলে প্রচলিত তত্ত্ব সাহিত্যের উদ্ভব।

৩. তান্ত্রিকতার কেন্দ্র : তত্ত্বগ্রন্থের তালিকা ও শ্রেণীবিন্যাস

একটি অতি সুপ্রচলিত মত এই যে, তান্ত্রিকতার জন্মভূমি বঙ্গদেশ : গোড়ে প্রকাশিতা বিজ্ঞা'। একথা ঠিক যে, প্রাচীনতম তত্ত্বগ্রন্থের অনেকগুলি বঙ্গদেশ হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে—বঙ্গদেশীয় তত্ত্ব দর্শন-তত্ত্ব বিরহিত প্রাচীনতার চিহ্নও বর্তমান, বাংলাদেশের রক্ত-মাংস-মজ্জার মাতৃভাষার প্রাধান্য—বাংলার ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আচার-ব্যবহার, বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার ও সাহিত্য মাতৃভাবে অল্পরঞ্জিত ;

ভারতব্যাপী বিখ্যাত শাক্তপীঠের অনেকগুলি বন্ধদেশে ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যমান। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিকতার কেন্দ্র হিসাবে চারিটি স্থানের নাম করিয়াছেন : কামরূপ, সিরিহট্ট ও ডিডিয়ান ও পূর্ণগিরি—এগুলিও বাংলাদেশে ও বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

কিন্তু তন্ত্রাচার কেবল বন্ধদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত হিমালয় পর্বতের পাদদেশ ধরিয়া একটি রেখা টানিলে সমগ্র অঞ্চলটিকেই তান্ত্রিকতার বন্ধনী বলিতে হয় : উপরন্তু দাক্ষিণাত্যেও তন্ত্রাচার প্রচলিত। শৈবাচারের সহিত তন্ত্রাচার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই শাক্তাচার মহাধান বৌদ্ধ কর্তৃক ভারতের বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছে : তিব্বত, চীন, জাপানেও তন্ত্রাচার সুপ্রতিষ্ঠিত।

তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিকতার লীলাভূমিকে তিনটি কেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে : অশক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা।^১ বিদ্যাপর্বত হইতে কৃত্যাকুমারিকা অঞ্চল অশক্রান্তা, বিদ্যা হইতে উত্তরস্থিত সমগ্র ভূভাগ রথক্রান্তা এবং বিদ্যা হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিষ্ণুক্রান্তা।

এই সকল কেন্দ্রে কত যে তন্ত্র গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। তন্ত্রশাস্ত্রে অবশ্য একটি সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে। তাহাতে অশক্রান্তাদি প্রত্যেকটি কেন্দ্রের গ্রন্থ সংখ্যা চৌষট্টি—একুনে তন্ত্রের সংখ্যা একশত বিরানব্বই।

অশক্রান্তার অন্তর্ভুক্ত ৬৪ খানি তন্ত্র—তন্মধ্যে ভূতভূক্তি, গুপ্তদীক্ষা, শিবতন্ত্র, শিবার্চন, যোগতন্ত্র, বিন্দুতন্ত্র, শবর, শ্লিনী, চূড়ামণি, বিশুদ্ধেশ্বর, চীন, ভূতেশ্বর প্রভৃতি বিখ্যাত।

রথক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ খানি তন্ত্রের মধ্যে—মেরু, মহানির্বাণ, ভূতভাম্বর বৃহৎগৌতমীয়, পুরস্চরণচন্দ্রিকা, পুরস্চরণ রসোজ্জ্বল, প্রশঙ্কসার, পিচ্ছিলতা, স্বরোদয় জ্ঞানভৈরব, কঙ্কালমালিনী, শক্তিগঙ্গা, সারদা, চান্দার, বন্ধভাম্বর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্ভুক্ত ৬৪ খানির মধ্যে কালীতন্ত্র, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, নীলতন্ত্র, কেকারিণী, শ্রীকৃষ্ণ, সিদ্ধবাহন, মৎস্যসূক্ত, সিদ্ধসার, বারাহী, যোগিনী, শিবগম্ভ, যোগিনীসুদয়, কুলচূড়ামণি, কামাখ্যা, ভূতভাম্বর, বামল, ব্রহ্মবাহন, বিশ্বসার, কুলোজ্জীর্ণ, কুজিকা, কালীবিলাস, মায়াতন্ত্র প্রভৃতি বহুল প্রচলিত।

১। হিন্দুর যুক্তিকা-গ্রন্থেও এই তিনটি স্থানের নাম আছে :

অশক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বহুতন্ত্রে।

যুক্তিকে হয় নে পাশং বয়্যা দ্রুততঃকৃতম॥

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে তহগুলি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত : আগম, ভামর, বামল ও তহ। তহশাস্ত্রে উহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বাংগর বক্তা শিব, শ্রোতা পাণ্ডিতী এবং যেমত বাহুদেবের, তাহাই আগম।^১ ইহাতে সাধারণভাবে সৃষ্টি, প্রলয়, দেবচনা, পুরস্করণ, ঘটকর্ম ও ধ্যানযোগের বিবৃতি থাকে।

শিবপ্রাক্ত শাস্ত্রে ভামর বলে। শাস্ত্রে ছয় প্রকার ভামরের উল্লেখ আছে,— যোগভামর, শিবভামর, তর্গাভামর, সারস্বতভামর, ব্রহ্মভামর ও গন্ধর্বভামর ; এগুলি ছাড়া কুতভামরও একপানি বিখ্যাত গ্রন্থ।

বামল শব্দের সাধারণ অর্থ 'যুগল'। ইহা তদ্ব্যাক্তগত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। ইহা অষ্টলক্ষ্য যুক্ত। ইহাতে থাকে সৃষ্টি, জ্যোতিষ, আখ্যান, নিত্যরূপ, ক্রমসূত্র, বর্ণভেদ, জ্যোতির্ভেদ ও যুগধর্মের কথা। বামলের সংখ্যাও ছয়পানি,—ব্রহ্মবামল, বিষ্ণুবামল, কপ্তিবামল, গণেশবামল, রবিবামল ও আদিত্যবামল।

শাস্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট নাম তহ। ইহাতে সর্গ, প্রাতিসর্গ, দেবতাসংস্থান, তীর্থবর্ণনা, আশ্রমধর্ম, যজ্ঞবর্ণন, জ্যোতিষ, পুরাণাখ্যান, কোষবর্ণনা, ব্রতাবিবরণ, শৌচাশৌচ, নরকবর্ণনা, শাপকথার লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, প্রভৃতির বিবরণ থাকে।

তহের সমার্থক আরও অনেক শব্দ আছে—নিগম, রহস্য, সাহিত্য, অর্ণব ইত্যাদি। যোটির উপর এই সকল মিলিয়া তহশাস্ত্র সাগরের মতই অনন্ত ও অগাধ। শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় কর্তৃকও অসংখ্য তহ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু তহ গ্রন্থগুলির মধ্যে সুবোধারি উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রতহ।

ভাব, আচার ও কুলভেদে তহ সাধনায় নানা শ্রেণী বিভাগ আছে : তন্মধ্যে কালীকুল ও শ্রীকুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই তহ গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে বহু সাধক, পণ্ডিত ও আচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক তাহ্মক নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। বিরাট তহসাহিত্যের জাগরে সেগুলিও অমূল্য রত্ন। এই নিবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,

১. শঙ্করাচার্যের প্রণয়নার তহ এবং সৌন্দর্যলহরী, ২. লক্ষ্মণ দেশিকের সারদাতিলক,
৩. অভিনবগুপ্তের তহালোক, ৪. ভাষ্কর রায়ের সেতুবন্ধ ও বরিবস্তারহস্ত, ৫. সর্বানন্দের সুবোধাস্তহ, ৬. রুকানন্দ আগমবাণীশের তহসার, ৭. ব্রহ্মানন্দগিরির শান্তানন্দ তরঙ্গিনী ও তারা রহস্ত, ৮. পূর্ণানন্দের ক্রীতস্বচিন্তামণি (ইহার অন্তর্গত ঘটচক্রনিরূপণ),
- ভামারহস্ত ও শাস্ত্রক্রম এবং ৯. গৌড়ীয় শঙ্করাচার্যের তারারহস্তবৃত্তিকা।

১। আগতঃ শিববক্তে ভ্যোগতঃ গিরিজাক্ষতৌ।

যতক বাহুদেবস্ত তস্মাদাগমমুচ্যতে ॥

৪. কয়েকটি তন্ত্রগ্ৰন্থ ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয়

• তন্ত্রশাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থগুলির নানা প্রকারভেদ বাহাই হউক, প্রত্যেক তন্ত্রেরই বর্ণনীয় বিষয়—কিছুটা জ্ঞান (দর্শন) এবং বেশির ভাগ ক্রিয়া (পূজা, যোগ, চর্চা)। তন্ত্রে ক্রিয়াংশই প্রধান। তাই প্রত্যেক তন্ত্রেই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে দেবতার পূজা-প্রণালী। এক এক দেবতার এক এক প্রকার মন্ত্র, যন্ত্র, ধ্যান ও অর্চন-পদ্ধতি। এই দিক হইতে তন্ত্রের বর্ণনা অত্যন্ত একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন। তবে কোন কোন গ্রন্থে বিশেষত্বও যে না আছে, তাহা নয়। এই বিশেষত্বগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এবং বাঙালীর তৎসংস্পর্শ সহিত সাদৃশ্য আছে এমন কয়েকটি মূলতন্ত্র ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয় দেওয়া যাউতেছে।

॥ মূলতন্ত্র ॥

॥ কালীতন্ত্র ॥^১ কালীমূলের একটি বিখ্যাত তন্ত্র। ইহার আকার ক্ষুদ্র কিন্তু পুজার ইঙ্গিত অত্যন্ত গূঢ়ার্থবাহক। কালীপূজা বিশেষে ইহাষ্ট প্রামাণিক মূলতন্ত্র। ইহা একাদশ পটলে বিভক্ত এবং হর-পার্বতীর কথোপকথন রূপে বিবৃত। মহাবিদ্ভা কালিকার তত্ত্ব ও উপাসনাপ্রণালী বর্ণনাই এই তন্ত্রের মূল লক্ষ্য। এই তন্ত্রেই বহুবিখ্যাত দক্ষিণকালীর 'কালিকাং দক্ষিণাং দিন্যাং মুণ্ডমালাবিকৃসিদ্ধাম্' ধ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে। এই ধ্যানের মূর্তিই বাংলাদেশের বহুখ্যাত ও সমৃদ্ধ পরিচিত কালীমূর্তি। দেবী মুণ্ডমালা-বিকৃসিতা। তাঁহার বামহস্তে ধ্বজা ও সজ্জাধার মল্লক, দক্ষিণ হস্তে বর ও অভয়; তিনি মহামেঘপাভা শ্রামা ও দিগম্বরী—ঘোরদংষ্ট্রা, কিন্তু তসবর্ণী; শবরূপে মহাদেব তাঁহার পদতলে পতিত। এই মাতৃসাম্বন্ধের আচার কোলাচার—অষ্টম পটলে সেই কোলাচারের বর্ণনা। এই তন্ত্রে বলা হইতেছে :

ন হি কালী সমা বিদ্ভা নহি কালী সমা কলম।

নহি কালী সমা জ্ঞানঃ নহি কালী সমান্তপঃ ॥ [নবম পটল]

॥ তারাতন্ত্র ॥^২ দশ মহাবিদ্ভার দ্বিতীয়া বিদ্ভা তারা; তারাতন্ত্র তারা বিদ্ভা উপাসনার কথা। ইহাতে তারা-উপাসনার ষাটতীয় প্রক্রিয়া বর্ণিত হইলেও দেবীর ধ্যান প্রকাশ করা হয় নাই। তারার ধ্যান অবশ্য তন্ত্রান্তরে পাওয়া যায়। তারার পুজার পঞ্চ-ম-কার তন্ত্রের প্রয়োগ বিহিত : এই পুজার সহিত চীনতন্ত্রের যোগ

১। Sanskrit Sahitya parishad Series No. 2.

২। Published by Varendra Research Society, Rajshahi.

স্বীকার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে দেবীর নিকট নিজ দেহরক্ত প্রদানের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অল্প জন্তুর কলসপূর্ণ রক্তদান অপেক্ষা তিলপ্রমাণ নিজদেহরক্তদান অধিকতর প্রশস্ত :

জন্তুরকেন সস্পূর্ণ কলসাং পর্বতাস্থজে ।

তিল প্রমাণ কথিরং নিজদেহস্ত শস্ততে । [পঞ্চম পটল]

তারা-অর্চনা বামাচার সাধনার অঙ্গদূর্ত্ত ; এইজন্ত ইহা অত্যন্ত গুরু ও রহস্যময় ।

॥ মহানির্বাণভঙ্গ ॥ অনেকেই মনে করেন, এই তত্ত্বগানি অপ্রাচীন। কেহ কেহ আবার রাজা রামমোহন রায়কে ইহার প্রণেতা বলিয়া মনে করেন। হয়তো এই তত্ত্বের কিছু অংশ পরবর্ত্তীকালের যোজন্য, কিন্তু ইহাতে যে হুপ্রাচীন তাত্ত্বিক উপাসনার বিষয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা চোদ্দটি উল্লাসে বিভক্ত এবং ছয়-পার্বতীর কথোপকথন ভলে বর্ণিত। ইহাতে বলা হইয়াছে, কলিকালে পশুভাবও নাই, দিবা 'ভাব'ও নাই—তথোক্ত বীরভাবই কলিতে অবলম্বনীয়। কলির মার্গ কোলাচার—'কৌলধর্ম্যং পরো ধর্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে' [৪র্থ উল্লাস]। এই কোলাচার শাস্ত্রদ্বী বিজ্ঞার সার। 'আগমোক্ত বিধানের শ্রেষ্ঠ পথ। মহানির্বাণ তত্ত্বে পরমাশক্তির প্রধানমূর্ত্তি আত্মামূর্ত্তি [৫ম উল্লাস] : অপূর্ণ এই মূর্ত্তি—

মেঘাদ্রাং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাধরং বিভ্রতীম্ ।

পানিভ্যামভয়ং বরকং বিকসদ্ রক্তারবিন্দং স্তিতাম্ ॥

নৃত্যন্তঃ পুরতো নিপীয মধুরং মাধ্বীকমন্তঃ মহা-

কালং বীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাচ্চাং ভজে কালিকাম্ ॥

—কালিকা দেবীকে ভজনা করি : তিনি মেঘাদ্রী, চন্দ্র-মৌলি, ত্রিনয়না ও রক্তাধর পরিচিতা। তাঁহার স্তম্ভে বর ও অভয়। তিনি রক্তপদ্মে অবস্থিতা, মধুর মাধ্বীক মন্ত্রগানে নৃত্যপর মহাকালকে সম্মুখে দেখিয়া হাস্তমুখরা।

এই শাস্ত্র দেবার পূজার উপকরণ পক্ষ তত্ত্ব—'মন্ত্রং মাংসং তথা মংস্তাং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ'। শুদ্ধহীন দেবীপূজা অভিচারমাত্র : 'পক্ষতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।' মহানির্বাণ-তত্ত্বে বিস্তৃতভাবে এই পক্ষতত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'চক্রাঙ্ঘ্রাণ' ক্রিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্বাণ-তত্ত্ব প্রকৃতই তত্ত্বলক্ষণাক্রান্ত। ইহাতে শ্রাদ্ধকর, বর্ণালম্বর্ধ, রাজ্য-শাসন প্রভৃতির কথাও আছে। নারী সম্পর্কে এই তত্ত্ব অতিশয় প্রাচীন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে :

কস্তাপোবং পালনীয়। শিক্ষনীয়। তিষথত্বতঃ ।

দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমমিতা ॥ [৬ম উল্লাস]

মহানির্বাণতত্ত্বের দর্শনাংশও অতি মূল্যবান। শক্তিই পরমতত্ত্ব। একদিকে তিনি 'পরমা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ', অন্যদিকে তিনিই 'মহাদ্বাদ্ব্যপূর্ণবস্তুর বহেতৎ সচরাচরম্'। এই শক্তি জগতে অনন্তরূপিণী। তিনিই তারিণী, দুর্গা, বোড়শী, কুবেরেশ্বরী, তিনিই ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তকা। উপাসকের কার্যার্থে তিনি বিবরূপা। এই অনন্তরূপের মধ্যে কালী রূপটিই অশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত : কালীনামের তাৎপর্যও গূঢ়ার্থবোধক :

কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীৰ্তিতঃ ।

মহাকালস্ত কলনাং তমাগ্ৰা কালিকা পরা ॥

কাল সংগ্রসনাং কালী সর্বেষামাদিরূপিণী । [৪র্থ উল্লাস]

—সর্বভূতকে কলন করেন বলিয়া শিবের নাম মহাকাল ; সেই মহাকালকে কলন করেন বলিয়া তিনি কালী : কালীই আদিরূপিণী।

॥ কুলার্ণব তত্ত্ব ॥ কোলমার্গের প্রশস্তি-জ্ঞাপক আগমজাতীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্বমতে কোলাচারই সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে অন্তান্ত ছয় প্রকার আচারের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত 'কোলাৎ পরতরং ন হি।' কোল শ্রেষ্ঠ সাধক : ইনি কুল ও অকুল দুইয়েরই সন্ধান জানেন। কুল হইতেছে পরমা শক্তি, আর অকুল পরম শিব। কোলগণ এই শিব-শক্তির সম্বোধনে কুশল :

অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীৰ্তিতা ।

কূলকূলানুসন্ধানেন নিপুণাঃ কোলিকাঃ প্রিয়ে ॥

কোলগণের সাধনাও অতি রহস্তপূর্ণ। কুলার্ণবতত্ত্বে পঞ্চ ম-কারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কোল সাধকের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য। পরিশেষে পঞ্চতত্ত্বের অতি সূক্ষ্মর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও বোঝিত হইয়াছে। স্তূল প্রদৃষ্টির জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব সাধনা কিভাবে সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক জগতে পদার্পণ করে, কুলার্ণবতত্ত্বের পঞ্চমোল্লাস তাহার একটি দৃষ্টান্ত। শক্তিসাধনা যুগপৎ ভুক্তি ও মুক্তির সাধনা। ভোগের জগতকে অবলম্বন করিয়া ইহা মোক্ষের স্তরে গমন করে। সে স্তরে সাধক সহস্রারচিত মহা-পদ্মবনের পথিক, তাঁহার মন্ত 'চিচ্চক্ৰকুণ্ডলীশক্তি-সামরস্ত' (শিব ও কুণ্ডলীশক্তির মিলনরূপ সৌখ্য), তাঁহার মাংস জ্ঞান-বজ্রের নিহত পূণ্যাপুণ্য পশুর মাংস ; তিনি ইন্দ্রিয়সংযমরূপ কর্ম করিয়া মৎস্ত ভক্ষণ করেন, প্রবুদ্ধশক্তিরূপ মূত্রা গ্রহণ করেন—সর্বোপরি তিনি শিব-শক্তির মিলনানন্দে বিভোর—ইহাই তাঁহার অন্ত্য তত্ত্বাধ্বানন :

পরশক্ত্যাশ্রমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ ।

য আন্তে বৈধুনং তৎ স্তাদিতরে স্ত্রী-নিবেষকাঃ ॥ [পঞ্চম উল্লাস]

॥ রাধাতন্ত্র ॥ প্রাচীনভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাকে তেমন প্রাচীন মনে হয় না। ইহার সিদ্ধান্তে একটু অভিনবত্ব আছে। এখানে রাধাকৃষ্ণলীলার একটি রহস্যময় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একজন বাস্তবের মহাদেবের নিকট ধর্ম উপদেশ চাহিলে তিনি ইহাকে ত্রিপুরা-উপাসনার নির্দেশ দেন। কৃষ্ণ সেই উদ্দেশ্য কালীতে বাইয়া মহামায়ার অর্চনা করিতে আরম্ভ করেন। মহামায়া তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলেন,

সংযোগ্য কৃষ্ণ যত্নেন শক্যাসহ উপোষন।

যোগ্য বিনা স্তবত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা-সিদ্ধি ন জায়তে ॥ [দ্বিতীয় পটল]

শক্তি যোগে সাধনার নিমিত্ত কৃষ্ণ যথুরায় আবির্ভূত হইলেন। তথায় পূর্বেই দেবীর অংশভূতা পদ্মিনী রাধারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 'কালিন্দীকূলে মাধুরীপীঠে দেবীর শিব কেশপীঠ। সাধনার জন্য কৃষ্ণ সেই পীঠে পদ্মিনী রাধার সহিত মিলিত হইলেন। ইহাই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণলীলার গূঢ়ত্ব। এই তত্ত্বে রাধাকৃষ্ণের যে অধ্যায়ান বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে লৌকিক কথার সহিত কিছুটা ভাগবতকথাও প্রতিধ্বনি আছে। রাধাতন্ত্রে বৈষ্ণবীয় প্রেমলীলাকে শাক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১. তাত্ত্বিক নিবন্ধ ॥

মূলতন্ত্রের তত্ত্ব ও উপাসনাপ্রণালী বিষয়ে অনেকগুলি তাত্ত্বিক নিবন্ধ পাওয়া যায়। নিবন্ধগুলি ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্কলন, কোথাও বা মৌলিক রচনা। রচনাকার অধিকাংশই সাধক ও পণ্ডিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই অল্পবিস্তর রচিত হইয়াছে। বাংলাদেশে রচিত বা সংকলিত গ্রন্থগুলি কালীকলাপ্রিত। তাহাতে দর্শন-ভাষ্য অপেক্ষা ক্রিয়াকর্মের অংশই প্রধান। অস্ত্রাঙ্গ অঞ্চলে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি ত্রিকলাপ্রিত। তাহাতে দর্শনের আলোচনাই মধ্য।

বাংলাদেশের নিবন্ধগুলির ভিতর সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের (কোড়শ শতাব্দী) তন্ত্রমার। ভারতবর্ষের সবত্র এই গ্রন্থের সমাদর। ইহাতে দীক্ষা, শাক্তের নিত্যকর্ম ও বিভিন্ন দেবতার যে পূজামন্ত্র ও বিধি সংগৃহীত হইয়াছে, হিন্দুর দীক্ষা ও কালী-তারাদি শাক্তপূজা তাহার অনুরণনেই অতুষ্টিত হয়।

ব্রহ্মানন্দপিরির শাক্তানন্দতন্ত্রঙ্গিনী আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ উল্লাসে বিভক্ত। ইহাতে জীবের জন্ম, মেহে নাড়ী-বায়ুর সংস্থান, শক্তি-অর্চনার উপযোগিতা, শাক্তী দীক্ষা ও উপাসনার সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ভাবা সহজ ও সরল, সংগ্রহ-নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়।

পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ ত্রীতম্ভচিন্তামণি, শাক্তকর্ম ও ভ্রামারহস্ত। ত্রীতম্ভচিন্তামণির অন্তর্গত ‘ষট্চক্রনিরূপণ’ Avalon-সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সপ্তচক্রের (মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, অজ্ঞা ও সহস্রার) অতি সূক্ষ্মরূপে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শক্তি-সাধনার মূল ভিত্তি দেহে। ষট্চক্রনিরূপণে এই দেহতত্ত্বেরই বিশ্লেষণ।

বাংলার বাইরে যে সমস্ত তাত্ত্বিক নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্যের (দ্বাদশ শতাব্দী) প্রাপকসার তত্ত্ব ও সৌন্দর্য-লহরী বহুখ্যাত। প্রাপকসার তত্ত্ব মূল তত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত। সূচনায় শক্তির অবরোহণ-ক্রমের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাশক্তি ‘অম্বরাদ্যবহিষ্ঠ দেহীনা’ দেহপুরণী। এই তত্ত্বখানি ৩৬ পটলে বিভক্ত। কেহ কেহ মনে করেন, পটল-সংখ্যা শক্তির ছত্রিশ তত্ত্বের নির্দেশক। সৌন্দর্য-লহরী বা আনন্দলহরী বস্তুতঃ একখানি কাব্য। ইহাতে ষোড়শী ত্রিপুরা মূর্তির যে অপূর্ব বর্ণনা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে Shelley-র Intellectual Beauty-র স্তোত্র তুলনা করিতেন। দেবী-বর্ণনার মধ্যেই দেবীতত্ত্ব ও দেবার্চনের ইঙ্গিত। কিন্তু তবকে অতিক্রম করিয়া প্রাকট হইয়াছে অপূর্ব কবিত্ব। যেমন দেবীর কৃষ্ণকৃষ্ণলে সমীক্ষ-সিন্দুরের এই বর্ণনা, -

বহন্তী সিন্দুরঃ প্রবলকবরীভার তিমির-

দ্বিধাঃ সূক্ষ্মবন্দীকৃতমিব নবীনাকীকরণম্।

তনোতু কেমঃ নস্তব বদনসৌন্দর্য লহরী-

পরীবাহশ্রোতঃ সরণিরিব সীমন্ত-সরণিঃ ॥ [সৌ. ল. ৪৪]

—হে দেবী, তোমার কেশ মধ্যস্থ যে সীমন্ত রেখা, তাহা তোমার বদন-সৌন্দর্য-লহরীর পরীবাহ-শ্রোতঃপথের দ্বারা গোভ্রামান; তাহা সিন্দুরাচিত হওয়ায় মনে হইতেছে, যেন শঙ্ক-কেশকলাপরূপ তিমির দ্বারা প্রভাতসূর্য বন্দীকৃত হইয়াছে; সেই সীমন্তরেখা আমাদের কাছে কেম বিতরণ করুক।

সৌন্দর্যলহরী মোট শ্লোকসংখ্যা ১০৮। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ তত্ত্বের সময় তত্ত্বই কাব্য গারে বিবৃত হইয়াছে। ষোড়শী দেবী বা ত্রীবিজ্ঞাই এই গ্রন্থের মহাবিজ্ঞা।

অস্ত্রান্ত নিবন্ধাবলীর মধ্যে অভিনবভূষণের তত্ত্বালোক একটি স্পষ্ট ও মূল্যবান গ্রন্থ। অভিনবভূষণ ছিলেন ত্রীবিজ্ঞার উপাধিক, তিনি প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনবাদী। তত্ত্বালোক এই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনেরই কাব্যময় ব্যাখ্যা। তত্ত্বের দার্শনিক চিন্তা যে কত স্বচ্ছ ও উচ্চতরে উঠিয়াছিল, তত্ত্বালোক তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। তত্ত্বালোকে কাম্যদীর্ঘ শৈব মতের প্রভাব আছে। এই মতে শিবই পরমতত্ত্ব, কিন্তু শিব সর্বদাই শক্তিযুক্ত—শক্তিদ্বারা শিবের প্রকাশ। শিব তেমন নিত্য, শক্তিও তেমন নিত্য এবং তাঁহার পরস্পর অবিনাশকে

মূল : 'শিবশক্তাবিনাতাবারিত্যেকা মূলকারণম্' [তত্ত্বালোক. ২. ১৫২]। অভিনবগুপ্ত
বনম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

লক্ষণ বেশিকের সারদাতিলক আর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একাধিক
টীকা রচিত হইয়াছে; বঙ্গদেশীয় তাত্ত্বিক নিবন্ধাবলীতেও সারদাতিলকের মত গৃহীত
হইয়াছে। সারদাতিলক পঞ্চবিংশতি পন্নবে বিভক্ত। ইহার প্রথম পন্নবে সৃষ্টিতত্ত্ব,
দ্বিতীয়ে বৈশ্বরী সৃষ্টি, চতুর্থে দীক্ষাবিধি, পঞ্চমে হোমবিধি এবং তৎপরবর্তী পন্নবগুলিতে
বিভিন্ন দেব-দেবীর অর্চনাপদ্ধতি। সারদাতিলকে হৃদয় শক্তির স্তোত্রাভিযুক্তির ক্রমটি
অতি সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে : পরমতত্ত্ব সচ্চিদানন্দবিভব ও স-কল ; তাহা হইতে
শক্তি, শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি :

সচ্চিদানন্দবিভবঃ সকলান্ পরমেশ্বরান্ ।

আসৌচ্ছক্তি জতো নানো নাদাধিব্দ্যঃ সমুদ্ভবঃ ॥ [প্রথম পটল]

এই বিন্দুরষ্ট প্রকারভেদ দেখিব শব্দব্রহ্ম। ইহাই কুণ্ডলীরূপে প্রাণীদেহে
অবস্থান করিতেছে।

তাত্ত্বিক গ্রন্থাদির আর একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার পণ্ডিত ভাস্কর রায়। [অষ্টাদশ
শতক]। ইনিও শ্রীবিষ্ণুর উপাসক। বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে তিনি শ্রীবিষ্ণুর গুচ রহস্য
উল্লেখ্য করেন। তাঁহার বহুবিখ্যাত গ্রন্থ বামকেশ্বর তত্ত্বের 'সেতুবন্ধ' নামক টীকা
এবং বরবসারহস্ত নামক তাত্ত্বিক নিবন্ধ। মহাশক্তির উপাসনা যোগ্য রূপ সম্পর্কে
তিনি সেতুবন্ধ টীকায় বলিতেছেন ১.—পরমেশ্বরের উপাসনাব্যোগ্য তিনটি রূপ আছে—
মূল, হৃদয় ও পর। প্রথমতঃ করচরণাবয়বমূল মূলমূর্তি, দ্বিতীয়তঃ মহাশক্তি মূর্তি,
তৃতীয়তঃ মানসধ্যানযোগ্য মূর্তি। এই তিনের অতীত আর এক রূপ আছে, তাহা
বাণেশ্বরের অতীত।

৫. শাস্ত্রদর্শন ও শক্তিসাধনার মূলকথা

পূর্বে আলোচিত মূলতত্ত্ব ও তাত্ত্বিক নিবন্ধাদির আলোচনা প্রসঙ্গে ষোড়শটিভাবে
শাস্ত্রদর্শনের একটা আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। অতি আদি হরে সাধনায় দর্শনের স্থান
ছিল নিত্যানন্দ গোপ, সাধনাই ছিল মূল লক্ষ্য। বঙ্গদেশীয় তত্ত্বাদিতে দর্শনাংশ খুবই কম।

১। উপাসনায়: পরমেশ্বরান্বীণি রূপাণি উপাস্ত্রিযোগ্যানি মূল হৃদয় পরঞ্চেতি ।
তজ্জাত্য করচরণাবয়ব শীলঃ মন্ত্রসিদ্ধিযত্না চক্ষুরিঙ্গিয় পানীক্লয়যোগ্রাহম্ । দ্বিতীয়ঃ
মহাশক্তি পুণ্যবত্যাঃ প্রবণেকিয় বাসিক্লিয়যোগ্রাহম্ ॥ তৃতীয়ঃ বাসনাশক্তি পুণ্যবত্যাঃ
বনসোযোগ্যম্ ।... এতদ্বিত্যর্থাভিত্ত্য বায়নশাভীতঃ মূর্তিরহস্ত্যাহ অঙ্গকুরমানমণ্ডঃ
রূপম্ ।*

কান্দীরীর তত্ত্বে দর্শনের সূত্রাত্মক আলোচনা আছে। পরম তত্ত্ব, জীব ও সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই দার্শনিকতার ভিত্তি। এ সম্পর্কে বহুদৈর্ঘ্য তত্ত্বে অতি সংক্ষেপে যে আলোচনা আছে, তাহার মূল কথা এই যে,—শক্তিই পরমতত্ত্ব; তিনি ব্যক্তাব্যক্তরূপিণী—মহানীতমুপবৃত্ত চরাচরজন্য তাহারই সৃষ্টি। জীব শক্তির সঙ্কচিত প্রকাশ। শক্তির উপাদান কারয়া সঙ্কচিত জীব মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে এবং শেষ পর্বন্ত পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শিবদে প্রীতি লাভ করিতে পারে। জীবই শিব—এই তত্ত্বে প্রোতপ্তিত হওয়াই শক্তিসাধনার লক্ষ্য।

শাক্তমতন কালক্রমে হুস্ম ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। সে দর্শনের মূলভিত্তি বহুত্রিংশ তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলির মধ্যেই পরমতত্ত্ব ও সৃষ্টিরূপে তাহার অভিব্যক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বহুত্রিংশ তত্ত্ব হইতেছে,—১. শিব, ২. শক্তি ৩. সদাশিব, ৪. ঈশ্বর, ৫. বিজ্ঞা, ৬. মায়্যা, ৭. অবিজ্ঞা, ৮. কলা, ৯. রাগ, ১০. কাল, ১১. নিয়তি, ১২. জীব, ১৩. প্রকৃতি, ১৪. মনঃ, ১৫. বুদ্ধি, ১৬. অহঙ্কার, ১৭—২১ পঞ্চতন্ত্রাত্ম, ২২—৩১ দশেক্রিয় ও ৩২—৩৬ মূল পঞ্চভূত। শিবই শাক্তের পরমতত্ত্ব; এই শিব নিরীহ, নিষ্পন্দ, গুণাতীত, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ইনি শক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গভাবে যুক্ত—অর্থেত হইলেও শক্তির্বিশিষ্টাথেতঃ ইনি নির্বিশেষ শিব। শক্তি হইতেছেন এই শিবেরই স্বাতন্ত্র্যশক্তি, অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে শিবের ইচ্ছাশক্তি। এই শক্তিই শিবের প্রকাশ—যেমন সূর্যের প্রকাশ তেজ, অগ্নির দাহিকা শক্তি, মণির মণিভাতি। এই শক্তি হইতেই সদাশিব, ঈশ্বর, বিজ্ঞা প্রভৃতি তত্ত্বের আবির্ভাব। এগুলি শিব শক্তির অতি শুদ্ধ, অতি স্বচ্ছ প্রকাশ—অর্থাৎ শক্তির অন্তর্মুখী পরিণাম। শক্তির বহির্মুখী পরিণাম মায়্যা হইতে মূল পঞ্চভূত পর্যন্ত তত্ত্বগুলি। তন্মধ্যে মায়্যা হইতে নিয়তি পর্যন্ত তত্ত্বগুলি অন্তঃস্থ লক্ষণ মিশ্রিত। জীব শিবেরই অংশ, কিন্তু আচ্ছন্ন, কঙ্ককাবেত, মলাকীর্ণ—জীব মায়্যা, অবিজ্ঞা, কলা, রাগ, কাল ও নিয়তির অধীন,—এই জীবেরই মূলদেহ মহৎ হইতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক ভোগদেহ,—বাহ্যায় মূল প্রকৃতি। অন্তএব তত্ত্বমতে শিব হইতে জীব বা সৃষ্টি পর্বন্ত সমস্ত কিছুই শক্ত্যাশ্রয়। কোথাও শক্তির প্রকাশ স্তম্ভ বা ময়, কোথাও স্বপ্নের মত, কোথাও শক্তি অতিশয় মূলভাবে জিয়াশীল। জীবদেহে এই শক্তি রহিয়াছেন মূলধারে কুণ্ডলীশক্তিরূপে। শক্তি এখানে ভট পাকানো—তাই তিনি কুণ্ডলী রূপ।

শাক্তমতে সাধনা জীবকে কেন্দ্র করিয়াই। জীব শিবাত্ম হইলেও মায়্যাচ্ছন্ন। অবিজ্ঞায় জীবের শিবভাব আবৃত। বিষয়ের প্রতি রাগ (আশক্তি) তাহারই, জীব কালের অধীন, তাহার বিনাশ আছে এবং সে নিয়তি-ভাঙিত। অন্তএব জীবের

হুঃখের অর্থ নাই। সে মোহনাস্ত, বিবরাসক্ত, কৃত্যজয়ে ভীত। হুঃখের কবল হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে শিব-স্বরূপে, আনন্দধন নিত্য চৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাই শাক্ত সাধনার লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে গিয়া শাক্তগণ জীবদ্দেহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, দেখিয়াছেন, দেহভাগ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের দাবতীয় বস্তু দেহে বর্তমান—‘ব্রহ্মাণ্ডে যে পুণ্যঃ সখ্য তে তিষ্ঠাস্ত কলেবরে।’ এই দেহে লক্ষ্যকোটি নাড়ী ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে ও প্রাণ-অপানাদি বায়ুর ক্রিয়ায় জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। শুধু তাই নয়, জীবদ্দেহে আছে চরিত চকু বা পর—গুরুমূলে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, মাতিতে মণিপুর, চন্দ্রে ‘মনাহত, কণ্ঠে বিশ্বদে, জ্রমণ্যে আজ্ঞা। উপরন্তু ব্রহ্মরঞ্জে অশেষমুখে রাহুগাছে সচশার পর। জীবদ্দেহে পরম শিব রহিয়াছেন সহস্রার পদ্মের কলিকাবিন্দু পরম শিবপুরে, আর শক্তি রহিয়াছেন স্তম্ভাবস্থায় মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী-রূপে। মূলাধার হইতে সহস্রার পদমু কমলগুলি শুভ্রা নামক নাড়ীতে গ্রথিত। স্তম্ভায় চুই পাখে আরও চুইটি নাড়া—দক্ষিণে পিঙ্গলা বামে ইড়া। শক্তির স্রোত মূলাধার হইতে স্তম্ভাবস্থে সহস্রার পদমু প্রবাহিত হয়। মূলাধারের কুণ্ডলীশক্তি জাঘত হইয়া এট পথেও উজ্জীচাৰী হইয়া সহস্রার কমলের কেন্দ্রাবস্থিত পরম শিবের সাহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির এই মিলনে অপূৰ্ণ আনন্দময় সামরস্ত্রের উদয় হয়। এই সামরস্ত্র পানে বিভোর হওয়া বা নিজে সম্বরসীকৃত হইয়া যাওয়াই সাধকের পুরুষার্থ। শাক্ত সাধনার ইহাই চরম প্রাপ্তি। ইহা রসান্বাদজনিত এক অনির্বচনীয় মাধুর্যধন আনন্দময় অবস্থা।

শাক্ত সাধনাতত্ত্বের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। শাক্তদর্শনে যে ষট্‌ত্রিশং তত্ত্বের ক্রমোক্তিবাক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকে জানিয়া একে একে সকল তত্ত্বকে জয় করিয়া শেষতরে অর্চ্য শিবতবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ইহার সাধন। দর্শনে শক্তির অবরোহণ, সাধনায় রচিগাতে শাক্তের কুমারোহরণ।

শক্তি-সাধনা কেম-বস্ত্রং। অবকারীভেদে ইহার ভাব ও আচার ভিন্ন ভিন্ন। এ সাধনায় তাক, জ্ঞান ও কন্ম সমন্বয়ে গ্রথিত। শাক্ত সাধনার আরম্ভ ভক্তিভাৱে, ইহার সাধন ক্রিয়ায় এবং ইহার প্রতিষ্ঠা শিব-শক্তির অধৈত জ্ঞানে। অধিকারীভেদে এই সাধনার সাতটি আচার—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামাচার ও কোলাচার। এই আচারগুলি আবার তিনটি ভাবে বিভূত—পশুভাব, বীরভাব ও দ্বিবাভাব। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের, সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের এবং কোলাচার দ্বিবাভাবের অন্তর্ভুক্ত।

বাহ্যিক। ব্রত-উপবাস ইত্যাদি। বারভাবের উপাসনা অতি দুর্বল। ইহাতে ভৈবিক সত্তার অতি কঠোর পরীক্ষা। ইহাতে মূল পঞ্চ ম-কার গ্রহণ করা হয় এবং স্বপ্নানে বা নির্জনস্থানে সাধনা চলিতে থাকে। সাধক প্রয়োজনবোধে ইহাতে মারণ-উচাটনাদি ঘটকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বীরভাবের সাধনা বীরেরই বোধ্য সাধনা—বিনি বলিষ্ঠ, নির্ভীক, শক্তি-সম্পাতে ভূরু ও সফলিত। কিন্তু শক্তি-সাধনার অত্যন্ত মত্ত দ্বিভাবের সাধনা। ইহা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবোধ্য সাধনা—অতি শুদ্ধ, অতি রহস্যময়, কিন্তু আনন্দময়। দ্বিভাবস্বীয় আচার কোলাচাচার। কোলের সাধনার মূর্তির প্রয়োজন হয় না, বিশ্বজন্য মাতৃমূর্তি—বাহুপূজাও নিরর্থক, কারণ সাধক এখানে অকর্মে মগ্ন। এ স্তরের পঞ্চ ম-কার সাধনাও আধ্যাত্মিক ভাবের। দ্বিভাব 'সর্বভাবোত্তমোত্তম'

শক্তি-সাধনার অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত পরিচয় না থাকার দক্ষণ সমাজে নানাপ্রকার ভ্রান্ত-ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা মত্তপানের সাধনা, ভোগের সাধনা, বাভিচারের সাধনা। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে উহার কোনটিই সত্য নয়। শক্তি-সাধনা ভৈবিক সত্তাকে জাগ্রত করিবার সাধনা, দেহস্থ নিম্নলিখিত পদ্ধতোরককে উন্নীলিত করিবার সাধনা—কমল-সৌরভে ও শক্তির চন্দ্রে জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার সাধনা। এ সাধনায় সংসার-ত্যাগের উপরেও জোর দেওয়া হয় নাই। সংসারে থাকিয়া ত্যাগী হইবার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এখানে ভোগকে বিসর্জন দিতে বলা হয় নাই, ভোগপক্ষে পক্ষপাতি প্রস্তুতি করার শিক্ষা নির্দেশিত হইয়াছে। যে-কোন মানব শক্তি-সাধনায় অগ্রসর হইতে পারে এবং পরম কোলের মর্গদা লাভ করিতে পারে। ইহাতে জাতি বা বর্ণবিচারের প্রদও নাই। ইহা প্রকৃত সমদ্বয়বাদের সাধনা। সকল প্রকার আচারই ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে,—তাই ইহাতে ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রদই উঠে না। অষ্টম তত্ত্ব লক্ষ্য হওয়ায় এখানে সত্বীর্ণতাও প্রদ্রয় পায় না।

তবে এই সাধনায় পতনের আশঙ্কা প্রচুর। মূল পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিত অনেকই অত্যাধিকার করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই পতনও খুব সহজে ঘটে। এইজন্যই এই সাধনার প্রতি বহিরঙ্গ জনের তির্যক কটাক্ষ বর্ষিত হয়। তাহা ছাড়া, শক্তির আভিচারিক ক্রিয়াও বহু নিম্নিত। কিন্তু বাহ্যিক পতনের পথ রোধ করিয়াছেন, সঙ্গুতর আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সাধনা আশীর্বাদ। সিদ্ধির আনন্দ ও ঐশ্বর্য অতি সহজে তাঁহাদের করতলগত হয় এবং প্রবর্ত সাধকের মত নানাভাবে তাঁহার অগন্তের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

৬. তত্ত্বের সাহিত্যিক মূল্য

তত্ত্ব ক্রিয়া-প্রধান। উহা স্বীকাপন্যতি, ময়, ময়োদ্ধার, ব্রহ্মকন, জ্ঞান, ধ্যান ও পূজাপন্যতির বিবরণে পূর্ণ। সাহিত্য বলিতে আমরা বাহ্য বুদ্ধি, তাহার লক্ষণ নাই বলিলেও চলে। তথাপি কয়েকটি দিক হইতে তত্ত্বের সাহিত্যিক মূল্য বিচার্য।

প্রথমতঃ তত্ত্বসাধনা মানব-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মানবের দেহ, জৈবিক বৃত্তি ও মানবমনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই শাস্ত্রে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রহিয়াছে, তাহার আকর্ষণ কম নয়। মনশস্য বিশ্লেষণে তত্ত্বের মূল্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্বোপরি তত্ত্ব মোহ-ভ্রান্ত জীবের যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার কল্পনা বিরোগান্ত নাটকের জায় কক্ষণ। স্মৃতি বায়ুব বেগে পীড়িত জীব জন্মমাত্র রোদন করিতে থাকে, দুঃখে পাখী করিয়াই তাহার জন্ম। তাহার পর জন্মে বড় হয়, জন্মে বন্ধন বাড়তে—দেহ, ধন, স্ত্রীপুত্রাদির বন্ধনে সে আবদ্ধ হয় : ‘অপত্যং মে, কলত্রং মে’ বলিয়া অধির হয়—কিন্তু দেখে না, যম তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, বুঝে না :

পাপপুলবিনিভিন্নঃ সিক্তং বিষয়সপিষা।

রাগধেয়াননৈঃ পকঃ সূত্মরসো ত মানবম্ ॥ [শান্তিনন্দতরঙ্গিনী :৩ উল্লাস]

—পাপের শূন্যে বিদ্ধ করিয়া, বিষয় স্তুতে সিক্ত করিয়া, রাগধেয়ের অনলে পক করিয়া সূত্ম মানবকে ভক্ষণ করে।

দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বসাধনায় নরনারীর জৈবিক সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া যে রহস্তময় সাধনের ইচ্ছিত রহিয়াছে এবং তাহাতে যে একটি গূঢ় অনিবাচ্য ভাবের বিলাস আছে, তাহাও সাহিত্যের দিক হইতে কম আকর্ষণীয় নহে। তত্ত্বের শব্দসংঘন, লতাসাধন, চক্রাচুর্ভান ভয়াবহ ও অদ্ভুত। সাহিত্যে বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুত রস সৃষ্টিতে এগুলির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। ভববৃত্তি প্রমুখ কবি এই সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া সাহিত্যে ভয়ানক ও অদ্ভুত রস সঞ্চারিত করিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্ব, বেতালপঞ্চাশতীর কথাগুলো, বাণভট্টের কাণ্ডহরী গ্রন্থে, স্ববন্ধুর বাসগদ্যতা গদ্যকাব্যে এবং কথা সরিৎসাগরের কতিপয় কাহিনীতে তত্ত্বের এই রহস্তময় সাধন-প্রক্রিয়া লইয়া যে বিচিত্র রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার আবেদন উপেক্ষণীয় নহে। বস্তুতঃ তত্ত্বসাধনার গুহ্য রহস্তময়তা সাহিত্যের রহস্তময় পরিবেশ সৃষ্টিতে একটি প্রধান উপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ তত্ত্বের কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা কবিত্বময়। যট্টচক্রের বর্ণনায়, কুণ্ডলিনীশক্তির চিত্রকর্মে ও লহরীর শব্দের বিবরণে সাধক যেন কবি হইয়া উঠিয়াছেন। অলঙ্কারে ও উক্তি-বৈচিত্র্যে এই সকল অংশ অত্যন্ত জরুর্য্যপ্রাপ্ত। ‘শশি-মহির’রূপা ইড়া-শিখলা,

বার হুহুয়া 'বিদ্যাবালাবিলাসী মুনিমলি ললতলক্ষ্মী হুহুয়া' [বিদ্যা-বরণী, হুহুয়া বত
হুহুয়া]। হুওলিনীর বর্ণনাও অপরূপ—

তস্তোহুঁ বিবতলক্ষ্মীদয় ললতলক্ষ্মী জগমোহিনী

ব্রহ্মদায়কঃ মুখেন মধুরং লাক্ষাদায়কী মধুঃ ।

শম্ভাবর্তনিভা নবীন চন্দ্রামালা বলাসাম্বদা

হস্তা সর্পসমা শিবোপারি ললং সার্কিঃ কুস্তাকৃতিঃ ॥

কৃষ্ণস্তী কুলকুওলিনী চ মধুরং মস্তাক্ষিফুটম্

বাচঃ কোমল কাব্যবদ রচনা ভেদান্তিভেদকর্মৈঃ ।

শাসোচ্ছ্বাস বিবর্তনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্যতে

সা মূল্যবৃত্তগহ্বরে গিলগতি প্রোদ্যামদীপ্তাবলী ॥ [ষট চরিত্রকরণ ১১-১২]

—তাহার উর্ধ্বে পদ্মতল্লর স্তায় স্তম্ভা ভুবনমোহিনী, মুখদ্বারা ব্রহ্মদায় আচ্ছাদন
করিয়া শম্ভাবর্তীকারে সর্পের মত সার্কিঃকৃতিয়ে শিবের উপর হস্ত রহিয়াছেন ।
নানাছন্দে চাক কাব্য রচনা করিয়া, মস্তালির মত মধুর কৃষ্ণ করিয়া
শাসোচ্ছ্বাসছলে জীবের জীবন ধারণ করিয়া তিনি মূল্যধারে প্রোদ্যাম
দীপ শ্রেণীর স্তায় শোভা পাইতেছেন ।

শাক্তসাধকের কবিত্ব চরমে পৌঁছিয়াছে পরম শিবপূরী সহস্রদল সহস্রার পদে
বর্ণনায় : এই পদ্য 'দশদলং পূর্ণ পূর্ণেন্দুভ্রম'। শূন্যে অবস্থিত অধোমুখ এই পদ্যে
পরাগ বালস্বর্ষের ন্যায় অরুণ ['তরুণরবি-কলাকান্ত কিঞ্চৎপুঙ্খ'] ; ইহারই কণিকাবিন্দু
পরম রমণীয় শিবপূরী :

সহস্রারং শিবপূরং ক্রমাং দুঃখ বিগজিতম্ ।

সর্বতোহলস্তুতৈর্দিব্যৈ নিত্য পুষ্পফলৈর্জ্যৈঃ ॥

পীতং কুমুং তথা বেতং রক্তং পুষ্পক পার্বতি ।

হরিতক বিচিত্রক নানাপুষ্পং মনোহরম্ ॥ [গর্ভবালিকাতন্ত্র]

শুষ্ক ষট্চক্রে বিবৃতিতে নয়, যে কোন দেবতার ধ্যান রচনায় শাক্তসাধক কবিত্বের
ভাণ্ডার উজার করিয়া দিয়াছেন । দেবমূর্তি সাধকের সৃষ্টি নয়, তপোজ্যোতির স্বতঃস্ফূ
প্রকাশ । মগ্নসাধকের হৃদয়বেশে প্রথমে জাগে মূর্ত্যজ্যোতি—তাহারই মধ্যে ক্রমে
প্রকাশিত হয় আলোর বিন্দু ; ক্রমে সেই বিন্দু স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়—দেখা দেয় অস-
পন্থে সজ্জিত, দিবা অলঙ্কারে কুঁসত অপরূপ দেবমূর্তি । সাধক তখন তরয়, বাহ্যজ্ঞানরহিত ।
ভাণ্ডার অচক্ষুতিও অনির্বচনীয় । সেই হৃদিত গূঢ় অম্লভূতির বাহ্য প্রকাশ শক্তির ধ্যান।
শক্তিমূর্তি সাধকের 'ধেয়ানের ঘন'—এইরূপই স্বাভাবিক কবিত্বের স্রোত । শুষ্কময়

পরিচয় প্রসঙ্গে, এইরূপ করেকটি ধ্যান-মূর্তির বর্ণনা উদ্ধৃত হইরাছে—একটি কালিকাভয়ের কালীর ধ্যান, অপরটি মহানিৰ্বাণতরোক্ত আদ্যার ধ্যান। দুইটিই অপূর্ব বর্ণনা। যে-কোন ধ্যানেই এই বর্ণনা-চাতুৰ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শক্তিমূর্তি সর্বত্রই যে কোমল, নিম্ন ও হৃদয় তাহা নহে। কোন কোন মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর, কোন কোন মূর্তি রক্তবর্ণের ভীষণ প্রতিমা। সাধক কবি তাহাতেও সৌন্দর্যের ছদ্ম বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন; বথা ছিন্নমস্তা দেবীর বর্ণনা : অর্দ্ধবিকশিত বেতপত্রের কোরকে স্বর্ঘমণ্ডল, ঐ মণ্ডল জবাহ্নবের স্তায় অকর্ণ, সেই রক্তবর্ণ কণিকার দণ্ডায়মানা মহাভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তা :

মধ্যে তু তাতঃ মহাদেবীঃ স্বৰ্ঘকোটি সমপ্রভাম্ ।

ছিন্নমস্তাঃ করে বামে ধারয়ন্তীঃ স্বমস্তকম্ ॥

প্রসারিতমুখীঃ ভীমাঃ লেলিহানাগ্রাঃ ত্রিহস্তিকাম্ ।

পিবন্তীঃ যৌধিরাঃ ধারাঃ নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্ ॥ [তন্ত্রসার]

এ মূর্তি যে-কোন দর্শকের চিত্রপটে চিরকাল মুদ্রিত হইয়া থাকিবার মত অতি ভীষণ অথচ অতি হৃদয় একখানি আকর্ষণীয় মূর্তি।

তন্ত্রের অভিব্যেক, শাস্ত্রমন্ত্র এবং অন্তর্বাণের মন্ত্রগুলিও কাব্যগুণ সমন্বিত। এ সকল হলে শব্দশক্তি এক অভূত ব্যক্তনার সৃষ্টি করে। মন যেন কোন্ এক স্বর্ঘর লোকে চলিয়া যায়। মন্ত্রের বাচ্যার্থ কিছুই নয়, 'স্বরাষ্ট্রাধিভাবিকন্ত ত্র্যম্বকশিবোহমঃ, কিংবা 'সমুদ্রাষ্ট্রাধিভাবিকন্ত মন্ত্রপুত্রেণ বারিণা', কিংবা 'নাভৌ চৈতন্তরূপাগ্নৌ হবিষা মনসাক্রচা। জ্ঞানগ্রন্থীপিতে নিত্যমক্ষবৃন্তিজু'হোমাহম্ ॥'—কিন্তু শাস্ত্রী-ব্যাচনা অতি অভূত। পরিবেশ মন ও শব্দময় যেন একসঙ্গে ফিরা করিতে থাকে।

তরোক্ত শব্দ-স্ততিগুলিও আশ্চর্য আবেগ-কম্পিত। কতকগুলি স্তবে স্পষ্টতঃ গীতিকবিতার কঙ্কর ও ময়ূরতা ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি স্তবেই ভক্তি ও অল্পমূর্তি-বলসিত। সাধক ইহাতে দেবতার নিকট নিজের হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন বলিয়াই গীতিকবিতার স্বর্ঘজরটি বাজিয়া উঠে। অবশ্য অগণিত স্তবে যে গতাহুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা নাই, তাহা নহে—তথ্যাপি স্থানে স্থানে অঙ্ককারে বিদ্বাং-বিকাশের মত উহার সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। যেমন শঙ্করাচার্যের প্রণকমারতরোক্ত প্রকৃতি-স্তবের এই অংশটি :

লসৎশম্ভচক্ৰা চলৎধৃঙ্গাভীয়া

নমৎসিঃহবাহা জলন্ত্বেমৌলিঃ ।

ব্রব্যদৈত্যাবর্গা স্তবৎসিদ্ধসংঘাঃ

স্বমেবেশি দুর্গাপি সর্গাঃহনৌনে ॥

কিংবা সাধক সর্বানন্দ-কৃত আত্মজয়ের এই ভবকটি :

অহংকৃত গতিভক্ত, চলৎমুক্ত রাগিণী ।

ধরশিলিগু কুটিলমুক্ত চিত্তরনক্ত কারিণী ।

কলিতথও বিরতচও হৃদয়মুক্ত মালিনী

বিগতবস্ত্র নিশিতশস্ত্র কৃপণবস্ত্র ধারিণী । [সর্বানন্দ-ভরদ্বাজ]

এ সকল হলে ছন্দে ও অলঙ্কারে সচেতন শিল্পীর সৌন্দর্য-হৃষ্টির প্রয়োগ অতি সহজে বুঝি আকর্ষণ করে ।

৭. ধর্মে ও সাহিত্যে তত্ত্বের প্রভাব

বহুশক্তির প্রতি বিশ্বাস, রহস্যময় বৌদ্ধিক উপায়ে মস্তকের সাধন, নরনারীর মিলনে কল্প কোশলে শক্তির উদ্বোধন, অলৌকিক শক্তিদ্বারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি প্রভৃতি তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও সিদ্ধির মধ্যে এমন একটি স্তরীয় আকর্ষণ আছে যে, ইহা যুগে যুগে প্রায় সকল ধর্মকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই আকর্ষণকে নিছক ইন্দ্রিয়জ বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই, ইহার মধ্যে আছে একটি সহজ সত্য, সহজ সিদ্ধি ও সহজ আনন্দ। ইহার ফলও প্রত্যক্ষ। এইজন্যই তাত্ত্বিক বিশ্বাস ও ক্রিয়া এত জনপ্রিয় যে, ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় কোন-না-কোন আকারে তাত্ত্বিকতাকে নিজেদের ধর্মে-কর্মে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। ইহা দ্বারা তত্ত্ব যেমন নিজে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, তেমনই অপরকেও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্য যুগ্মিত করিয়া তুলিয়াছে।

ক. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শক্তিবাদ

শিব ও শক্তি বেদপূর্ব প্রাগৈতিহাসিক দেবতা। আদৌ আর্ব-সাহিত্যে ইহাদের স্থান ছিল নগণ্য, তত্ত্বাচারও ছিল বহুনিষ্পন্ন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় বৈদিক সাহিত্যেও ইহারা কালক্রমে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছেন। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে, উপনিষদে শক্তিবাদের প্রভাব কম নয়। ঋগ্বেদের 'গৌরী', [১. ১৬৪], 'গায়ত্রী', [৩. ৬২. ১], নবম মণ্ডলের 'সোম' ['উম্মা সহ বর্তমানঃ'] 'দেবীহুত' [১০. ১২৫] এবং 'রাজিহুত' [১০. ১২৭] প্রভৃতি শক্তি-তত্ত্বের দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বশীকরণাদি বটকর্ম তাত্ত্বিক ক্রিয়ার অন্ততম বৈশিষ্ট্য, তাহাও ঋগ্বেদে ইতস্ততঃ ছড়ানো। অথর্ববেদে তো 'শক্তি-পৌষ্টিকভিচারাদিকর্ম প্রতিপাদকখন অত্যন্ত বিলক্ষণ এবং [প্রহানভেদ]। কেনোপনিষদের 'উমা হৈমবতী' উপাখ্যান বহুবিখ্যাত—উহাতে শক্তি ও শক্তিস্বানের অভেদতত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা ছাড়া

মুক্তকোপনিষদের 'কালী করালী' প্রভৃতি নাম, বাজিকা-উপনিষদের 'হুর্গাণ্যত্রী', হ্রণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে 'ভদ্রকালী'র উল্লেখও শক্তিবাদের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ।

পুরাণে শক্তিদেবী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পুরাণের সকল দেবতাই শক্তিস্বক। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, সার্বভৌম ও গায়ত্রী, বিষ্ণুর শক্তি বৈকুণ্ঠী লক্ষ্মী, শিবের শক্তি শিবানী মহেশ্বরী। শক্তিই এখানে ক্রিয়াশক্তি। শক্তির প্রভাবেই লীলা, শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। পুরাণে পরমতত্ত্ব সর্বত্রই নিষ্ঠুর নিবেশে। তিনি সত্ত্ব বা বিশিষ্ট হন অকর্তৃনিহিত শক্তিবোধে : 'It is the unique inscrutable power inherent in the nature of the supreme Spirit, which makes really possible what appears to be logically impossible to our discursive knowledge'^১—এই সিদ্ধান্ত শাক্ততত্ত্বের নিষ্ঠার হইতে অভিন্ন।

সামান্যেও শক্তিবাদের প্রভাব কম নয়। রাক্ষসহুল শিবের বয়েই বলীয়ান। কেহ কেহ 'মিহুস্তিলা' দেবীকে শক্তি দেবী বলিয়া মনে করেন : হুয়া ও হাংসে তাঁহার পূজা। মেঘনাদের মিহুস্তিলা বজ্রও আভিচারিক ক্রিয়া-প্রধান। রাক্ষসগণ মারামারি সম্পন্ন—তাঁহার। ইন্দ্রজাল সৃষ্টিতে নিপুণ। উত্তরকাণ্ডে নানা প্রসঙ্গে শিব-শক্তির কথা উল্লেখিত হইয়াছে। অগ্নিশূক দশরথের জন্ত যে পুংখেটি বজ্র করিয়াছিলেন, তাহাও 'অথর্ব-শিরসি প্রোটেক্ট মট্রে: সিদ্ধাং বিধানত:' [বাল. : ৫]

মহাভারতে শক্তিবাদের প্রাচুর্য নানাদিক হইতে লক্ষ্যীয়। প্রথমত: ইহাতে দুইটি 'হুর্গাণ্যত্র' স্থান পাইয়াছে, একটি দ্বিরাট পর্বাঙ্গগত যুধিষ্ঠির-কৃত—অপরটি ভীষ্মপর্বে বর্জুন-কৃত। এই তবে দেবার 'কালী', 'কপালী', 'করালী', 'ভদ্রকালী', 'মহাকালী', 'চণ্ডী', 'ভারিণী' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। অধা-অধিকা-অছালিকানামগুলি শাক্তহোমে ব্যবহৃত হয়—মহাভারতে ইহারা কান্দীরাজদ্রুহিতা। মহাভারতে যন্ত্রপ্রভাব ও আভিচারিক ক্রিয়ার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়—১. ব্রাহ্মণের বয়ে কুন্তীর দেহত্যাগীকরণের মন্ত্রলাত ['ময়গ্রাং... অথবশিরসি দ্বিতম্'—বন. ২৫২], ২. বক্ষ স্তুপাকর্ণের সহিত ক্রপদ-দ্রুহিতা শিখণ্ডিনীর স্ত্রী-পুং স্বভাব বিনিময় [উত্তোগ. ১৮২], ৩. মগধরাজ বৃহদ্রথের গৃহে বাস-শোণিতভোজিনী 'জরা' কর্তৃক তৎপুত্রের মাংসপিণ্ড সন্ধিতকরণ [সভা. ১৮] ৭. বনপর্বের কন্দোপাখ্যানে অতি ভীষণ মাতৃকাগণের উল্লেখ এবং স্বপ্নের বয়ে কন্দমাতৃকাগণের ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরীর অল্পরূপ মর্ষালা লাভ ও কন্দাপম্বারের উৎপত্তি [বন,

১। The Puranas by A. K. Banerjee [Hist. of philosophy Eastern & Western]

১২০.]^১ প্রকৃতি তাত্ত্বিকতার দিক হইতে অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। মহাভারতে উদা-মহেশ্বর লংকান্ত বহু বিচিত্র উপাখ্যান পাওয়া যায়। বনপর্বের তীর্থ-প্রকরণে শক্তি-তীর্থ হিসাবে 'বেবিকা' (কামাখ্যা) 'বোনি', 'শাকন্তরী', 'ধূমাবতী', 'তনকুণ্ড', 'কালিকা-সত্ৰ' (কৌশিকী ও অরুণার সত্ৰ), 'শ্রীপর্বত' (এখানে মহাকেশবের সহিত দেবী শ্রীতিপূর্বক বাস করেন) ও 'মণিকণিকা' প্রভৃতি তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের 'মক্যবয়'গুলিও তাত্ত্বিক শাহিমন্তের ধ্বনি স্মরণ করাইয়া দেয়, যেমন অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর এই বাক্যটি :

প্রয়াহবিষয়েনৈবাস্ত বিজ্ঞায় মহাবল ।

নমো ধাত্রে বিধাত্রে ১ স্বস্তি গচ্ছ জন-মবয় ॥

ভ্রীঃ শ্রীঃ কীৰ্ত্তি ধৃতিঃ পুষ্টিকমা লক্ষী সরস্বতী ।

ইমা বৈ তব পায়স্ত পালয়ন্ত ধনজয় ॥

[বন. ৩৩]

খ. বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ তত্ত্ব

বৌদ্ধদের মধ্যেও অগণিত তত্ত্বগ্রন্থ প্রচলিত আছে। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, বুদ্ধদেব নিজেই নিরাধিকারীর পাখি বন্ধ লাভের জন্য বৌদ্ধধর্মে তত্ত্বাচারের স্থান করিয়া দিয়াছেন ; 'ব্রহ্মজাল সূত্রে' দেখা যায়, ভিক্ষুগণ কপালমালা, কপালপাত্র ধারণ করিয়া 'ইন্দিশাদ'-এর চর্চা করিতেছেন।^২ কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্যের এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়, কারণ, বৌদ্ধ ধর্মসাধনায় যোগের প্রভাব এবং ঋদ্ধিলাভের ইঙ্গিত থাকিলেও, বুদ্ধদেব নিজে তাত্ত্বিকতা প্রচার করিয়াছিলেন, এমন কথা কোথাও নাই। বৌদ্ধধর্ম তাত্ত্বিকতা প্রবর্তিত হইয়াছিল ইতিহাসের অল্প এক সূত্র ধরিয়া এবং বৌদ্ধ তাত্ত্বিকতার প্রসার ঘটয়াছিল বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অনেক পরে।

বুদ্ধদেব সজ্জ্ব সকলেরই প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। তাহাতে শূদ্র-ব্রাহ্মণ, নারী-পুরুষের বিচার ছিল না। এই সূত্রে কতিপয় মাতৃতাত্ত্বিক জাতি—বুজি ও লিচ্ছবি, বহু নারী ও শূদ্র স্থানীয় 'কম্মারবিয়া' (কর্মকার চহিতা), 'মিগলুদ্ধক' (মৃগলুদ্ধক—ব্যাধ) সজ্জ্ব স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্মে কতকগুলি লৌকিক আচার প্রবর্তিত হয় এবং বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে পরেই সজ্জ্ব ভেদ

১। এখানে শিবা-শিখা লোকমাতৃগণের নামগুলিও অন্তর্ভুক্ত :

কাকী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহিলা তথা ।

আর্য্য পলালা বৈ মিত্রা সঠৈতাতাঃ শিভবাতরঃ ॥ [বন. ১২০. ৩]

২। Introduction to Sadhan Mala. Vol II (Gaekwad Oriental series No. XLII)

সৃষ্টি হয়। এই ভেবে কেবল করিয়া কালক্রমে বৌদ্ধধর্মে দুইটি প্রধান শাখার উৎপত্তি হয়—হীনযান ও মহাযান। হীনযান সংরক্ষণশীল, আচারনিষ্ঠ ও আদি বৌদ্ধ-মতের সমর্থক : সম্রাট গ্রহণ পূর্বক চারিটি আর্বলতা ['চৎচারি অরিয় সন্ধানি'—চঃ, হঃ, তঃ, উঃ-এর উৎপত্তি, হঃ-বিনাশ ও হঃ-বিনাশের উপায়] মানিয়া অষ্টাঙ্গিকমার্গে (অষ্টাঙ্গিকমার্গ-সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যকস্বত্তি ও সম্যক সমাধি) বুদ্ধের অর্জন বা নির্বাণ লাভ করাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাঁহাদের প্রমাণগ্রন্থ পালিতে প্রথিত বুদ্ধবচন 'ত্রিপিটক'। কিন্তু মহাযান উদ্যম মতের পরিণামক, সংরক্ষণশীলতা নয়, অল্প বর্ষমতকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করা ও উহার সহিত নিজধর্মের সমন্বয় সাধন করা মহাযানের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের আপাত লক্ষ্য বুদ্ধের অর্জন করাও নয়, বোধিসত্ত্ব অবস্থার উন্নীত হওয়া। বুদ্ধদেব স্বয়ং বুদ্ধ হইবার পূর্বে 'বোধিসত্ত্ব হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন : এই বোধিসত্ত্বরূপে জগৎ-কল্যাণ ও 'কল্যাণ-মোক্ষের' চর্চা করা মহাযানীদের জীবনের মূলদর্শন।

ঈষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতক হইতে ভারতের পূর্বাংশে মহাযান শাখা প্রবল হইয়া উঠে। এই শাখার মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুইটি মত প্রাধান্য লাভ করে। মাধ্যমিক ধর্মের আদিগুরু নাগার্জুন। নাগার্জুনের পরে আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি ও শাস্ত্রিয়েব প্রমুখ আচার্যগণ দ্বারা মাধ্যমিক মত পরিপুষ্ট লাভ করে। এইমতে 'স্বভাবশূন্যতা'ই একমাত্র সত্য, উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই—কর্মও নাই, কারকও নাই—পরমার্থতঃ কিছুই নাই। এই স্বভাবশূন্যতার প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নির্বাণ। ইহা অনেকটা বেদান্তের ব্রহ্ম বা তত্ত্বের পরম শিখের অবস্থা। মহাযানের দ্বিতীয় মত যোগাচার। ইহা চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে অসঙ্গ ও বহুবজ্রের মাধ্যমে বিস্তৃত হইতে থাকে। অসঙ্গের 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' এবং বহুবজ্রের 'মহাভূজ বিজ্ঞান' যোগাচারের বিখ্যাত গ্রন্থ। মাধ্যমিক ধর্মের ভিত্তিতেই যোগাচারের উৎপত্তি। মাধ্যমিক শাস্ত্রের 'স্বভাব শূন্যতা' যোগাচারে হইয়াছে 'বিজ্ঞাপ্রমাইতা'। তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞান বিজ্ঞানই শূন্যতা, এই বিজ্ঞান 'হুল ল্যা' (অবাঙ মনসো গোচর)। ও 'অজুত পরিবর্তন' (নিবিকল্প) ; বিজ্ঞাপ্তি মাত্রতায় অবস্থিতই নির্বাণ। বহিমুখী (সামুদ্রিক) চিন্তকে প্রতিলোম গতিতে পরাবৃত্ত করিয়া স্বহানে ফিরাইয়া আনাই যোগাচারের ক্রিয়াক্ষেত্রের মূল কথা। এই ক্রিয়ার তাত্ত্বিক যোগের বীজ প্রজ্জ্বল্য রহিয়াছে। এই মতে সামুদ্রিক চিন্তাই বিকল্প জ্ঞানের মূল। চিত্ত পরমার্থতঃ প্রকৃতি-প্রভাব্যয়।

মাধ্যমিক শাস্ত্র ও যোগাচারের ভিত্তিতে তাত্ত্বিক বৌদ্ধমত প্রসার লাভ করে। জঃ শশিধর দাসগুপ্ত বলেন, During the time of the Palas, however, a

tendency towards esoterism was manifest and Buddhism very soon underwent another great change from Mahayana to Vajrayana^১.—

এই বজ্রবান শাখা হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তার। পাল আমলে যে-সকল বিহার হুলস্থূলত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। ‘আম্বিদেব’ বুদ্ধদেব এবং ‘আম্বিদেবী’, বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার শক্তি বোগিনী, পঞ্চথানী বুদ্ধ এবং তাঁহাদের দেবী—এবং আরও অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাবান বৌদ্ধধর্মের এই শাখাকে সাধারণভাবে বলা হয় ‘বজ্রবান’। বজ্রবানেরই প্রকার ভেদ বজ্রবান ও কালচক্রবান। এই শাখার কত যে দেবদেবী আছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। এই সকল দেবদেবীর মন্ত্র ও সাধন প্রণালী লইয়া যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাই বৌদ্ধতন্ত্র।

বৌদ্ধতন্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য। ধর্মপাল ও শীলভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কমলশীল, অতীশ-দীপকর সকলেই তন্ত্রের চর্চা করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্বোধে তিব্বতে, চীনে জাপানে তান্ত্রিকমত প্রচারিত হইয়াছে এবং তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই সকল তন্ত্রগ্রন্থের অধিকাংশই আজ লুপ্ত, কিন্তু বাহা আছে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। চর্চাপদের টীকায় কতিপয় তন্ত্রের নাম পাওয়া যায়—সমাজতন্ত্র, হেবজ্ঞতন্ত্র, হেরুকতন্ত্র, আগম, সম্পূটোন্তব তন্ত্ররাজ, রতিবজ্র প্রভৃতি। এই সকল তন্ত্র হইতে চর্চা-টীকার উদ্ধৃতিও সংগ্রহ করা হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগান ও দোহার পরিশেষে কতিয়োরের তালিকস্থবায়ী যে ‘বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গ্রন্থকার নাম-মুচী’ দিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের বিপুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে বিপুল তন্ত্ররাজি আজ কোথায়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অঘরবজ্র সংগ্রহ, ডাকার্বব, গুহ সমাজতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুইখানি অতি মূল্যবান বৌদ্ধতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন : ১. সাধনমালা ও ২. নিম্পর বোগাবলী। নিম্পর বোগাবলী অভয়াকর গুপ্তের রচনা; তাঁহার ‘বিমলপ্রভা’ বা ‘লব্ধকালচক্রতন্ত্র-রাজটীকা’ও বহু বিখ্যাত। এই সকল গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মূল প্রতিপাত বিষয় এবং অগণিত দেবদেবীর মন্ত্র, মূত্রা, মণ্ডল ও পূজাপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত হিন্দুতন্ত্রের নানাদিকে সাদৃশ্য আছে। হিন্দুতন্ত্র যেমন দেবদেবীর মন্ত্র, মণ্ডল, মূত্রা ও সাধনার কথা, বৌদ্ধতন্ত্রও তেমনি মন্ত্র, মূত্রা ও মূর্তি-প্রধান। হিন্দু শক্তি দেবতা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতির সহিত কয়েকটি বৌদ্ধ দেবতার সাদৃশ্যও লক্ষ্যীয়। তবে বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে অত্যাশ্রয় ভীষণতার ভাব বেশি এবং আঁকার-

বৈচিত্র্যও অকৃত। হিন্দুর বটচ্ছক বৌদ্ধদের মধ্যে চারিটি চক্রে বা চারিটি কারে [নির্বাণকার, ধর্মকার, সন্তোষকার ও সহজকার] পরিণত হইয়াছে। মুদ্রা (উত্তর সাধিকা) গ্রহণ, মন্ত্রপান প্রভৃতি উভয়তন্ত্রেই দৃষ্ট হয়। বাকমুদ্রার সহিত মিলিত হইয়া পরম শূন্যতা লাভের উপায়টিও একপ্রকার। হিন্দুতন্ত্র হইতে বৌদ্ধতন্ত্রের পার্থক্য প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্বের দিক হইতে। বৌদ্ধতন্ত্র বৌদ্ধধর্মসাধনার ভিত্তি, উহার ধর্মনিষ্ঠাও বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মের অন্ততম লক্ষ্য 'শূন্যতা' বা নির্বাণ। বাধ্যনিক শাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে 'মহাবিশূন্যতা' এবং যোগাচারে 'বিজ্ঞপ্তিমানসতা'। এ অবস্থায় জ্ঞেয় থাকে না—গ্রাহ্য থাকে না। গ্রাহক থাকে না। কিন্তু এই অবস্থায় পৌছাইতে হইলে প্রয়োজন 'বোধিচিত্ত'। বোধিসত্ত্বের চিত্তই 'বোধিচিত্ত'। ইহা শূন্যতা ও করুণার একটি যুগলক মিলিতরূপ ['শূন্যতা করুণাভিন্নঃ বোধিচিত্তম্ ইতি বৃত্তম্'—শ্রীগুহা সন্যাসঃ ১১]। এই শূন্যতা ও করুণার মিলিত রূপই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা চরম শূন্যের অবস্থা। অতএব মাধ্যমিক বা যোগাচার মহাবলম্বীদের সাধন চটল শূন্যতা ও করুণার মেলন। এই মেলনক্রিয়ায় যোগাচারে শ্রী-পুং যোগের রূপক গৃহীত হইয়াছে।

বজ্রবান শাখারও সাধনার মূল ভিত্তি গুহা যৌগিক উপায়ে শূন্যতা ও করুণার মেলবন্ধন বা রক্তময় শ্রী-পুং যোগ। বিজ্ঞানদান চরম শূন্যতার অবস্থাকে তাঁহারাই বলেন 'বজ্রসত্ত্ব'—বাতা দৃঢ়, সার, নিশ্চল, অবিকল্প ও বজ্রের জ্ঞায় কঠিন।^১ এই সত্ত্বের আরোহত্বই 'বোধিচিত্ত'। তাঁহারাই মনে করেন, 'বোধিচিত্ত' গঠনে মহাসাধনও একটি উপায়, অর্থাৎ মহাধারা শূন্যতা ও করুণার যোগসাধন সম্ভব। এই মন্ত্রেরই ঘনীভূত রূপ দেবতা। অতএব অমেরুতা যোগ বা দেবতার উপাসনা দ্বারাও বিশুদ্ধ বোধিচিত্ত গঠন করা ও বজ্রসত্ত্ব হওয়া সম্ভব।

বজ্রবানে দেবপুঞ্জার উদ্দেশ্য আর একটি দিক হইতেও বিচার্য। তাঁহাদের মতে সর্বশূন্য বুদ্ধই আদিদেবতা—তিনি বজ্রসত্ত্ব। তাঁহাকে হেবজ্র বা হেরুকবজ্রও বলা হয়। এই আদিদেবের শক্তি, আদিশক্তি। বজ্রসত্ত্ব শক্তি-আলিঙ্গিত অর্থাৎ যুগলক। মূলতঃ ইনিই লাঘ্য। কিন্তু বজ্রসত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পথে অনেক বাধা। প্রধান বাধা শূন্যের পরিপন্থী শূন্যোক্তব পঞ্চক—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান; এইগুলিই রাগদোষাদির ভৎস। এইগুলিকে জয় করিতে না পারিলে শূন্যতার পৌছানো অসম্ভব। বজ্রবানে এই পঞ্চককে পঞ্চাধানীভূতরূপে কল্পিত। তাঁহাদের নাম বৈরোচন, রক্তমন্ডব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অশ্বকাত্য। ইহার প্রত্যেকেই মুদ্রাবৃত্তঃ মুদ্রাগুলির নাম

১। দৃঢ়ঃ সারঃ অসৌবীৰ্যম্ অচ্ছেদ্যভেদ্য লক্ষণম্

অদ্বাদী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে।—অমরবজ্রসংগ্রহ [চর্যাপদের চীকার ইহা 'যোগরত্নমালা'র উক্তিরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে]।

বখাকসে বাবকী, তাঁরা, পাওরা, বজ্রবাণীবরী ও মোচনা। ইহারা এক একজন এক এক কুলের প্রধান দেবতা। যেমন রূপকঙ্কের প্রতীক বৈরোচন বোহকুলের, বেবনার প্রতীক রত্নসত্তব চিঙ্কামণি কুলের, সংকার প্রতীক অমিতাভ রাণকুলের, সংকারের প্রতীক অমোঘসিদ্ধি সমরকুলের এবং বিজ্ঞানের প্রতীক অকোভ্য বেবকুলের। তাঁহাদের বর্ণ, মূর্তি, যন্ত্র, ধূপা ও অর্চন-পদ্ধতি পৃথক পৃথক। উপাসনা দ্বারা এই সকল দেবতা যে পুত্র রূপ, তাহা উপলব্ধি করিয়া সর্বপুত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বজ্রবানের সাধন।

বজ্রবানে দেবতার সংখ্যা অসংখ্য।^১ প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক বলিয়া তাঁহাদের মূর্তিগুলিও অতি ভয়ঙ্কর এবং উগ্র। অবশ্য মহাকাব্যিক মূর্তিও আছে। আদিবুদ্ধ কিংবা তাঁহার দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি শান্ত। ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তিগুলিও প্রশান্ত এবং মূর্তিগুলিও সৌম্য, শান্ত, স্থল্লর। বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির মধ্যে ‘অবলোকিতেষর’ মূর্তিটি বিখ্যাত। ইনি শুভ্রবর্ণ, দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা, বামে পদ্ম। ইনি করুণার প্রতিমূর্তি, জগতের হৃদয়ে বিগলিত চিত্ত। অপর বোধিসত্ত্ব মূর্তি ‘মঞ্জুশ্রী’। ইনি পরাজ্ঞানের দেবতা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে উন্নত জ্ঞান-অসি, বামে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

অধিকাংশ দেব-দেবতার উদ্ভব পক্ষ ধ্যানীবুদ্ধের কুল হইতে। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ডতা ও উগ্রতা, মূর্তিগুলিও প্রকৃতির অম্লরূপ। অকোভ্যকুলের বহুবিখ্যাত ভয়ঙ্করী মূর্তি ‘মহাচীল তারা’। ইনি একমুখ, চতুর্ভুজা—দক্ষিণ করকরে তরবারি ও কত্রি, বাম করকরে উৎপল ও কপাল। ইনি প্রত্যালীচন্দ্রে শবের উপর দণ্ডায়মান। এই মূর্তির অম্লরূপ আর একটি দেবী ‘একঅটা’। তাঁহার কেশকলাপ অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গল ও উদ্ভোষিত। এই কুলের অপর দেবতা ‘জাজুলী’। ইনি সর্পের দেবতা, শুক্লসর্পধারী। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, ‘হিন্দুদের মনসাদেবীকে জাজুলীর প্রতিক্রম বলিলে অত্যাক্তি হয় না।’ অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে বৈরোচন কুলের ‘বজ্রবারাহী’ ও ‘চূন্দা’—রত্নসত্তবকুলের ‘বজ্রতারা’ ও ‘বজ্র বোগিনী’ (হিন্দু ছিন্নমস্তার অম্লরূপ)—অমোঘসিদ্ধিকুলের ‘পর্ণশবরী’ (মারীভর প্রশমনের দেবতা) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ভাষিকিনীরও নানারূপ—‘কারভাবস্ত ভেদস্ত ভাষিক্তনস্তরূপকম্’ [ভাষার্থ]।

বৌদ্ধ শক্তিমূর্তিগুলির প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্য একটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং তাহা বৌদ্ধতন্ত্রের পরবর্তীকালে রচিত। তিনি আরও বলেন, *Hindu goddesses like Mahachintara, Chinnamesta*

১। ব্রহ্ম বৌদ্ধদের দেবদেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য।

Kali etc were originally Buddhists. ১: কিন্তু এই মত নব্বীংশে গ্রহণ-যোগ্য নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, একদিন তান্ত্রিকবোধ ও তান্ত্রিকহিন্দু একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভবকৃতির 'মালতীমাধব' মাটিকে দেখা যায়, হিন্দু কয়লা দেবীর উপাসিকা কপালকুণ্ডলা এবং বোধ সিদ্ধা সোদামিনী উভয়েই কাপালিক ব্রতধারিণী—কিন্তু ক্রিয়া ও আচরণের দিক হইতে উভয়ে স্বতন্ত্র। হিন্দুগণ বৌদ্ধগণ হইতে দূরে থাকিতেন এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। কথিত আছে শঙ্করাচার্য মিলেও ত্রিবিভার উপাসক ছিলেন, তথাপি বোধ তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান ইতিহাস-বিখ্যাত। কাজেই বোধ তত্ত্বদ্বারা হিন্দুত্ব প্রভাবান্বিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

হিন্দুর প্রসিদ্ধ মহাবিভার অঙ্গগত তারা, ছিন্নমস্তা, কালী বোধতত্ত্ব হইতে পরিগৃহীত এরূপ মনে করাও অসঙ্গত। 'তারা'—'জিন-লিচ্ছান্ত-বিত' দেবতা—এরূপ চিহ্নিত পাঁচ দ্বাদশ শতাব্দের কবি আচাৰ্য গোবর্দ্ধনের আধাসপ্তশতীতে।^২ কিন্তু এই তারাকে হিন্দুগণই বোধতত্ত্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, না বৌদ্ধগণই হিন্দু-পরিকল্পনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তাসঙ্গত প্রশ্ন। হিন্দুদের নিকট 'তারা' নাম অজ্ঞাত ছিল না। তারা দেবত্ব বৃহৎশক্তির পত্নী—ইহা অতি প্রাচীন পৌরাণিক উক্তি। রামায়ণে আর এক তারার উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি—বালীর স্ত্রী মহাবিষ্ণুলা ও নয়কৃশলা। নন্দব্রহ্মদেবতা রূপে তারা হিন্দুর মধ্যে বহুকাল পূর্ব হইতে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। উপরন্তু দেবমূর্তির করনা আধো হিন্দুর, বোধদেব নয়। হিন্দু তারা মূর্তি ও বোধ মহাচীনতারা বা একজটা মূর্তিতে পার্থক্যও আছে। উভয় মূর্তির অকোভা, পট্টিকা প্রভৃতির ব্যাখ্যাও স্বতন্ত্র। ছিন্নমস্তা দেবী সম্পর্কেও অমূর্ত্য মূর্তি প্রযোজ্য। কালীমূর্তি হিন্দুর একান্ত নিজস্ব, উহাতে বোধ প্রভাবে কষ্টকল্পনা করা অযায্যত।^৩ বরং এইরূপ ধারণা করাই সম্ভব যে, তত্ত্বসাধনার ধারাটি স্বপ্রাচীন। হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন, কিংবা অস্ত্রধর্মাবলম্বী যে-কেহই হউন, সকলেই সেই স্বপ্রাচীন ধারাটি স্ব স্ব ধর্মের অধীকৃত করিয়া লইয়াছেন।

১। Foot note, Introduction to Sadhan Mala—Dr. B. Bhattacharya.

২। অতি পূজিতা তারেয়ঃ দৃষ্টিঃ শ্রুতিলজ্জনকমা স্বতন্ত্র।

জিন-লিচ্ছান্তহিত্তিরিব লগাসনাং কং ন মোহয়তি ॥ [আধা সপ্তশতী]

৩। ব্রহ্মা শাক্ত পরাবলী ও শক্তি-সাধনা—শ্রীমাদ্ভবকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

প. বৌদ্ধ সহজিয়া

বালকসে বৌদ্ধ ভাবিকতা ভয়ের ব্যাপক পূজা-অর্চনার প্রতিক্রিয়ার আর একটি রূপান্তর লাভ করে। ইহা সহজবান। এই সহজবানীদের বলা হয় বৌদ্ধ সহজিয়া। অবহেষ্ঠ ভাবায় রচিত মোহা ও বাংলা ভাবায় রচিত চর্চাগানে সহজ মতের কথা আছে।

এই মতে বাহু আচার-অহুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনার স্বীকৃতি নাই। ‘কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে বানবখানে’—চর্চা. ৩৬। অহরতস্বই পরমতস্ব। এই তত্ত্বমাধ্যমিক সর্বশুদ্ধতা কিংবা যোগাচারের বিজ্ঞপ্তিমাধুতায়ই নামান্তর। ইহা এক মহাস্থময় সহজানন্দের অবহা—অনির্বাচ্য ও ‘বাক্শখাতীত’। ইহাই চরম বুদ্ধ্য। এই সহজানন্দের অবহান ‘সহজকায়ে’। সহজকায়ের কল্পনা বজ্রধানে নূতন। প্রাচীন মতে ছিল ত্রিকায়—নাভিতে নির্মাণকায়, হৃদয়ে ধর্মকায় ও কণ্ঠে সন্তোষকায়। বজ্র বানীরা বলিলেন, মহাস্থম বা সহজানন্দ থাকে চতুর্থকায়ে—লীর্ষে বা উকীষকমলে। উহাই বজ্র বা সহজকায়। অস্তান্ত কায়ের তুলনায় ইহার শূন্যতা ও আনন্দবোধও পৃথক। শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য অতিক্রম করিয়া সহজ কায়ের সর্বশূন্য; প্রথমানন্দ, পরমানন্দ ও বিরমানন্দ অতিক্রম করিয়া সহজকায়ে সহজানন্দ। এখানে চিন্তের মহাস্থম্বে বিশ্বাস। এই চিন্তকে কেহ বলেন ‘মন’, কেহ বলেন ‘জ্ঞক’। মহাধানে—কি মাধ্যমিক শাস্ত্রে, কি যোগাচারে ‘চিন্ত-এর পরিকল্পনা রহস্তময়। যতক্ষণ এই চিন্ত বা মন বা জ্ঞক চঞ্চল, ততক্ষণই দুঃখ—সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানাদি পঞ্চকঙ্কের খেলা—‘চঞ্চল চীএ পইঠো কাল’—চর্চা : ১)। এই চিন্ত যখন স্থিরস্বভাব, তখনই পঞ্চকঙ্কের বিনাশ, ভববাসনার ক্ষয় ও স্থময় অবস্থার উদ্ভব। এই স্থিরস্বভাব চিন্তের নাম ‘বোধিচিন্ত’। কায়ভেদে ইহার শূন্যতা ও আনন্দের ক্রমভেদ। সহজকায়ে ইহা সর্বশূন্য ও পূর্ণানন্দ (চিঅ সহজে শূণ সংপূর্ণা—৪২)।

রহস্তময় বৌদ্ধিক কৌশলে এই বোধিচিন্ত গঠন এবং সেই চিন্তকে নিম্নতর কায় অতিক্রম করাইয়া সহজকায়ে উন্নীত করাই সহজসাধনার লক্ষ্য। বোধিচিন্ত বস্তুতঃ শূন্যতা ও করুণা কিংবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিত অবহা। সহজধানে ইহার যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষরূপে কল্পিত। এই কল্পনা বাস্তব ও অতিশয় শুদ্ধ। স্ত্রী-পুরুষের সম্মে যে চিন্ত-প্রসাদ জন্মে, তাহা বাস্তব। ইহার ফলে যে চিন্ত (মন বা জ্ঞক) উৎপন্ন হয়, তাহার দুই গতি—অধোগতি ও উর্ধ্বগতি। গতিভেদে চিন্তের দুই সংজ্ঞা—‘চিন্তসংজ্ঞা দ্বিবিধা লৌকিকী লোকোত্তরা চ’। যেটি লৌকিক তাহা বিকল্প লক্ষণযুক্ত, যেটি লোকোত্তরা তাহা নির্বল, দৃঢ়, অচ্যুত, সারযুক্ত ও নিবিকল্প স্থখযুক্ত। ইহাই নিম্নতর বোধিচিন্ত। অতি শুদ্ধ বজ্রাক, কয়ল-কুলিশ বা

বোলকোভল যোগ্য যারা এই চিত্র নির্মিত হয়। ইহা অনেকটা বিবাহের বিষ-শব্দের কৌশল। সংজ্ঞাবর্ণ স্তম্ভগম্য। ইহাতে তাত্ত্বিক যোগের প্রভাব অপরিণীত।

সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সংজ্ঞা তাৎক্ষণিক যোগী। যেহে নাড়ী ও বাহুর কল্পনা, কার বা চক্রের কল্পনা হিন্দু তত্ত্বেরই অল্পরূপ; পার্থক্য—হিন্দু তত্ত্বে বহুচক্র, সংজ্ঞা চারিচক্র। সংজ্ঞা সাধনার ভোধ্য, শব্দী, চণ্ডালী যদিও অধ্যুতিকা, তথাপি উহার তত্ত্বের উত্তরাধিকার প্রতিরূপ। মঙ্গলানের উল্লেখ [‘আসব-মাতা’] উভয়স্থলেই আছে। সহজানন্দের ‘মাতা’ (মন্তব্য) তত্ত্বের সাময়িক-পানোয়ন্ততার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সিদ্ধ অবস্থায় সংজ্ঞা বৌদ্ধ—তত্ত্বের দ্বিবা সাধক। তাঁহার বাহু অচ্যুতান নাই, পূজা-অর্চনা নাই। চিত্র তখন সর্বশূন্যতায় পূর্ণ। সহজতত্ত্বের চিত্তরূপ অদ্বয়তরুতে কল্পনার ফুল ফুট, পর-উপকার ফল ধরে। তাত্ত্বিক দ্বিবা মন্ত্রের নিষটক ‘মদেদো ভুবনঃপ্রম’।

৩. নাথপন্থ

নাথপন্থ যোগীদের উপরেও তাত্ত্বিকতার প্রভাব লক্ষ্যীয়। কেহ কেহ বলেন, ‘নাথ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙলা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।’^১ এই ধর্মমতের উৎপত্তি যেখানেই হউক, একদিন ইহা সমগ্র উত্তর-পূর্বভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। রাজপুতানা, গুজরাট, পাঞ্জাব, নেপাল ও বঙ্গ—সর্বত্রই ‘কনফট’, ‘মচ্ছেন্দ্রী’ বা ‘নাথযুগী’ আছেন। ইহাদের প্রধান আচার্যগণ নাথ-উপাধিতে ভূষিত, তাই এই সম্প্রদায় নাথ-পন্থ নামে পরিচিত।

নাথ-পন্থের কিছু গ্রন্থ সংকলিত রচিত হইয়াছে : তন্মধ্যে প্রবোধচক্র বাগচী সম্পাদিত ‘কৌলজ্ঞান নির্ণয়’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া ‘গোরক্ষবোধ’, ‘হঠযোগ-প্রদীপিকা’, ‘শিব-সংহিতা’, ‘যোগচিহ্নাবলি’, ‘শবনবিজয়সম্বোধন’, এবং ‘গোষ্ঠ-বিজয়’ ও ‘মীনচেতন’ প্রভৃতি গ্রন্থে নাথসিদ্ধাচার্যদের অলৌকিক জীবন-কাহিনী এবং সাধন-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধ আচার্যদের মধ্যে প্রধান আদিনাথ, মন্ত্রেশ্বরনাথ, চৌরহীননাথ মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি। মন্ত্রেশ্বরনাথই মীননাথ কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক রহিয়াছে। ডঃ কল্যাণী মল্লিক মনে করেন, ‘লুইপাদ ও মন্ত্রেশ্বরনাথ অভিন্ন, বাঙালি মন্ত্রেশ্বরই নেপালে নামাধরে অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহার আরও একটি নাম মীননাথ।’^২ মন্ত্রেশ্বরনাথ মীননাথ হইতে পারেন, কিন্তু লুইপাদ ও মন্ত্রেশ্বরনাথ অভিন্ন নহেন : লুইপাদ বৌদ্ধ সহজবানী আর মীননাথ নাথযোগী : বৌদ্ধ চর্যাগানের [২১ নং]

১। নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য—ডঃ সূর্য্যনাথ সেন [বিষভারতী-প্রকাশিত যোগ-বিভর]

২। নাথপন্থ—ডীকল্যাণী মল্লিক [বিষবিভা সংগ্রহ]

টীকার বোধ আচাৰ্যের পক্ষের ভাব বুঝাইতে গিয়া মীননাথের উক্তি ‘বহুত্ব গুরু পরমার্থের বাট’—তথাচ পরম্পরনে মীননাথঃ’ বাংলা উদ্ধৃত হইয়াছে : সম্প্রদায় ভিন্ন না হইলে মীননাথের দর্শনকে ‘পরম্পরন’ বলা হইবে কেন ? তবে একথা ঠিক যে, বোধ সহজিয়া এবং নাথযোগীদের সাধন ক্রিয়ায় সাদৃশ্য আছে। তাহার কারণ উভয় ধর্মই এক সাধারণ তত্ত্বের উৎস হইতে উৎসারিত। কালক্রমে এই দুই সম্প্রদায়ের সিদ্ধাই-কাহিনীও একত্র যুক্ত হইয়া গিয়াছে—বাংলায় রচিত গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি কাহিনী-কাব্য তাহার প্রমাণ।

নাথপন্থের দার্শনিক মত এবং সাধন পদ্ধতি নানা দিক হইতে তত্ত্ব-তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক যোগ দ্বারা প্রভাবান্বিত। নাথ সম্প্রদায় মূলতঃ যোগী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের ‘প্রধান সিদ্ধা’ মহাদেব [‘আগ্রে গুরু মহাদেব পিছে আর সব’]। ইনিই আদিনাথঃ ইনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের শিব : ‘Adinath is none but Siva of the Hindus’ [Obscure religious cults : Dr. S. B’ Dasgupta] : ইহার পত্নী জয়-মরপশীল গৌরী। নাথ সম্প্রদায়ের তব হিন্দুত্বের মত শিবশক্তির কথোপকথনচলে বণিত। মথেশ্বরনাথ মীনরূপ ধারণ করিয়া গৌরীর নিকট কথিত শিবের যোগ-তত্ত্ব শ্রবণ করেন।

শিব-প্রোক্ত তত্ত্বটি ‘মহাজ্ঞান’ বা মৃত্যুঞ্জয় যোগ। এই যোগ-প্রভাবে নাথ-যোগগণ কালক্রমে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতে পারেন [‘খণ্ডিয়া কালক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে’ হঠযোগ-প্রদীপিকা]। বস্তুতঃ জীবনে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া বিচরণ করাই নাথযোগীর লক্ষ্য, তাহাদের কাম্য ‘সিদ্ধদেহ’। সে দেহে জরা নাই, মৃত্যু নাই, চাকল্য নাই, উহা ‘কাষ্ঠা সমতুল’। এই অবস্থায় দেব-দেবী বোধ একাকার—ধ্যান নাই, ধ্যানতাও নাই : সাধক এখানে—

স্বয়ং দেবী স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিষ্যঃ স্বয়ং গুরুঃ।

স্বয়ং ধ্যানঃ স্বয়ং ধ্যানতা স্বয়ং সর্বত্র দেবতা ॥ [কৌলজ্ঞাননির্ণয়]

ইহা প্রকৃত পক্ষে তাত্ত্বিক দিব্য যোগীর শিবাবস্থা : তিনিও মহাজ্ঞানী, মৃত্যুঞ্জয়ী। ততোক্ত জীবমুক্তিই নাথযোগীর ‘জ্যোত্তেমরা’ বা সিদ্ধাবস্থা।

এই অবস্থায় পৌত্তিবার জন্ত নাথযোগীর যে সাধন, তাহা ‘কায়সাধন’। কায়সাধনের ব্যাপারে নাথ-পন্থ সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ব-পন্থী। তত্ত্ব বলা হইয়াছে, ‘ঐন্দ্রলোক্যে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে’, নাথযোগীও তেমনি বলেন, ‘তাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড’। দেহ সাধনীর জন্তই তাত্ত্বিক সাধক দেহের নাড়ী, বায়ু, কুণ্ডলিনী শক্তি প্রভৃতির সংস্থান বুঝিয়া ক্রিয়ায় অগ্রসর হন,—নাথপন্থ যোগীরাও তেমনি দেহের নাড়ী, বায়ুর প্রকৃতি বুঝিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়া থাকেন :

জাযা কনুয়ানভেনং কৃষা বাহুং চ মধ্যগম্ ।

বিজা নর্যব স্বহানে ব্রহ্মরক্তে নিরোধয়েৎ ॥ [চর্যবোগ-প্রবীণিকা]

নাথপথে নানাজায়ে 'উল্টা সাধন' বা 'উল্লান বাওরা'র ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে । উল্টা সাধন প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির মোড়কে নিরুদ্ধ করিয়া নিবৃত্তির পথে বাহু, তরু ও মনকে চালনা কর।। তাত্ত্বিক কুণ্ডলিনী-যোগও প্রত্যোয়োগেই । নাথপথে এই প্রত্যায়োগেরই বিশেষ গুরুত্ব ।

উল্লান ভাঙ্গিয়া কর অমনাতে মন ।

তবে সে রহিব শুক অম্বলা রতন ॥ [গোখবিভর]

নাথপথে ব্রহ্মচর্যের উপর ও দৃঢ়ভাবে শুকধারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে—
বার বার বলা হইয়াছে, 'মরণ-বিন্দুপাতেন জীবন-বিন্দুধারণাৎ' । নারীসম্পর্কেও তির্যক কটাক্ষ করা হইয়াছে, নারীকে বলা হইয়াছে 'বাঘিনী' । মীননাথ নারী-সঙ্গে প্রেমত্ব হইয়া বধন মণিজ্ঞান বিম্বত হইয়াছিলেন, তখন শিয় গোরক্ষনাথ এই নারী ও ভোগ সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন : 'শরীর শুধাইল শুক হারাইলা পরাণ' । কিন্তু কায়া-সাধনে বা উল্টা-যোগসাধনে যে-সকল ইঙ্গিতময় প্রক্রিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে শাক-যোগকে অস্বীকার করা হয় নাই । নাথযুগীদের দেহস্থ 'চন্দ্র-সূর্য' বা 'গঙ্গা-যমুনা' নর-নারীর প্রতীক । হর্যোগধারা চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করাই প্রধান সাধন-ক্রিয়া । চন্দ্র হইতেছে পরম বিন্দু বা অমৃত : ইহা সহস্রার কমলে অধোমুখে অবাস্তত : ইহাই শিব । এই শিবরূপ চন্দ্র হইতে যে অমৃতবিন্দু নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে, তাহাকে পান করাই মহারস পান । মহারস পানের জন্ত প্রয়োজন সূর্য বা শক্তি । ইহা মূলধার উর্দ্ধমুখী হইয়া অবতান করে । ইহা প্রবৃত্তিমুখী, যুক্তাশীল ও মরণ কারণ । এই শক্তিকেই শুকর নির্দেশে যৌগিক কোশলে শিবের সহিত যুক্ত করিতে হয় । ইহাই যোগের শেষ কথা ।

বিন্দু শিবো রজঃ শক্তিঃ চন্দ্রো বিন্দু রজো রবিঃ ।

অনয়ো সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমঃ পদম্ ॥ [গোরক্ষ-পদ্ধতি]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, 'Thus it seems that the conception of the moon and the sun has been associated with that of Siva and Sakti, and metaphysically the moon and the sun represent the nature of Siva and Sakti respectively'.—তিনি চন্দ্র-সূর্য বলেন ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি লক্ষ্যীয়, The combination of the sun and the moon implies secondly the yogic practice

in which the male and the female unite and the combined substance of the seed and the ovum is sucked within by the yogin or yogini, as the case may be, through some secret yogic processes.” বস্তুতঃ নর-নারীর মূল মিলন যেমন তত্ত্ব স্বীকৃত, আবার উহা আধ্যাত্মিক ভাষ্যেও বর্ণিত, নাথ-পন্থের কামা-সাধনেও এই ব্যাপারটি আছে। হঠযোগ-প্রদীপিকার বজ্রোন্মেষ-সাধনে স্পষ্টতঃ এই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৬. বৈষ্ণব সহজিয়া

বৈষ্ণবধর্মেও শক্তিবাদের প্রভাব গুরুতর। প্রাচীন বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থের বাহুবোদিত-তত্ত্বে শক্তিতত্ত্বের প্রভাব তো আছেই, এমন কি মহাপ্রভু-প্রচারিত গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বেও শক্তিবাদের প্রভাব আছে। ডঃ হুশীল কুমার দে মনে করেন। গোড়ীয় বৈষ্ণবের ত্রিমতীকে স্বরূপ শক্তিরূপে গ্রহণ এবং সাধন-ব্যাপারে কামগায়ত্রী গ্রহণের মধ্যে তাত্ত্বিক প্রভাব রহিয়াছে।^১ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতেও বৈষ্ণবধর্ম তদ্বৎস্পষ্ট।^২ ডঃ শশীকৃষ্ণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার ‘শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’ গ্রন্থে দৃষ্ট বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ‘কৃষ্ণের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তা শক্তি রাধার ফ্লাদিনীরূপ’ শক্তিবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যদিচ প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণবের রাধা তত্ত্বাদিবর্ণিত শক্তি হইতে অনেকখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন, সে রাধাকে আর শক্তি বলিয়া চিনিবার উপায় নাই—তথাপি রাধাতত্ত্ব আসলে শক্তিতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।^৩ গোড়ীয় বৈষ্ণবের ফ্লাদিনীশক্তিরূপা মহাশক্তি যে তত্ত্বেরই মহাশক্তি রূপগোষ্ঠাসমীপে তাহা বলিয়াছেন,

ফ্লাদিনী বা মহাশক্তি: সর্বশক্তিবরায়ণা।

তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতা ॥ [উজ্জল নীলমণি]

পঞ্চরাত্র, পুরাণ, গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিলে এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বেও সাধনায় তদ্বৎ গভীরভাবে যুক্ত। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে ‘ব্রহ্মসংহিতার’ কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আর এই সংহিতার সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবগণ প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও শক্তিবাদের প্রভাব স্পষ্টতঃ : এখানে সহস্রার পদ্যকেই ‘গোকুলাধ্যঃ মহৎ পদম্’ বলা হইয়াছে, এই পদ্যেরই কণিকার মহাবস্তু প্রকৃতি ও পুরুষ জ্যোতীরূপ কামবীজ দ্বারা মিলিত হইয়া প্রেমামন্দে বাস করেন।^৪

১। Obscure Religious cults—Dr. S. B. Dasgupta.

২। Early History of the Vaishnava faith & movement—Dr. De.

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ৪। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।

৫। কণিকারঃ মহদ্বস্তুঃ ঘটকোণঃ বজ্রকীলকম্। বড়ল ঘটপদীযানঃ প্রকৃত্য।

পুরুষেণ চ ॥ প্রেমামন্দ মহানন্দ রসেনাবহিতঃ হি যৎ। জ্যোতীরূপেণ মহনা কাম-বীজেন সততম্। [ব্রহ্মসংহিতা]

কিন্তু গোড়ার বৈকবধৰ্মে এই সকল দিক হইতে তত্ত্বের প্রভাব থাকিলেও, ইহার প্রেমভক্তি ও প্রেমভক্তির সাধন স্বতন্ত্র। নিজস্বেরূপে নিজস্বই মনে করিয়া, গোপী-অহুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা ভাবনা করাই বৈকবের অন্তরঙ্গ সাধনা। এখানে সাধকের কৃমিকা ঝট্টার বা নখীর বা লীলাভক্তের। ভক্তের ভাব গোপীর অহুগত ভাব, অর্থাৎ রাগাহুগমার্গে ভজন। রাগাত্মিক ভজন সাক্ষাৎ গোপীর, ভক্ত কদাচিৎ সে স্তরে উন্নীত হইতে পারেন; সাধারণভাবে ভক্তের পক্ষে রাধাস্তরে উন্নীত হওয়ার প্রায় উঠে না, কৃষ্ণ হইয়া বাওয়ার প্রায় তো একেবারেই নয়। লয়মুক্তিতে ভক্ত চির বিরক্ত। সাধুজ্ঞা নুষ্টি দিলেও তাঁহার প্রহণ করেন না। কিন্তু তত্ত্বের শেষস্তরে অধৈত-সামুজ্ঞ্য। বৈতবোধ তত্ত্বসাধনার পাদপীঠ, সিদ্ধপীঠে তাত্ত্বিক সাধক অধৈত 'শিবোহং' বোধে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু কি তত্ত্বের দিকে, কি সাধন-পদ্ধতিতে সহজিয়া বৈকব শাক্তের সগোত্র। বৈকব সহজ মত কত প্রাচীন, বলা দুষ্কর। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, মুসলমান সূফীযতের সহিত মিশ্রণে বৈকব সহজ মতের উদ্ভব। কিন্তু বৈকব সহজিয়া মতে, এ মত আরও প্রাচীন। মুসলমান-পূর্ব যুগে বিষমজল-চিন্তামণি, জয়দেব-পদ্মাবতী ছিলেন সহজ পথের পথিক। যে পরকীয়া প্রেম সহজ সাধনার প্রাণ, সহজিয়াগণ তাহাকে স্বদূর দূরত্বের ব্রজলীলার যুগে টানিয়া লইয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই সাধনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ব্রজলীলারও পূর্ববর্তী একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়। সর্বপ্রথম 'এই ধর্ম বাতন কর্যাছিল ভরতমুনি' [আনন্দ ভৈরব]।^১ আখ্যানটি এইরূপ^২ : ব্রহ্মা ও তাঁহার মানসকন্ডা হইতে ময় ও ভরতের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁহাদ্বয়কে সৃষ্টির আদেশ দিলে ময় হইতে বহুতর সৃষ্টি পত্তন হয়। কিন্তু ভরতমুনি তপস্যায় মন দেন। রেবা নদীর তীরে বেতবন, তাহার ভিতর রহস্তময় এক কুঠ। তপস্তানিরত ভরত এইখানে এক অকৃত নারক-নারিকারক প্রত্যক্ষ করেন—গোপরূপে পরকীয়া-সদয়। বিভ্রান্ত ভরত এই বৃত্তান্ত নিত্য কৃন্দাবনের গোলোকনাথের নিকট নিবেদন করেন, 'নর মাছুষের লীলা দেখি সর্বোত্তম'। গোলোকনাথ শুনিয়া বলেন, এই পরকীয়া লীলার ইন্দ্ৰিয়কার অতি গোপনীয়। কিন্তু অতিশয় আনন্দপূর্ণ, 'সে কাম সাক্ষাৎ কারি রহে আনন্দরূপে'। ভগবানের বাক্য শ্রবণে ভরত সেই লীলা-সাধনে মন দিলেন। এদিকে ভরতমুনি মূখে নররূপে পরকীয়া লীলার প্রসঙ্গ শুনিয়া কৃষ্ণের মনে লোভ হইল,

এই কথা ভরত কহিল বেই যাত্র।

তুংনে ভগবান লোভ ধরিল একান্ত ॥

১। সহজ : সাহজো। এই কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে 'আনন্দ ভৈরব', 'রতিবিলাস-পদ্ধতি' ও 'স্বধাবৃত্ত কবিকা' গ্রন্থের অহুগরণে কাহিনীটি বিবৃত হইল।

গূঢ়রূপে হাললে আখ্যান ইচ্ছা হইল।

ভরত প্রতি ভাব তবে গোপন করিল ॥ [রতি-বিলাস-পদ্ধতি]

এই ইচ্ছার প্রকট প্রকাশ ব্রজারণ্যের পরকীয়া লীলা। সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধন-প্রমাণ ব্রজের পরকীয়া ভাব এবং ভরতমূনির সাধন।^১ হৃদয় বাণের যুগের কথা বার দিলেও, যে ভরতমূনির প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ সহজিয়া সাহিত্যে উল্লেখিত হইয়াছে এবং যিনি এই রস প্রথম ব্যক্তন করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস, তিনি যদি রসশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমূনি হন (এবং তাহা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়), তাহা হইলে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার ধারাকে ঐষ্টাক্ষের দ্বিতীয় শতকে স্থাপন করিতে হয়।

কিন্তু বর্তমানই হউক, সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের পুথিগুলি পাওয়া বাইতেছে চৈতন্য-পরবর্তী যুগ হইতে। ভরতমূনি সংস্কৃতে যে সহজ-রস প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা লুপ্ত। ইতস্ততঃ দুই একটি শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রাগাঙ্গিক পদগুলি বাতীত প্রাক্-চৈতন্য যুগের কোন নিদর্শন নাই। এই চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কিনা, সে সম্পর্কেও অনেকে সংশয় পোষণ করেন। সহজিরাগণ উজ্জল নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃতকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। উপরন্তু এই গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য—১. ‘আগম’, ‘আনন্দ ভৈরব’ ও ‘অমৃতরসাবলী’ (এই গ্রন্থগুলি প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত), ২. কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে প্রচলিত ‘আমৃততত্ত্ব’, ‘রসভক্তি চন্দ্রিকা’, ‘রসকদম্ব কলিকা’ ও নরোত্তম দাসের ‘আমৃততত্ত্ব’ (দেহ-কড়চা) ও ‘রাধারসকারিকা’, ৪. লোচনদাসের ‘দুর্লভসার’ ও ‘পদাবলী’ ৫. বীরভদ্র গোস্বামীর ‘শিক্ষাকড়চা’ ৬ হরিদাস গোস্বামীর ‘রাগময়ী কণা’ ৭. রসিকদাস গোস্বামীর ‘রতিবিলাস-পদ্ধতি’, ‘রসতত্ত্বসার’ ৮. মুহূর্তদেব গোস্বামীর ‘ভক্ত রত্নাবলী’, ‘অমৃত রত্নাবলী’ ৯. লক্ষ্মীকান্ত দাসের ‘স্বধামৃত কণিকা’ ১০. কবিরাজ যনকদাস দাসের ‘গোবিন্দরতিমঞ্জরী’ ১১. অকিকন দাসের ‘বিবর্ত-বিলাস’ এবং অন্যান্য বিবিধ সহজিয়া পদাবলী। এগুলি বিপুলকায় বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য ও রসনিবন্ধাদির সামান্য দিগ্‌দর্শনমাত্র।

ঐহাদের অত্মসরণে বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা শাক্তাস্ত্রবাদের নির্ধারিত লইয়াই রচিত; বিশেষতঃ উহার সাধন-পদ্ধতি শিব-শক্তি যোগের মতই গুহ্য ও রহস্যময়। স্থূল দেহ ও কাম উভয় সাধনার ভিত্তি, উভয় দ্বলেই নারী সাধন-সজ্জিনী। তত্ত্বের সাধন-পদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া উহার প্রকাশের

১। নট্যঃ সৰ্বোপে কৃষ্ণে বৎ নিভৃতঃ পরম বনম্।

তস্ত কৃষ্ণে নায়িকায়ঃ মিলনং ভরতস্ত হি ॥

ভালী বেমন সঙ্কেতময় এবং নানাপ্রকার জটিল রূপকাবরণে আবৃত, বৈকব সহজিয়াদের সাধন-সঙ্কেতও তেমনি অতি গূঢ় বলিয়া প্রকাশ সাক্ষেপিক, পরিভাষাও ইচ্ছিতময়।

আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সহজিয়া সাহিত্যে বিভিন্ন বৈকবমতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; কি ভাষে, কি সাধনার বিষয়ে উহাতে পৌড়ীয় বৈকব গোষ্ঠাবাদীদেয়—ঐরূপ, সনাতন, কৃষ্ণদ্বাস কবিরাজ প্রভৃতির বাক্য প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে ওই সকল বাক্যের অর্থ স্বতন্ত্র, ব্যাখ্যাও স্বতন্ত্র। সহজিয়াগণ মনে করেন, মহাপ্রভু স্বয়ং, বটগোষ্ঠাবাদী এবং কৃষ্ণদ্বাসাদি বৈকবগণ সকলেই সহজ সাধক; তাঁহাদের পরকীয়া সঙ্গিনীদের একটি তালিকাও ‘বিবর্ত-বিলাস’ গ্রন্থে প্রস্তুত হইয়াছে। বিবর্ত-বিলাসকার মনে করেন, বাক্য ও আচরণে গোষ্ঠামিগণ সহজ-সাধনার গূঢ়ত্বের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিটি বাক্যেরই দুই অর্থ—বাহ্য ও আন্তর। আন্তরিক অর্থটিই গূঢ় ও সহজমতের পরিপোষক। চৈতন্তদেব স্বয়ং বেমন ‘এক কার্যদ্বারে প্রভু অল্প কার্য করে’—তেমনি গোষ্ঠামিগণ একই লিঙ্গান্ত বাক্যে সহজ মর্মার্থ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অল্প অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধ্য ও সাধনার ব্যাপারে সহজিয়া বৈকবের অবলম্বন চৈতন্তচরিতামৃত-মৃত এই মহাবাক্য,—

বুদ্ধাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।

কামগায়ত্রী কামবীজে ধীর উপাসন ॥ [চৈ. চ. মধ্য ৮]

অপ্রাকৃত বুদ্ধাবনের এই ‘নবীন মদন’ই পরমতত্ত্ব। তিনি ‘নিত্যানন্দ দেহ’ ‘মহামধু ছইতে মধুর’। তিনি পূর্ণ, অখণ্ড ও এক। এক হইলেও এই তত্ত্ব অনির্বচনীয় ‘মধুর যুগল’। একই দেহে ইহা পুরুষ ও প্রকৃতি, রস ও রূপ, রাগ ও রতি ইহাই নিত্যের দেশে নিত্যকালের রাগাক্রম,—

রাগবন্ত মহাভাব ঐরাধিকা রতি।

স্বয়ং রাধা তার নাম স্বয়ং প্রকৃতি ॥

কৃষ্ণান হইতে সেই রাধার প্রকাশ।

গোবিন্দ-মন্দিরী রাধা প্রেম-বিলাস ॥ [রসকলষ কলিকা]

অপ্রাকৃত বুদ্ধাবন ‘নিত্যের দেশ’। সেখানে কালশ্রোত নাই, মধু ক্ষতুর শেষ নাই, রস-রতির অন্ত নাই। সেখানে নিত্য হীলি, নিত্য পূর্ণবিকাশ, নিত্য মধুরলীলা। স্বতঃসিদ্ধ ‘রসযুতি’ চিরকিশোর রূপ এই ধামে নিজ প্রকৃতির সহিত নিত্যলীলার নিজের রসবাসুর্ষ নিজেই আত্মকন করিতেছেন, ‘আপনি আপনি প্রেম, করে সদা আত্মকন, আপনি আপনি হয় বশ’ [বিবর্ত-বিলাস]।

সহজিয়া নাহিতো এই অনির্বচনীয় 'বামল তত্ত্ব'টিকে নানাভাবে প্রকাশ করা
হইয়াছে। খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন প্রয়োগের ছলে রয়োক্তের 'আত্মতত্ত্ব' গ্রন্থের বর্ণনা—

স্বতঃসিদ্ধ গোলোক নিত্য বৃন্দাবন।...নিত্য বৃন্দাবনে কে থাকেন ?
ত্রিভুজনাথ। সেখানে হয় কি ? নিত্য রাস হয়, নিত্য মহোৎসব
হয়। নিত্য বৃন্দাবনঃ নাম নিত্য রাসমহোৎসবম্।...করেন কি ?
শূদ্র রস আন্দোলন করেন। রক্ত ঘেদীতে...কিশোর-কিশোরী
বিরাগমান। নারকের কামরতি। নারিকার প্রেমরতি। [আত্মতত্ত্ব]

নিত্যধামের রসকুঞ্জে রসরাজের এই যে কেলি, এই যে রাগ-রতির যোগ, নিত্যরাস
বা স্বরূপের সহিত-স্বরূপের লীলা, ইহারই প্রাকৃত প্রকাশ ষাণ্ময়ের বৃন্দাবন-লীলা।
অদ্বৈত এখানে স্পষ্ট দ্বৈতে প্রকট—রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ। শুধু তাই নয়, স্বাক্ষর এখানে
পরকীয়া। যদিও তত্ত্বটি যোগমায়াম্রিত, তথাপি উহার প্রাকৃতত্ব স্বীকৃত। কৃষ্ণ-ভরতমুনি
সংবাদে ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেখানে বলা বলা হইয়াছে, এক ও
অখণ্ড তত্ত্বের দুইয়ের প্রকাশ প্রধানতঃ দুই কারণে,—১. বাহ্য আকারে প্রেম আশ্বাসনের
জন্ত, এবং ২. পরকীয়া নায়িকা সহায়ে কিভাবে সিদ্ধরতি সাধন করিতে হয়, তাহা
বুঝাইবার জন্ত [ভৃঙ্গ-রত্নাবলী]।

সিদ্ধদেহে সিদ্ধরতির সাধনাই এই লীলার মূল লক্ষ্য। ব্রজলীলার এই সিদ্ধান্তের
সহিত রাধাতত্ত্বের সাদৃশ্য রহিয়াছে। রাধাতত্ত্ব মতেও, শক্তিসহায়ে সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণ
ব্রজধামে পদ্মিনী রাধার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন—‘কৃলাচারণ্ড সিদ্ধার্থঃ পদ্মিনীসঙ্গমা-
গতঃ’ [রাধাতত্ত্ব. ১৩ পটল]। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্বতঃসিদ্ধ নিত্য সহজের আর এক
সহজমাত্মবরূপলীলা। উহাই সহজ-সাধনার প্রত্যক্ষ আদর্শ।

সহজমতে জীবের পরিকল্পনাও তত্ত্ব হইতে অভিন্ন। জীব নানাপ্রকার। তন্মধ্যে
বিশিষ্ট তটস্থ জীব। ইহার অবস্থান দেহভাণ্ডে। দেহভাণ্ড পঞ্চভূত, একাদশ
ইন্দ্রিয় ও ষড়্‌রিপুর সমষ্টি। ইহাদের রাজা মন। মন ইন্দ্রিয়বর্গের চালক। এই
ভাণ্ডে জীবাত্মা রহিয়াছেন গুহ্যদেশে, চতুর্দলপদ্মে, ভগ্নাসনে; আর পরমাত্মা রহিয়াছেন
সহস্রদলের উপরে শূন্যে শোণিতাচ্ছন্ন অবস্থায়। জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভাবেন, আর
পরমাত্মা জীবাত্মাকে হরণ করেন। তাহাতে জীব পরমানন্দ হয় ও পরমাত্মার
স্বরূপ হয়। রূপ (জীবাত্মা) ও স্বরূপ (পরমাত্মা) তত্ত্বতঃ অভিন্ন—‘স্বরূপ ও রূপ
এক বস্তু কতৃ ভিন্ন নয়’। কিন্তু সাধারণতঃ জীব এই স্বরূপ মায়াক্ষর ও মোহাবৃত্ত।
জীবের সাধন ‘স্বরূপ’ হওয়ার লক্ষ্যে।

সহজিয়া সাধন দেখকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহারা বলেন, ‘দেহের ভিতর আছে

সকল সংসার।’ বেছেই নিত্য বৃন্দাবন, বেছেই মর্ত্য-বৃন্দাবন, বেছেই ‘গুপ্তচর’ বেশ। তাই তাঁহার নির্দেশ, ‘জগতের তত্ত্ব কর আপন কায়াতে’। রাহুব জানিয়া এই বেছেই রাহুবের তত্ত্ব করিতে হয়। রাহুব তিন প্রকার—সহজ রাহুব, অযোনি রাহুব ও সংসার রাহুব। অতসিদ্ধ সহজ রাহুবের স্থান গোলোক বা নিত্য বৃন্দাবন। অযোনিসত্ত্ব রাহুব ইহার নিরে পরমযোগে ও চৌদ্দদুর্বে অবস্থান করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রকৃতি অযোনি-সত্ত্ব। যোনি-সত্ত্ব রাহুবের স্থান গোহুল বৃন্দাবন, ইনি ব্রহ্মের নরাকার কৃষ্ণ। ব্রহ্মাণ্ডের সামান্ত রাহুবও যোনিসত্ত্ব। এই রাহুব যদি সহজ রাহুব হইয়া ভজন করিতে পারে, তবেই তাহার সহজপ্রাপ্তি হয়। ‘সহজ রাহুবেই সহজ বসে।’ কিন্তু সেই সহজ রাহুব হওয়া সহজ কথা নয়। চণ্ডীদাস বলেন, ‘রাহুব রাহুব সবাই বলয়ে রাহুব নিগূঢ় কথা’, আর সে রাহুব ‘ভাবিয়া গিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গুটিক হয়।’ সামান্ত রাহুবের মধ্যে থাকিলেও, ‘যোনিতে জনম তাঁহার নয়, তাঁহার জনম রাগেতে হয়’ [চণ্ডীদাস] তিনি ‘জ্যাঙ্গে মরা’—‘রাহুব বলি যারে, জীরঙ্গে সে মরে, সেই সে রাহুব হয়’।

বস্তুতঃ কামকে সহজ প্রেমে উন্নীত করা, জৈবিক সত্তাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নিষ্কল সহজ প্রেমসত্তায় পরিণত করাই সহজ সাধনা। সহজ হইলেও ইহা সহজ নয়। প্রাকৃত জগতের নারক, প্রাকৃত জগতের নারিক। এবং প্রাকৃত জগতের কাম ইহার বিষয়, আশ্রয় ও অবলম্বন। এখানে কাম ও প্রেম একই আধারে যুক্তবৈগীর মত অবস্থান করে—‘প্রেম অব্যত কাম রহে এক ঠাঁই।’ বিষ লইয়া, আশ্রয় লইয়া সহজ-সাধন। পদে পদে পতনের আশঙ্কা। তাই বারবার সাবধানী বাণী—একটু এদিক ওদিক হইলে ‘ভীমকল বকল’ উঠিবার ভয়।

তাই এই সাধনার ‘আরোপ’ এর শুরুত্ব। আরোপ দ্বারা প্রাকৃত বিষয়, আশ্রয় ও কাম অপ্রাকৃত সহজে পরিণত হয়। আরোপের প্রধান বিষয়ালয় পুরুষ ও নারী : এ সাধনার গায়ত্রী কামগায়ত্রী [‘কামদেবায় বিদমহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহিনকঃ প্রচোদয়াৎ’], ইহার বীজ কামবীজ ‘ক্লৌঃ’। সবই প্রাকৃত, সবই লৌকিক, কিন্তু বিশেষ আরোপ-কৌশলে—সবই হয় অপ্রাকৃত, অলৌকিক ও বিস্ময়।

সহজ সাধনার পুরুষের কৃমিক। বস্তুতঃ প্রকৃতির। সহজ স্বভাবে পুরুষ বধন কাম গ্রহণ করেন, তখন বিশেষ আরোপ প্রণালীতে তিনি প্রকৃতিই হইয়া যান। সাধনদ্বারা এই প্রকৃতিই প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়—‘প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতির সঙ্গ’ [আন্তরতত্ত্ব]। এই সাধনার অন্ততম আশ্রয় বে প্রকৃতি, তিনিও অসামান্য। তিনি স্বরূপতঃ ‘মহাভাবশিরোমণি’ রাখার আর এক বিগ্রহ। রাখারানী

যেমন রাগময়ী বেহ, তাঁহার রতি যেমন 'সম্মতি', তিনি যেমন হিররত্ন—সাবন-
নক্ষত্রী-নারিকাও সেইরূপ,—

বন্ধ নহে কঙ্ক রেডা মন রাখিকার ।

টলাটল ছাড়া এদেশের বিচার ॥ [বিবর্তবিলাস]

এই প্রকারের নায়ক-নারিকার দ্বারে সহজের রস-সাধনা। দেহের নাড়ী, বাহু,
চক্র প্রভৃতির অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি বুঝিয়া রতিক্রম আত্মাকে শোষণ করিয়া
বাণরূপ অগ্নিধারা মন্ত্রের বাজন করিতে হয়। ইহা যেমন রহস্যময়, তেমনই দুর্লভ :

অত্যন্ত রহস্য কহি প্রাকৃত শূদ্রারে ।

রতিরূপে জয়ী তারে করি নমস্কারে ॥ [বিবর্তবিলাস]

সহজ সাধনায় গুরুর স্থান অতি উচ্চে। গুরু আনন্দময়, নিতাইচ্ছন্ত, পরমাত্মা
হইতে অভিন্ন। তিনিই জীবকে চৈতন্য দেন, সহজবস্ত্র জ্ঞানাইয়া দেন এবং
সহজস্বরূপ হইবার কৌশল শিক্ষা দেন। গুরুই নায়ক, শিষ্য নারিকা। নিত্য বৃন্দাবনে
যেমন স্বতঃসিদ্ধ সহজ মাতৃ (শূদ্রারসমুত্তি সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ) স্ব-শক্তিসহ কামগায়ত্রী
কামবীজে নিত্য শূদ্রার আন্দোলন করিয়া পরমানন্দ হইয়া থাকেন, সেখানে যেমন
নিত্য রাস হয়, নিত্য মহোৎসব হয়—আবার গোকুল বৃন্দাবনে যেমন রসরাজ কৃষ্ণ
পরকীয়ভাবে রাগামহ প্রেমচর্চা করিয়া সেই নিত্য সহজধারাকে মৃত্যু প্রকট করেন—
তেমনই ভাণ্ডব জীব (স্বরূপের রূপ) প্রথমে গুপ্ত বৃন্দাবনে, পরে মনোবৃন্দাবনে গুরু
সহায়ে (গুরুই নায়ক, তিনি পুরুষই হউন আর প্রকৃতিই হউন, তিনিই মর্ত্যের
সহজপুরুষ) নিজেকে প্রকৃতি ভাবিয়া (শিষ্য নারিকা ; তিনি পুরুষই হউন বা নারীই
হউন, শিষ্য চির প্রকৃতি-স্বভাব) কামগায়ত্রী কামবীজ দ্বারা শূদ্রার আন্দোলন পূর্বক
সেই নিত্য রাস, নিত্য মহোৎসবে মগ্ন হন। রূপের ভিতর স্বরূপের আত্মান বা
রূপের স্বরূপে স্থিতিই সহজ-সাধনার শেষ প্রাপ্তি।

প্রবন্ধের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সহজিয়া সাহিত্যের ভূমিকার বলিষ্ঠাছেন,
'অনেকের বিশ্বাস যে সহজিয়ারা তাত্ত্বিক প্রণায় সাধনা করেন।...এই মত সম্পূর্ণই
ভ্রমাত্মক। শরীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সহজিয়া তত্ত্বের অহুকরণ করিয়াছেন
সত্য, কিন্তু সাধন-ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণই ভিন্নপন্থী।' মন্তব্যটি বিচার করিয়া দেখা
আবশ্যক। অধ্যাপক বসু স্ব-কার করিয়াছেন, সহজিয়া মার্গে দেহের বিশেষণ তত্ত্বেরই
অহুরূপ, কেবল চক্রাদি হলে সরোবরের কল্পনা এবং শিব-শক্তি হলে রসরূপ কৃষ্ণ ও
রতিক্রম রাখার কল্পনা। তাঁহার মতে সহজিয়া সাধনা ভাব-কল্পনা। কিন্তু তাহা নয়।

সহক-সাধনার সাধকের তিন প্রকার ভেদ—প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ—তাহাদের সাধনও তিন প্রকার :

ভাবান্ধর রসান্ধর আর প্রেমান্ধর ।

প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তিনে তিন হয় ॥ [অবতরণাবলী]

প্রবর্তের আশ্রয় 'ভাব'; ইহা নিরাধিকারীর করণ। ইহা সাধকের তরে প্রতিষ্ঠিত হইবার সোপান বাহ্য, অনেকটা তত্ত্বের পত্তভাবের সাধনার অনুরূপ। কিন্তু যে অবস্থায় ব্রহ্মান্ধরে সাধকের 'গোত্রান্ধর' হয় বা 'দেহান্ধর' হয়—তাহা তো ভাবসাধনা বাহ্য নহে : 'রসান্ধিত' সাধন ক্রিয়ামূলক—তাহার অবলম্বন 'দেহ', তাহার আশ্রয় 'দায়ক-দায়িকা' এবং উদ্দীপন 'কাম'। প্রকৃতিকে অবলম্বই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ 'অগ্নিকুণ্ড বিনে নহে চুহু আবর্তন'—আর অগ্নিকুণ্ড আছে প্রকৃতির অঙ্গে। যে 'গুপ্তচন্দ্রপুর' ক্রিয়া-সাধনের স্থান, তাহা অবলম্বন অর্ধঅঙ্গ—'অবলম্ব অর্ধ অঙ্গ গুপ্তচন্দ্র দেশ'। এই সাধনা অত্যন্ত গুহ্য বলিয়াই অতিশয় সঙ্কেতময়; করণের ভাবা ও পরিভাষাও সাঙ্কেতিক। অতএব 'সাধন-ব্যাপারে তাঁহার (সহজিয়ারা) ভিন্নপন্থী'—এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রেম ইহার শেষ লাভ, বিশেষ প্রক্রিয়ার কাম সেই প্রেমলাভের আরোহ-সোপান। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও বলেন, 'A close study of the literature of the vaishnava Sahajiyas will leave no room for doubting the clear fact that it records the spirit and practices of the earlier Buddhist and Hindu Tantras, of course in a distinctly transformed form wrought through the evolution of centuries in different religious and cultural environments. [Obscure Religious cults]

৮. বাউল

ভক্ত সাধনা যে উচ্চকোটির হিন্দুধর্মেই শুধু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নহে—এ দেশের নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে ইহার প্রভাব আরও ব্যাপক ও বিচিত্র। সহজের নিম্নতরে লোচকুর অন্তরালে কত যে গুহ্য, রহস্যময় সাধনার ধারা রহিয়াছে তাহার পরিমাপ করা কঠিন। তাহাদের কোনটি লুপ্ত চইয়া গিয়াছে, কোনটি অতি ক্রীণ প্রদীপ লিখার মত মিটমিট করিয়া জলিতেছে, কোনটি বা অশান্তের হইয়াও লোকজীবনের মধ্যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান আছে। ভক্ত-সাধনা লৌকিক; আরো উচ্চ ভজন-জীবনের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। তারপর উচ্চ

উক্ত কোটির অনেক ধর্মের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, অনেক ধর্মকে নিজের প্রবাহে মিলাইয়া লইয়াছে। কিন্তু উহার সর্বাধিক প্রভাব রহিয়াছে লৌকিক ধর্মবোধে ও আচরণে। বাংলার বাউল তাহাদের মধ্যে একটি।

বাউল একটি বিচিত্র সম্প্রদায়। লোকালয়ে তাঁহারা বড় থাকেন না। তাঁহাদের হান নির্জন আখড়া বা দরগা। তাঁহাদের জাতিবিচার নাই। নানারঙের বিচিত্রিত কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা দিয়া তৈয়ারী তাঁহাদের পরনের লম্বা আলখালা। আচার-আচরণে ইচ্ছিতমরতা ও স্বল্পভাষণই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের প্রধান সম্পদ—সহজ সরল কথার গভীর অন্তর্ভুতিমূলক গান। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বাংলাই তাঁহাদের নাই, পুঁথিগত পাণ্ডিত্যকেও তাঁহারা বড় আসন দেন না। তাঁহাদের জীবনের একমাত্র বাস্য ‘মনের মাতুব’-এর অন্তরঙ্গত্ব। সে সন্ধান মন্দিরে-মসজিদে নয়, নিজের দেহ-দেবালয়ে। তাঁহাদের জীবনের প্রধান আশ্রয় গুরু, আর তাঁহাদের আনাগোনা সাধারণ মাতৃবের সমাজে। বাউল গান যেন আমাদের দেশের ভূঁইটাপা ফুল,—মাটির খুব কাছাকাছি, সহসা নজরে পড়ে না; অলক্ষ্যে ফোটে, স্বপ্নর আকাশের আলোর পানে পাণড়ি মেলিয়া ধরে, আপন মনে বাতাসে দোল পায়, খুসীর মৌজে নিজের মধ্যেই নিজে ডুবিয়া থাকে, নিটোল তাহার স্বাভা, আর অটল সৌন্দর্য।

‘বাউল’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাগল [< হিঁ বাউরা] বা ব্যাকুল; ইহার সহিত ‘আউল’ [< আকুল] কথাটিও প্রায় একার্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রেমময় ভগবান বা ‘মনের মাতুব’-এর ভক্ত বাহারা আকুল, পাগল, ব্যাকুল—তাঁহারাষ্ট বাউল। বাউলেরা যদিও জাতি মানেন না, তথাপি তাঁহাদের কেহ বৈষ্ণব সহজপন্থী—কর্তাভক্তা, জ্ঞাড়া, সহজী, বলরামী প্রভৃতি; আবার কেহ মুসলমান—ফকির, দরবেশ, সাঁই। তাঁহাদের মধ্যে একদিকে আসিয়া মিশিয়াছে চিরাচরিত লৌকিক গুণ তত্ত্ব সাধনা বা সহজ সাধনার ধারা, আর আসিয়া মিশিয়াছে মুসলমান স্তব্ধমত এবং হিন্দু বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার ধারা।

বাউলিয়া মত খুব প্রাচীন। আচার্য ক্ষিত্তিমোহান সেন তাঁহার ‘লীলাবক্তৃত্য’র বলিয়াছেন যে, বাউলের ‘প্রেমতত্ত্ব’, বাউলের ‘আভাস-রহস্য’ (Mystery), তাঁহার ‘ভাবের ইঙ্গিত (Symbolism) ও হৈয়ালি’ [‘তালগাছে শোলের শোনা শিয়ালে ধরে ধার’], তাঁহার ‘মনের মাতুব’ [বেদের ‘পুরুষব্রহ্ম’ বাহাকে বলা হইয়াছে, ‘এতাবান অন্ত বহিমা অভো জ্যায়াংচ পুরুষ’—ব. ১০, ২০.] এবং তাঁহার ‘মরমী সংকেত’ (Mystic message) প্রভৃতির ছায়া বেদে ও উপনিষদেও আছে। তিনি একথাও বলিয়াছেন

যে, এই সকল ভাব আবেগের সমাজের ভাব : ‘অনেক পরে বেয়ের শেখভাগে ও উপনিষদে এইসব মতবাক্যও ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকৃত হইল। বেখিলায়, সত্যই তো, সেখানেও বাগ-বজের উপরে ক্রমশই নানা ভাবের ‘সরসী’ মতবাদ আসিয়া যেন বীরে বীরে দেখা দিতেছে।’ [বাংলার বাউল—কিত্তিমোহন সেন]

বাংলাদেশেও ‘সরসী’ মতবাদ প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া ও মাধবপন্থ যোগীদের ধর্মমতের সহিত বাউলিয়া মতের সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের গানগুলিকেও বাউল গানের সহিত বিনিময় করা চলে। চৈতন্যযুগে যে এদেশে ‘বাউল’ সম্প্রদায় ছিল ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থে [অঙ্ক্য. ১২ পরিচ্ছেদ] তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে সহজিয়া বৈষ্ণব ও সাঁই-ককিরদের মিশ্রণে ও পোষকতার ইচ্ছা নতুন প্রেরণায় জাগ্রত হয়। জনশ্রুতি এই যে, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোদামারী নিত্যানন্দের আদেশে মাধব বিবির নিকট এই মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধব বিবির শিক্ষায় দেহ-সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ‘কায়ান্তরা ভজে যেই সেই সুপ্রতিভ’। উহাতে হিন্দু-মুসলমানী ভাবের মিশ্রণও লক্ষ্যীয়।^১

বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান-মিশ্র ভাব বাউল সম্প্রদায়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,

কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।

মিল জুগে কর সাঁইজীকা কার ॥^২

মুসলমান-বিজয়ের পর হইতেই এদেশে পীর-ককিরদের আবির্ভাব হইতে থাকে। তাঁহাদের কথ্যতা ছিল অলৌকিক এবং অনেকেই ছিলেন স্নাকীমতালম্বী। তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রেম ও যোগসিদ্ধির সহিত এদেশের যোগপন্থদের সাদৃশ্য থাকায় অতি সহজেই তাঁহাদের মিশ্রণ সম্ভব হয়। গোঁথপীর, সত্যপীর, মানিকপীর এই মিশ্রণের ফল। এই মিশ্রণ পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় চৈতন্য পরবর্তী যুগে। একদিকে শাহ্‌জালাল শাহ্‌মুলতান প্রভৃতি ‘অলী’দের [< আউলিয়া = ভক্ত] প্রভাব, অপরদিকে কুতবন, দৌলতলাহী, আলাওল, আলারাজা ও সৈয়দহুসতান প্রভৃতি স্নাকী মতাবলম্বী কবিদের হিন্দুভাব এবং সহজিয়া বৈষ্ণবগণের ককিরী-সাধন। ইহার ফলেই হিন্দু-মুসলমান মিশ্র ‘বাউল’ সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হইবার সুযোগ লাভ করে।

কিন্তু বাউল সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হইলেও, উহার ভাব শিক্ষিত

১। আশু সখী বিবি আমি স্ত্রীরাধা মোর নাম।

স্বকা যদিহা হয় ব্রহ্মকৃমি ধাম ॥ [বীরভদ্রের শিক্ষা—মূলকড়চা]

২। জটন্য ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ (২য় ভাগ)—অক্ষয়কুমার দত্ত।

উচ্চকোটির হিন্দুকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। ককিরী সাধন বা বাউল সাধনা প্রধানতঃ কৰ্ত্তাভজা, ভাড়া প্রভৃতি সহজিয়া বৈক্য এবং সাই-দরবেশ জাতীয় মুল্লহান ককিরদের পৃষ্ঠপোষকতার সমাজের নিরকোটিতে আশ্রয় করিয়াই প্রচলিত ছিল। লোকে তাঁহাদের গান শুনিতে, সহজ কথায় সহজ প্রাণের স্বরও হয়তো মর্ম্ম স্পর্শ করিত—তথাপি উচ্চবর্ণের সমাজে তাঁহারা ছিলেন অপাংক্তেয়। অবশ্য পণ্ডিতবৃত্ত হইবার আগ্রহও বাউলদের ছিল না। সমাজের নিয়ন্ত্রণেই তাঁহারা আনাগোনা করিতেন; সমাজের বাহিরে নির্জন নদীর তীরে, বিশাল বন-প্রান্তরের প্রবেশ-মুখে তাঁহাদের আশ্রয় বা দয়গা; সেইখানেই নিজস্বলীয় মনের মাহুদের সহিত তাঁহারা সন্নিবেশিত হইতেন। রাতভর চলিত নেশার মৌজ, আর কথার কঁাকে কঁাকে সাধনতত্ত্ব বা ক্রমের আকৃতি-প্রকাশক গান। গভীর নিশীথে সে গানের স্বরকার অন্তরতল হইতে দূর আকাশের পানে বাজা করিত—স্বরে স্বরে কীপিত দূর গগনের তারা, রাত্রির অঙ্ককার, আর নিম্নম বাতাস; কিন্তু লোকালয়ে বিশেষতঃ শিক্ষিত, সংস্কৃতি সম্পন্ন, অভিজাত মাহুদের দরবারে তাহা প্রবেশ পথ পাইত না। মুখ, নিরক্ষর বলিয়াও বটে, আর অদ্ভুত-আচারী বলিয়াও বটে, বাউলের গান বহুদিন পর্যন্ত এইভাবেই অনাদৃত ছিল।

উনবিংশ শতকে বেদিন দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িল, সেদিন অসমাজিক এই মরমিয়া সঙ্গীত অবহেলিত রহিল না। সেদিন অক্ষয়কুমার দত্ত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থে বাউলসম্প্রদায়ের কথা প্রকাশ করিলেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী ‘বাউলবিংশতি’ রচনা করিলেন, হরিনাথ মজুমদার ‘কাকাল’ বা ‘ফিকির চাঁদের ছায়া’ নামে বাউলগানে দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গ ভারতীর শ্রেষ্ঠ সেবক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাম। তিনি বাউল সম্প্রদায়কে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন, এবং বাউলগানের গূঢ় মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে বিশ্বের বিজ্ঞানসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রবীন্দ্রনাথের ‘মাহুদের ধর্ম্ম’ প্রবন্ধ গ্রন্থে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Hibbert Lectures ‘The Religion of man’ (1930) গ্রন্থে বাউল গানের প্রসঙ্গ বাউল-প্রীতির এক অভিনব স্বাক্ষর। এই প্রসঙ্গে আচার্য কিত্তিমোহন সেন শাস্ত্রীর উক্ত্যও প্রশংসনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘মীলাবক্তৃতায়’ (1949) তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল ‘বাংলার বাউল’।

বাউল গানগুলি নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্পর্কে একটি মতবাদ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, বাউলের সাধ্য হইতেছেন উপনিষদের ‘ব্রহ্ম’ এবং বাউলের সিদ্ধি জীব-ব্রহ্মের একত্ব বা ব্রহ্মসাহচর্য্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউলতত্ত্বের এই গূঢ়ভাব

প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে, বাউলের ‘মনের মাহুয’ উপনিষদের ‘অন্তরন্তর বদরমাস্ত্রা’, তিনি বলেন, “আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতার একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল।

কোথার পাব তারে

আমার মনের মাহুয বে রে ।

হারিয়ে দেই মাহুবে তার উদ্দেশে ।

দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে ॥

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু হৃদের যোগে এর অর্থ অস্পৃহ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়াছে, ‘তং বেত্তং পুরুষং বেদং বা বো বৃত্তাঃ পরিব্যথাঃ’—বাক্যে জানবার, সেই পুরুষকেই জানো’ নইলে যে মরণ-বেদনা। ‘অন্তরন্তর বদরমাস্ত্রা’ উপনিষদের এই বাণী একের মুখে যখন শুনলুম, আমার মনে বড় বিশ্বাস লেগেছিল।^১

‘Religion of Man’ গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ ‘The man of my heart’ কে উপনিষদের প্রতিপাদ্য ‘ব্রহ্মবন্ত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার উপায় যে ‘যোগ’—বাউলের বাহা সাধন—তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ‘The special mental attitude which India has in her religion is made clear by the word ‘yoga’ whose meaning is to effect union. Union has its significance not in the realm ‘to have,’ but in that ‘to be’; To gain truth is to admit its separateness, but to ‘be’ true is to become one with truth’^২—অর্থাৎ কবি স্বীকার করিতেছেন, মনের মাহুযের সহিত মিলিত হওয়া মানে, ‘সোহহম্’ হইয়া যাওয়া, ইহা যোগেরও লক্ষ্য, বাউলেরও লক্ষ্য। ডঃ শশিধ্বজ দাশগুপ্ত মহাশয়ও বাউলের সিদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অল্পরূপ উক্তি করিয়াছেন, ‘The Bauls also speak of love and union, but this love means the love between human personality and the Divine Beloved within and in this love man realises his union

১। মুহম্মদ হুম্মারউদ্দীন এর-এ কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত (১৯৪২ কঃ বিশ্ববিদ্যালয়) ‘হারামনি’ গ্রন্থের কৃত্রিম হইতে উদ্ধৃত।

২। Religion of man (Spiritual union)—Tagore.

with the Divine, or in other words he merges his personal existence in the Beloved that reside within this temple of the body'.

কিন্তু, বাউল সাধনার শেষ লক্ষ্য 'to become one with truth' [Tagore], কিংবা 'he merges his personal existence in the Beloved' [Dr. Dasgupta] কিনা, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বাংলার বাউল গানে এত বিচিত্র রকমের প্রতীক্ষা আছে যে, অনায়াসে একটি মতকে আর একটি মত দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাহাতে সাধা ও সাধনে সাক্ষ্য হোষ ঘটে। বাউলের 'মনের মাহুয'কে অনেক ক্ষেত্রেই উপনিষদের 'ব্রহ্মবৃত্ত', 'অন্তরতর আত্মা' বা 'সবজুতান্তরাত্মা' বলা হইয়াছে। দেহই আত্মাই বাউলের মনের মাহুয : বাউল বলেন 'আত্মা খোঁজ নিজ মোকামে।' উপনিষদের মতে এই আত্মাই 'ব্রহ্ম' ['অয়মাত্মা ব্রহ্ম'] : উপনিষদের উপদেশ, 'তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব'-তাঁহাকে জান ; তাঁহাকে জানিলে এই বোধ হইবে, 'যোহসাবসো পুরুষঃ সোহুহমস্মি' [ঈশ. ৩]—যিনি এই পুরুষ, আমিও সেই।

বাউল গানে এ ধরনের উক্তি প্রচুর আছে, 'আপনাকে যে ভেদেছে নিগূঢ়তম সেই পেয়েছে', কিংবা, 'আপনাকে আপনি যেজন জানে, আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে' [জালন সাই]। কিন্তু এই নিগূঢ়তম লাভ করিলে কি অবস্থা হয় বাউলগানে তাহার বর্ণনা অল্প। বাউলগানে 'মনের মাহুয' করুণ, তিনি কোথায় থাকেন, কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা যায়—তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে ; মনের মাহুযকে পাইবার নিমিত্ত আন্তরিক আবেগ-আকুলতা ও রম্যভঙ্গী ক্রন্দন আছে ; কিন্তু তাঁহার সহিত মিলিত হইলে কি অবস্থা হয়, সাধক তখন কি হইয়া যান, তাহার বর্ণনা একরূপ নাই বলিলেও হয়। বাউল বিরহের বর্ণনায় মুখর, মিলনের বর্ণনায় মুক। মিলনের বর্ণনা বাগ্য আছে, তাহাও অতিশয় রহস্যময় ;

স্বর্গের সুসঙ্গে কমল করুণেতে যুগল হয়,

সে প্রেম সাযোজ্যে কি জানা যায় ? [জালন]

আর একটি গানে ['হল আত্মা-নগী যুগল মিলন' হারামণি ১৭ নং] আরও একটু স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে : সেখানে মহামিলনে 'মনের উল্লাসে প্রেমের বেশে প্রেমের মিশে গেল দুইজন', কিন্তু 'রইল চিত্তের ধ্বংস উভয়ে আত্মসমর্পণ।'—এখানে প্রেমে মিশামিশি আছে, তরলতা আছে—কিন্তু ঠিক অবৈতব্যোধের কথা নাই। 'রইল চিত্ত ভিন্ন' বাক্যাংশে বৈতের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমাদের মনে হয়, বাউলের

প্রেম-যোগ-সাধনার উপনিষদের ব্রহ্ম-সাবুজের কথা নাই; মিলনে যে অবয়বোষ ঘরে, তাহাও লয়স্কৃতি নয়। প্রেমরসে তন্ময় হইয়া ল্পন, আলাপন ও আনন্দ-রসাবাহন করাই বাউলের কার্য। ইহা উপনিষদের 'সোহচরমি' অবস্থা নহে। তাহা ছাড়া, উপনিষদের জ্ঞান-সাধনাও বাউলে অল্পপরিচিত। উপনিষদের রসধন প্রিয়তম ব্রহ্মকে জানিবার উপায় জ্ঞান; বাউলের প্রেমরস 'মনের মাহব'কে পাইবার উপায় প্রেম। বাউলের সাধন প্রেম-যোগ।

বস্তুত: রস-সন্তোষের ক্ষেত্রে 'দুয়ের'ই স্বীকৃতি, একাকী রস-সন্তোষ হয় না। বাউলের সাধনা এই রস-সন্তোষের সাধনা। কাজেই বাউলগানে মন ও মনের মাহব—এই দুইকে স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য রস-সন্তোষের অতি নিবিড় স্তরে মন বধন একান্তই রসে মগ্ন, তখন অনির্বচনীয় এক আনন্দ-মুগ্ধিত অবস্থা। সে অবস্থার আনন্দহারা ভাব। কে ভোগ্য, কে ভোক্তা এ জ্ঞানও থাকে না। থাকে শুধু আনন্দের অকৃত্রিম। বাউল গানে কোন কোন স্থলে জটিল রূপক ও রহস্যময় ভাষায় এই অনির্বচনীয় ভাবতন্ময়তার যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা বৈতাঁষেতের এক আশ্চর্য সন্মিলন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, 'দুই না হইলে প্রেম হয় না। আবার দুই মিলিয়া এক না হইলেও প্রেম হয় না। কাজেই দুই বধন এক হয়, তখনই প্রেমের উদয়। বাউলেরা বলেন, 'নিত্য ষেতে নিত্য এক্য প্রেম তার নাই।' [বাংলার বাউল]। বাউল সাধনার ইহাই মূলতত্ত্ব। বাউল প্রেমপন্থ বোণী।

সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, বাউলের তথ্যে স্বকীয়ত ও বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার প্রভাব ওক্ততর। এই দুইটি প্রেম-সাধনার ধারাকে বিশ্লেষণ করিলেও বাউলের প্রাপ্তি যে অতি সাংখ্যিক ষেতবোধের প্রাপ্ত, তাহা প্রমাণিত হয়।

(i) স্বকীয় মত্ত ও পন্থ : স্বকীয় মত্তেও নানা মত্তবাদের মিশ্রণ আছে। স্বকীয়েরও নানা শ্রেণী—চিশ্টি, হরামধী, কাছরী, মাহারী প্রভৃতি। প্রাচীন স্বকীয়ত হইতে আধুনিক স্বকীয় মত্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য বাহাই থাকুক, স্বকীয় সাধা বস্তু প্রেমরসের আলাহ। ইসলামের তোহিদ—আলাহর একত্ব [‘লায়েলাহা ইলাল্লাহ’] স্বকীয়মত্তেও স্বীকৃত। তোহিদ বলে, খোদা এক এবং একমাত্র উপাস্ত: খোদার বোমর নাই, তিনি ‘লাশরীক’—তিনি নিরাকার বিশ্বব্রহ্ম। খোদার ‘নূর’ বা জ্যোতি হইতেই সৃষ্টির পয়লা। এই নূরের এক প্রকাশ ‘নবী বা পয়গম্বর’ তাহারাই ঈবরের নির্বাচিত প্রেরিত পুরুষ। নবী বা পয়গম্বর কখনও ঈবর নহেন, ঈবরের সহিত তাহাদের হাল বা হোস্ত সম্পর্ক। হবরত মওদ্ব (দ:) শেষ নবী, তিনিও খোদা-হোস্ত। মাহবও ঈবরের স্বটি। ‘আবব’ জগতের প্রথম মাহব। মাহবেরও

আল্লাহর ঈশ্বর। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ইসলামের 'তৌহিদ' বা আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস এবং তব্বুসারে প্রেরণের আল্লাহর 'বেকের' অর্থাৎ সরণ, 'কেকের' অর্থাৎ 'মনন', 'মুরাকিব' অর্থাৎ ধ্যান, এবং 'মুশাহেদা' অর্থাৎ দর্শন—সুকীর সাধন। সুকীর সরণ-মনন-ধ্যান ও দর্শনের সহিত বেদান্তের সাধনের যোগ অতি অল্প ; বরং উহার সহিত যোগ, বিশেষতঃ তাত্ত্বিক যোগ এবং সহজ সাধনার সাদৃশ্য আছে। কারণ, দ্বিবিদ্য বলে আল্লাহর চিরন্তন অসুগ্রহ ও নৈকট্যলাভই হইল 'সুকীতরিকা' বা সুকী পন্থার উদ্দেশ্য ও নীতি। সুকীর জীবনব্যাপী সাধনা প্রেরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও তাঁহার সহিত মিলন। সুকীগণ বিশ্বাস করেন, আল্লাহ এই বেহের মধ্যেই আছেন, যেহেতু জানিলে তাঁহাকে জানা যায়, পাওয়াও যায়। সুকীদের ভিতর একটি অতি প্রচলিত বাণী আছে—'হান্ আরাকা নাকছাহ, ফাকাহ আরাকা যাক্বাহ'—যে খুদকে জানে, সেই বোধাকে জানে। তাই সুকীদের তত্ত্বাসক্তান বেহের মধ্যে, তাঁহাদের যাত্রা মানব-কারার অহর-অনন্তের পানে : For the Sufis spiritual life became a journey (safar) along the road (Tariqua, Suluk) which led to the goal or union with God. The journey has many stages and each stage (Maquam) has its corresponding state (Hal)—achievement of certain virtues. For the traveller along the road there is a definite course of discipline which the adepts know. This knowledge (Marifat) however, is different from the ordinary knowledge (ilim), for this is the wisdom of the heart (ilim UI Qutub) as the other one is the product of intellectual processes, and no one can acquire it without the special signs (Fawaid) of the grace of God (Faiz). The object of the knowledge is the attainment of cosmic consciousness, beatific vision, absorption in ecstatic union with the Truth ১

এখানে যে মিলনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে আছে অতি স্বল্প দ্বিবিদ্যদর্শন ও মিলন-জনিত অতি উল্লাসকর মগ্নতার কথা। ইসলামে ও সুকী মতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক ব্যাপ-ব্যাপক সম্পর্ক। 'কুলে সাইন মহিন'—ঈশ্বর সমস্ত বস্তুকে ঘেঁষে করিয়া আছেন. ইহা সূর্য্য শরিকের একটি মহাবাক্য। সুকীর আত্মদর্শন এই

১। Growth of Islamic thought in India—Dr. Tarachand : History of Philosophy Eastern & Western]

ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্পর্কের অববোধ; এই জ্ঞান রহস্যময় বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান। ঈশ্বর 'সামরীক'—তাঁহার আশীর্বাদ নাই—এ জ্ঞান অবৈজ্ঞানিক জ্ঞান; কিন্তু মাহুদ, নবী, বিশ্ব তাঁহার সৃষ্টি এবং তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরের প্রেমের সম্পর্ক—এইখানেই দুয়ের 'সীকৃতি,' প্রেমের বোণ। বাউল গানেও এই প্রেমের বোণ।

(ii) বৈকল্যসহজিয়া : বৈকল্য সহজিয়াদের মধ্যেও দুয়ের সীকৃতি ও দেহতত্ত্বের প্রাধান্য। সহজিয়া ধ্বতে পরর 'এক' দুয়ের যুগল। সেখানেও মিলনে এক হইয়া যাওয়া নহে, রসাসাধনের কথা। যুগল প্রেমের পরমানন্দ স্বাদ লাভ করাই সহজিয়া ধ্বতে পাখির যুগল-সাধনার শেষ লক্ষ্য। শেষ ধ্বরেও যুগলবোধ লুপ্ত হইয়া যায় না। কারণ, দুয়ের আশ্রয় (তাহা হৃদয়তাহা অস্তিত্ব হইতে পারে) না থাকিলে রসের আশ্বাদন হয় না। সহজিয়ারা বলেন,

মনের রতন বাহির না কর

যতন করিয়া রাখ।

বিরল পাইলে কপাট খুলিয়ে

নয়ান ডরিয়া দেখ ॥ [চণ্ডীদাস]

বাউলের প্রেম-সাধনায় এই যুগলের প্রভাব কি ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সাধনার কথা লইয়া কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই। বাউলগণ পুঁথি ও পাণ্ডিত্যের বিরোধী। উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতসম্পন্ন মুসলমান সূফী কবিরা প্রেমপন্থ বোঙ্গী সম্পর্কে কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাউলদের মত ও পন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। সৈয়দ হুলতানের 'জ্ঞানচৌতিশা', আলীরাজার 'জ্ঞানসাগর' ও আলাওলের কিছু রচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাউলের মনের কথা ছড়াইয়া আছে তাঁহাদের মুখের গানে। কিন্তু এই সকল গান বহুদিন পূর্বকাল লোকের মুখেই ছিল। লোকের মুখে মুখে তাহা বিকৃত হইয়াছে, অনেক গান লুপ্তও হইয়া গিয়াছে। বাউল গানের সংগ্রহপ্রয়াস জাগ্রত হইয়াছে কবি রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য কিশোরীমোহন গেন কিছু কিছু বাউল গান প্রকাশ করিয়াছেন। বাউল গান সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের উদ্যমও প্রশংসনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'হারামাণ' গ্রন্থখানি তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি।

এই সকল উপাদান হইতে বাউলের ধর্ম ও সাধনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু এ ধারণা গঠনে একটু বিপদও আছে। কারণ সংগৃহীত বাউল গানে মুসলমানী পরিভাষা ও প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, মুদ্রণ-

প্রবাহও সায্যত নয়। অনেকস্থলে অর্থভেদ করাই করিম। তাহা ছাড়া বাউলের বহু বিচিহ্নিত পরিধের স্বতন্ত্র স্বত বাউলের ধর্ম নানা ধর্মের ছাপ পড়িয়াছে। উপনিষৎ, বেদান্ত, বোপ, তন্ত্র, বৌদ্ধ শৃঙ্গবাহ, বৈক্য প্রেমধর্ম, লক্ষ্যধর্ম, হকীরত প্রভৃতির প্রতিফলি বাউল গানে তুল'ভ নয়। তবে সব কিছু মিলাইয়া এইটুকু মাত্র বলা চলে যে, বাউলধর্ম মাহুযকেত্রিক প্রেমের ধর্ম, উহার সাধন প্রেম ও রহস্যময় যোগের পথে, উহার সিদ্ধি পরমানন্দে।

বাউলের সাধ্যবস্ত 'মনের মাহুয': 'সুকুল জীবের ঘটে আছে মাহুয বস্ত একজন' [হারামনি, ৪নং গান]। এই মাহুয বাউলের 'কামধেহু', 'কল্লতক'; ইনি 'রূপের জ্যোতি', 'রূপের ফুল'—ইনি 'প্রেমরতন', 'পরশমণি', 'অমূল্যধন'। সন্তানদ্বয়ভেদে বাউলগণ এই মাহুযকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মূলমানে ককির-দরবেশের দৃষ্টিতে ইনি 'লাশরিক আল্লাহ', ইনিই 'নূর' (পরম জ্যোতি); বৈক্য বাউলের নিকট ইনি পরপ্রেমিক কৃষ্ণ, বা সহজ মাহুয—কাহারও নিকট তিনি নদীয়া-নাগর গৌরাদ।

বাউল এই মনের মাহুযের অন্ত পাগল। তিনি কাছেই আছেন, আছেন এই দেহের মধ্যেই—কিন্তু 'অধরা': 'আছে সে গুণভাবে ব্যক্ত হয়ে'। তিনি সহজলভ্য নহেন বলিয়াই বাউলের সমগ্র জীবনটাই তাঁহার অহুসঙ্কান। চিরজীবন ধরিয়া বাউল বাজী বা পথিক। তাঁহার বিরহ-দুঃখও নিঃসীম। বাউলগান দুঃখ-বেদনার ডগা, ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে হৃদয়ের কাগা, অস্তর উজ্জ্বল। কিন্তু বাউল এই দুঃখকে বরণীয় বলিয়াই মনে করেন, তাঁহারা বলেন,

সুখ-মর্ম দুঃখ বিনে না জানে রাজন।

বদ্যাজনে নাহি জানে প্রসব-বেদন ॥ [আলাওল]

তাই 'ককিরী হালে' দুঃখের মূল্য অসীম। ভাঙ্গা ঘর, ছিন্নবস্ত তাঁহাদের আদরণীয়। তাঁহারা বলেন, 'দুঃখের অন্তরে সুখ বিধি রাখিয়াছে' [জান-সাগর]^১। এইজন্যই বাউলের প্রতিটি কথার আক্ষেপ, স্বরে উদাসকরা বৈরাগ্য। না পাওয়ার বেদনাই সর্বাধিক। বাউলের দুঃখ-ব্রতে প্রেমের আসন অতি উচ্চ, কারণ তাঁহারা মনে করেন, 'প্রেম দুঃখপন'। প্রেম তো সহজ নয়, শুধু সুখের নয়—তাহা বিষ, তাহাতে বন্ধি-দহন। বাউলের তন-মন এই অগ্নি-দহনে প্রোজ্জল।

বাউলের প্রেমতত্ত্ব এক অপূর্ব সামগ্রী। বাউলের মনের মাহুয পরম প্রেমিক। বাউলগণ বিশ্বাস করেন, প্রেমরসে ভূবিয়াই প্রেমিক ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব জুড়িয়া প্রেমের আসন। বিশ্বের অগুণ্ডে-পরমাগুণ্ডে প্রেমের বন্ধন:

১। জানসাগর—আলীরাজা [আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত]

প্রেমের আগনে জুড়ি আছে জিকুবন।

প্রেমরসে বন্ধন আলোর লিহাসন ॥ [জানসাগর]

নৃষ্টির মূল বৃক্ষ প্রেম। প্রেমের জীবের জন্ম, প্রেম-বিহনে মৃত্যু : ‘প্রেমমূলে জগজ্জের জীবন-মরণ’। আলোরাজা বলেন, ‘প্রেম বিম্ব জন্ম নাই ভাব ক্রিয়া রস’, আলোকল বলেন, ‘জিকুবনে বসে দেখ প্রেম হচ্ছে বশ।’ যে ফুলে প্রেমরূপ মধু থাকে, সেই ফুলেই মনেরমাত্রবরূপ স্রমর আলিঙ্গা উড়িচা বসে। তাই বাউল বলেন, ‘অহুরাগের ঘরে আলারে গতি সাধনে মতি পাওয়া যায়’ [হারামণি]। বাউলমতে সকল রসের মূল শিরীষ-ভজন’।

প্রেমকে স্বীকার করিয়া লইয়া বাউল ‘মুগল’কে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুগল ছাড়া প্রেম হয় না। রূপ ছাড়া রতির প্রকাশ ঘটে না। নৃষ্টিই মুগলের। ‘জানসাগর’ গায়ে এই মুগলের সুদীর্ঘ প্রশস্তি রহিয়াছে। ঈশ্বর প্রথমে একা ছিলেন, প্রেম জানাইবার জন্য তিনি দুই হইলেন, কারণ, ‘একাএকি প্রেম না হএ কহাচন’। নৃষ্টির প্রথম মুগল ‘ভাবক আর ভাবিনী’ : লামরিক আল্লাহ ভাবক, আর ‘খোদা-বোস্ত’ ভাবিনী। এই মুগলকে কেন্দ্র করিয়াই নৃষ্টিতে ভক্তি, ভাব ও প্রেমের প্রকাশ। মুগল ধরিয়া মুগল প্রেমের মধ্যেই বিবলীলা চলিতেছে : হর-গৌরী, রাধাকৃষ্ণ, লীতা-রাব, লক্ষ্মী-ত্রক্ষা, রোহিণী-চন্দ্র, ছায়া-সূর্য, হাওয়া-আদম, আয়েশা-মহম্মদ, জোলেখা-ইছুপ সকলেই মুগল। প্রকৃতি জগতেও মুগলে মিলিয়াই পূর্ণতা—বহি-বাহু, মাটি জল, স্বর্ণ-মৃত্যু হয়ে মিলিয়া মুগল। এই মুগলের প্রেমে চন্দ্র বন্দী আকাশে, জল বন্দী সাগরে, মীন বন্দী তলে, স্রমর বন্দী কমলে : সর্বত্র মুগল, সর্বত্র যোগ। তত্ত্বর সহিত যুক্ত মন, মনের সহিত যুক্ত পবন। বাউল বলেন, ‘নাহিক সিন্ধির পথ এই মুগ বিনে’।^১

মুগলত্ব হইতেই বাউলের যোগভঙ্গ। মুগলে মুগল-সাধন করেন বলিয়াই বাউলের আর এক নাম ‘মুগী’ বা ‘যোগী’,

এ মুগল হৈতে নাম ধরে যোগিকুল।

প্রেমপথ যোগীর প্রধান ভঙ্গমূল ॥ [জানসাগর]

বাউলের সাধনায় স্পষ্টত : দুইটি দিক রহিয়াছে—(১) প্রেম, ও (২) যোগ : প্রথম সাধন-পীঠ প্রেম, তাহার পর যোগ। দুইটি সাধনই বেহকে কেন্দ্র করিয়া। প্রেম বা যোগ ‘কই’কে লইয়া। এই যোগ হর বেহে। বেহই মুগল-যোগের স্থান। বেহেই রূপ,

১। ঠিক এই উক্তিই প্রতিফলিত পাওয়া যায় রাধাতন্ত্রে,

ল-যোগ-কৃক বড়েন লক্ষ্য সহ তপোধন।

যোগ বিনা হুত প্রেত বিদ্যাসিন্ধি আরতে ॥ [রাধাতন্ত্র, ২য়শটল]

দেহেই 'বৃক্ষ'। কথাটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। দেহ হ'ল ও মূলভেদে দুই প্রকার : হৃদয়দেহ শূন্যকার, মূলভেদে রূপাগার। হৃদয় শূন্য-দেহ অব্যক্ত, মূল রূপ-দেহ ব্যক্ত। কিন্তু হৃদয় হইতেই মূলের প্রকাশ—'শূন্য সিদ্ধ হৈতে ব্যক্ত রূপের লাগন'; আবার এই রূপ-কারার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হৃদয় কায়া। আদি 'নূর' হইতে 'রূপ হইল নরের আকার', আবার নর-দেহেই নূরের প্রকাশ। বাউল ধর্ম তাই বেহের প্রোক্ত। দেহ বৃত্তিকার ভাও বটে, কিন্তু অমূল্য :

বৃত্তিকার ভাও বটে অমূল্য মতন।

বৃত্তিকার ভাও মূলে আছে নিরঞ্জন ॥ [জানসাগর]

মানব ও মানব-দেহ তাই বাউলের প্রিয়। বাউল মানব প্রেমিক। তাঁহার বাক্যে—

আপনার ভাও ছেড়ে

কেন খুঁজে বেড়াও জগৎজুড়ে ?

আপনার ভাও খোঁজ রূপরূপে দেহ হাজ

বাতে প্রেমের অঙ্কুর হয়। [হারামশি ৭৫ নং]

তাঁহার জানেন, যেমন সুফীরা জানেন, 'ইশ্কে মজাজী (মানবীয় প্রেম) শেষে ইশ্কে হকীকী (ঐশী প্রেম) হয়' [মনসুর উদ্দীন]।

প্রেমিক বাউলের বাহা তাই দেহ-রূপকে কেন্দ্র করিয়া। মূল রূপকে আশ্রয় করিয়াই আছে অরূপের রূপের স্বলক। রূপের পদ্যেই অরূপের প্রেম-মধু। 'দান রূপে এই প্রেমের পরশ লাগল সে ত হল বাউল। রূপের উজ্জ্বল প্রেমিককে হাজারবার ছুরিকাঘাতে কতল করল। একবার বার চোখে লাগল রূপের বাধুরী, সে হল দিগ্‌দান। তাকে ভুলে থাকা কি সম্ভব ? বিশ্বভূবন তার রূপের জ্যোতিতে উজ্জ্বল :

সেই কি পাসরিতে পারে,

সেই কি ঘরে রইতে পারে জীবন থাকিতে ?

লেগে গেছে রূপ বার নমনে ।'²

প্রেম সাধনায় দেহই যেমন আশ্রয়, বোগসাধনাতেও তেমনই দেহই প্রধান আশ্রয়। বোগের ব্যাপারে বাউলের সহিত তত্ত্বের বিচিত্র বোগ। তান্ত্রিকের মত বাউলও বলেন, 'আন্ত অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।' যে-কোন বোগপর সাধকে এই মত—কি তান্ত্রিক, কি বৌদ্ধ সহজিয়া, কি সুফী, কি বৈক্যব সহজিয়া। দেহ-বটিক (মূল্যধার, আধিষ্ঠান, বসিপুর, অনাহত, বিদ্যুৎ ও আত্মা) এবং সহস্রাব কক্ষ,

১। 'জানেন মজাজী'—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মূঃ-এ।

ভিন্ন নাকী (ইড়া, পিঙ্গলা, হুমুয়া) এবং বিবিধ বাহু (প্রাণ-অপানাদি) তত্ত্বের বিবরণ। স্বকীর্ণেরও দেহের মধ্যে 'ছয় লতিকা' বা ছয়টি আলোক-কেন্দ্রের কল্পনা আছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, উহা তত্ত্ব হইতেই গৃহীত। বাউলগণ নিরক্ষর, মুখ হইলেও এই সকল দেহতত্ত্বের হৃদয় জটিল বিবরণ তাঁহাদেরও অজানা নয়। অবশ্য হৃদয়ভাবে বিলাইয়া দেখিলে চক্রেয় নাম ও স্থান অনেক ক্ষেত্রেই মিলে না, কিন্তু যোগ-পদ্ধতি যে এক, প্রক্রিয়া যে এক—তাহা বৃত্তিতে অস্বিধা হয় না। শাক্তের ব্যক্তিগণ এক প্রকার রূপ ও রূপকে বাহ্য বলিয়াছেন, নিরক্ষর জনগণও তাহাই বলিয়াছেন লোকজগতের রূপ ও রূপকের মাধ্যমে। তাঁহাদের সহজ ভাষা, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাও সহজ।

কায়-সাধনই বাউলের মুখ্যসাধন। এই সাধনে তত্ত্বের প্রভাব গুরুতর।

(i) তত্ত্ব বলা হইয়াছে, বস্তুকণ বাহু বা মন ইড়া-পিঙ্গলার বিচরণ করে, ততকণ মন অধির : হুমুয়ামার্গে বাহুকে চালিত করিয়া মনকে স্থির করিতে পারিলে, সত্য লভ্য হয়। বাউলগণও বলেন,

একম হাওয়ার চলে একম বুরছে কলে

আর একম সত্য হলে অনায়াসে মিলে। [হারামনি, ৬৮]

(ii) বাহুর ছোয়ার ডাটা বৃত্তিয়া মনকে হুমুয়া বস্তুর উর্দ্ধপথে চালনা করিতে হয়। ভাবিক 'হুতততি' বা 'কুণ্ডলিনী যোগ' এই প্রক্রিয়া লইয়া। বাউলেরা ইহাকে বলেন, 'পলটুযোগ' বা 'উল্টাসাধন'। বাউলমতে উল্টাসাধনের নানা অর্থ। যোগীর ভোগ, আচার, আচরণ—সবই উল্টা। যোগীরাও ভোগ করেন, সে ভোগ সাধারণ বাস্তবের বস্তু নয়। তাঁহারা দিনে ঘুমান, রাতে আগেন—তাঁহাদের শিরীতি 'পল্টা শিরীতি' (অর্থাৎ স্বকীয়ার সঙ্গে নয়, পরকীয়ার সঙ্গে)—তাঁহাদের 'কাকড়-মাকড়' যোগও রহস্যময়, গুহ ও জটিল। বাউল সাধনার সর্বত্র এই 'উল্টা'র প্রাধান্য। তাঁহারা বেহে যে গাছের কল্পনা করেন, তাহারও 'উল্টা গঠন' :

উলট গাছের ডাল ছাড়া পাতা,

আসমানে তার গাছের গোড়া জমিনে তার ডাল—

রে কেনা জমিনে তার ডাল।

গাছের মূলে গেলে রক্ত মিলে

অখণ্ড গোলকধার। [হারামনি, ২১৭]

'উল্টা সাধনে'রই আর এক রূপক 'উজান বাওয়া',—

উজ্জ্বল হতে নৌকা দিতে

কত লাধু বলে ডাবছেন তাই,

ধার চিলে ধার ধরতে পারলে,

তার নৌকা কি যারা যায় ? [হারামণি. ২৪১]

(iii) হুমুয়াবার্গে এই উল্টা পথেই দেহহ চক্র বা পদ্ম। শাক্তের মহাপ্রতি
এই পথে চক্রে চক্রে বিচরণ করেন। বাউলের ‘মনের মাহুব’ও পদ্মে পদ্মে লকরণশীল।
বাউল কখন বলেন,

আমার মনের মাহুব খেলছে মণিপুরে হায়রে।

ও ধারার সনে আছে মাহুব ধরো সে ধারায় রে। [হারামণি. ২৪৩]

আবার কখনও বলেন,

তুই দলে লুকিয়ে রোল কে রে,

লুকিয়ে রোল কে রে ! [হারামণি, ২৭৪]

(iv) তরে দেহের ভিতর হুমুয়া নাদ-বিন্দু ধারণার উপদেশ আছে। হয় জ্যোতির
আকারে, না হয় ধ্বনির আকারে দেহমধ্যে মহাপ্রতি বিরাজ করেন। বাউল গানে
বহুস্থলে এই রূপ ও নাদের প্রসঙ্গ। রূপকে তাঁহারা বলেন ‘ফুল’। দেহের রূপ-
নগরে বা রূপ-সরোবরে ফুলের আকারে রূপের ছটা :

একটি ফুল ফুটেছে কদম গাছে

যমুনা আলো করে ।...

সেই ফুল দিনে দেখা যায় জগৎ লুকার

আর দেখা যায় হুমুয়াবার্গে । [হারামণি. ২২]

হুমুয়াগণও মনে করেন, নূর (=জ্যোতি) হইতে সৃষ্টির পরদা। মাহুবের দেহমধ্যে
এই নূরের খেলা। দেহের রূপ-নগরে এই নূর বা জ্যোতি, দেহের রূপ-সরোবরেও ফুলরূপে
এই জ্যোতি, দেহ-কুণ্ডে উল্টা গাছের কুম্ভ রূপেও এই জ্যোতি। সে জ্যোতি—

‘অঁধার পসর করে শরীর মাঝার ॥’ [জাননাগর]

বাউল এই জ্যোতির ধ্যানে তন্ময়। চরম প্রাপ্তিতে এই জ্যোতির তরঙ্গে মগ্নতা।

(v) তন্ময়ের নাদতত্ত্ব বাউলের ভিতর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শক্তি
নাদরূপিনী। নাদের চারিটি অবস্থা—পর্য, পঞ্চমী, মধ্যমা ও বৈখরী। বৈখরী ফুল নাদ
—উহা মাহুবের কণ্ঠোদগীর্ণ ধ্বনি। এই ফুল ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া হুম বা পরানাদকে
ধারণা করা যায়। বাউলগণ নিজেদের গান সম্পর্কে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে
তন্ময়ের এই নাদ-ধারণার প্রভাব অতি গভীর। বাউল বলেন, ‘মুখ হুমর জান প্রাণের

আহার' [তোহফা : আলাওল]। মনের খাতি গীতধ্বনি, গান মনের আনন্দ ও তৃপ্তি। গানই বাউলের সর্বস্ব। গানই বাউলের জিজ্ঞাসা, গানই বাউলের তর্ক, উদ্ভাস, বীহাংনা। সুখেও গান, দুঃখেও গান। গান মহামন্ত্র—'মহামন্ত্র গান বহুতত্ত্ব ব্রহ্মনাথ'। বাউল বলেন, 'তনের অঙ্করে মন, মনের অঙ্করে জ্যোতি, জ্যোতির অঙ্করে ধনি। সে ধনির নাম 'অনাহত'। কমলকলির মত যে দিল (হৃদয়), তাহার মূলে এই ধনি উঠে; তাহাতে কখনও নৃপরের শিকন, কখনও বা মুরলীরব। ইহা 'কতের স্বকার'। গান 'কত', গান পরম সত্য। দেহের চক্রে'চক্রে এই কতের স্বকার উঠিতেছে :

চক্রমূলে বাঁশী কুশারে বসি স্বত।

তবে চক্রমূলে বাজে সব বহুগীত। [জানসাগর]

কবরত কমলকলির অঙ্করে এই যে ধনি, কলি বিকশিত না হইলে সে ধনি আগে না। তাই আগে চাই কমল-কলির বিকাশ, মজিত কমল দলের প্রস্ফুটন। পদ্ম মল মেলিলেই সুগন্ধি মাধুরী ছড়ায়, অলি গুল্লিরিয়া উঠে। যিনি সত্যের ধ্যানে লিখ চইয়াছেন, তাহার অঙ্করেই ধনির তাগরণ, তাহার কর্ণেই গান।

জান-ধ্যান শুধু যে করে তবমূলে।

অবশ্য নিঃসরে গীত হৃদয়-কমলে ॥ [জানসাগর]

ধ্যানে বেছে ধনির কাম্পন অনুভূত হয়। তখন ধনির প্রকাশে কাঁপে তনু, কাঁপে মন, কাঁপে কণ্ঠ। হুরে হুরে প্রকাশিত বাউল গান দেহের কমল-কলিতে উজ্জ্বল নাথের বহিঃপ্রকাশ। নাদ-গীত সম্পর্কে বাউলের এই যে তত্ত্ব, ইহা তহেরই তত্ত্ব। তত্ত্ব বলে, কুলকুণ্ডলিনী মন্ত্রালির স্তায় যে মধুর কুজন করেন, তাহাই কাব্য-গীতির মূল।—

কুলকুণ্ডলিনী মধুর মন্ত্রালিস্ফুটম্।

বাস : কোমল কাব্যবন্ধ রচনা ভেদাতিভেদক্রমে ॥ [ষট্চক্রনিরূপণ]

গান সত্যের স্বতন্ত্রতা বাণী। ইহাই বাউলগানের মূলতত্ত্ব। সহজ ও সহজ জীবনের ইহা গভীর সত্যের স্রোতক। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজা-সহজ সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আবারের নাই। আবার তো ইহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।'*

(৫) বাউলের গুরুবাদেরও তত্ত্বের প্রভাব স্থাপিত। গুরু সাধন সংক্রান্ত বাবতীয়

১। আচার্য ক্রিষ্ণমোহন সেনের 'বাংলার বাউল' হইতে উদ্ধৃত।

বিবর গুরুমুখী। এইকল্প রহস্তময় সাধনায় গুরু নিত্যসদা। বাউলগণ মনে করেন,
যেহে 'অবরা'কে গুরুই ধরিয়া দিতে পারেন,

গুরুপদে নিষ্ঠা মন বার হবে

অমূল্যধন সেই সে হাতে পাবে। [লালিন]

গুরু সাধারণ মানুষ নহন, তিনি মাতৃস্বরূপে স্বয়ং নিরঞ্জন। গুরু যে 'ময়ের মস্তুরী'
'তয়ের তস্তুরী', 'যয়ের যস্তুরী', গুরুরূপে তিনিই নিরূপ-মাহুয :

গুরুরূপে যে দিয়েছে নয়ন,

সে জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে

গুরুরূপে সেই নিরাজন। [হারামণি. ২৩]

তাই বাউলের উপদেশ,

আগে মৃশিদ ধর জেনে শুনে।

রূপের জ্যোতি আলিয়ে বাতি

গুরুর রূপ ধিয়ানে ॥ [হারামণি. ৩]

বাউলধর্মে গুরু-শিষ্য একতন্ একমন। শিষ্যের অঙ্করে গুরুরূপের বলক। ভালবাসা বা,
সবই গুরু। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কও 'মতি রহস্তময়। কারণ, গুরু যে প্রেমেরও গুরু,
রসের সঙ্গী। তিনি মৃতাভাবের মাহুয। বাউল ধর্মে যে যুগলের ও যুগলভক্তদের এত
প্রশংসা, যাহার সম্পর্কে বাউল বলেন, 'নাহিক সিকির পক্ষ এই যুগ বিনে', সেই যুগের
প্রথম যুগল গুরু-শিষ্য : 'রূপ গুরু আনল সেবক হএ প্রেম' [জ্ঞানসাগর]। এই যুগল
প্রেম হইতে মহাপ্রেমের বিকাশ হয়। এ যেন আগুনের পরশমণি। শিষ্য সেই প্রেম
লইয়া মহাপ্রেমের সন্ধানে যাত্রা করেন। তাই বাউলের প্রেম সাধনায় কিংবা যোগ-
সাধনায় গুরু অপরিহার্য।

তত্ত্বসাধনা লোক-জগতেরই সাধনা, বাউল ধর্মেও তাই তত্ত্বের এত প্রভাব। কিন্তু
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, বাউলের অনুরাগ-তত্ত্ব বৈকবর্ধ্য ও স্বকীয়বাদ হইতে
গৃহীত। বাউলের রসাস্বাদনের পদ্ধতিও বৈকবর্ষীয় রসাস্বাদনের অনুরূপ। উপনিষদের
'সোহমস্মি', বা তত্ত্বের 'শিবোহম' তত্ত্বদ্বারা উহার ব্যাখ্যা না করাই সম্ভব।

ছ. বাংলাদেশ ও তত্ত্বসাধনা

অনেকেই বলেন, তত্ত্বের উৎপত্তিস্থান গৌড়বঙ্গভূমি : 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিজ্ঞা'।
উক্তিটিকে সত্য মনে করিবার কারণও আছে। বাঙালী 'মা-পাগল' জাতি। মাহু-
উশাসনা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও উহা এই দেশেরই একটি

লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর হীকা, পূজা-অর্চনা, আচার-আচরণ ও লোকব্যবহার তত্ত্বশূন্য। এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম—বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথপন্থ, বৈষ্ণব সহজিয়া, শৈবধর্ম ও বাউল মত তত্ত্বের প্রভাবপুষ্ট। সমাজের নিয়ন্ত্রণে তো বটেই উচ্চতরও শক্তি-সাধনার প্রভাব গুরুতর। পুরাণ-প্রসিদ্ধ একাধিক শক্তি-পীঠের ভিতর অনেকগুলি—কয়তোয়া, কালীঘাট, চট্টল, কীরগ্রাম, ত্রিপুরা, নলহাটি, বক্রেশ্বর ও অষ্টহাস প্রভৃতি বাংলাদেশে অবস্থিত। শক্তির প্রচলিত যুক্তিগুলির মধ্যে কালী বাঙালীর নিজস্ব। গ্রাম-বাংলার হানে হানে কত যে বিচিত্র শক্তি-যুক্তি, কত যে বিচিত্র শাক্তপীঠ আছে, বাংলাকাব্যের ‘দ্বিপংখ্যনা’ অংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্গভীমা, কিরীটেশ্বরী, বিশালাক্ষী, বুড়ীমা, রত্নপী প্রভৃতি শক্তিদেবতা বাঙালীর শাক্তপ্রীতির পরিচয় বহন করে। সুপ্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ বেদাচারপ্রভূ মাতৃ-তান্ত্রিক মন্ত্রবৈদ্যবাসনরূপে পরিগণিত। আচারপ্রভূ হইয়া কবি দীর্ঘতমা এই দেশেই নির্বাসিত হইয়াছিলেন*, অভিশপ্ত দম্ভাকৃষ্ণিষ্ঠ বৈষ্ণবমিত্রেরও নির্বাসন-স্থান বঙ্গদেশে। তারা-সাধক বসিষ্ঠাদি মুনির কথা বাদ দিয়াও দেখা যায়, গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই দেশে, মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুর, সাধক চন্দ্রশেখর, চাঁদরায়-কেদার রায়ের গুরু রত্নগর্ভ, মিতরায় অর্দ্ধকালীবংশের প্রবর্তক রাঘবরায়, ঠাকুর দ্বারকাক ও পাগল বামাকেশ্বর মত বিকৃতিসম্পন্ন শক্তিসাধকের আবির্ভাব হইয়াছে। মাতৃভাব বাঙালীর মঙ্গাগত। সুপ্রাচীন এই শক্তি-সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া এদেশে সংস্কৃত ও বাংলায় বিপুলারতন শাক্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশে রচিত মূল তন্ত্র ও তান্ত্রিক নিবন্ধের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। বাংলার চর্যাগান, নাথ-সাহিত্য, সহজিয়া বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউলগান তত্ত্বের প্রভাবপুষ্ট। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহাদের আলোচনা করা হইয়াছে। এগুলি ছাড়া বাংলার আরও কিছু শাক্ত সাহিত্য আছে, সেগুলিতে শক্তি-সাধনার বিভিন্ন ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়।

শক্তি-সাধনা পশুভাব, বীরভাব ও দ্বিবাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু প্রাচীনকাল হইতে বাংলাদেশে শক্তি-সহায়ে গুরু বীরভাবের সাধনা প্রচলিত ছিল। সেন আমলে শাক্ত সাধনার ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার বীরচারণী সাধনা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে লীমাবদ্ধ হয়। সিন্ধু সাধকদের মধ্যে ইহার প্রভাব কোন কালেই কম ছিল না।

বৈষ্ণবধর্মের প্রাকৃত্যব কালেও যে বিচিত্র বীরচারণ প্রচলিত ছিল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, নরোত্তম বিলাস, ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সাধনার সঙ্কেত অতি গোপনীয়। সাধন-প্রণালীও রহস্যময় ও গুহ্য; এইজন্য বীরচারণ শক্তি-সাধনা লইয়া বহুকাল ভাবায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। একমাত্র বাংলা কালিকাবল কাব্যে এই সাধনার এই অঙ্গই ইঙ্গিত আছে।

ঐক্য ধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে পঞ্চাচার প্রাধান্য লাভ করায় বর্ধ-হিন্দুদের ভিত্তর সাধারণভাবে শক্তি আরাধনাই প্রসার লাভ করিয়াছিল। সাধারণ শক্তি-আরাধনা বানে ধাতু-পাখাণ-মাটির প্রতিমার সাড়যের নৈবেদ্য বলি ইত্যাদি উপচারে শক্তিপূজা। এই পূজাগুলির মধ্যে প্রধান দুর্গোৎসব। ইহা এক প্রকার পৌরাণিক শক্তির পূজা। রামচন্দ্রের অকাল-বোধনকে কেন্দ্র করিয়া শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়। 'রামচন্দ্রগ্রন্থার্থায় রাবণস্ত বধায় চ'-দেবীর অকালবোধনের এই কথা, কোন প্রাচীন পুরাণে না থাকিলেও কালিকাপুরাণে ও দেবী ভাগবতে ইহার প্রসঙ্গ আছে। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলা রামায়ণে, বিশেষতঃ অঙ্কুর রামায়ণে (জগন্নাথ বা রামপ্রসাদী রামায়ণে) এই অকালবোধন উপলক্ষ্যে পঞ্চরাত্র বা নবরাত্র দুর্গাপূজার বিবরণ আছে। এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া সংকৃত পুরাণ ও উপপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'চণ্ডীসপ্তশতী', দেবী ভাগবত ও কালিকাপুরাণের অংশ বাংলায় অনূদিত হয়। এইগুলিই বাংলার পৌরাণিক দেবীমঙ্গল-কাব্য। এগুলিতে একদিকে আছে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের বর্ণনা এবং সেই প্রসঙ্গে পৌরাণিক দেবীসাহায্য; অপরদিকে আছে নবরাত্রকল্প বা পঞ্চরাত্রকল্প দেবীপূজার বিধান। পূজাপদ্ধতি সাধারণ পশ্চাত্তমের। বাংলার শাক্ত সাহিত্যে এগুলির স্থান নগণ্য নয়, সংখ্যিক্যও বিপুল। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পিতাম্বর দাসের 'মার্কণ্ডেয় কথা', বিজয় কল-লোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়', অঙ্কুরবি ভদ্রানীপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল', রামশঙ্কর দেবের 'অভয়ামঙ্গল' এবং বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তের 'দুর্গাসপ্তশতী'। এগুলি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অঙ্কুরণে রচিত। দেবীভাগবতাদি অবলম্বনে দেবীলীলার বর্ণনা পাওয়া যায় এই সকল কাব্যে—দুর্গাপঞ্চরাত্রি—জগৎরাম, দুর্গাপুরাণ—মুক্তারাম নাগ, দুর্গাভক্তিভরঙ্গী—বিজয় রামনিধি, গৌরীমঙ্গল—পৃথ্বীচন্দ্র, দুর্গামঙ্গল—রামচন্দ্র মুখটি এবং কালী কৈবল্য-দায়িনী—নন্দকুমার কবিরত্ন।

বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্ট সাধিত হইয়াছে লৌকিক দেবীমঙ্গল কাব্যদ্বারা। লৌকিক মঙ্গলকাব্যোৎপত্তির একটি ঐতিহাস আছে। বাংলাদেশে স্বপ্রাচীন কাল হইতে অপান্তের সমাজ ও মহিলামহলকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের লৌকিক দেবদেবীর ব্রত ও পূজা প্রচলিত ছিল : এই ব্রতপূজার উপাত্ত দেবতা—মঙ্গলচণ্ডী, বনলা বা ডাকিনী জার্তায়া দেবতা। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে ইঁহার অপরিচিত ও অবহেলিত ছিলেন। 'ডাইনীকলা'ও নিম্ননীয় ছিল। কেহ মনে করেন, এই সকল দেবতা অনার্য দেবতা, কেহ কেহ বলেন—বৌদ্ধ দেবতা। কারণ ইঁহাদের পরিচয় প্রাচীন কোন পুরাণে নাই। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিকট ইঁহারা অবজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু অরোহণ-

চতুর্দশ শতকে নববিজ্ঞতা মুসলমানদের আত্মকলহে ও অভ্যাচারে যখন জন্মলীতি, মগ্নস্থায়, সোনার গাঁ 'বালধাকপুরে' (বিবাহপুরীতে) পরিণত হইয়াছিল, তখন সেই জর্জোপের হ্রস্বে লৌকিক চণ্ডী ভয়হরণী ও মঙ্গলকারিণী দেবতারূপে বর্ণহিন্দুসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন এবং পুরাণের আত্মশক্তি বহিষমুখিনী দেবীর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন [‘মুক্তিভঞ্জন সা দেবী মূলপ্রকৃতিবরীষণী’]; ইনিই ‘মঙ্গলচণ্ডী’—লৌকিক মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবতা। ‘বিজুবনে’ ইনি সিংহবাহিনী, কালীমূর্তি ‘কমলেকামিনী’। মনসা, বগী, শীতলা এই দেবীরই কার্যবাহ, তাহারও মূলশক্তি হইতে অভিন্ন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই দেবীসম্মুখে লইয়া অসংখ্য চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, বগী, ও শীতলামঙ্গল রচিত হইয়াছিল। এই সকল কাব্যে দেবীর মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে দেবীসম্মুখের যে মানবলীলা ও পূজাপদ্ধতি এবং মন্ত্রশক্তির যে অলৌকিক ক্ষমতার কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বাঙালীর শাক্ত সংস্কার ও বিশ্বাসের একটি দিকের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবতা ও পূজাপদ্ধতির উপর যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রলেপ মাথাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি উহারে অন্তরালে শক্তির আদিমতম রূপ ও শক্তিপূজার ঘাদিতর পদ্ধতি লক্ষণীয়। বৃক্ষে, প্রস্তরে ও তিব্বক প্রাণীতে দেবসত্তার কল্পনা প্রাণার্ব আতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যের মঙ্গলচণ্ডী কোথাও বনদেবতা, কোথাও বতুলাকৃতি প্রকরণও—মনসা দেবীর অধিষ্ঠান কেয়াপাতে বা সিঁজুবৃক্ষে, পঞ্চকর্ণ সর্পরূপে ও তিনি প্রপূজিতা [‘শকনাগের মা জয়দেবা মনসা’]; এই সকল দেবতার পূজাও আড়ম্বরহীন, পূজা ‘অষ্টহুঁতওলে’, প্রার্থনা ‘চৌতিশান্তবে’। বাংলা দেবীমঙ্গল কাব্যের ‘চৌতিশান্তবে’ (চৌত্রিশটি বাহনবর্ণের এক একটিকে আত্মকর করিয়া যে পূব) শক্তিসাধনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা প্রকৃতপক্ষে মূল বর্ণাঙ্ক ধ্বনি অবলম্বনে স্বল্প নাদ ধারণা করিবার চেষ্টা। ‘দেবী বর্ণময়ী প্রোক্তা’—কারণ, নাদশক্তির প্রকাশ অক্ষরবর্ণে; এইজন্য শক্তিপূজার অঙ্গে অঙ্গে বর্ণভাস। ইহাচার্য্য নাদক নিজেদেহকে শক্তিময় বা বর্ণময় করিয়া তুলেন। চৌতিশান্ত হুবে একসঙ্গে ত্রাস, ধ্যান ও প্রার্থনার কাজ হয়। বর্ণ-পুতি এই পূর্বের পরিকল্পনাটি অভিনব এবং উহার শক্তিও অসাধারণ।

॥ চণ্ডীমঙ্গল ॥ লৌকিক মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা চণ্ডীমঙ্গল। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত : দেবখণ্ড (দেবীর পৌরাণিক লীলা), আখণ্ডি খণ্ড (ব্যাধ কালকেতু ও ফুরার কাহিনী) এবং বণিকখণ্ড (ধনপতি-শ্রীমন্তসগুনগরের উপাখ্যান)। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে, জাহা স্থিরীকৃত হয় নাই—তবে মালবহের কবি মানিক বণ্ডকে

(পঞ্চদশ শ্রী:) দ্বিতীয়ের পথিকৃত বলা হয়।^১ কাব্যখানি মানিক দত্তের 'দাঁড়া' (বাবা পাল) নামে পরিচিত। এই কাব্যে লোক-সংস্কারের প্রভাব লক্ষ্যীয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরায় (১৫৭৭): বাবুড়ার কুসুমী রঘুনাথ রায়ের অগ্রজ্যায় তিনি এই কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরায়ের শাক্তাচার প্রধানতঃ বৈকুণ্ঠাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণে তাঁহার হৃদি 'গোবিন্দ ভকতি'র উদ্দেশ্যে। তাঁহার অভয় ভূগা 'গোকুল রক্ষণী জয়া যশোদানন্দিনী', তিনি বিদ্যাসাগর। চৌতিশা শব্দ বাতীত দেবীর পূজাপদ্ধতিও পৌরাণিক। খুরনার চণ্ডী পূজায় কিছুটা লোক-সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়: 'ধূপ দীপ নানাবিধ মৈবেচ্ছ পাচলা। পূজনা পূজেন ধটে শ্রীসর্বমঙ্গলা'। দেব-পূজার তত্ত্বাচারের কিছুটা প্রভাব দেখা যায় পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজমাধবের কাব্যে (১৫৭২)। কবির চণ্ডী 'ঘন্ত্রিকাং দেবী যন্ত্রধরুণা': পূজার বীজাকর স্রবণের ইঙ্গিতটিও তাৎপর্যপূর্ণ। খুরনার দেবীপূজার পদ্ধতি আড়ম্বরহীন, তাহাতেই দেবার তুষ্টি: 'অঙ্গ শুচি হইয়া রামা করয়ে দেবার্চা, সাক্ষাতে হইল ভানে দেবী দশভূজা।' দ্বিজমাধবের কাব্যে দেবীর মঙ্গলচণ্ডী নামের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, 'মঙ্গল দৈত্যে বধি মাতা হৈলা মঙ্গলচণ্ডী'। মঙ্গলচণ্ডী নামের এই ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত আরও দুইখানি কাব্যে—দ্বিজ রামদেবের 'অভয়াঙ্গল' (১৬৪২) এবং মুক্তারাম সেনের 'সারদাঙ্গল' (১৭৭৪)। মুক্তারামের কাব্যে দেবী 'নব কাঞ্চিনী কালী'রূপে শ্রীমন্তের মশানে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কাব্যে অন্তর-কথিরে রঞ্জিত শ্রামার রসকেলির বর্ণনাটিও অভিনব। দেবীর পূজাও তত্ত্বাচারে,—'ময়ে আমন্ত্রিয়া পূজে তত্ত্বের বিধানে।' আরও বহু কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন; দ্বিজ হরিরামের 'অত্রিঙ্গামঙ্গল' (সপ্তদশ), গঙ্গাধর দাসের 'কিরীটি মঙ্গল' (১৭৬৪) ও ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' (১৭৭২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে যে শক্তিপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট। এখানে শাক্তাচার পদ্ধতাবের অনুরূপ।

॥ মনসামঙ্গল ॥ শক্তি-সম্ভার অস্ততমা দেবী মনসা। মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মনসা-মন্ত্রে সিদ্ধ মহী ধ্বংসকরী সদৃশ। মনসার নামভেদ—বিষহরি, পদ্মা, কেতকা ও জগৎপোহী। এই সকল নাম কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেদে বিষ-অপনয়নের মন্ত্র আছে: ঋগ্বেদের খিলস্থল্কে অঙ্গগর, কালিক, কর্কোটক প্রভৃতি সর্পের নাম পাওয়া যায়। অস্ত্র একটি খিলস্থল্কে জরংকাক, জরংকতা ও আন্তীকের নাম

১। মানিক দত্তের 'আমি করিলু' বিনয়।

বাঁহা হৈতে হৈল দ্বিতীয় পরিচয় ॥ [কবিকঙ্কণ]

আছে। বাংলার লোক-সভ্যতার মনসা এই অরুণাকান্ত সহিত যুক্ত হইয়া দেববর্ষাদা লাভ করিয়াছেন : এখানে তিনি বরং ভগবতী—‘বৈ জান ভগবতী সেই বিবহরি’। এই দেববর্ষাদা লাভ করিতে দেবী মনসাকে যে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, বাংলা মনসাযজ্ঞের ঠান্দ সঙ্গার ও বেহলা-লক্ষীন্দরের কাহিনীতে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এ কাহিনীও কোন সংকৃত পুরাণে নাই। বাঙালী আপন মনের বাধুরী বিশাইয়া ঠাণ্ডাবেনের অনমনীয় দৃঢ়তা ও সতী বেহলার কাহিনী রচনা করিয়াছে। প্রত্যেকটি মনসা মঙ্গল কাব্য বীর ও করুণরসের যুক্তবেণী। মনসামঙ্গল নাট্যটি বেশি প্রাচীন নয় : প্রথম দিকের কাব্যগুলিকে বলা হইয়াছে পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান। মনসা শক্তি-সত্ত্বের দেবতা, তিনি সর্পের মতই ক্রুরশৃঙ্গিল। কিন্তু এই বিভীষণ দেবতার অন্ত একটি দিকও আছে—‘বিষময়নী’ দেবী ‘অমৃতনয়না’ও বটেন। অমৃতনয়নে যখন তিনি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাহা অশেষ কল্যাণ-মঙ্গলের আকর হইয়া উঠে। মনসার এই শক্তিই তাঁহাকে মঙ্গলদেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সর্পভয়-ভীত মানুষ ভয়েই এই দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছে।

বাংলাদেশে শতাধিক কবি মনসার ভাসান রচনা করিয়াছেন। যদিও কাব্যের দিক হইতেই মনসামঙ্গলের প্রেরণ, তথাপি শক্তিসাধনার কতকগুলি দিক হইতেও ইহার মূল্য কম নয়। বিষ-ঝাড়নের মন্ত্রগুলিতে তাত্ত্বিক মন্ত্রশক্তির পরিচয় রহিয়াছে তাঁদের ‘মহাজ্ঞান’, হংস-পবনের বোগ—প্রভৃতিও তাৎপৰ্যপূর্ণ। ‘প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত’ (চতুর্দশ শতক) বলিয়া প্রসিদ্ধি। কিন্তু হরিদত্তের রচনার কয়েকটি ছিন্ন অংশ ব্যতীত আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহ, জ্রীহট্ট ও আসামে ‘মুকবিবলভ’ নারায়ণ দেবের নাম বড় বিখ্যাত। বরিশাল ফুলশ্রী গ্রামের প্রসিদ্ধ কবি বিজয় গুপ্ত (১৭২৪) : ‘সোনার খাটে বৈসে দেবী রূপার খাটে পা’—এই সকল বর্ণনায় রূপকথার প্রভাব আছে। নাটুডায়া বটগ্রামের বিপ্রদাস চক্রবর্তী (১৫২৩) কাব্যও প্রাচীন। এই কাব্যে বিষ-ঝাড়নের মন্ত্রে ‘কামরূপা চন্দ্রবর্ষ’, ‘হংস’ ও ‘মন-পবন’এর উল্লেখ লোক-প্রচলিত তাত্ত্বিক বোগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মনসামঙ্গলের খ্যাতিমান কবি বর্ধমানের কেতকাদাস-কেমানন্দ (সপ্তদশ)। কবি কেতকা বা মনসার দাস—তাই নাম কেতকাদাস। কেমানন্দের কাব্য রচনা-সৌরবে উৎকৃষ্ট : পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এই কাব্যের যথেষ্ট সমাদর। অন্তান্ত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরভূমের বিকুশাল (সপ্তদশ), গৌড়ের কালিদাস (১৬২৭) ও উত্তরবঙ্গের কবি তত্ত্ববিস্তৃতি, জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয় (১৭৪৪)। মনসা মঙ্গলের সংগ্রহ-গ্রন্থও পাওয়া যায়, উহাকে ‘বাইশা’ বলা হয়। ‘বাইশা’র একই অঞ্চলের বিভিন্ন কবির রচনা একত্র করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পালার রূপ দেওয়া হয়।

॥ বক্সী ও শীতলামঙ্গল ॥ বক্সী ও শীতলা দেবীও শক্তিব্যূহের দেবতা। লোক-সংস্কৃতিতে শক্তিদেবীর মহিমা যে কি অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বাংলার এই অবাধতর মঙ্গল কাব্যগুলি তাহার প্রমাণ। শক্তির প্রভাব দ্বিগুণপ্রসারিত। বুদ্ধে, শৈশবে, সন্নিহিতে, সরোবরে, পথের চৌমাথায়, গৃহের আনাচে-কানাচে—কোথায় তিনি নাই! জাতহারিণী দেবীরূপে শক্তি, শিশুর রক্ষাকর্তারূপে শক্তি, রোগনাশীরূপে শক্তি, রোগ মুক্তিরূপে শক্তি। তিনিই ভয়, তিনিই অভয়। বাঙালীর অহিমস্কার এই বিশ্বাস সংক্রামিত। তাই বাংলার শক্তিদেবতার এত সংখ্যাধিক্য। ওলাইচণ্ডী, কুসুইচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী, শুভচণ্ডী (সুবচনী), বনবিধি—কত যে শক্তিদেবতা, সংখ্যা করিবে কে? বক্সী ও শীতলা দেবীও মাতৃকাশক্তি। অবশ্য বক্সী দেবী প্রাচীন। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কালের হইলেও বাংলার লোকসমাজে বিশেষতঃ মহিলা-মহলে বক্সীদেবীর প্রতিষ্ঠা হুচিরকালের। মহাভারতে, ভবিষ্য পুরাণে ও দেবীপুরাণে বক্সীপূজার প্রসঙ্গ আছে। কানিংহাম প্রমুখ Archaeological Reports Vol. iii হইতে জানা যায়, মদনপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাক্ষে একটি বক্সী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বক্সীর কল্পনার স্বন্দরমাতা ঘটমাতৃকার প্রভাব আছে। স্বন্দের বয়ে তাঁহার প্রধান দেবীসঙ্গে উন্নীত হইয়াছিলেন [মহা. বন. ১২০]। বাংলা মঙ্গলকাব্যেও বক্সীদেবী পরাশক্তি হইতে অভিন্ন। বাংলার কুসুমার দাস (সপ্তমণ), কুসুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি বক্সীমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। বক্সীদেবী প্রধানতঃ শিশুর রক্ষাকর্তা।

বসন্ত-বিশ্বেদ্যাকের দেবী শীতলাও ‘শঙ্কর-গৃহিণী শৈলহুতা’। শীতলা মঙ্গলের অন্ততম কবি কুসুমার দাস (সপ্তমণ)। স্বন্দপুরাণে শীতলাদেবীর ধ্যান আছে।^১ বাংলাদেশে শীতলা-সেবকদের শীতলা পণ্ডিত বলে। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই এক দেবীর ব্যাপক প্রভাব লক্ষিত হয়।^২

॥ কালিকামঙ্গল ॥ পূর্বেই বলিয়াছি বাংলাদেশে বীরাচার শক্তিসাধনার একদিন যথেষ্ট প্রসার ছিল। কালক্রমে ইহার উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আঘাত লাগিয়াছে; বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থানে ইহাকে আর একটি প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তথাপি শক্তি-সহায়ে ও যত্নাদি সহযোগে শক্তি-উপাসনার প্রভাব কোন কালেই দূর হয় নাই। এই সাধনার প্রণালী অত্যন্ত রহস্যময় ও গুহ্য,—এইজন্য ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলাভাষায় বীরাচার শক্তি সাধনা লইয়া কোন গ্রন্থ

১। নবামি শীতলাঃ দেবীঃ রাসভয়াঃ দ্বিগুণরীম্।

মার্জনী কলসোপেতাঃ শূর্ণালঙ্কৃত বস্তকাম্ ॥ [শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত]

২। ব্রহ্মব্য ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ (২য় ভাগ)—অক্ষয়কুমার দত্ত।

রচিত হয় নাই। তবে এই সাধিনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে বৌদ্ধ সহজিয়া, বাথপুহ বোদী, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যে এবং তাহা লেখা সাহিত্যও কষ্ট হইয়াছে। বীরাচার শক্তি-সাধনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাংলা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যভঙ্গিতে। বনে চর, খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে এদেশে যে কাপালিক ধর্ম প্রচলিত ছিল, বাংলার পরিচর রহিয়াছে ভবভূতির 'বালভীমাধব' নাটকে, বাণভট্টের কাব্যে ও দ্বিতীয় দশকহারচরিতে—ঈদং পরিবর্তিত কাহিনী সমেত তাহারই ভের আনিয়া পৌঁছিয়াছে বাংলার কালিকামঙ্গল কাব্যে। এই কাব্যের প্রধান উপাখ্যান দিভ্যাহ্মের কাহিনী। শক্তি-সাধনার ব্যাপারে এই কাহিনী নূতন কিছু নয়। হরিবংশের উবা অনিষ্ট কাহিনীতে এই কাহিনীর বাজ আছে : বেতাল পঞ্চাংশতির কয়েকটি দলে, কান্দীরী কবি বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যে এই একই বিষয়ের প্রাতিমূর্তি পাওয়া যায়। তত্ত্বের চক্রাভুতান ও লতা-সাধনাদির ব্যাপারে সাধন-সাহিনীই ভগবতীর প্রতিমা। তত্ত্বাচারের এই গুট, জটিল ও রহস্তময় বিষয়টিই কালিকামঙ্গল কাব্যের উপজীব্য। এখানেও আছে বীরাচারসম্মত কামকলাবিলাস, দেবীও এখানে 'কালের কাহিনী'—ঠাহার কৃপায় নায়ক অবৈধ উপায়ে নায়িকাকে লাভ করিতে পারেন। দিভ্যাহ্মের কালিকামঙ্গল কাব্যে বিচার সহিত হুম্মরের অবৈধ মিলন, হুম্মরের আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে স্বার্থক বাক্যে বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে হুম্মরের শ্লোক রচনা, ১ দক্ষিণ মশানে হুম্মরের চৌতিশা ভক্তি এবং সর্বশেষে খটা করিয়া দক্ষিণাকালিকার পূজা ও মশানে শবসাধনা—সমস্ত কিছুই বামাচার শক্তি-সাধনার গুট ইঙ্গিতবহ। হুম্মর যেহীর ধরপুত্র শক্তিসাধক। ঠাহার সাধনা জটিল ও রহস্তময়, বিচার সহিত ঠাহার সম্পর্কটিও অতি জটিল। আত্মপরিচয় প্রধানকালে হুম্মর যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সমানভাবে বাহবী বিদ্যা ও মহাবিচার প্রতি প্রযোজ্য।

তত্ত্ব সাধনার একটি অতি গুট মূল রূপ ও আকৃতি কালিকামঙ্গল কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে : রূপটি সঙ্গতময় ও গূঢ়ার্থবোধক। সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা অস্পষ্ট ও কঠিনগহিত। অথচ এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলেন রাবপ্রসাদের মত সাধক কবি, ভারতভ্রমের মত শক্তিবান শিল্পী। অনেকেই এই কাব্য দুটিটিকে অষ্টাদশ শতকের বিগহিত রচিত রূপায়ণ হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু

- ১। অতাপি তং কনক চম্পকদামগৌরীম্
কুমারবিন্দবরনাং তত্ত্বেরংমর্যাক্তিম্।
হুগ্ধোন্মিতাং মননবিহ্বললালসাসীম্
বিদ্যাং প্রসাধ পণিতাষি চিত্তম্বাষি ॥
[ঐদ্য বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকা]

মনে হয়, কালিকামঙ্গল কাব্যের এরূপ ব্যাখ্যা ঠিক সম্ভব ব্যাখ্যা নয়। কচির প্রশ্ন তুলিলে শক্তিসাধনাকেই সম্রাট করিয়া দিতে হয়,—তত্ত্বশাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতে হয়,—লক্ষ্য-সাধনার সমগ্র সাহিত্য-রুতিকে অস্বীকার করিতে হয় : সর্বাধিক বড় কথা, বাঙালীর প্রতি সাধের প্রতিমা ‘কালীমূর্তি’কেও তাহা হইলে চিরন্তনে বিসর্জন দিতে হয়। ভাসাভাসা জ্ঞান লইয়া শাক্ত-সাধনাকে বিচার করিলে উহার প্রতি আবিচারের সম্ভাবনাই অধিক। সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে সাধনার বিচার হয় না। বিভাস্ত্রের কাব্যের মূল্যও বিচার করিতে হইবে তত্ত্বসাধনার আলোকে। ইহা বামাচার শক্তিসাধনা বিষয়ক কাব্য। আচার বাম বলিয়াই ইহার কাহিনী অন্তত, সাধন তির্যক ও সিদ্ধি অতিলৌকিক। এই সাধন সম্পর্কে সাধক রামপ্রসাদের বাক্যেরই পুনরুক্তি করা যাইতেছে :

জ্ঞাত নাহি বল্যে কেহ না করিবে হেলা ।

বিষয় বিষয় কাল সর্ব নিয়ে খেলা ॥ [কালিকামঙ্গল]

বিভাস্ত্র সহিত ভবানীভক্ত স্বন্দরের মিলন-রূপকটিও বিষয় বিষয়। কালিকামঙ্গল বিভাস্ত্রের কাব্যে এই গোপনীয় গুঢ় বিষয়কেই গল্পাকারে রূপ দেওয়া হইয়াছে।

বিভাস্ত্রের কাহিনী লইয়া অনেক কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। সম্রাট ফিরোজশাহের অগ্রগ্রন্থপুট কবি শ্রীধর (১৫৩২) প্রথম কালিকামঙ্গল রচনা করেন বলিয়া বিশ্বাস। কেহ কেহ মনে করেন, রঘুনাথসিংহের কবি কঙ্ক (আত্মমানিক বোড়শ শতাব্দী) প্রথম বিভাস্ত্রের পালা রচনা করেন : উহাতে লতাপীরের মাহিমা ও বিষ্ণু মাহাত্ম্যের কথা আছে। ইহার পরে গোবিন্দদাস (বোড়শ), প্রাণরাম চক্রবর্তী (: ১৬৬৬), কৃষ্ণরাম দাস (১৬৭৬) ও কবিশেখর বলরাম (অষ্টাদশ) প্রভৃতি কালিকা মঙ্গল রচনা করেন। কাব্য হিসাবে এগুলি অকিঞ্চিৎকর। রামপ্রসাদের কালিকা মঙ্গল (অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশক) তাত্ত্বিক সাধনার দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই কাব্যেই সর্বপ্রথম ভাষাছন্দে বীরাচার শব্দ-সাধনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে : কালী মূর্তির ব্যাখ্যাও তত্ত্বসম্মত : ‘নাম নিত্য নৃত্যতি মিথিলনাথ উরে, বিপন্নিত কাজ লাজ পরিহারি দূরে।’ বিভাস্ত্রের বিচার প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ যে কথাটি বলিয়াছেন, বাংলা বিভাস্ত্রের কাহিনী প্রসঙ্গেও সে উক্তি প্রযোজ্য :

কালী-কিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার ।

বুঝে কিছু সে কালী অক্ষর ছন্দে বার ॥ [কালিকামঙ্গল]

কালিকামঙ্গল-বিভাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রাম গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁহার কাব্য ‘অন্নদামঙ্গল’ (১৭৫১) তিনখণ্ডে বিভক্ত : শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল-বিভাস্ত্র-

স্বন্দর ও মানসিহ-অরপূর্ণাবল। ভারতচন্দ্রের কাব্য রচয়িতাদের বাঙ্গালীসাহিত্যের অতুলনীয় কীর্তিতত্ত্ব। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি, তাঁহার বর্ণনা রাজনৈতিক ঐশ্বৰ্যের পরিচায়ক ; তিনি পণ্ডিত, তাঁহার কাব্য পাণ্ডিত্যের প্রকাশে বলবল। শক্তি-ভবেরও বহু কথা ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে জানা যায়। তদ্রোক্ত প্রসিদ্ধ বনবহাবিভার বাঙ্গালা রূপ-বর্ণনা^১ ভারতচন্দ্রের কাব্যেই প্রথম পাওয়া বাইতেছে : ইক্ষবল্ল্যে বাইবার প্রাকালে সতী মহাবেককে এই রূপ দেখাটাইয়াছিলেন। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভারতীয়শাক্ত পীঠমালার তালিকাও ভারতচন্দ্র ভাষাছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : পীঠগুলির সহিত তত্ত্বপীঠের ভৈরব ও বৈবীর নামও উল্লেখিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পীঠমালার বর্ণনাব্য বর্ণনা এই প্রথম।^২ অজ্ঞাত কাব্যের দ্বিগ্‌বন্দনা অংশে পীঠের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ও পাঁচমিশাল। ভারতচন্দ্রের অক্ষর-পুটিত স্বরেরও বিশেষত্ব আছে। কবিকল্পণের চৌতিশায় বহিঃ অক্ষরের তালিকা পাওয়া যায় ; রামপ্রসাদ বহিঃ বলিয়াছেন,—‘চতুঃশ্রীং শাক্তে স্তব করি কহে কাব’—কিন্তু আসলে উহাতে আছে ‘ত্রিশাকরা স্তব ; ভারতচন্দ্রের স্তব পঞ্চাশাকরা—‘স্বন্দর করিলা স্তুতি পকাশ অক্ষরে’ [ভারতচন্দ্র ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪ ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা পুটিত স্তব রচনা করিয়াছেন]। তদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্রের স্বগভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কাব্যে। ভারতচন্দ্রের দেবী-ভক্তিও আত্মরিক্ততাটীন নয়,—যেমন,—

একি মায়। একি মায়। কর মহামায়।

সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়।ছায়া ॥

নিগম আগমে তুমি নিরুপম কায়।

ত্রিগুণ জননী পুনঃ ত্রিদেবের জায়। ॥

ইহলোকে পরলোকে তুমি যে সহায়।

ভারত কহিছে মাগে দেহ পদছায়া ॥ [অন্নদামঙ্গল, ১ম খণ্ড]

শাক্ত পঞ্চাবলী : বাংলা দেশে শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের সমাদর কোন দিনই হ্রাস নাই। বোড়শ শতকে মহাপ্রভুর প্রেম-প্রাবনে গোটা ভারতবর্ষ দ্রাবিত হইয়াছে, সতের শতকে দ্বিতীয় চৈতন্ত শ্রীনিবাস আচার্যের ভাবোদ্বাদনার ও খেতরীর মহামহোৎসবের মৃদঙ্গবজ্রারে বৈষ্ণবভাব ও রসকীর্তন আত্মর্ধ ভাবাবেশ স্রষ্ট করিয়াছে—তথাপি বাংলা দেশে শাক্ত প্রভাব ক্রয় হয় নাই। কৃষ্ণানন্দ আগমবাসীশের ‘তন্ত্রদার’,

১। বন বহাবিভা : কালী, ভায়া, স্বাক্ষরাজেশ্বরী বোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমতা, দুর্ঘাভতী, বগলা, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী।

২। একারটি শাক্ত পীঠের মধ্যে ভারতচন্দ্র বিয়াল্লিশটির নাম দিয়াছেন।

রুক্মন ও শূলপাণির 'হুগোৎসব তত্ত্ব' বাংলার শক্তি-সাধনার ধারাকে জীবন্ত রাখিয়াছে। নবাত্মের নিয়ন্ত্রণে সহজ সাধনার সহিত শাক্তাচার যুক্ত হইয়াছে, বামাচার চলিয়াছে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে এবং পশ্চাচারী সাধনা চলিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে। বাংলার বারকুঞা এবং আকলিক রাজা ও জমিদারবৃন্দও শক্তিপূজার পোষকতা করিয়াছেন। অবশেষে অষ্টাদশ শতকে শক্তিপূজা ও শাক্ত সাহিত্য নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহা বাংলার শাক্ত সঙ্গীত।

দুঃখ-মুক্তি, অভেদবুদ্ধি ও মুক্ত জীবনের আকৃতি লইয়া বাঙালীর মর্মকেন্দ্র হইতে অতি স্নন্দর বৈরাগ্য-মধুর শাক্তগীতির উৎসার। তখন বাংলাদেশে নবাবী আমল। বাহাদুরের রাজত্ব ও মারাঠী চৌধুর চাপে নবাবগণ বিপর্যস্ত, জমিদারগণ নবাবের চাপে সশস্ত্র, আর সাধারণ প্রজা 'মসিলে তসিলে'র চাপে অস্থির। সকলেই বিপন্ন, সমাজদেহের রক্তে রক্তে প্রসারিত দুঃখ। তখনকার বৈষ্ণবধর্ম এই বিপদে মাতৃমুখে আশ্রয় করিতে পারিতেছিল না। ধর্মের দিক হইতেও নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা আচারসংস্কারতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা সমাজদেহকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছিল। ইহারই প্রতিবাদে বাংলার মর্মকেন্দ্র হইতে শাক্তাগম সমস্ত দিব্যভাবে মহিমা ঘোষণা করিয়া অভিনব সঙ্গীত মূর্তিতে ভ্রাম্যসঙ্গীত বা শাক্তগীতাবলী সঞ্চিত হইল। দুঃখ, অনাচার ও অত্যাচারের পটভূমিকায় এই মাতৃসঙ্গীত এক স্বর্গীয় সূচনা।

শাক্ত গানের প্রধান বিশেষত্ব দিব্যভাব। এই ভাব শক্তি-উপাসনার চরম ভাব ও সকল দিক হইতেই শ্রেষ্ঠ। শাক্তের অতি সরল পশ্চাচার ও অতি জটিল বামাচারের উপরে দিব্যচার একটি অতি স্নন্দরভাব। ইহাতে স্থূল পঞ্চ ম-কারের প্রয়োগ নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই, নাই আচার-বিচারের কাঠিন্য। দিব্যভাব বাহিরের সামগ্রী নয়, অন্তরের সামগ্রী। ইহা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক স্নন্দর সমন্বিত রূপ। ইহাতে জ্ঞানী দিব্যজ্ঞানের সুরে প্রতিষ্ঠিত, কর্মী দিব্যকর্মের সাধনার তন্ময়, ভক্ত ভক্তির পরম প্রাপ্তিতে মুগ্ধিত। দিব্য ভাবের সাধনায় মাতৃমুখের মধ্যেই দিব্যভাবের জাগরণ ও অধ্যাত্ম শক্তির সঞ্চার হয়। বাংলার শাক্ত সঙ্গীত এই স্বর্গীয় দিব্য ভাবের কথায় মুগ্ধ, উহা শক্তির সামগান।

এই সঙ্গীতের পটভূমি হালিসহরের সাধক কবি রামপ্রসাদ; তাঁহার গান সাধনার সিদ্ধি ও প্রকাশের আনন্দে পরিপূর্ণ। 'আমি কি হুগোয়ের ভরাই' বলিয়া তিনি শাক্তের তেজ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাক্তের কর্ম, শাক্তের ভক্তি, শাক্তের 'সাধন-সময়', শাক্তের 'সিদ্ধি-বিভূতি' ও আত্মসমর্পণে রামপ্রসাদের গান বাংলার নবাগম, নূতন তত্ত্ব। তাঁহার আকুল করা বা ডাকে সকল হীনতা ও দীনতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,

‘কবি রত্নাকরের অগাধ জলে’ ডুব দিয়া তিনি সৃষ্টি-রত্ন আহরণের কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। তন্ময় বাবতীর দিব্যতাব—মনোহীকা, অন্তর্বাণ ও শ্রেষ্ঠ পুন্ডার আদর্শ এবং জীবনসৃষ্টির কল প্রসাদী সঙ্গীতে প্রসূত হইয়াছে।

রামপ্রসাদকে অনুসরণ করিয়া কত কবি যে শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে শক্তি-সাধনার বিপুল প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, সমগ্র দেশ বেন শাক্তের দিব্যতাবে অতুপ্রাণিত হইয়াছিল। সাধক কমলাকান্ত, শ্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, ভক্ত কবি গোবিন্দ চৌধুরী ও রামলাল দাসদত্তের গান অপূর্ণ। কমলাকান্তের কবিত্ব ও ভাষাসম্পদ বৈষ্ণব পদাবলীর ‘রমনারোচন’ বাচনভঙ্গীর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার ‘মঞ্জিল বন-ভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে’ প্রভৃতি গান ছন্দের স্বাক্ষরে ও ভাবের গাঢ়তায় শ্রেষ্ঠ গীতিকাবিত্যের পথায়তৃত্ব। গোবিন্দ চৌধুরীর গানেও কবিত্বের অনন্ত স্রবসা। অষ্টাদশ শতকের বহু রাজা, জমিদার ও দেওয়ান তত্ত্ব-গভীর শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কুমার শত্ৰুঘ্ন ও নরচন্দ্র—মহারাজ নন্দকুমার, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, কোচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণ, নাড়াঙ্গোলের রাজা মহেন্দ্রলাল খান, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ অতি সুন্দর শাক্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। মহাতাব চাঁদের অন্বদিত মাতৃদ্যানগুলি অমূল্য সম্পদ। দেওয়ান রঘুনাথ ও রামজলাল নন্দীর গানও খুব উপভোগ্য।

শাক্ত সঙ্গীতের প্রধান দুইটি ভাগ: লীলা সঙ্গীত (আগমনী ও বিজয়া) এবং সাধন-সঙ্গীত (মনোহীকা, ভক্তের আকৃতি প্রভৃতি)। রামপ্রসাদ উভয়প্রকার গানই রচনা করিয়াছিলেন। ক্রিয়া-প্রধান শক্তি-সাধনার অন্তরঙ্গ ভাবের প্রতিচ্ছবি রামপ্রসাদের বিশেষ কৃতিত্ব। রামপ্রসাদই বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসকে নতুন করিয়া শক্তি-সাধনার অঙ্গীভূত করিয়াছেন: তাঁহার সাধন-সঙ্গীত প্রতিবাৎসল্য রসে ভরপুর, তাঁহার লীলাসঙ্গীত বাৎসল্য রসের নিষ্কর। কমলাকান্তে এই নিষ্করের সাবলীল গতি ও বিস্তার। অবশ্য সাধক কবিত্বের রচনার লীলা অশেকা সাধন-সংস্কৃতিতেই প্রাধান্য। লীলাগান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কবি-আখড়াই-পাচালি গানে। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমে শাক্ত সঙ্গীত কবি, আখড়াই ও পাচালি গানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে উহা যাত্রা ও নাটকের পালার সন্নিবেশিত হইতে থাকে। লৌকিক প্রবোধ-কৌতুকের কেন্দ্রে লীলাগানগুলিই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছিল। হক্টাকুর, রামবত্ত, নীলবনি পাটুনি, এ্যান্টুনী কিরিকী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিধুবাবু, কালি বিজা, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পকী, দাশরথি রায়, রসিক রায়, নীলকণ্ঠ, বদন দাঁটার প্রভৃতির গানে লীলার স্থানবীর ভাব ও পারিবারিক জীবনের

হুজুতিসহ বর্ণনা লক্ষ্যীয়। অবশ্য হাওরায়ের সাধনসঙ্গীত—‘বোম্ব কারো নয় গো মা, আমি বোম্ব সলিলে ডুবে মরি’, কিংবা রসিক রায়ের সাধন-সময়ের গান ‘আর না সাধন-সময়ে, দেখি, মা হারে কি ছেলে হারে’ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গান। ‘কঠোর গান’ও (নীলকণ্ঠের গান) ভক্তিবিলসিত ও অতি মধুর।

॥ নব্য বাংলায় শক্তি-চেতনা ॥ বাঙালীর জীবনে শক্তি-সাধনার আবেশন গূঢ়স্বাক্ষরী। বাংলাদেশে শক্তি-সাধনার কেন্দ্রের অপ্রতুলতা নাই। মেহার, কিল্লীটেঘরী, ককালিতলা, তারাপীঠ, কালীঘাট, ভবানীপুর ও সেরপুর শক্তিসাধনার বিশিষ্ট কেন্দ্র। বাংলার গ্রামে গ্রামে কালীপূজার ধুম। বংশভুক্ত্যে এখানে সর্বাঙ্গী বংশ, মিতরার অর্ধকালী বংশ, মেড়তলার ভট্টাচার্য বংশ, আন্দুলের শ্রেমিক-গোষ্ঠী শক্তির সাধক। বাঙালীর শাক্ত চেতনা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নব্য বাংলার কাব্য-গানেও উহার প্রভাব বিদ্যমান। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র আগমনী-বিজয়া বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন। দশমহাবিচার রূপগুলিকে ভিত্তি করিয়া সভ্যতার বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার সরকার করিয়াছেন, তাহাতে শাক্তচেতনার প্রভাব সুস্পষ্ট। শক্তির রূপ স্বদেশ জননী, শক্তির রূপ দেশের নারী-সমাজ। হেমচন্দ্রের দশমহাবিচার কাব্যে শক্তির এই রূপান্তর লক্ষ্যীয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও দেশকে শক্তিমায়ের বিগ্রহ ভাবিয়া ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। স্বদেশজননীকে জগজ্জননীর রূপে অভিযুক্ত করিয়া স্বদেশপ্রেমমূলক গান রচনা করিয়াছেন, কীরোদ গাঙ্গুলি, কালিপ্রসন্ন বিজয়াবিশারদ, অম্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি। দেশাত্মমূলক শাক্তগীতিকে বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচার করেন চারুণ কবি মুকুন্দদাস। তাঁহার ‘জাগো গো, জাগো গো জননী’ গানগুলি আশ্চর্য উদ্গাদকর। কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রীসঙ্গীতও প্রাণময়। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, মুসলমান কবির ভিতর এই শাক্ত চেতনা জাগিল কোন্ স্তর ধরিয়া; ইহা কি সুকী প্রভাব, না বাউলের প্রভাব, না হিন্দু প্রভাব? না, ইহা বাঙালীর মজাগত শাক্ত চেতনার প্রকাশ? অবশ্য গীতের রাজ্যে নামশক্তির প্রভাব তানসেনাদির গানেও আছে। দরাদর গঙ্গাশ্রোত্র বহুবিখ্যাত।

নব্যযুগের গীতিকবিতার আর একজন পূর্বসূরী বিহারিলাল চক্রবর্তী। তাঁহার ‘সারদামঙ্গল’, ‘সাধের আসন’ প্রভৃতি কাব্য তত্ত্বের মূলতত্ত্বের নির্ধারিত লইয়া রচিত। ‘সারদামঙ্গল’ যেন বাংলার ‘আনন্দলহরী’ বা ‘সৌন্দর্য-লহরী’। শঙ্করাচার্য একদিন ‘আনন্দলহরী’ কাব্যে বোড়ালী দেবীর সৌন্দর্য-মূর্তির বর্ণনা করিয়াছিলেন : সেই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীই স্বরূপে বিহারীলালের ‘সারদা’। তিনি সৌন্দর্য-প্রতিমা—‘উদার সৌন্দর্য রাশি’, তিনিই আবার ‘মুতিমান প্রেম্যানন্দ’—‘জননী, পিতা, নন্দিনী, রমণী, মিতা’, তিনিই আবার—

কবির বোঙ্গির ধ্যান

ভোলা প্রেমিকের প্রাণ

মানব মনের তুরি উদার হৃদয়।

যা দেবী সৰ্বস্বতেষু কান্তিরূপেণ সংহিতা।

নমঃ স্তুতৈ নমঃ স্তুতৈ নমঃ স্তুতৈ নমো নমঃ ॥

[সাধের আসন]

বিহারীলালের শাক্ত চেতনা ত্রিবিজ্ঞানসূত্রসারী। তাঁহার আরাধ্যা দেবী শারদা। শক্তিভবের হৃদয় রক্ত ও শক্তি-সাধনার লতাসাধন বা বোণিনী-সাধনের অতি অটল তত্ত্ব বিহারীলালের কাব্যে প্রেমযোগে পৰ্যবসিত হইয়াছে। প্রেমের ভাবটি বৈকুণ্ঠ সহজিয়া সাধনা হইতে ভাবমুগ্ধ কবির চিত্তে অজ্ঞাতসারেই আসন করিয়া লইয়াছে। অবশ্য শক্তি-সাধনার শেষ স্তর মাধুর্ঘ্যে অবসিত : শিবশক্তিযোগের সারস্বত্যাধীন বা সেই মহারসে সমরসীকৃত হইয়া যাওয়া সাধকের চরম লক্ষ্য : এই অবস্থার সারস্বত সঙ্কৃত অবতধারায় বেহ আগ্রাসিত হওয়ায় সাধক সমস্ত ভগৎ বিন্মত হইয়া এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হইয়া যান। বিহারীলালে তাহারও অভাব আছে—

ভোমারে চন্দ্রে রাখি'

সদাই আনন্দে থাকি,

আমার প্রাণে পূর্ণ চন্দ্রোদয়, সারা দিবা রজনী।

[সাধের আসন]

বিচ্ছেদ-বেদনা প্রকাশের দিক হইতে বিহারীলাল 'বাউল', প্রাপ্তির দিক হইতে ত্রিবিজ্ঞানসূত্রের কোল সাধক। তিনি আত্ম-সমাহিত ধ্যান-তত্ত্বয় বোণী।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পক্ষে শক্তি-সাধনা নূতন ভাষায় মণ্ডিত হইয়াছে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সাধনায়। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন তত্ত্বয় মাতৃসাধক। গন্ধর্ব-নিমিত্ত কণ্ঠে তিনি নিজে প্রাচীন শাক্ত সঙ্গীত গান করিতেন এবং সেন্তালিকে আত্মাদান করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। শাক্ত চেতনাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। আজিও দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরে এইভাবে সাধন চলিতেছে। ঠাকুরের ধর্ম ছিল ভাবের ধর্ম। ভাব দিয়াই তিনি 'অভাব'কে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'রসে-বশে রাখিস মা'—ইহা শক্তি-সাধনার আর একদিক। ঠাকুরের প্রভাবে শাক্তভাব আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই প্রভাবে বিবেক-বীর বিবেকানন্দের কর্মে ও বাক্যে এইভাব অদ্বৈত বৈরাগ্যের সহিত যুক্ত হইয়া এক অপূর্ব যুক্তবোঁ সৃষ্টি করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র ও এই যুক্তবোঁর ধারায় রাত। বস্তুতঃ শাক্তচেতনাকে ভিত্তি করিয়া বাঙালী যে কত ভাবের সাধনা করিয়াছে, কত বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জীবিলে বিম্বিত হইতে হয়। মাতৃভাব অতি বিচিত্র।

॥ পুরাণ ॥

১. পুরাণের অর্থ ও লক্ষণ

পুরাকাল হইতে লোকপরম্পরায় বাহ্য ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাই পুরাণ—‘পুরাণরম্পরাঃ ব্যক্তিঃ পুরাণঃ তেন বৈ শ্রুতম্’ [পদ্ম. সৃষ্টি. ২]। অথর্ববেদে ‘পুরাণবিশং’ শব্দটির নিকৃষ্টি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদেও পুরাণের উল্লেখ আছে। বৈদিক-সাহিত্যে পুরাণের কাহিনীর বীজ ইতস্ততঃ ছড়ানো। অতএব পুরাণ চির পুরাতন।

কিন্তু যে আকারে পুরাণগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহা খুব প্রাচীন নয়। পুরাণের আদি সঙ্কলক ছিলেন বেদব্যাস। সে সঙ্কলনের অন্নই অবশিষ্ট আছে। গুপ্তযুগে পুরাণ নুতন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল। বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলি গুপ্তযুগেরও পরবর্তী, কোথাও বা আরও পরবর্তী। ফলে হুতাদির বিবৃতি বলিয়া ‘পুরাণ’ নামে যে বিশাল পল্লবিত সাহিত্য আজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিভিন্ন যুগের নানা স্তর সংযোজিত।

আদৌ পুরাণের এতটা বিস্তৃতি ছিল না। আদি পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণ-সম্বিত,—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোন্মম্বন্তরাণি চ।

বংশাশ্রয়চরিতকৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্ ॥ [বিষ্ণু. ৬. ৮]

—সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (সৃষ্টির পর পুনঃ সৃষ্টি), বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ), মম্বন্তর (মহুর অধিকার কাল) এবং বংশাশ্রয়চরিত (বংশোদ্ভূত বিখ্যাত চরিত্র)—পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ।

অনেকে এই লক্ষণকে অব্যাপ্তি দোষে ভুট বলিয়া মনে করেন, কারণ, পুরাণে এই পঞ্চ লক্ষণ বহির্ভূত আরও অনেক বিষয়ের, যথা, ভুবনবিস্তার, জ্যোতিষ, তীর্থসাহায্য, দেবলীলা, দেবপূজা-পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমধর্মাদির বর্ণনা থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে, পঞ্চলক্ষণ উপপুরাণের, আসল পুরাণ দশলক্ষণযুক্ত [ব্র. বৈ. কৃষ্ণ. ১৩৩]। শ্রীমদ্ভাগবত মতেও পুরাণ এই দশলক্ষণাক্রান্ত^১ :—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ (ঈশ্বরাত্মগ্রহ), উত্তি (কর্মবাসনা), মম্বন্তর, ঈশাত্মকথা, নিরোধ (প্রলয়), মুক্তি ও আলয় (পরব্রহ্ম)। খুব সম্ভব আদি পুরাণ পঞ্চ লক্ষণযুক্তই ছিল এবং পঞ্চ

১। অত্র সর্গ বিসর্গস্থানঃ পোষণমুত্তরঃ।

মম্বন্তরেশাত্মকথা নিরোধো মুক্তিরালয়ঃ ॥ [ভাগ. ২. ১০]

লক্ষণের ভিত্তর সৃষ্টি ও বংশ বর্ণনা ছিল প্রধান। অধ্বববেদে পূর্ব পূর্ব কল্পের সৃষ্টি-তত্ত্ববিদ্যেকেই 'পুরাণবিৎ' বলা হইয়াছে।^১ পুরাণ-প্রবক্তা সৃষ্টজাতির স্বধর্ম ছিল বংশগতী ধারণ ['বংশানাং ধারণং কার্যম্'—পদ্ম. সৃষ্টি. ১]। এই সৃষ্টি ও বংশ বর্ণনারই পরিপূরক প্রতিসৃষ্টি, বহুত্বের ও বংশাভ্যুত্থিত। পুরাণের দশ লক্ষণও পঞ্চ লক্ষণের সম্প্রসারণ।

প্রথমত: 'সর্গ'। উহার অর্থ 'সৃষ্টি'। সাধারণভাবে পৌরাণিক সৃষ্টি নবদ্বা : ১. মহৎসর্গ (পুরুষের সারিষ্যে প্রকৃতির গুণবৈবক্ষ্যে 'মহৎ'ত্বের সৃষ্টি), ২. সূতসর্গ (অহঙ্কারাদি পঞ্চতন্ত্রাঙ্ক ও তাহাদের বিকারে স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি), ৩. ঐন্দ্রিয়িক সর্গ (দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং ঐন্দ্রিয়িক একাদশ দেবতা—চন্দ্র, দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতির সৃষ্টি), ৪. স্বাবর সর্গ (বৃক্ষগুণ্য-লতাদিগির সৃষ্টি), ৫. তির্থক সর্গ (জল ও তির্থক প্রাণিবর্গের উৎপত্তি), ৬. উদ্বাস্তোতা সর্গ (দেবগণের সৃষ্টি, ইহাকে দেবসর্গও বলে), ৭. অর্বাচশোতা-সর্গ (মানব সৃষ্টি), ৮. অমুগ্রহ সর্গ (ভূতাদির সৃষ্টি), ও ৯. কোমার সর্গ (ব্রহ্মার মানস প্রজা—নীললোহিত কুমার, নবব্রহ্মা—মরীচি, অজিরা, অজি, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, ভৃগু, বাশিষ্ঠ ও দক্ষ এবং মিত্রনাদি সৃষ্টি)।

এই নববিধ সৃষ্টির মধ্যে প্রথম তিনটি (মহৎ, সূত ও ঐন্দ্রিয়িক) প্রকৃতির বিকারে উৎপন্ন বলিয়া 'প্রাকৃত সর্গ' নামে খ্যাত। ইহাই পুরাণের আদি সর্গ। ইহা হইতেই ব্রহ্মাও ও ব্রহ্মার উৎপত্তি। পরবর্তী ছয়টি সৃষ্টি ব্রহ্মাকৃত। উহাকে 'ব্রাহ্মী সৃষ্টি' বা 'ব্রাহ্মসর্গ'ও বলে। উহা বৈকৃত ও প্রাকৃত-বৈকৃত ভেদে দুই প্রকার : স্বাবর সর্গ হইতে অমুগ্রহ সর্গ পঞ্চম পাঁচটি সৃষ্টি বৈকৃত, এবং নবম কোমার সর্গ প্রাকৃত ও বৈকৃত অর্থাৎ উভয়াত্মক। পুরাণে ব্রহ্মাই স্রষ্টা বা প্রজাপতি। স্বাবর সৃষ্টিই প্রথম। এই সৃষ্টি বাবতীর ব্রাহ্মসর্গের আদি বলিয়া ইহা 'মূখ্য সর্গ' নামে পরিচিত।

পুরাণমতে নিখিল সৃষ্টি নিগুণ, নিবিশেষ, সচ্চিদানন্দঘন বিত্ব পরমেশ্বরের লীলা। তিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ, নিবিশেষ হইয়াও বিশিষ্ট, এক হইয়াও বহু। নিগুণ ব্রহ্মের সমষ্টিভূত অব্যক্ত রূপ 'বিরাট'; ইনি সগুণ ব্রহ্মের প্রথম বিগ্রহ। বিরাটের রূপ অপ্রমের ও অচিন্তনীয়। তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাং। তাঁহার অনন্ত শরীরে বিভক্ত চতুর্দশ ভুবন (স্ব-ভুব-স্ব-বহ-জন-তপ-সত্য) এই সপ্তলোক এবং সপ্ততল (অতল-বিতল-স্থতল-তলাতল-মহাতল-রসাতল-পাতাল), ভুবনান্তর্গত সপ্তবীণ (জম্বু-

২। বেদে আসীদ্ব্যুত্থি: পূর্বা বায়ভাতর ইহ বিহু:।

যো বৈ তাং বিভাং নামধা স মন্তেত পুরাণবিৎ ॥ [অ. ১১. ১০. ৭]

প্রক-শাল্লব-কুশ-কৌক-শাক-পুষ্কর), বীপাস্তর্গত বর্ষ (বধা জহুদীপাস্তর্গত ভারতবর্ষ),
 সপ্তসাগর (বধি-সপি-কীর-কার-ইকু-হুয়া-ভ্রোহক), লোকাস্তর্গত জ্যোতিষ্চক বা
 কালচক্র—গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, বর্গ, নরক (রৌরব, মহারৌরব, তামিস্র, অন্ধ-
 তামিস্র, কালহস্ত, অসিপত্র, অবিচি, কুজীপাক প্রভৃতি একবিংশতি নরক),
 হাবির-জলমাদি সৃষ্টি, হুরাহুর নর, ধর্মাদর্ম, অখিল বেদ, নিখিল শাস্ত্র—এক কথায়
 ব্যক্তব্যক্ত সমগ্র সৃষ্টি। তিনিই একদেহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—স্রষ্টা, পালক, সংহর্তা।
 [‘য এক টেশো জগন্ আয়লীলয়া সৃজ্যতাব্যত্ৰি’—ভাগ ১. ১০. ৩৪]। ইনি প্রথমে
 জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন; তাহাতে প্রকৃতি হইতে প্রাকৃতসর্গ
 প্রবর্তিত হয়। প্রাকৃত মহাদাদি তৎ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টিকার্যে অক্ষম। পরমেশ্বরের
 অধ্যক্ষতায় উহার পরস্পর সংহত ও সংযুক্ত হইয়া একটি হিরণ্যর ‘অণু’ স্রজম
 করে [‘সংহত্যা দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসজন্’—ভাগ. ৩. ২০. ১৪]। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড।
 ইহা বিহু পরমেশ্বরের দ্বিতীয় শরীর। ইহাও ত্রিলোক, দ্বীপ, বর্ষ, মেরু, পর্বত ও
 সাগর-সমবৃত্ত। [‘তন্মিরণ্ডে দ্বিমে লোকা অন্তবিশ্বমিদং জগৎ’—লিঙ্গ. ১. ৩. ২৮]।
 সৃষ্টির সংহত রূপ ব্রহ্মাণ্ড—যেন বীজাস্তর্গত বৃক্ষ। স্বয়ং পরমেশ্বরই ব্রহ্মা রূপে
 অণ্ডে আবিস্তৃত বলিয়া ব্রহ্মার এক নাম ‘অয়ম্’। হিরণ্যর অণ্ডে উদ্ভূত বলিয়া
 তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মাই ব্যক্ত সৃষ্টির আদি পুরুষ, ইনি পরমেশ্বরের
 তৃতীয় শরীর। পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডে লোকালোক
 সংস্থান করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত সলিলে শয়ান
 থাকেন। অনন্ত সলিলে শয়ান বিহুকে বলা হয় ‘নারায়ণ’।^১ এষ্ট অনন্ত পুরুষের
 নাভিস্থিত ভূপদ্ম-কর্ণিকায় সমাসীন বেদময় ব্রহ্মা বিরাটাস্তর্গত অব্যক্ত সৃষ্টিকে ব্যক্ত
 রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার প্রত্যেকটি সৃষ্টি গভীর তাৎপৰ্যমণ্ডিত। তন্মধ্যে
 কোমার সর্গাস্তর্গত মিপুন সৃষ্টির গুরুত্ব সমধিক। প্রথমে তিনি মানসী প্রজা সৃষ্টি
 করেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রজাসৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি নিজ দেহকে বিধা
 বিভক্ত করিয়া নিজেই মিপুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষরূপ ধারণ করেন। পুরুষের নাম
 ঋয়ম্ভব ময়, স্ত্রীর নাম শতরূপা। এই দুই আদি মানব-মানবী হইতে বিব্রজগতে স্ত্রী-
 পুরুষ সংসর্গে সন্ততি-সৃষ্টির শ্রুতা প্রবর্তিত হইয়াছে।

১। পরমেশ্বরের ‘নারায়ণ’ নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে একটি অতি প্রাচীন শ্লোক
 প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই উদ্ধৃত হইয়াছে: ‘আণো নারা ইতি প্রোক্তা আণো বৈ
 নর হনব:। অয়নং তন্ত তাত: পূর্বং তেন নারায়ণ: স্তত:॥—অপ্ বা জলের এক নাম
 ‘নার’; ‘নার’ সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন। এই ‘নার’ পুরুষের অয়ন (অধিষ্ঠান স্থান)
 বলিয়া তাঁহার নাম ‘নারায়ণ’।

পুরাণের বিভিন্ন লক্ষণ ‘প্রতিসর্গ’। সাধারণতঃ সৃষ্টির পর পুনঃ সৃষ্টিকেই ‘প্রতিসর্গ’ বলা হয়। সৃষ্টির পর প্রলয় সংঘটিত হয়, প্রলয়ের পর আবার নবসৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। ‘প্রতিসর্গ’ এই চিরন্তন সৃষ্টি-লীলার পুনরাবর্তন। বৎসরান্তে যেমন পূর্ব পূর্ব বৎসরের কটুচিকণ্ডিলি ক্রমাগত আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই যুগান্তে পূর্ব-পূর্ব যুগের সৃষ্টি ও ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে।^১ কল্পারম্ভে বেদগর্ত ব্রহ্মাই তপস্বী বা অভিধান দ্বারা নবসৃষ্টির পত্তন করিয়া থাকেন। ইহাই ‘প্রতিসর্গ’।

ঐমধ্যাবসরতে প্রাকৃত সর্গ ই (মহৎ হইতে বিশেষাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাও সৃষ্টি) সর্গ, আর বাবতীয় সৃষ্টি ‘বিসর্গ’ বা প্রতিসর্গ। এই মতে আদি ব্রাহ্মসর্গও অর্থাৎ স্বাবর, তিব্বক, উপাস্রোতা, অহুগ্রহ ও কৌমার সর্গও প্রতিসর্গের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোম কোম পুরাণমতে ব্রাহ্মী সৃষ্টির পরে মরীচ্যাঙ্গি ঋষি, দক্ষ ও মহাদি প্রজাপতি যে সকল নৃতন সৃষ্টি প্রবর্তন করেন, তাহাই প্রতিসর্গ নামে গ্যাত।^২ এই মতে প্রাজাপত্য সৃষ্টিগুলিই প্রতিসর্গ।

প্রতিসর্গও বহু ব্যাপক। রুদ্র হইতে রুদ্রসর্গ, দক্ষ হইতে দক্ষসর্গ, মরীচি হইতে মরীচি (কল্পসর্গও ইহার অন্তর্গত), বশিষ্ঠ হইতে বশিষ্ঠ। এই প্রতিসর্গ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি। শুধু তাই নয়, প্রতিসর্গ ই নব নব সৃষ্টি-সভাবনার অঙ্গুর। বিভিন্ন যুগে বা করে প্রতিসর্গ দ্বারা নূতনতর সৃষ্টি প্রবর্তিত হইয়াছে। সমুদ্রমণ্ডনে উৎপন্ন হইয়াছে গরল ও অমৃত; বেণের রাজ্যকালে উৎপন্ন হইয়াছে ‘নিবান’ জাতি [ভাগ. ৪. ১৪]; পৃথুরাজার পৃথিবীদোহনে আবিস্কৃত হইয়াছে নূতন ঔষধি—তিনি পৃথবীর অভ্যন্তর ভাগ হইতে ধাতব পদার্থও আবিষ্কার করিয়াছেন, নতোরত বিষয়া কুম্বিকে সমস্তল করিয়াছেন এবং নিখিলবিধে এক এক বিশিষ্ট জমকে এক এক বিষয়ের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন [মৎস্য. ৮]; অজিরার প্রতিসর্গে প্রবর্তিত হইয়াছে বহু-মহা [‘মহ-মহাদয়ো যে বৈ তে সবেহজিরসঃ স্তবঃ’—কালিকা. ২৬], নারদীয় প্রতিসর্গে সৃষ্ট হইয়াছে গান্ধর্ববিদ্যা, বিমান ও প্রয়োত্তর [‘প্রয়োত্তরাস্তথৈবান্তে নৃত্যগীতক কোতুকম্’—কালিকা. ২৬], আর ঋষি বিশ্বামিত্র স্বজন করিয়াছেন দক্ষিণ আকাশে নবতর নক্ষত্রমালা ও সপ্তবিষণ্ডল [‘স্বজন দক্ষিণমার্গস্থান্

১। যথোক্তুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্বে।

দৃষ্টতে তানি তান্তেব তথা ভাবা যুগাদিযু। [পদ্ম. সৃষ্টি, ৩]

২। কুরো বিরাড্ মহদক্ষো মরীচ্যাচ্চান মানসাঃ।

বৎ বৎ সর্গঃ পৃথক চক্লুঃ প্রতিসর্গস্ত স স্তবঃ ॥ [কালিকা, ২৬]

সপ্তধিনপরাণ পুনঃ নকত্রালায়পরামস্বজং ক্রোধযুক্তিতঃ—রাশা. বাল. ৩০]।
আদির্সর্গে গ্রাম ছিল না, পুর ছিল না, দুর্গ ছিল না; পৃথু-রুতসর্গে নৃত্যন করিয়া
গ্রাম, পুর, দুর্গ (বাক-দুর্গ, পার্বত্য দুর্গ ও ঐশ্বর্য দুর্গ) নির্মাণের পদ্ধতি প্রয়োগনের
তাগিদে প্রচলিত হইয়াছে। প্রতিসর্গ নবসৃষ্টির প্রেরণাকে কল্প না করিয়া অনাগত পৌরুষ
সৃষ্টির সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত রাখিয়াছে।

তৃতীয়তঃ ‘বংশ’। ‘বংশ’ বলিতে বুঝায় ঋষি ও দেবসর্গজাত দেবগণের কুল।
বংশ-বর্ণনা বস্তুতঃ কুলশ্রী। ইহাতে বিদ্যুতপ্রায় সূদূর অতীতের এবং অদূর
অতীতের বংশ-সমূহের সম্বন্ধ-সম্বন্ধিত্বের নাম ক্রমানুসারে উল্লিখিত হইয়াছে।
ইহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসও বলা বাইতে পারে। এই ইতিহাসের বংশলতিকার
সেখাও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, কোথাও কল্পনাধারা গ্রথিত—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিকের।

বংশবর্ণনাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে পড়ে অনাদি যষ্টিজন্মের
দেববংশ, ধর্ম ও অধর্মের বংশ এবং অতি পুরাতন ঋষিবংশ। দেব-বংশ অষ্টবিধ : ১ দেব
২ পিতৃ (পিতৃবংশ সাতটি : অগ্নি, সোম, ইন্দ্ৰ, উষ্মা, আত্মা, ইন্দ্র, ইন্দ্র)
৩ অশ্বর, ৪ যক্ষ-রক্ষ, ৫ গন্ধর্ব-অঙ্গরা, ৬ সিদ্ধ-চারণ-বিভাদর ৭ ভূত
প্রোক্ত-পিশাচ এবং ৮ কিম্বদন্তি-কল্পকথ্য। ধর্ম ও অধর্মের বংশও বহু বিভক্ত। কমলধোনি
ব্রহ্মার বক্ষ হইতে ধর্মের জন্ম। তাঁহার দশ পত্নী—কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি
প্রজ্ঞা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি। এই সকল পত্নী হইতে ধর্মের বংশে সংপ্রবৃদ্ধি ও
সদৃশ্যাবলীর বিকাশ। অধর্ম ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার স্ত্রীর নাম
হিংসা। এই বংশের মহাভয়ঙ্কর সম্ভূতি অনুত, নিষ্ঠুরতা, ভয়, নরক, বেদনা ও বৃত্তা
[মার্ক ৫০]। সুপ্রাচীন ঋষি বংশাবলীর মধ্যে দক্ষকল্পাদির বংশ বহুখ্যাত। দক্ষের
পত্নী প্রমদিত (মতাস্তরে দীর্ঘিণী বা অসিকী)। এই পত্নী হইতে দক্ষের বষ্টি সংখ্যক
কল্পা জন্মে, তন্মধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরটি কল্পকে, সাতটিশটি চন্দ্রকে এবং নয়টি
নয়জন ঋষিকে ও সতী নাম্নী কল্পাকে কন্দকে সমর্পণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে
কান্তপ গোত্র বহুবিভক্ত। ‘কন্তপাং সকলঃ ভগং’—কথাটি মিথ্যা নহে। কন্তপ হইতে
দেবমাতা স্নানান্তে উৎপন্ন হয় দেববংশ, দ্বিতীয় হইতে দৈত্যকুল। কান্তপ গোত্রেই
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সূর্য, ইন্দ্র, বরুণাদি দেবতা—হিরণ্যাক হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি
দৈত্য—ব্রহ্মাদি দানব—নারদ-চিত্ররথাদি গন্ধর্ব—মিশ্রকলী-তিলোত্তমা-রম্ভাদি অঙ্গরা—
বৈমতেয় গন্ধর্ব—রাহু-কেশু ও সর্পকুল; বহু খ্যাত সূর্যবংশ ও কান্তপগোত্র-সম্ভব।
তুং হইতে ভার্গব বংশ, অজি হইতে সৌমবংশ, পুলস্ত্য হইতে যক্ষ-রক্ষবংশ, পুলহ

হইতে সিংহ-বায়-কক বংশ, অজিয়া হইতে বৃহস্পতি-বংশ প্রবর্তিত হয়। এইগুলিই অতি প্রাচীন কবিবংশ। প্রাচীন বলিয়াই উহা কল্পনাপ্রসূত।

বংশ-বর্ণনার দ্বিতীয় স্তরে পড়ে মতুবংশ এবং অবরকালীন কবিবংশ। মতুদিগের মধ্যে ষাটকুব মত এবং বৈবস্বত মতুর বংশ বহু বিখ্যাত। বৈবস্বত মতুর আদি সূর্যবংশ, এই বংশেরই উত্তরবংশ রঘুবংশ।^১ অত্রি চইতে বে সৌমবংশ প্রবর্তিত হয়, তাহা হইতে উত্তরকালে পৌরবংশ, যদুবংশ, ভাটভবংশ এবং কুরুবংশ বিস্তারলাভ করে।^২ এতদ্ব্যতীত জনকবংশ, শিবিবংশ, কৌশিক বিশ্বামিত্রবংশ, বশিষ্ঠবংশ ও ভার্গববংশও বহু খ্যাত। বংশ বর্ণনার এই স্তরটি অর্ধ ঐতিহাসিক। বিশ্বতপ্রায় ইতিহাস কল্পনা দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইহার ঐতিহাসিক মূল্য লঘু হইয়া গিয়াছে, তথাপি এদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের তথ্য সংগ্রহে উহার উপযোগিতা কম নয়। মতু হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জনৈক্য পর্যন্ত রাজাবলীর আখ্যানবহুল ইতিহাস এই বর্ণনার দ্বান্না করিয়াছে। মনে হয়, পৌরাণিক যুগের পরিসমাপ্তি পরীক্ষিৎকে লইয়াই। [বক্ষ. ৪ ১০]

ইহার পর ভগিন্দ্রবংশ বর্ণনা। ইহাই ঐতিহাসিক স্তর। পুরাণে ইহার যোজনানিঃসন্ধেহে পরবর্তীকালের, কারণ, এই বংশপর্বাতে উদয়ন, প্রসেনজিৎ ও প্রজ্ঞোতের নাম আছে : তাহা ছাড়া নন্দ, মৌগ, স্বপ্ন, কাশ, অজ্ঞ, সাতকর্ণী (সাতবাহন) প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের বংশতালিকা বিবৃত হইয়াছে। V. A. Smith প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই তালিকাকে ভারত-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া মনে করিয়াছেন।

এদেশের প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস-নির্মাণে পুরাণের বংশ-বর্ণনার মূল্য অসাধারণ। খনির সোনা যেমন খাদ মিশানো থাকে, তেমনই পুরাণে ইতিহাসের সত্য কল্পনা-মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া লইলে

১। সূর্যবংশের সাক্ষিপ্ত কুলপঞ্জী,

বিষ্ণুনাভ্যাজকো ব্রহ্মা মরীচিব্রহ্মণঃ স্ততঃ

মরীচো বস্ত্রপত্ন্যাম্ সূর্যো বৈবস্বতো মতঃ ॥

ততস্তন্ম্যাম্ তথেক্ষুকৃত্তম্ বংশে ককুৎস্থকঃ ।

ককুৎস্থস্ত রঘুস্তন্ম্যাজকো দশরথস্ততঃ ॥ [অরি. ৫ ৫]

২। চতুঃবংশের সাক্ষিপ্ত কুলপঞ্জী,

বিষ্ণু নাভ্যাজকো ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্রোহত্রিরত্রিতঃ ।

সোমঃ সোমাবুধ গুণ্ডামৈবল আসীৎ পুরুববাঃ ॥

ভদ্রাবদ্যু স্ততো রাজা নহবোধিববাতিকঃ । *

স্ততঃ পুরুবস্ত্রবংশে ভরতোহধ নৃপঃ কুরুঃ ॥ [অরি. ১০]

প্রাচীন ভারতেতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। বাহারা মনে করেন ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই, ভারতবাসীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই—এই বংশ-বর্ণনা তাঁহাদের মত পরিবর্তনে সহায়তা করিবে।

পুরাণের চতুর্থ লক্ষণ ‘মহন্তর’। ইহার সাধারণ অর্থ, মহুর অধিকার-কাল। এক মহুর হইতে অন্ত মহুর ভোগকালের অন্তর্বর্তী কালই মহন্তর : ‘মনোরন্তরমবকাশোহবধিৰ্বা অশ্রিগ্নিতি মহন্তরম্’ [শঙ্কতল্লক্ষ্মণত লিঙ্গপুরাণোক্ত বচন]। মহুর সংখ্যা চতুর্দশ।^১ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেদে মহুরগণ তিন ভাগে বিভক্ত : স্বায়ত্ব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ—এই ছয় মহুর কাল অতীত হইয়াছে ; সপ্তম বৈবস্বত মহুর, বর্তমানে তাঁহারই অধিকারকাল চলিতেছে ; ভবিষ্যতে আরও সাতজন মহুর আবির্ভূত হইবেন, তাহাদের নাম—সাবর্ণ, দক্ষসাবর্ণ, ব্রহ্মসাবর্ণ, ধর্মসাবর্ণ, ক্রতুসাবর্ণ, রৌচ্য ও ভৌত্য। অতীত-অনাগত ভেদে মহুর এই সংখ্যাগণনা বর্তমান বারাহ কল্পের। পূর্ব পূর্ব করে এইরূপ চতুর্দশ মহুর আরও অনেকবার আবির্ভূত হইয়াছেন। কোন মহুর কাল যখন প্রবর্তিত হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, সপ্তর্ষি ও মহুপুত্রগণ সহ মহুর আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মহন্তরে বিপর্যয় ঘটে, একপ্রকার প্রলয়ও সংঘটিত হয়, তখন মহুরসহ দেবতা, সপ্তর্ষি ও মহুপুত্রগণ কালে লয় প্রাপ্ত হন।

মহন্তরকালের পরিমাণ গণনায় প্রাচীন ভারতবাসীর কাল-জ্ঞানের হুম্মতিস্বস্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে মিনিট-সেকেণ্ড দ্বারা আমরা কাল গণনা করিয়া থাকি, প্রাচীন ভারতে ছিল নিমেষ-পর্য্যন্তের গণনা। কোন একটি বস্তুর ভোগকালই কাল। এই কালের সূক্ষ্মতম বিভাগ ‘নিমেষ’ : ‘অক্ষিপক্ষ পরিক্ষেপো নিমেষাঃ পরিকীৰ্তিতাঃ’—চোপের পাতার একটি মাত্র স্পন্দনকালই নিমেষ, উহাকে পলকও বলে। দুই নিমেষে এক ‘ক্রটি’ (কোন পদার্থের দৃষ্টমান ক্ষুদ্রতম অংশ ‘ত্রসরেণু’ যে কালপরিমাণ ভোগ করে, তাহাই ক্রটি—ভাগ ৩. ১১), তিন নিমেষে এক ‘ক্ষণ’ ; ছয়ক্ষণে এক ‘দণ্ড’, দুই দণ্ডে এক ‘মুহূর্ত’ (‘দ্বাদশক্ষণ পরিমিতঃ কালঃ’—মেদিনী), সাড়ে সাত

১। মহুর: স্বায়ত্ব: পূর্ব: তত: স্বারোচিষো মত:।

ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥

যড়ৈতে মনবোহতীতা: সান্দ্রতস্ত রবে: স্তত:।

বৈবস্বতোহয়ং যন্তৈতৎ সপ্তমং বর্ততেহন্তরম্ ॥.....[কূর্ম, পূর্ব, ৫০]

ভবিগ্নতি চ সাবর্ণো দক্ষসাবর্ণ এব চ ;

দশমো ব্রহ্মসাবর্ণো ধর্ম একাদশ: স্তত: ॥

ষাদশো ক্রতুসাবর্ণো রৌচ্য নামা ত্রয়োদশ:।

ভৌত্য ক্ষত্বদশ: প্রোক্তা ভবিজ্ঞা মনব: প্রমা: ॥ [কূর্ম, পূর্ব ৫২]

যে এক গ্রহের, অষ্ট গ্রহের এক 'অহোরাত্র'। পনের অহোরাত্রে এক 'পক্ষ'; দুই পক্ষে এক 'মাস'—মাসের দুই পক্ষে যে মাস হয়, তাহাই পিতৃগণের এক দিন-রাত্রি—কৃকপক্ষ পিতৃগণের দিবস, শুক্লপক্ষ রাত্রি [কালিকা ২৫]। মহুগ্ধ্যমানের ছয় মাসে এক 'অন্নন'; দুই 'অন্ননে' (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) এক বৎসর। মাসের এক বৎসরে দেবগণের এক দিব্যরাত্রি—দক্ষিণায়ন দেবতার রাত্রি, উত্তরায়ণ দিন। 'অন্নন-দক্ষিণ রাত্রি দৈবানামুত্তরং দিনম্'—বিষ্ণু ১. ৩]। দিব্য ষাটশ সহস্র বৎসরে এক চতুর্যুগ (চতুর্যুগ = সত্য, ত্রেতা, ত্রাপর ও কলি), এইরূপ এক সপ্ততি চতুর্যুগে এক 'মহন্তর'; চতুর্যুগ মহন্তরে এক 'কল্প'—টোটে ব্রহ্মার একদিন ['ব্রহ্মণো দিবসে বিপ্রা মনবন্ত চতুর্দশঃ'—কূর্ম পূর্বঃ]। কল্পান্তে প্রলয় সংঘটিত হয়, আসে ব্রাহ্মীনিশা—এই নিশাও এক কল্পকাল স্থায়ী হয়। এইরূপ দুই কল্প ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। ব্রাহ্মমানের তিনশত বাট অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর; এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পক্ষমায়ু—তাহাকে 'পর' বলে; এই পরের অর্ধেক 'পরাদ্বি'। পরাদ্বি কালের বিপুলতম পরিচিত বিভাগ।

কালেট সৃষ্টি, কালেই ধ্বংস। তাই কাল গণনায় 'প্রলয়'-এর প্রশ্ন আসে। প্রলয় চারি প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যাত্মিক। প্রতিনিয়ত ভগতে যে বৃত্ত্য সংঘটিত হইতেছে, তাহা নিত্য প্রলয়; ব্রহ্মদিবার অবসানে, অর্থাৎ কল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় সংঘটিত হয়; এই প্রলয়ে সৃষ্টি একাধারে পরিণত হয়; হিপরাঙ্কে প্রাকৃত প্রতিসঙ্কর বা প্রাকৃত প্রলয় ঘটে, তখন সমগ্র সৃষ্টি প্রকৃতিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়।^১ মহাপ্রলয় মহা-বিপর্যয়। তখন ষাটশ সূর্যের কিরণে ব্রহ্মাও উত্তপ্ত হয়, প্রচণ্ড অগ্নিগাহনে সৃষ্টি দগ্ধ হইয়া যায়। এই সময় একসঙ্গে উনপঞ্চাশ মরুৎ প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। তারপর সংবতাপ্য মহামেঘসকলের সকার হয়—কোন মেঘের বর্ণ দলিতাজন সন্নিভ, কোন কোন মেঘ ধূস্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ। তাহার পবিতাকারে বা কুতরাকারে আবির্ভূত হইয়া ঘোর গর্জনে, প্রবল বর্ষণে সৃষ্টিকে একাকার করিয়া দেয়। তখন রাত্রি থাকে না, দিন থাকে না, আকাশ-পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার কিছুই থাকে না, থাকেন শুধু নিরাধার, নিরাকার, নিঃস্ব, বিশেষণবঞ্চিত, সাক্ষদানন্দধন 'একং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমান্'।^২ 'আত্যাত্মিক প্রলয়ে'—

১। ভক্তান্তে সবসবানাম্ বহেতো প্রকৃতৌ লয়ঃ।

ভেনায়ঃ প্রোচ্যতে সন্তিঃ প্রাকৃতঃ প্রতিলকরঃ ॥ [কূর্ম পূর্বঃ ৫]

২। নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি—

নানীং ভবো জ্যোতির্নভূ চাক্ষুঃ।

জ্যোত্বাবিবৃদ্ধ্যাহশালভ্যমেকং

প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমান্ভবানীং ॥ [বিষ্ণু ১.২ ; কালিকা ২৫]

জানী ও বোপিনপ এই 'একমেবাদিতীয়ম্' ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। প্রলয়ের এই অনন্ত শূন্য অবস্থাই পুনঃ সৃষ্টির পূর্বাবস্থা। পুরাণমতে যেখানে লয়, সেইখান হইতেই সৃষ্টি। প্রলয়ই সৃষ্টির হেতু [আত্মাত্মিক প্রাকৃতিকত্ব বোধ্যঃ নৈমিত্তিকত্ব প্রতিদর্শন হেতুঃ— বায়ু ৩. ২৩]। সৃষ্টি ও প্রলয় একই দেবতার দুই লীলা।

পুরাণের পঞ্চম লক্ষণ 'বংশাশ্রয়িত্ব'। বংশাশ্রয়িত্ব বলিতে বুঝায়, কোন বংশোদ্ভূত প্রবর অর্থাৎ কীর্তিমান্ দেব, ঋষি ও পৃথ্বীপালগণের চরিত্র ['দেবষি পাথিবানাঞ্চ চরিতম্—বিষ্ণু ১. ১']। স্বর্ষবংশের প্রাচ্যাত পুরুষ ইক্ষাকু, নাভাগ, ককুৎস্থ, রঘু। চন্দ্রবংশ উজ্জল করিয়াছেন পুরুষা, নচ্ষ, যযাতি। স্বায়ম্ভুব মন্তর কুলপাবন পুত্র ঋষ। দৈত্য ও দানবকুলেও কীর্তিমান্ সম্বানের অভাব হয় নাই। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, বলি, বিরোচন—দানবকুলের বুজ, পুরাণপ্রসিদ্ধ। এইরূপে দেব, ঋষি বা যযাদির বংশে দানে-ধ্যানে-তপস্যায়-রাজ্যশালনে যাহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, বংশাশ্রয়িত্ব তাঁহাদের কীর্তিগাথা। বংশাশ্রয়িত্বের অর্থ আর একটু প্রসারিত করিলে অবতারাদি চরিত্রও এই পর্ষায়ে পড়ে। ভাগবতোক্ত ঈশাস্তকথা বংশাশ্রয়িত্বেরই সম্প্রসারণ। কারণ পরশুরাম, বলরাম, রাম প্রভৃতি অবতার মতের কোন বংশকে অবলম্বন করিয়াই আবির্ভূত। পূর্বব্রহ্ম রুদ্রও যতুকুলোদ্ভব।

বংশাশ্রয়িত্ববর্ণনা পুরাণের একটি বৃহৎ অংশ। চরিত্র বর্ণনা দ্বারা পুরাণকার পুরাণের অন্ততম উদ্দেশ্য—'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ', 'ধর্মস্ত স্মৃদ্ধাগতিঃ', 'মহাজনো যেন গত্যঃ স পদ্ব্যঃ' প্রভৃতি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। মনোজ্ঞ কাহিনীর মাধ্যমে ইহাতে সংকর্ম, সদাচার ও নীতিধর্মের জয় উলোচিত হইয়াছে। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে, আদর্শ স্থাপনে ও সংকর্মানুষ্ঠানে পৌরাণিক চরিত্র অশেষ প্রেরণার উৎস।

এই পঞ্চ লক্ষণের সহিত বিবিধ আখ্যান (অয়ংদূত কথা), উপাখ্যান (প্রত্যাখ্যেয় কথন), গাথা (পিতৃ বা ঋষি কর্তৃক গীত প্রাচীন শ্লোক) ও কল্পশ্রুতি (শ্রাদ্ধকল্প ও ব্রত-পূজাদির বিধান) যুক্ত করিয়া পুরাণকার বাসদেব পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।^১ ইহার ফলে পুরাণের বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিপুলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কালক্রমে পুরাণবক্তা স্মৃতিগণও উহাতে বিবিধ কথা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সংকলনকালে হিন্দু-ব্রাহ্মণ সংস্কারের নানা বিষয়ও যুক্ত হইয়াছে। ফলে অধুনাপ্রচলিত পুরাণ হইয়াছে সার্বভৌমিক হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। ইহাতে না আছে, এমন বস্তু নাই। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ, দর্শন, পূজাপদ্ধতি, নানা সংস্কার ও কুসংস্কার

১। আখ্যানৈশ্যাপ্যাপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশ্রুতিভিঃ।

পুরাণ সংহিতাঃ চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ ॥ [বিষ্ণু ৩.৬]

—সবই পুরাণের অন্তর্গত। পণ্ডিতপ্রবর Winternitz বলেন, 'They afford us a far greater insight into all aspects and phases of Hinduism—its mythology, its idol-worship, its theism and pantheism, its love of god, its philosophy and superstition, its festivals and ceremonies and its ethics, than any other works. [A Hist. of Ind. Lit Vol I]

—উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

২. পুরাণের বিশিষ্টতা

পঞ্চ লক্ষণ দ্বারা পুরাণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মে, উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথাও জানা যায়। জনসাধারণের মধ্যে বোধার্ঘ্য প্রচার করা পুরাণের অন্ততম লক্ষ্য। বেদের মর্যাদা গূঢ় ও রহস্যময়। পুরাণ জনসাধারণের বেদ, তাই উহা বেদের সরলতর বিস্তৃত ভাষা। শুধু তাই নয়, পুরাণে লোক-সংস্কার ও বিশ্বাসকেও অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

(i) পুরাণে লোক-সংস্কৃতি : বেদাদি সাহিত্যেও লোক-সংস্কৃতির মিশ্রণ রহিয়াছে। উন্নাসিকতা থাকিলেও অযজ্ঞা, অত্রতা ব্রাত্যদের আচার-আচরণ, মনু-তত্ত্বের প্রতি অঙ্কুরিত বিশ্বাস বেদে স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থব্রহ্মে ও ব্রাহ্মণে ব্রাত্যগণ সুউচ্চ দেব-মর্যাদার অধিকার পাইয়াছেন। কোথাও গ্রাম্যদেবতা, কিংবা পাপদেবতা নির্ধারিত স্থানলাভ করিয়াছেন। বেদ অপেক্ষা পুরাণে এই মিশ্রণ আরও স্পষ্ট ও বহুব্যাপক।

পুরাণে যুতি-কল্পনা, যুতির অধিষ্ঠানভূমিরূপে দেবস্থান (ধান) বা তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠা, দেবতার প্রতি ভক্তির আধিক্য এবং দেবপুজার প্রচুর প্রচলন দেখা যায়। বৈদিক যুগে যদ্বিও বিগ্রহবৎ দেবকল্পনা ছিল, কিন্তু সত্যই দেবতার কোন বিগ্রহ ছিল না। পুরাণে দেবতামাত্রই যুতিমান বিগ্রহ।^১ পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দুর যে অখ্যাতি, তাহার প্রচার পুরাণ হইতেই। দেবতায় প্রতিমা-প্রতীক প্রাণার্য যুগে

১। পাঁচাত্তম পণ্ডিতগণ মনে করেন, ভারতবাসী যুতি-কল্পনার জন্ম গ্রীকদিগের নিকট স্বামী। ইহা সত্য নয়, কারণ, গ্রীক আগমনকালেও যে এদেশে হারকিউলিসের অনুরূপ (সম্ভবতঃ কৃষ্ণ) এবং ডায়োনিসাসের অনুরূপ (সম্ভবতঃ শিব) বিগ্রহ ছিল, মেগাস্থিনিসের To India বা ভারত-বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। দেবযুতির প্রচার এদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রচলিত। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কৃত যুগ্মীয় যুতিগুলি তাহার সাক্ষ্য। মনে হয়, যুতিকল্পনা প্রাণার্য জাতি হইতেই বিস্তারলাভ করিয়াছে। মহাভারতে দেখা যায়, নিবান-তনয় একলব্য গুরু দ্রোণের যুগ্ম যুতি গড়িয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন। [মহা, আদি. ১৩৪]

প্রচলিত থাকিলেও উহার প্রতিষ্ঠা পুরাণে। এই দেবতার লীলা-কাহিনী, অধীর্ভান-কৃষিরূপে অনাথ্য তীর্থ ও দেব বলিদানদিয় প্রতিষ্ঠাও পুরাণে। দেবযুতিকে স্বীকার করিয়া লঙ্কার, পাণ্ড-অর্ঘ্য-আচমনীয়-স্নানীয়-পুষ্প-চন্দন-ধূপ-কীপ-নৈবেদ্য যোগে দেবতার বাহু পূজা এবং দেবতার সুদীর্ঘ স্তব-স্ততির বাহুল্যও পুরাণের ব্যাপার। ভাবাত্মিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, ‘পূজা, ফুল’ প্রভৃতি শব্দগুলি অনু-আর্ষভাণ্ডারের শব্দ। পুরাণ-প্রবক্তা ব্যাসদেব নিজের স্বীকার করিয়াছেন, অরুণের রূপকল্পনা, সর্বব্যাপীকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা এবং অনির্বচনীয়কে স্তব-স্ততিতে বচনীয় করিয়া তুলিবার প্রয়াস—তিনি নূতন করিয়া প্রবর্তন করিয়াছেন। ব্যাসদেবের এই স্বীকৃতি পৌরাণিক প্রতীমাকল্পনার, স্ততিরচনার ও তীর্থ-কল্পনার লৌকিক প্রভাবেরই সূচনা করে। পুরাণের দেববিগ্রহে, ভক্তির মাত্রাধিক্য, বাহু পূজার আড়ম্বরে এবং তীর্থিক মনোভাবে নিঃসন্দেহে আর্ষেতার সংস্কারের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

পুরাণের দেবতাও বৈদিক দেবতা হইতে ভিন্নতর। বেদের ইন্দ্র-অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বরুণ পুরাণের প্রধান দেবতা নন। পুরাণে প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব [‘ব্রহ্মা-বিষ্ণু-কৃত্রাণাঃ সাহায্যঃ’—মৎস ৪৪]। ইহাদের সহিত আছেন শক্তিদেবতা দুর্গা বা কাত্যায়নী বা চণ্ডী। বেদে ব্রহ্মা নামের প্রতিষ্ঠা ঐক্য পরবর্ত্তী কালের। অবশ্য প্রজাপতির প্রজাপতিত্ব, বেদে ও পুরাণে একই প্রকার। বেদের বিষ্ণু ও রুদ্র পৌরাণিক বিষ্ণু ও রুদ্র হইতে স্বতন্ত্র। বেদে বিষ্ণু সূর্যের প্রকারভেদ, পুরাণে বিষ্ণু স্থিতির দেবতা। বেদের ত্রিপাদক্ষেপী বিষ্ণু পুরাণে ত্রিবিক্রম, তিনি বলির শাস্তা ধামন অবতার। শুধু তাই নয়, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শ্রেণিক কমলাপতি ও ভক্তবৎসল ভগবান। হিতুঁক মুরলীধারী রুদ্রের সহিত তাঁহার অভিন্নতাও লক্ষণীয়। গোপকুলের সহিত বিষ্ণুর সম্পর্ক আবিষ্কার পুরাণেরই অভিনব কল্পনা—আর এই কল্পনার সহিত লোকজগতের সম্পর্ক অতি নির্বিড়। পুরাণের রুদ্র সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। বেদে রুদ্র ঐশ্বরিপতি, ভয়ঙ্কর দেবতা; শতকদ্রিয় হস্তে তিনি দহ্য-ভঙ্করের পতি। বেদের রুদ্রাধ্যায়ের রুদ্র পুরাণে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, এখানে তিনি প্রধানতঃ ভূত-প্রৈত্যাদির অধীশ্বর; উপরন্তু পৌরাণিক শিব নটরাজ—প্রলয়ের দেবতা, নগ্ন ভিখারী, উমাপতি ও আন্ততোষ; সর্বাপেক্ষা বড় কথা পুরাণের রুদ্র মহাযোগী, তিনি যোগীশ্বর। বৈদিক সাহিত্যে দুর্গা ও উমাহেমবতীর নাম আছে। কিন্তু সেখানে শক্তিদেবীর ভূমিকা প্রধান নয়। পুরাণে দুর্গা ও উমাহেমবতী বিশিষ্ট শক্তি-মূর্তি; দুর্গা দম্ভজ-দলনী, মহিষমর্দিনী—উমা শ্রেণিকা ও তপস্চারিণী অপরী—উভয়েই শিব-শক্তি। পুরাণের শিব ও শক্তি অম্বর-রাক্ষসের উপাত্ত—ইহাও লৌকিক প্রভাবের

দিক হইতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাণের লীলাবাদের শক্তির স্বীকৃতি, সাংখ্যের প্রকৃতিকে পুরুষের স্বীকৃতি করণা, যোগের অধিদেবতারূপে শিবের প্রতিষ্ঠা এবং শিবশক্তির মেলন কিরূপে 'যোগ', দেবতার রূপ-চিন্তনই ধ্যান—এগুলির মধ্যেও লোক-সংস্কারের প্রভাব অল্প নয়।

(ii) সরলীকরণের চেষ্টা পুরাণের অপর বৈশিষ্ট্য। বেদ-দর্শন-তন্ত্রের পরবর্তী যুগটিই বিশেষভাবে পৌরাণিক যুগ। ইহা জনসাধারণের উপযোগী করিয়া রচিত বলিয়া ইহাতে বেদের দুরূহতা, ক্রিয়াকর্মের জটিলতা, দর্শনের কঠিনতা ও তন্ত্রের নরকসমরতা বশাসম্ভব পরিহার করা হইয়াছে। পুরাণ যেন বঙ্গের সমস্ত লোকের ত্বরি, ইহাতে বন্ধুরতা নাই, প্রকৃতসম ভূতাদের কাঠিন্য নাই, নীরসতা নাই। পুরাণের ধর্ম, কর্ম, দর্শন—সবই সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য। বেদের বাগ-বজ্র ব্যাবহল। পুরাণে সৌম্যবাক সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'ন সর্বসাধ্যো বজ্রোঃ বহুরো বহুদক্ষিণঃ' [ত্র. বৈ. কৃষ্ণ. ৩০]। রাজস্বর ও অশ্বমেধ যজ্ঞও তথৈব চ। পুরাণে তাই ধর্মোচরণের সহজ ব্যবস্থা—ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞের পরিবর্তে স্বল্পব্যয়ের ব্রহ্ম-পার্বণের নির্দেশ—উন্নাত্ত, মাহেশ্বরী ব্রহ্ম, সার্বভৌমত, বিভিন্ন তিথি ও বারব্রহ্ম। দর্শনের জটিলতাও পুরাণে সরলীকৃত। নিগুণ নিবিশেষ তত্ত্ব স্বীকৃত হইলেও উপাসনার ব্যাপারে পুরাণে সগুণ ব্রহ্মেরই প্রাধান্য।^১ নিগুণ নিরাকারকে ধারণা করা কষ্টকর; পুরাণে তাই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিমা, বসন, ধ্যান স্থিতি, দেবতার প্রতি ভক্তি এবং পূজাচরিতা দ্বারা দেবতার তুষ্টিবিধানের প্রয়াস। তৎসাদনাও পূজাবহল। কিন্তু তন্ত্রের পূজা যন্ত্রাঙ্ক, যন্ত্রাঙ্ক ও যোগাঙ্ক বলিয়া জটিল—পৌরাণিক পূজানিদি সরল ও জটিলতা-বঞ্চিত। এখানে শূকোপচারেও দেবপূজার বিধান আছে। উপচার যদি না হিলে তাহাতেও কতি নাই—পুরাণমতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপচার।

পুরাণের 'শাখাও সহজ সরল। লোকব্যবহারের উপযোগী সহজ সংস্কৃত ভাষাই পুরাণের ভাষা। এই ভাষায় শব্দের দুরূহতা নাই, ব্যাকরণের কড়া কড়ি নাই। ইহা অলঙ্কার ও বাচস্প্যবঞ্চিত। পুরাণের এই ভাষা ব্রাহ্মণের সরল ও অনাড়ম্বর গানের কথা স্বরণ করাইয়া দেয়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থমাংশের গল্প যেন ব্রাহ্মণেরই গল্প।

(iii) পুরাণের আর একটি বিশেষত্ব সময়প্রচেষ্টা। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সময় যেন আছেই, উপরন্তু আছে নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্মের সময়, অর্থাৎ ও বৈতথ্যের সক্তি, বেদাঙ্ক ও সাংখ্যের মিলন, জ্ঞান ও ভক্তির সমীকরণ। বিগ্রহবৎ

১। ত্রৈলোক্যিকতত্ত্ববোধিনীসঙ্ঘাচার্য্য চেষ্টালাভ।

অব্যাক্তাহি গতিঃঃঃ দেহবস্ত্রিবাশ্যতে । [গীতা ১২.৫]

দেবতার প্রতি একান্ত ভক্তি-বিশ্বাসই এই সময়স্বাক্ষরের মণিমাণ্ডল। পুরাণমতে সর্বকৃতে দেবতার অধিষ্ঠানবোধই জ্ঞান, সেই দেবতার শ্রীত্যাগে পূজা-অর্চনাই কর্ম, এবং দেবতার প্রতি ভক্তি ও প্রশস্তিই মুক্তিসাধনের উপায়। দেবতাই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির একাত্মরূপ। দেবলীলার প্রতি পুরাণের অগাধ বিশ্বাস। এই লীলাবাহে স্বর্গ ও মর্ত্য প্রেমভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, লীলার রহস্যময় স্বভাবপ্রকাশ শক্তিকে স্বীকার করায় বেদান্তের মায়্যা, সাংখ্যের প্রকৃতি ও তত্ত্বের পরমাশক্তির মধ্যেও একটি আশোষ-মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে। সৃষ্টি-তত্ত্বেও সমীকরণের চেষ্টা প্রবল,—অব্যাক্ত ও ব্যাক্ত এখানে এক দেবতার দুই দিক ; এই সৃষ্টি-প্রকরণে জ্ঞান-বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি ও বস্তু পুরুষবাদ এবং বেদান্তের ব্রহ্মবাদের একতান ধ্বনিত হইয়াছে।

(iv) কাহিনী-প্রাধান্য পুরাণের অপর বিশেষত্ব। পুরাণ কথা ও কাহিনীর মহাসমুদ্র। কি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায়, কি বংশকীর্ণনে, কি তীর্থ-মহাত্ম্য বোষণায়, ধর্মার্থ পরিজ্ঞানে, সমাজের কথনে, শ্রাভকর্ম বর্ণনে, অক্ষয়ন্ত কাহিনীর সমাবেশ। দক্ষযজ্ঞ, সমুদ্রমন্थন, মন্বন্তর, উমা-মেনকা সংগাম, হর-পার্বতী বিবাহ, ত্রিপুরমর্দন, মহাযাতুর-মর্দন, শুভনিত্য বধ, বৃদ্ধসংহার, ধ্রুব-চারণ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, বলির লক্ষ্মণ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র সংবাদ, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা কাহিনী, পুত্ররথ-উবলীকৃত্যন্ত, রামলীলা, রুক্মলীলা ও বিবিধ দেবীলীলা—কাহিনীর যেন শেষ নাই। কথায় কথায় কাহিনী, কাহিনীর ভিতর আবার কাহিনী-সম্পৃষ্ট।

এই কাহিনীট সরল পঞ্চলক্ষণ-সমর্পিত পুরাণকে বিপুল ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সংযোজন ও কপোল-কল্পনাকেও প্রস্রব দিয়াছে এই কাহিনী। লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব কল্পনার অতিরঞ্জন ও বর্ণনার বাহুল্য—এই কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। কাহিনী গুলিই কৃষ্ণ-স্বাক্ষরের আকর। ইহা দ্বারা সাধারণের মধ্যে বঙ্গমূল ধারণা জন্মিয়াছে যে, রাহ বা কেতু সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে কতই গ্রহণ হয়, কৃষ্ণপৃষ্ঠে ধরণী অবস্থিত থাকায় কৃষ্ণের দেহ আকাশনে ভূমিকম্প হয়। কাহিনীগুলিই খেব-নির্ভরতাকে দূর করিয়া পুরুষের পৌরুষকে তুল্য করিয়াছে।

কিন্তু, এই কাহিনীর আবার অল্প দিকও আছে। কাহিনীগুলি জীবনের স্বাদে পূর্ণ। মাহাত্ম্যের কামের পরিণাম, আত্মরী ভাবের শোচনীয় গতি, দৈবভাবের দয়া, ক্ষমা, ধান ও ধর্মের মহিমা ও জীবের ভাবাচার স্বপ্নবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির কাহিনীর আবেদন চিরকালীন। নীতিধর্মের জয়-ধোষণার পৌরাণিক কাহিনীর মূল্য অসাধারণ। কতকগুলি কাহিনী রূপকল্পিত। সাহিত্য-কৃতি হিসাবে ইহাদের মূল্য অপরিণীম। তত্ত্বের দুর্বল অটলতা এই কাহিনীর মাধ্যমে সরল ও সরস হইয়া উঠিয়াছে।

৩. পুরাণ পরিচয়

(i) পুরাণের সংখ্যা ও শ্রেণী বিভাগ

পুরাণের সংখ্যা আঠার ['অষ্টাদশ পুরাণানি'] এবং উহাতে ষোট চারি লক্ষ শ্লোক । পূর্বে পুরাণ একখানি ছিল, ব্যাসদেব তাহাকে আঠার খানি সংহিতায় বিভক্ত করেন । কবাহসারে পুরাণগুলির নাম—(১) ব্রাহ্ম, (২) পাদ্ম, (৩) বৈকব, (৪) শৈব বা বায়বীয় (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) আর্যেয়, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বারাহ, (১৩) স্বাক্ষ, (১৪) বামন, (১৫) কোর্ষ, (১৬) মাত্ত, (১৭) গারুড় ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ড ।*

এই পুরাণগুলিকে কোথাও কোথাও সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে । পুরাণমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ষাণ্ডক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রতীক । দেবতার গুণভেদে তাই পুরাণেরও প্রকারভেদ । ভাগবত, নারদীয়, গারুড়, পাদ্ম, বারাহ ও বিষ্ণুপুরাণ সাংখ্যিক ; ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন পুরাণ রাজসিক এবং শিব, লিঙ্গ, স্বাক্ষ, অগ্নি, মাত্ত ও কূর্ম পুরাণ তামসিক ।

কিন্তু, পুরাণগুলির এরূপ অবাস্তব ভেদকল্পনা অব্যক্তিক । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব গুণত্রয়ের বিশিষ্ট প্রতীক হইলেও পুরাণের এই ত্রিযুতি মূলতঃ এক । শুধু তাই নয়, সাংখ্যিক পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য আছে (যেমন পাদ্ম-স্রষ্টা), রাজসিক পুরাণে বিষ্ণুর মহিমা ঘোষিত হইয়াছে (যেমন, ব্রহ্মবৈবর্ত ও বামন), আর্যেয় তামসিক পুরাণেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত লইয়াছে (যেমন স্বাক্ষ পুরাণের উৎকল খণ্ড), আর্যেয় মার্কণ্ডেয় বামন ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে শক্তি-মাহাত্ম্য । কাজেই গুণ বা দেবতা ভেদে পুরাণের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সহিত লৌকিক সংস্কারের মিশ্রণে পুরাণগুলির উদ্ভব । মনে হয়, এই লৌকিক সংস্কারের প্রভাবের ক্রমাধিক্য বিচার করিয়াই পরবর্তীকালে পুরাণের এই অবাস্তব ভেদ কল্পিত হইয়াছে ।

* ব্রাহ্ম পাদ্ম বৈকবক বায়বীয় তথৈবত

ভাগবতঃ নারদীয়ঃ মার্কণ্ডেয়ক কীর্ত্যতে ॥

আর্যেয়ক ভবিষ্যক ব্রহ্মবৈবর্ত লিঙ্গকে ।

বারাহক তথা স্বাক্ষঃ বামনঃ কূর্মসাম্বিকম্ ॥

মাত্তক গারুড়ঃ তথঃ ব্রহ্মাণ্ডাখ্য ইতি ত্রিযুগৎ ॥ [নারদীয় পুরাণ]

(ii) অষ্টাঙ্গ পুরাণের পরিচয়

ব্রহ্ম পুরাণ : পুরাণগুলির মধ্যে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মপুরাণকেই সর্বাঙ্গে হান দেওয়া হয়। ইহা পূর্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে দেবতা ও অসুর এবং স্বর্গ ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি বিবরণ আর উত্তর ভাগে আছে তীর্থাদির বর্ণনা, শিষ্টাচার ও বর্ণাশ্রমধর্মের কথা; শেষের দিকে সাংখ্য, যোগ ও জ্ঞানের আলোচনা। উত্তর ভাগের অন্ততম আখ্যান বিস্তৃত কুরুচরিত। তীর্থাদির বর্ণনার উদ্ভিগ্নার তীর্থ-মন্দিরাদির উল্লেখও দৃষ্ট হয়। এই অংশ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ।

পদ্ম পুরাণ : পদ্ম বা পদ্মপুরাণ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত : সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। সৃষ্টিখণ্ডে পুলস্ত্য-ভীষ্ম সংবাদে শুরুর মাহাত্ম্য, ব্রহ্মবজ্র, বিবিধ ব্রতকথা এবং শৈলজার জন্ম, বিবাহ, কাটিকেশ্বরের জন্ম এবং তারকাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। ভূমিখণ্ডের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—পিতৃ-মাতৃ-পুত্র, বৃদ্ধ-নহব-ব্যাতির উপাখ্যান এবং সত্যী আশোক-সুন্দরীর কাহিনী। স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, লোকসংস্থান ও তীর্থাদির বিবরণ; শেষাংশে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও ব্রতাদির কথা। পাতালখণ্ডে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী সহ পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। পাতালখণ্ডে রামায়ণ-কাহিনী নানাদিক হইতে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। ইহাতে লব-কুশের সহিত রামসৈন্যের যুদ্ধের বিবরণ আছে। উত্তরখণ্ডে হর-পার্বতী সংবাদে পর্বতের কাহিনী, নগররাজার উপাখ্যান এবং গদা-গঙ্গা-প্রয়াগ-কাশীর মহিমা। উত্তরখণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ ‘গীতা মাহাত্ম্য’ ও ‘ভাগবত মাহাত্ম্য’। উত্তরখণ্ডে নানাদিক হইতে বৈকব লক্ষণাক্রান্ত। এই উত্তরখণ্ডের পরিশিষ্ট ‘ক্রিয়াযোগ সার’। ইহাও বৈকবগণের অতি আদরণীয়। ক্রিয়াযোগ-সারে বর্ণিত মাধব-চন্দ্রকলার উপাখ্যানের সহিত ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাহ্রদের কাহিনীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণু পুরাণ : এই পুরাণ বৈকবদের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার দুই ভাগ—প্রথম ভাগটিই মূল্যবান। ইহা পরাশর-মৈত্রেয় সংবাদে ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সৃষ্টি পত্তন, কল্লান্তে পুনঃ সৃষ্টি এবং দেব ও ঋষি বংশের বর্ণনার সহিত আছে ক্রব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান। দ্বিতীয় অংশে আছে কুম্ভগল বর্ণনা, ঈশ ও বর্ষ সংস্থান এবং প্রিয়ব্রত ও জড় ভরভের উপাখ্যান। তৃতীয় অংশের আরম্ভ মহত্তর বর্ণনা লইয়া। তাহার পর বেদব্যাসের অবতার, বেদবিভাগ ও পুরাণ-সংহিতা প্রণয়নের—ইতিহাস। এই অংশেই শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাও সনাতন কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আছে বেদবিরোধী বিগমর ও রক্তাক্ষর সন্ন্যাসীদের নিন্দা :

এতে পার্বত্যনঃ পাশা নহি এতানালপেদ্ বৃথঃ ।

পুণ্যং নস্ততি সস্তাবাদেতেবাঃ তদ্বিনোত্তবম্ ॥ [বিষ্ণু. ৩. ১৮]

—ইহারা পাবতী, পাশী ; পাণ্ডিত ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না ।

ইহাদের সস্তাবণে সেই দিনের পুণ্য নষ্ট হয় ।

চতুর্থ অংশ বংশাশুচরিত্ত বর্ণনা । দ্বর্ষ ও সোমবংশ হইতে ভবিষ্য রাজবংশ—শিশুনাগ-বংশ, বৌধ, হুদ, কথ ও অজ্জবংশের বিবরণ । ইহা গচ্ছো রাঁচতঃ ; মাঝে মাঝে অতি প্রাচীন গাথাকাতীয় শ্লোক । মনে হয়, গুপ্তযুগে যখন পুরাণগুলি পুনর্লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়েই এই ভবিষ্য অংশ যোজিত হইয়া থাকবে । বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ ঈশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত । ইহার রাস ও গোপীগীত অংশ অতি মধুর । ইহাতে রাখার উল্লেখ নাই । কৃষ্ণ শরচ্ছত্রের চক্রিকায় গোপীদের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন—‘সহ গোপীভির্মনস্ক্রে রতিং প্রাপ্তিঃ’ যত্ব অংশে কলি-জাত চরিত্র, চতুর্বিধ লয় ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে । বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চলক্ষ্যসংবিত্ত একটি প্রাচীন পুরাণ ।

বামু পুরাণ : এই পুরাণ শিবপুরাণ নামেও খ্যাত । ইহা পূর্ব ও উত্তর—এই দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথমভাগে সৃষ্টিপ্রকরণ, বংশবর্ণন, মহেশ্বর কথন, পাশুপতযোগ, দানবর্ষ, রাজবর্ষ ও গয়াস্বর বৃত্তান্ত ; উত্তরভাগে প্রধানতঃ শঙ্কর-নর্দমা-কাহিনী । এই পুরাণটিকে প্রায় সকলেই স্রষ্টাচীন বলিয়াছেন । ইহাও পঞ্চলক্ষ্যসংবিত্ত । রুহলোকে বান ও রুহস্ব লাভ করাই এই পুরাণমতে পুরুষার্থ । ভারতবর্ষের প্রায় জনপদগুলির বর্ণনায় এই পুরাণে প্রবল, বজ্রয়, মালদ, প্রাগজ্যোতিষ, বিদেহ, মগধ ও তাম্রলিপ্তের নাম উল্লেখিত হইয়াছে [বামু ৬০] ।

ভাগবত পুরাণ : পুরাণগুলির ভিতর অস্ত্যতম ভাগবত । শাস্ত্রগণ মনে করেন, ‘ভাগবত’ বলিতে ‘দেবী ভাগবত’কে বুঝায় । কিন্তু কি ভাবার দিক হইতে, কি বিষয়বস্তুর দিক হইতে দেবীভাগবতে প্রাচীনতার লক্ষণ অল্প । উহাতে মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার পূজাবিধানও স্থান পাইয়াছে । ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় মহাশক্তির বিবিধ লীলা ও দেবীমাহাত্ম্য । ইহাতে রাবণবধের জন্ত রামচন্দ্রের নবরাত্রি বিধানে দেবীপূজার উল্লেখ আছে [তৃতীয় স্কন্ধ, ৩০ অধ্যায়] । দেবীভাগবত মতে দেবীই ‘কারণং সংজ্ঞাত্বান্ম’, শুধু তাই নয়, ‘তস্তাঃ শক্তিঃ বিনা কোহপি স্পন্দিতুন কস্মৈ ভবেৎ’ । দেবীভাগবত বহুল পরিমাণে তত্ত্বলক্ষণাক্রান্ত ।

১। গভাংশের নমুনা : মহানন্দহৃতঃ শূদ্রগর্ভোত্তবোহতিলুকো মহাপন্ননন্দঃ
...তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুৎসৃজতি । তেবামভাবে মোধ্যান্চ পৃথিবীঃ
ভোক্যন্তি । কোটিল্য এব চন্দ্রশুভং রাজ্যে অভিধেক্যতি । ইত্যাদি ।

ভাগবত বলিতে প্রচলিতার্থে বৈষ্ণব ভাগবতকেই বুঝায়। ইহা বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-গ্রন্থ এবং চৈতন্যদেব-প্রচারিত গোড়ীয় প্রেম-ভক্তি ধর্মের আকর। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয়। ইহা নিগম-নির্গমিত কল্পতরুর অন্তত। ইহা ‘বাহু বাহু পদে পদে’। ত্রিমুখভাগবত ছাড়া অন্য কোনও ভিত্তি : প্রথম হচ্ছে পরীক্ষিতের উপাখ্যান, দ্বিতীয় হচ্ছে পুরাণলক্ষণ ও সৃষ্টি-প্রকরণ, তৃতীয় হচ্ছে বিহুরচরিত ও ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃন্দাঙ্ক, চতুর্থে সতী চরিত্র, ঐব চরিত্র ও প্রাচীনবহির আখ্যান—পঞ্চমে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান ও ব্রহ্মাণ্ডসংগত লোক-সংস্থান বর্ণনা, ষষ্ঠ হচ্ছে অভ্যাসিল-চরিত্র, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ও বৃন্দাঙ্কের কাহিনী, সপ্তমে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্ম কথন, অষ্টমে গজেন্দ্রমোক্ষণ, নবমের নিরুপণ বলির বৈভব ও মংস্তাবতার এবং নবমে সূর্য ও সোমবংশের বিবরণ। দশমকল্প ভাগবতের প্রধান অংশ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলার অংশ অতি মধুর। প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম ব্রজলীলার অন্ততম বিষয় ; ভাগবতে রাখার নাম নাই, কিন্তু রাসলীলাকালে কৃষ্ণ যে একজন গোপীর আরাধনার [‘অনরা-রাধিতো’] প্রীত হইয়া অন্তান্ত গোপীকে ভ্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া রহঃস্থানে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ এত ভাগ্যবতীকেই রাখা বলিয়া মনে করেন। ভাগবতের গোপীপ্রেম অনন্তসাধারণ। এই প্রেমই চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ। চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা এই নিঃসার্থ গোপী-প্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত। দশমকল্পের রাসলীলার অংশে গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রেমের নিকট চিরঞ্জী কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

ন পারয়েচ্ছং নিরবন্তসংযুজাং

স্বসাদুকৃত্যং বিবৃণাৎবাপি বঃ।

যা সাত্ত্বজন্ দুর্জয় গেহশৃঙ্খলাঃ

সংযুক্ত্য তবঃ প্রতিষাতু সাধুনা ॥ [ভাগ, ১০, ৩২, ২২]

—তোমরা গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, এ মিলন অনিচ্ছনীয়। দেবগণের পরমাহু লাভ করিলেও আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিব না ; তোমাদের স্তম্ভীলতা দ্বারা আমি অক্ষণী হইলাম।

ভাগবতের একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ জ্ঞান, বোগ ও ভক্তির কথায় পূর্ণ। ভগবদ্ভক্তিই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। ভাগবত-শ্রবণের ফলও ভক্তি। অনেক বৈয়াকরণ বোশদেবকে ভাগবতের রচনাকার বলিয়া মনে করেন। বোশদেব ভাগবত নয়, ভাগবতের অল্পকর্মী ‘হরিদৌলা’র রচনাকার।

নারদীয় পুরাণ : এই পুরাণখানিও বিষ্ণুভক্তি বিষয়ক। ইহার পূর্ব ও উত্তর—এই

ছই ভাগ। পূর্বভাগ চারিপাশে বিভক্ত : প্রথমপাশে সৃষ্টি বর্ণনা, দ্বিতীয়ে মোক্ষোপায় বর্ণনা-প্রসঙ্গে বেদাঙ্গ কখন, ত্রিতীয়ে সৎসনার ও পঞ্চোপাঙ্গনার বিবৃতি, চতুতীয়ে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে পুরাণলক্ষণ ও ত্রিধিত্রতাদির বর্ণনা এবং চতুর্থে সনাতন কর্তৃক নারদের প্রতি বৃহদাখ্যান কখন। উত্তরভাগে প্রধানতঃ তীর্থবর্ণনা। তীর্থাদির মধ্যে বৈষ্ণব পীঠের বর্ণনাই মুখ্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ : এই পুরাণ ১০৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বিভিন্ন অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে হরিস্কন্দকথা, দত্তাত্রের কাহিনী, মদালসা চরিত্র, সৃষ্টিপত্তন, বীণ ও বর্ষ বর্ণনা, চতুর্দশ মন্ত্রর কাহিনী, অষ্টম মন্ত্র পূর্বসাবণি মহন্তর প্রসঙ্গে 'চণ্ডী সপ্তশতী', রামায়ণ কথা, কৃষ্ণচরিত ও সাংখ্যযোগ বিবৃত হইয়াছে। আচার্য Winternitz এই পুরাণখানিকে, 'one of the oldest works of the whole Purana Literature' বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে ইহা খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত।

বস্তুতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ তো আছেই। উপরন্তু উহাতে অনেক প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। রাণী মদালসার কাহিনী অলৌকিকত্ব মিশ্রিত হইলেও অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তিনি দেহত্যাগ করেন। মদালসা তাঁহার সম্ভানদিগের নিকট 'তত্ত্বমসি' ধুমপাড়ানি গান পাহিতেন। বিভিন্ন মন্ত্রর কাহিনীগুলিও বিচিত্র। এই পুরাণের সর্বাংশে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৮১ হইতে ২৩ অধ্যায় : ইহাই প্রসিদ্ধ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা দেবী সপ্তশতী। পাক্ষান্ত্য পণ্ডিতগণ এই তেরটি অধ্যায়কে ষষ্ঠশতকের প্রাক্কিপ্তাংশ বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী সপ্তশতী প্রাক্কিপ্তও নয়, অবান্তরও নয়। এই পুরাণে মহন্তরবর্ণনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আরোচিব মহন্তরে মতামায়াচণ্ডীর আবির্ভাব প্রসঙ্গক্রমেই বর্ণিত হইয়াছে। রাজা সুরথ এই মহন্তরে দেবীর আরাধনা করিয়া পরবর্তীকালে সাবণি নামক অষ্টম মন্ত্র হইয়াছিলেন। একদা রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈষ্ণব সংসারবিরক্ত হইয়া বনে আসেন। কিন্তু বনে আসিয়াও তাঁহার সংসারের বন্ধনের কথা ভুলিতে পারিলেন না। কেন এই যারা ? কে এই যারা ? কি তাঁহার প্রকৃতি ? মুনিবর মেধস এই সকল প্রশ্নের প্রসঙ্গে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই খ্রীষ্টচণ্ডীর বর্ণনায় বিবরণ। ঋষি বলিলেন,

নিত্যৈব সা জগদ্বৃন্তি তয়। সর্বমিদং ততম্।

তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা ক্রয়তাং মম ॥ [খ্রীষ্টচণ্ডী—১.৬৪.]

—সেই মহামায়া নিত্য। প্রশংস জগৎ তাঁহারই প্রতিমা। তিনি নিত্য হইলেও বহুপ্রকারে তাঁহার আবির্ভাব হয়—সেই বৃদ্ধান্ত শ্রবণ কর।

'দেবীমাহাত্ম্য' দেবীমালার এই বিচিত্র কাহিনী। সাতশত মন্ত্রে দেবীর

প্রথম চরিত্র (মধুকৈটভ বধ), মধ্যম চরিত্র (মহিবাহুর বধ) ও উত্তর চরিত্র (তত্ত-নিতত্ত বধবৃত্তান্তে যুদ্ধলোচন, চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজ বধের কাহিনী) বিবৃত। ইহার বর্ণনা কবিস্বয়ম্বর, ভাবাও প্রাচীনতর। চণ্ডীতে লৌকিক ছন্দও ব্যবহার করা হয় নাই, গায়ত্রী, উৎকিঞ্চ ও অমৃতপু এই তিনটি বৈদিক ছন্দে যথাক্রমে চরিত্রত্রয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবীভবের মূল রহিয়াছে ঋগ্বেদের দেবীস্তুত্রে [ঋ. ১০. ১২৫] এবং রাজস্তুত্রে [ঋ. ১০. ১৩৭]। চণ্ডীপাঠের পূর্বে এই স্তুত পাঠ করিবার নিয়ম আছে। চণ্ডীসপ্তশতীর প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীসপ্তশতীর 'মোর্ধ' বা 'কোলাবিধ্বংসী' শব্দগুলি অপ্রাচীন। কিন্তু, এই 'মোর্ধ'—ঐতিহাসিক মোর্ধ নয়, ইহারা দৈত্য 'মুর'-এর বংশধর। 'কোলাবিধ্বংসী'কেও জোর করিয়া স্ববনার্থে প্রয়োগ করা অসঙ্গত।

অগ্নিপুরাণঃ পুরাণগুলির মধ্যে অগ্নিপুরাণের স্থান অষ্টম। ইহা ৩৮৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। Winternitz বলেন, "The distinctive feature of this Purana is however, its encyclopaedic character"—উক্তিটি সর্বাংশে সত্য। বিষয়-বৈচিত্রে অগ্নিপুরাণ অনন্ত। ইহাতে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-মহাভারত, সৃষ্টি প্রকরণ, দ্বীপবিধান, অভিষেকপদ্ধতি, দেবালয়নির্মাণ, তীর্থ-মাহাত্ম্য, লোক-সংস্থান, জ্যোতিষশাস্ত্র, যুদ্ধপ্রণালী, অভিচারাদি ঘটকর্ম, ভেষজবিজ্ঞা, শ্রাদ্ধকল্প, তিথিব্রত, রাজধর্ম, শত্ননিবিজ্ঞা, ধর্মবর্ষদ, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্যবিচার, ব্যাকরণ, যোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান—স্বাভাবীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে কাহিনীঅংশ অতি অল্প, ইহা বিধি-বিধানেরই বিস্তৃত বিবরণ। ইহা হিন্দুর অষ্টাদশবিজ্ঞা ও চৌষটি কলাশাস্ত্রের সার সঙ্কলন। ৩৩৭—৩৪২ অধ্যায় বট্ ক কাব্যবিচারের দিক হইতে অতি মূল্যবান। অগ্নিপুরাণমতে মর্ত্যালোকে কবিত্ব দুর্লভ বস্তু ['কবিত্বং দুর্লভং তত্র'], কাব্য-সংসারে কবি বয়ং প্রজাপতি :

অপারে কাব্য-সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।

যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথৈদং পরিবর্ততে ॥ [অগ্নি. ৩৩৯. ১০]

ভবিষ্য পুরাণঃ এই পুরাণ পাঁচটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের নাম ব্রাহ্ম পর্বঃ ইহাতে সূর্য্যাদির চরিত্র, সৃষ্টাদি লক্ষণ ও কল্পবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব প্রধানতঃ ব্রহ্মা-মহিমা-বিষয়ক। দ্বিতীয় পর্বে ভোগ বিষয়ে শিবমাহাত্ম্য, তৃতীয়ে মোক্ষ বিষয়ে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, চতুর্থে চতুর্বর্গবিষয়ে সূর্যমাহাত্ম্য এবং পঞ্চমে প্রতিসর্গ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণঃ এই পুরাণখানি লইয়া তুমুল তর্কের স্রবোগ ঘটিয়াছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান আকারের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকে পুরাণগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'ইহার রচনা প্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্য-

দিপের রচনার বস্তু' [কৃষ্ণচরিত, ৭শম পরিঃ]। কিন্তু, তিনি একথাও স্বীকার করিয়াছেন
জয়দেব, বিভাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।
অতএব এই পুরাণখানি বস্তু প্রাচীনই হউক, উহা ৭শম শতকের পরবর্তী নহে।

বাংলার জনসাধারণের উপর এই পুরাণের প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশের
কতকগুলি লৌকিক দেবতা—মনসা, চণ্ডী—এই পুরাণে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, জয়দেবের 'মৈথৈর্মেধুরমধরম্'—এই
শ্লোকটির আদর্শ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ; শুধু তাই নয়, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে যে রাধার
কথা আছে, 'সেই রাধাই নূতন বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই
শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাম্রাজ্যে অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন।' কিন্তু আশ্চর্যের
বিষয়, সনাতন গোষ্ঠ্যসমীকৃত 'ভাগবতাস্ত' বা গোপালভট্ট রচিত 'হরিশক্তিবিলাস'
ব্যতীত চৈতন্য চরিতামৃতাদির মত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে এই পুরাণের উদ্ধৃতি নাই;
স্বীকৃতিও নাই। তাই ইহার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়াই থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ চারি খণ্ডে বিভক্ত : ব্রাহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড ও কৃষ্ণজন্ম
খণ্ড। ব্রাহ্মখণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণ, নারদ-ব্রহ্মা বিবাদ, নারদের শিবলোকে গমন ও গান
শিক্ষা—প্রকৃতি খণ্ডে নারদ-সাবর্ণি সংবাদে কৃষ্ণ হঠাৎ প্রকৃতির অংশ ও কলাসকলের
উৎপত্তি ও পুষ্কার বর্ণনা—গণেশখণ্ডে গণেশের জন্ম, কার্তিকেয় জন্ম, কার্তবীৰ্য ও
পরশুরামের রক্তাস্ত এবং কৃষ্ণজন্মখণ্ডে—কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকা-
লীলার বর্ণনা। এই পুরাণমতে কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম এবং রাধা তাঁহার স্বরূপ শক্তি,

প্রাণাধিদাত্রী দেবী সা কৃষ্ণস্ত পরাশ্রয়ঃ।

আবিবর্ত্ত্ব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ [ব্রাহ্ম ৫.২৭]

ইহাতে 'রাধা' নামের ব্যুৎপত্তিও দেওয়া হইয়াছে : রাসমণ্ডলে উৎপন্ন হইয়াই
তিনি কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম রাধা। ব্রহ্মবৈবর্তে শক্তি-
বাদের প্রভাব ওরূপের।

লিঙ্গপুরাণ : ইহা পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে সৃষ্টি প্রকরণ,
যোগাখ্যান, কল্লারজ, লিঙ্গোদ্ভব ও লিঙ্গপুতা, ভুবন কোষ বর্ণনা, শিবমাহাত্ম্য, সূর্য ও
চন্দ্রব্যংগের কাহিনী, বরাহ-বৃকিংহরিত, দক্ষযজ্ঞ নাশ,, কামদহন ও শিব-পার্বতীর
বিবাহ। উত্তর ভাগেও শিব-মাহাত্ম্য। লিঙ্গপুরাণ শৈবধর্মের কথার পূর্ণ, ইহাতে
তাত্ত্বিকতার প্রভাব আছে।

বরাহ পুরাণ : ইহাও পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে গৌরীর
উৎপত্তি, বিনায়কের কথা, নাগের কথা, অগস্ত্যসীতা, রুদ্রসীতা, ব্রত ও তীর্থকথা।

উত্তর ভাগে আছে পুন্ড্র-কুরাঙ্গ সংবাদে তীর্থের মাহাত্ম্য, বিবিধ ধর্মোপদেশ ও পুণ্যকথা। ইহাতে শিবচরিত্রের কাহিনী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কঠোপনিষদের যম-নটিকের কাহিনীটিও ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণ : পুরাণগুলির মধ্যে স্কন্দপুরাণ সর্ববৃহৎ। ইহাতে মোট ৮১,০০০ শ্লোক। নারদীয় পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ২৫০০০ এবং পদ্মপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৫৫০০০। অগ্ন্যুক্ত পুরাণের শ্লোকসংখ্যা আরও কম। মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা মাত্র ১০০০। পুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আকার সর্বাপেক্ষা ছোট। স্কন্দপুরাণের বিখ্যাত সাতটি খণ্ড : মাহেশ্বরখণ্ড, বৈষ্ণব খণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, অবন্তীখণ্ড, নাগরখণ্ড ও প্রভাস খণ্ড। মাহেশ্বর খণ্ড প্রধানত: শিব বিষয়ক, ইহাতে দক্ষযজ্ঞ, পার্বতীর উপাখ্যান, কাতিকেশ্বরের জন্ম, তারকাসুর বধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবখণ্ডে—উৎকলে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্রোণের উপাখ্যান, রথঘাতা, গুণ্ডিচাআখ্যান—ভীষ্মপঞ্চক ব্রত, অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত ও তীর্থের কথা। বৈষ্ণবখণ্ড প্রধানত: বিষ্ণুভক্তি বিষয়ক। ব্রহ্ম খণ্ডে—সেতুবন্ধ মাহাত্ম্য, রাক্ষসখ্যান, ও রামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। শেবাংশে দক্ষযজ্ঞ, পার্বতীর জন্ম ও তারকবধ কাহিনী। ব্রহ্মখণ্ডের একটি উত্তর ভাগ আছে, তাহাতে আছে শিবমাহাত্ম্য, ভীষ্মমাহাত্ম্য ও উমামাহেশ্বর ব্রত। ইহাতে ঋক্বেদোক্ত ব্রহ্মাধ্যায়ের প্রশংসা আছে। কাশীখণ্ডে—সত্যলোকের প্রভাব, পতিব্রতা চরিত্র ও লোক সংস্থান বর্ণনাস্তর, কাশীর বিবরণ। এই খণ্ডে শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক। ভারতচন্দ্রের অরুণামঙ্গলের কাশীপ্রতিষ্ঠার বিষয়—কাশীখণ্ড হইতেই সংগৃহীত। নাগরখণ্ডে লিঙ্কোৎপত্তি, হরিস্কন্দ কথা, বৃদ্ধাসুর বধ, নাগরোৎপত্তি ও গঙ্গা, নন্দা ও সরস্বতী নদীর বৃত্তান্ত। প্রভাসখণ্ডেও নানারূপ তীর্থের বর্ণনা ও বহুতর প্রাচীন কথা আছে। স্কন্দপুরাণ সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামস পুরাণগুলির একটি সমাহৃত রূপ।

বামন পুরাণ : ইহা পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে হরললিত, কামদাহ, দেবাসুর যুদ্ধ, দেবীমাহাত্ম্য, বলির উপাখ্যান ও বিবিধ তীর্থাহুকাণ্ড। উত্তর ভাগের চারিটি সংহিতা—মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী ও গাণেশ্বরী। এই পুরাণে শিবশক্তির প্রাধান্য। Wilson সাহেব মনে করেন, ইহা মাত্র ৩০ শত বৎসরের গ্রন্থ।

কুর্জপুরাণ : কুর্জ পুরাণকেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বলিয়াছেন। কুর্জ পুরাণেরও চারিটি সংহিতা ছিল, তন্মধ্যে কেবল ব্রাহ্মী সংহিতাখানি পাওয়া গিয়াছে। এই সংহিতা পুরাণের পঞ্চলক্ষ সমন্বিত এবং পূর্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব ভাগের বর্ণনীয় বিষয়—সৃষ্টিপত্তন, দেববংশ ও ঋষিবংশ এবং ভূবনকোষ। উপরিভাগে আছে তীর্থমাহাত্ম্য ও শাস্ত্রকল্প। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে আছে দুইখানি

প্রসিদ্ধ গীতা—ঈশ্বরগীতা ও ব্যাসগীতা। কূর্মপুরাণকে বেদের মন্ত্রতাপ ও কর্মকাণ্ডের মায়নমুচ্চয় বলা বাইতে পারে। ইহাতে হিন্দুর নিত্যকর্মপদ্ধতিও হানলাভ করিয়াছে।

মৎস্ত পুরাণ : মৎস্ত পুরাণের আরম্ভ মনু-মৎস্ত সংবাদ লইয়া [১ম ও ২য় অধ্যায়]। মহাপ্রলয়ের প্রবল প্রাবনে অবতাররূপী মৎস্তের নির্দেশে মনু কি ভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ইহাতে আছে। মনুর নিকট মৎস্তপ্রোক্ত পুরাণই 'মৎস্তপুরাণ'। মনু-মৎস্ত আখ্যান অনেকটা বাইবেলোক্ত Noah কাহিনীর অনুরূপ। ব্রাহ্মণেও মনু-মৎস্ত কাহিনী রহিয়াছে। এই পুরাণে সৃষ্টি, মনুষ্য, তীর্থকথা প্রাদুর্ভাব, বাস্তবিকতা এবং প্রতীমা ও মণ্ডপ লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্য রাজবংশের প্রসঙ্গে যে তালিকা আছে, V. A. Smith তাহাকে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া মনে করেন।

গরুড় পুরাণ : ইহা পূর্ব ও উত্তর দুই খণ্ডে সমাপ্ত। পূর্বখণ্ডে তাক্কর কথ্য এবং উত্তরখণ্ডে প্রোক্তকল্প কথ্য। তাক্কর কল্পে সূর্য, লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতার পূজা, অষ্টোক্তযোগ, জ্যোতিষ, শ্রাদ্ধ, গ্রহযজ্ঞ, ব্রতোক্তি, আত্মবেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ-শাস্ত্র বেদান্ত, সাংখ্য, ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান কথিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে আছে ঔরুবেহিক ক্রিয়ার বিবরণ; ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সমলোকমার্গ, প্রোতপীড়া, প্রোতমোক্ষণ ও প্রোতাদির প্রয়োজন বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ : ইহা অষ্টাদশ পুরাণের শেষ পুরাণ। ইহা প্রক্রিয়াপাদ, অমৃত্যুপাদ, উপোক্ত্যপাদ ও উপসংহারপাদ—এই চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে কৃতাসমুদ্দেশ, নৈমিষাখ্যান, হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি ও লোককল্পন কথ্য—দ্বিতীয়ে কল্প-মহাস্তরাখ্যান, মানসসৃষ্টি, রুদ্রোৎপত্তি ও ভুবনকোষ বর্ণনা—তৃতীয়ে সপ্তর্ষির কাহিনী, মনু-উৎপত্তি, বংশাঙ্কচরিত—রজি, যযাতি, কান্তবীৰ্য, ভার্গব ও কলিযুগের ভবিষ্য রাজবংশের বিবরণ এবং চতুর্থে বৈবস্বত মনুর, ভবিষ্যৎ মনুর কর্ম ও কল্প-প্রলয়।

৪. উপপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণের ভাষা উপপুরাণও আঠারখানি। প্রাচীন পুরাণগুলিতে উপপুরাণের নাম দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ব্রহ্ম বৈবর্ত, গরুড় ও কূর্মপুরাণে উপপুরাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। উপপুরাণের নাম এক এক স্থলে এক এক প্রকার। ব্রহ্মবৈবর্তমতে মহাভারত, রামায়ণ, পাঁচখানি পঞ্চরাত্র (সনৎকুমারীর, বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কামিনী ও গৌতমীয়) এবং ব্রহ্ম, শিব, প্রহ্লাদ, গৌতম ও কুমার—এইগুলি উপপুরাণ। কিন্তু কূর্ম ও গরুড় পুরাণদ্বয় নামগুলিই লবধিক প্রচলিত; উহাদের সংখ্যা ও নাম এক প্রকার; যথা; (১) সনৎকুমার

(২) নারসিংহ, (৩) কুমার, (৪) শিব, (৫) দুর্বাশা, (৬) নারদ, (৭) কাশিল,
(৮) বামন, (৯) উশনা, (১০) ব্রহ্মাণ্ড, (১১) বাক্য, (১২) কালিকা,
(১৩) মাহেশ্বর, (১৪) শাখ, (১৫) সৌর, (১৬) পরাশর, (১৭) মারীচ ও (১৮) তৃণ ।*

পুরাণগুলি 'অশৌকবের'। ব্যাসদেব ইহার সঙ্কলয়িতা। কিন্তু উপপুরাণগুলি রচনা। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিয়া বিভিন্ন ঋষি সংক্ষেপে উপপুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন। কোন-না-কোন ঋষির নামে উপপুরাণের নাম, যদিচ শিব, ব্রহ্মাণ্ড ও কালিকাপুরাণ সেরূপ নহে। উপপুরাণগুলিও পুরাণের মত সর্বার্থ-সাধক।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণজয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, ব্রহ্মস্বর ও বংশাভ্যুত্থিত লক্ষণ সমন্বিত পুরাণকে বলা হইয়াছে—‘এতদ্রূপাণাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্ভাঃ’। বস্তুতঃ উপপুরাণেও পুরাণের পঞ্চলক্ষণ আছে। কিন্তু, উপপুরাণের প্রধান লক্ষণ—পুরাণের দার্শনিক মত ও আচার-বিচারগুলির বিস্তৃত বর্ণনা। উপপুরাণ একদিকে দর্শন শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত, অপরদিকে ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি; উহা বহুলাংশে তন্ত্রস্পৃষ্ট।

উপপুরাণগুলিকে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত—এই তিন ভ্রৌণীতে ভাগ করা যায়। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, সনৎকুমারীয়, গোতমীয় ও কাশিল পঞ্চরাত্র নামে বিখ্যাত। বৈষ্ণবীয় দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চরাত্র মতে ভগবান বাসুদেবই পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্ব অজ্ঞানভাবে শক্তিয়ুক্ত। প্রপঞ্চসৃষ্টি এই শক্তির বিক্রিয়া।

বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি ছাড়া উপপুরাণগুলির মধ্যে সৌরপুরাণ ও কালিকাপুরাণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৌর পুরাণ ব্রহ্মপুরাণের খিল অংশ [‘ইহং ব্রহ্মপুরাণস্ত খিলং সৌরমহাস্তমম—সৌর, ২.১৪’]। কিন্তু সৌর পুরাণ বস্তুত একটি শৈব পুরাণ [‘শিবকথাশ্রয়ম্’]। ইহা ৬২ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার শ্লোকসংখ্যা ছয়হাজার। ইহাতে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে, লিঙ্গ মাহাত্ম্য, যোগের অষ্টবিধ সাধন, হরোৎপত্তি এবং হরপার্বতীর বিবিধ লীলা। ইহাতে শিবনিম্নকরূপে মধ্বাচার্যের বিবরণ পাওয়া যায়

● আত্মং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম্ ।

তৃতীয়ং কান্দমুদ্রিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতম্ ॥

চতুর্থ শিবধর্মীধ্যং সাক্ষারলীল ভাষিতম্ ॥

দুর্বাশাসোক্ত মাস্তব্যং নারদীয়মতঃপরম্ ॥

কাশিলং বামনকৈব তথৈবোশনসৌরীতম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডং বাক্যকৈব কালিকাহ্রমেব চ ॥

মাহেশ্বরং তথা শাখং সৌরং সর্বার্থ সঙ্করম্ ।

পরশরোক্তং মারীচং তথৈব ভার্গবাহ্রয়ম্ ॥ [কুর্ম. পূর্ব. ১.১৭-২০

[৩১ অঃ]। মধ্বাচার্য এখানে যোগ নাস্তিকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। শৌর পুরাণ মতে শিব একটি বায়লতত্ত্ব : শিব অর্থ শিব-শিবা, বক্রিদ্বাদিক। শক্তির স্তার শিব-শিবা অস্তিত্ব।

কালিকা পুরাণ শাক্ত-দ্বন্দ্বাত্মক সমন্বিত। ইহা কমঠাদি মূনি ও মার্কণ্ডেয় সংবাদে ২০ অধ্যায়ে বিভক্ত। কালীর ক্রিয়াকলাপ কি, তাহাই এই পুরাণের প্রধান বর্ণনীর বিষয়। ইহাতে ব্রহ্ম-সৃষ্টি, সন্ধ্যা কাম-রতির উৎপত্তি, মহাদেবকে বোহিত করিবার জন্য দক্ষকন্যা-রূপে মহামায়ার আবির্ভাব, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, সতীর দেহত্যাগ, সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি বর্ণনা, নরকাসুর বৃন্তাস্ত, পাবতীর জন্ম, মদনভঙ্গ, শিববিবাহ, কালীর গোমুখলাভ ও শিবের অর্দ্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি ও দেবীপূজাবিধান বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের অন্ত্যতম বিষয়ণ বেতালভৈরবের উপাখ্যান, চন্দ্রশেখর কাহিনী ও কামাখ্যা তীর্থের বর্ণনা [৬২ অঃ]। ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিকথা [৮২ অঃ] ইহার আর এক কাহিনী। এই পুরাণখানি কামরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। ইহাতে কামরূপ, চন্দ্রশেখর, প্রাণ-জ্যোতিষপুর এবং ত্রিপুরার মাহাত্ম্য প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের উল্লেখ রহিয়াছে।

রামস্বামীগ্রন্থার্থায় রাবণস্ত বধায় চ।

রাজীবের মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুন্না ॥ [কালি, ৬০, ২৬]

কালিকাপুরাণ মতে কামরূপ শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং কালিকাদেবী পরমাত্মা, স্বরূপিনী। তিনিই সৃষ্টির বীজ, স্থিতির কারণ এবং অস্তকারিণী শক্তি। তিনি মহামায়া, 'মহামায়ৈতি সা প্রোক্তা'—তিনিই জীবজগতকে আমোদযুক্ত ও বাসনাসক্ত করেন ['আমোদযুক্তং বাসনাসক্তং করোতি সা. ']। তিনিই আবার মোক্ষের হেতুভূতা : 'একা ত্রিবিধা ভূত্বা বোক্ষসংসার-কারিণী' [কালি, ৬ অঃ]। বাংলা দেশে এই পুরাণখানির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ : উপপুরাণগুলির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মূল্যও কম নয়। এই পুরাণের দুইটি প্রধান অংশ—অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রাধা-হৃদয়। বাংলাদেশে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব অপরিমিত। বাংলা রামায়ণের কাণ্ডবিভাগ, ভক্তিবাদ, রাম কর্তৃক দেবীপূজা প্রভৃতি ঘটনা অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে সংগৃহীত। রাধা-হৃদয়ে শক্তিরূপে রাধায় তত্ত্বে গোড়ীর বৈকুণ্ঠমত্তের সহিত মিল লক্ষণীয়।

কব্জি পুরাণ : কেহ কেহ কব্জি পুরাণকেও উপপুরাণ মধ্যে গণনা করেন। কব্জি পুরাণ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের রচনা। ইহাতে ভগবান বিষ্ণু কি প্রকারে কব্জিরূপে লঙ্কায় আসিয়া বিষ্ণুবশা নামক বিপ্লবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কলির সহচর বোন্ধ, জৈন, ব্রহ্ম লহ হুধর্ষ কলিকে বধ করিয়া সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করিবেন, উপাখ্যানছলে সেই কাহিনী

বিবৃত্ত হইয়াছে। সিংহল রাজকন্যা পদ্মার সহিত কবির বিবাহ ঘটনাটি কোতুল্লোদীপক—অনেকটা রূপকথাধর্মী। এই পুরাণে কলিযুগের লক্ষণ বিবৃত্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহৎস্মরণপুরাণ : এই পুরাণখানি পুরাণের অন্তর্ভুক্ত নয়, উপপুরাণের তালিকার মধ্যেও ইহাকে গণ্য করা হয় না। বৃহৎস্মরণ পুরাণে অবশ্য ইহাকে উপপুরাণ মধ্যে বরা হইয়াছে [বৃহৎ পূর্ব. ২৫]। পণ্ডিতগণ মনে করেন ইহা অপ্রাচীন; মনে হয়, পুরাণখানি বাংলাদেশেই সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এই পুরাণ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত : পূর্বখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্বখণ্ডে অন্তান্ত বিষয়ের সহিত সংক্ষেপে রামায়ণ বিবৃত্ত হইয়াছে [১৮-২২ অধ্যায়]। এই পুরাণমতে রামায়ণ ও মহাভারতের পার্থক্য এই যে, রামায়ণকথা শুধু নারায়ণময় [‘এবং নারায়ণময়ঃ কৃতং রামায়ণং’], কিন্তু মহাভারত নয়-নারায়ণময় [‘নর-নারায়ণময়ঃ তন্মহাভারতং বিহঃ’]; নয় হইতেছেন অর্জুন, আর নারায়ণ বাহুবল। রামায়ণই সনাতন কাব্যবীজ। মহাভারত বা অষ্টাদশ পুরাণ এই বীজের ক্রমানুসারে লিখিত। ব্যাসদেব বাম্বোক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াই মহাভারত রচনা করেন।

মধ্যখণ্ডের প্রধান বর্ণনীর বিষয়—সৃষ্টি প্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, গৌরীবিবাহ এবং গল্যাৎ-পত্তি। সৃষ্টিপ্রকরণ একটু বিশিষ্ট : আদিতে কিছুই ছিল না, সৃষ্টি ছিল শূন্যরূপ ও তমোঘন [‘চন্দ্রস্বর্ষাদিরাহতং শূন্যরূপং তমোময়ম্’], শুধু ছিলেন প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতিযোগে এক ব্রহ্ম ত্রিধা বিভক্ত হইলেন এবং প্রকৃতি-সম্ভব ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) হইতে পুরুষত্রয় (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) উৎপন্ন হইলেন। প্রকৃতি জল সৃষ্টি করিয়া সেই পুরুষত্রয়কে তপস্বী করিতে বলিলেন। তপস্বী আরম্ভ হইল। দেবী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শবরূপ ধারণ করিয়া জলে ভাসিতে লাগিলেন [‘শবীভূতা-জলে তত্র ভাসমানা ততস্ততঃ’]। ব্রহ্মা সেই শব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বিষ্ণুও নিম্নলিখিত নেত্রে জলে শয়ান রহিলেন, কিন্তু শিব বিকৃতাকার সেই শবকে গ্রহণ করিয়া সমাধি অবলম্বন করিলেন। ইহার ফলে ভাসমান পুরুষ হইলেন শিবাখ্য শিবময়।^১ দক্ষযজ্ঞে বাইবার জন্ত সতীর মহাবিচারপথধারণও মধ্যখণ্ডের আর একটি আখ্যান। সতী পিতার যজ্ঞে বাইবার জন্ত অহুমতি প্রার্থনা করিলে শিব আপত্তি জানাইলেন। কোপে সতী স্ত্রীমায়ূর্তি ধারণ করিলেন। অতি ভীষণ সে যূর্তি—তৃতীয় নয়নে প্রজলিত রোষানি, মেঘ ‘ধ্বাস্তাভ্রনচরপ্রভা’, তিনি মুক্তকেশা ও বিবস্বা। শিব ধৈর্যচ্যুত হইয়া পলায়নে তৎপর হইলেন—কিন্তু ‘দশযূর্তিবর্ভে’ দেবী দশদিক্শু শিবেক্ষিতা’। শিব

১। এই কাহিনীর প্রতিলিপি পাওয়া যায় বাংলা ধর্মপুস্তাপদ্ধতিতে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে।

বুঝিলেন, সর্বস্বরূপিণী এই মহাশক্তিকে নিবেদন করার শক্তি কাহারও নাই। কাজেই তিনি দেবীকে যথাক্রমে গমনে অহুমতি প্রদান করিলেন [মধ্য. ৩.]।^১

মধ্যযুগের আর একটি ঘটনা গঙ্গোৎপত্তির বিবরণে শিবের গান। বৈকুণ্ঠ সভায় হরির নির্দেশে শিব পাঙ্কজ রাগ আলাপ করিতে আরম্ভ করিলে সাক্ষাৎ পাঙ্কজ রাগের আবির্ভাব হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক দূতী আসিয়া বলিতে লাগিলেন :

কেশব কমলমুখী মুখকমলঃ

কমলনয়ন কমলাতুলমমলম্।

কৃষ্ণগেহে বিজনেহতি বিমলম্ ॥ ৫৮ ॥

—হে কেশব, হে কমলনয়ন, কৃষ্ণগৃহে বিজনে অবস্থিত কমলমুখীর বিমল মুখকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

মহেশ্বরও গীতে ইহার অহুমোদন করিয়া পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিতে সভাস্থল মোহিত হইয়া গেল। দূতীও একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং হরির সেই প্রিয়াকে দেখিতে লাগিলেন। তখন সেই প্রিয়া বলিতে লাগিলেন :

রসিকেশ কেশব হে ;

রস সরসীমিব যামুণযোজয় রসময় রসমিব হে। ৫৯ ॥ [মধ্য. ১৪]

—হে রসিকেশ ! হে কেশব ! রসসরোবরের রসের স্তায় আমাকে যোজনাকর করুন।

প্রাচীন নাট্যগীতের আদর্শ বিরূপ ছিল, শিবের এই গান, তাহার স্মারক। এই গানে জয়দেবের স্তর ও বাগ্‌ভঙ্গিও লক্ষ্যীয়।

বৃহদ্রথ পুরাণে বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুইটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় বীজাকারে। উত্তরখণ্ডে বহুদেবের সপ্তম পুত্রের রক্ষার জন্য স্বয়ং বিষ্ণু অসুরনাশিনী দেবীর যে ভাব করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে,—

স্বঃ কালকেতু বরদাচ্ছল গোধিকাসি

বা স্বঃ শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখম।

শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিকঃ সন্তনো।

রক্ষেৎস্বজ্ঞে করিচয়ঃ প্রসতী বমন্তী ॥ [উত্তর. ১৬]

—আপনি ছলে গোধিকা মূর্তি ধারণ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি শুভামঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি কমলেকামিনী রূপে করিসমূহ প্রাস ও বমন করিয়া শ্রীশালবাহন নৃপতি হইতে সপুত্র বণিককে রক্ষা করিয়াছেন।

১। এই আখ্যানের প্রতিরূপ রহিয়াছে ভারতচন্দ্রের অন্নবানন্দনে।

৫. পুরাণের সাহিত্যিক মূল্য

অভাবিসালে পূর্ণ, বিবিধ আচার-বিচার, নিবেধ-নিয়মের তালিকার ভরা পুরাণের সাহিত্যিক মূল্য কি? সাহিত্য দৌন্দর্ভের লীলাভূমি, রসের নিবন্ধ। পুরাণে কি দৌন্দর্ভ আছে, রস আছে?

পুরাণকারগণ বলেন, ‘অতিক্রিঃ পুরাণম্’—পুরাণ অতি হৃদয়, পুরাণ ‘রসমালয়ম্’—রসের আকর—ইহা ‘কাব্যঃ নৃত্যঃ পদে পদে।’ শুকসুখনির্গত শ্রীমন্তগবত কথা ‘অমৃত ত্রবলঃযুক্ত’, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ভারতী-কামধেনুর হৃদয়ং । দেবীভাগবতের মুখবন্ধে আছে, বখা জিহ্বেদ্রিয়ান্ধাঃ বড় রসৈঃ সস্ত্রপততে ।

তথা শ্রোত্রেদ্রিয়ান্ধাদৌ বচোভিঃ হৃদয়ান্ধতঃ ।

—বড় রস দ্বারা যেমন রসনার আচ্ছাদ জন্মে, তেমন পুরাণ-প্রবক্তা হৃদয়জনের বাক্যদ্বারা কর্ণেদ্রিয় আচ্ছাদিত হয় ।

পুরাণ-কথা শ্রবণ করিতে করিতে সমুদয় রোম হৃষিত হইয়াছিল বলিয়াই পুরাণের প্রবক্তা স্তরের নাম ‘রোমহর্ষণ’ । পুরাণ-কথা দ্বারা তিনি শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষণ করিয়াছিলেন, ‘লোমানি হর্ষণাক্রমে শ্রোতৃগাঃ স্বংসুভাষিতৈঃ’ [বায়ু. ১. ১৫]

বস্তুতঃ পুরাণ-বর্ণিত ক্রিয়া-কর্মের অংশগুলি বাদ দিলে পুরাণকে কাব্য বলিতে বাধা থাকে না । প্রথমতঃ পুরাণের কাহিনী-গত আকর্ষণ । পুরাণ ছোট গল্পের ভাণ্ডার, বৃহৎ উপভাসের বীজ । ইহাতে অসংখ্য কাহিনী, আখ্যায়িকা, নীতিকথা ও ব্রতকথা আছে—আছে অসংখ্যাত দেবচরিত, ঋষিচরিত, পৃথিবীচরিত, দৈত্য-দানব চরিত আর মানবচরিত । ব্রহ্মার সৃষ্টিকাহিনী, বক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরাদির জন্মকাহিনী, জীবের চিরন্তন বৃত্তিগুলির জন্মরহস্য অতীব বিস্ময়কর । তাহা ছাড়া, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হরপার্বতীর কাহিনী, মদনভঙ্গ্য, তারকাসুর নিধন, সমুদ্র মন্থন—ঐবচরিত, প্রহ্লাদ চরিত, বলির উপাখ্যান—মহন্তরাধিপ বিভিন্ন মহুর বৃত্তান্ত—বিষ্ণু ও শিবশক্তির বিচিত্র লীলা সাহিত্যের চিরকালীন উপাদান ।

পৌরাণিক এই কাহিনীগুলি কোথাও সহজ-সরল, বর্ণনার আবেদন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, —কোথাও উহার রূপকধর্মী । পুরাণে রূপকের অভাব নাই । পুরাণের প্রতিমা রূপক, উহার এক একটি অনির্বচনীয় ভাবের মূর্ত বিগ্রহ—পুরাণের অলৌকিক ঘটনাবলীও অধিকাংশ রূপকালিঙ্গিত । এই রূপকসৃষ্টির পশ্চাতে পুরাণকারের কবিরস স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । যেমন সমুদ্রমন্থনকালে ‘বারুণী’র এই বর্ণনা :

ব্যাক্ষিপ্তচেতসঃ সর্বে বহুবৃন্তিমিতেক্ষণাঃ ।

কিবেতদ্বিতি সিদ্ধানাং দিবি চিত্তরতাং তদা ॥

বভ্রুব বাকশী দেবী মদ্যবৃণিতলোচনা ।

কৃতাবর্তা ততশ্রম্যঃ প্রাশ্নলক্ষ্য পদে পদে ॥

একবরা মুক্তকেশী রক্তাঙ্কুললোচনা । [পদ্ম. সৃষ্টি. ৪]

—(সহসা) চিত্ত বিক্লিপ ও নেত্র স্তম্বিত হইল ; ইহা কি—এই বলিয়া লিঙ্গপদ বধন চিন্তাকরিতেছিলেন, তখন সেই কীরাত্তিহইতে মদ্যবৃণিতলোচনা, পদে পদে আলিঙ্গন-চরণা বাকশী আবির্ভূত হইলেন ; তিনি একবরা, মুক্তকেশী, রক্তাঙ্কুলনেত্র ।

বাকশী মদ, এই বর্ণনার মধ্যে মদ্যপানে উগ্ৰত, ঘৃণিতলোচন, আলিঙ্গন ব্যক্তির আকৃতি ও প্রকৃতি উল্লেখিত হইয়াছে । দেবী ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে মদ্যোৎপত্তির বর্ণনাটিও তাৎপর্যমণ্ডিত । চাবন ঋষি অশীষয়কে সোমভাগী করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতেছিলেন, ইন্দ্র তাহাতে বাধা সৃষ্টি করায় ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিহত করিবার জন্য ঋষি যজ্ঞে একটি ‘কৃত্য’ উৎপন্ন করিলেন ; এই কৃত্যই মহাভয়ঙ্কর দ্বিপিত মদ :

মদো নাম মহা ঘোরো ভয়ঃ প্রাণিনামিহ ।

শরীরঃ পর্বতাকার স্তম্ভদংষ্ট্রো ভয়ঙ্করঃ ॥

চতস্রশ্চায়তাদংষ্ট্রো যোজনানান্ শতংশত ।

ইত্যে তস্মা দশনাবভ্রুবৃদংশ যোজনাঃ ॥ [দেবীভা ৫. ৭]

—মদ মহা ঘোর, প্রাণিগণের ভয়প্রদ ; পর্বতশ্রমণ তাহার দেহ, দন্তগুলি অতি ভয়ঙ্কর । তাহার চারিটি দশন শত শত যোজন পরিমিত, অপর দশনগুলি দশযোজন বিস্তৃত ।

ইহা মদ-দ্বিপিত অতিমানীর বিভীষণ মূর্তি—যাহার লোভ দিগন্তবিস্তৃত । পুরাণের এইরূপ কল্পনাগুলি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট কবি-কৃতির নিদর্শন । এইরূপ আরও কতকগুলি তামসীকৃতির মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দোঃসহ-উৎপত্তি অধ্যায়ে [৫০-৫১]

পুরাণ-ঋষির চারিজন সৃষ্টির ক্ষমতাও অসাধারণ । অসংখ্য কাহিনীর মাধ্যমে পুরাণে যে চরিত্রগুলি চিত্রিত হইয়াছে, কালের কঠিণাথরে তাহার উজ্জল । এক একটি চরিত্র এক একটি চরিত্রের বৃত্তির প্রতীক । দেব চরিত্রাবলীতে—ব্রহ্মার অশক্ষপাত, শঙ্করের ঔদাসীনা, বৃহস্পতির বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষ্মীর চপলতা পুরাণ-সিন্ধু । অস্ত্রান্ত চরিত্রাবলীর ভিতর ধ্রুবে তপস্চর্যা, প্রহ্লাদের হরিভক্তি, বলির অতিমানিতা, বৃদ্ধের দম্ভ, হরিশ্চন্দ্রের দান, শিবির দয়া, যযাতির ভোগলালসা প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়ীভূত । চরিত্র-রেখাগুলি দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও পাষণ-রেখার মত অক্ষয় । ভক্তিতে, কর্মে ও জ্ঞানে সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাই পুরাণের মূখ্য উদ্দেশ্য । পুরাণের চরিত্রাবলী এই লিলাই দেয়, জীব-জগতে ধর্ম ও অধর্মের, সত্য ও অসত্যের, অমৃত ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব

চিরন্তন ; অর্থ ও অলঙ্কারকে চিরকাল আকর্ষণ করে আলক্তির দিকে, ভোক্তার দিকে, লাভের দিকে ও লোভের দিকে—উহাই অশান্তি ও বৃত্ত্য। অর্থ ও অলঙ্কারে প্রতিষ্ঠাই জীবের পরম লক্ষ্য—ব্রহ্মা, শৌচ, ক্রমা, সন্তোষ, বিবেক সেই পথে চালিত করে। অগতির কীর্ত্তিমান পুরুষ—মহু, ইক্ষাকু, মাদ্বাতা, শিব, এই আদর্শেরই প্রতীক। পুঁরাণে হুৎ ও কুৎখের ভোগস্থানরূপে বর্ণাক্রমে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা করা হইয়াছে। সখাচার, সংকর্ম, নীলতা জীবকে স্বর্গলোকের লভান দেয়—আর হুৎকর্ম, কাম-ক্রোধ জীবকে নরকে আকর্ষণ করে। পৌরাণিক চরিত্র-কল্পনায় নীতিবোধ একটি মূখ্য মানদণ্ড। এই মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পুঁরাণে দৈব-নির্ভরতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পৌরুষ অধিকাংশ স্থলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ধর্মের হুৎস্র বিচারে সার্বভৌমিক মানবতাবোধকে বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। গ্রাম্য রমণীয় কৃষ্ণ-কামনা এখানে শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তির মর্বাদা লাভ করিয়াছে [ঐতর্য ভাগবত, বিষ্ণু], ধর্মতুলাধার সাধারণ মানুষ হইয়াও শ্রেষ্ঠ মাহুষের মর্বাদায় ভূষিত হইয়াছেন [ঐতর্য পদ্ম, সৃষ্টি ৫০], বারাকনার নীলাচার তাঁহাকে স্বর্গের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র-সৃষ্টিতে মানবধর্মের এই আবেদন তুচ্ছ নয়।

পুঁরাণের বর্ণনা অধিকাংশস্থলে বিব্রুতিবাহ্য। এইজন্য বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে নির্জীব ও বৈচিত্রহীন। কিন্তু বলবিশেষে এই সকল বর্ণনাই এমন হৃদয় ও স্নেহ, এমন ভাবাবেগকম্পিত যে, তাহা চিরকালের অন্ত মনের পটে রেখাপাত করে। বেদন ভাগবতের রাসপঞ্চাধায় বা ভ্রমরগীতার অংশ। রাসবর্ণনায় দেখা যায়, শারদোৎসবের রজনীতে চন্দ্র উদ্ভিত হইয়া, কুঙ্কুমরাগে দ্বিগ্বিভাগের বদন রঞ্জিত করিয়া দিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন। বিশ্ববিমোহন সুরে গোপীগণ আকৃষ্ট হইলেন। সুরম্য রাসমণ্ডলে রাসলীলা আরম্ভ হইল। গোপীগণ মগ্নবিস্ময়া। সহসা কৃষ্ণ অস্তর্জ্ঞান করিলেন। উন্নতের মত গোপীগণ কৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন, চেতনে-অচেতনে ভেদ নাই। কখনও অশ্রু, প্রক, অগ্রোধকে উদ্বেগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওগো, তোমরা কি নন্দ-নন্দনকে দেখিয়াছ? ওগো কুরুবক, অশোক, পুঁরাণ, চম্পক, তোমরা বল, হরি কি এই পথে গিয়াছেন?

চূত পিয়াল পনসাসন কোবিদ্যার-

অর্ধক বিধ বকুলার কদম্বনীপাঃ।

যে হস্তে পরার্থভাবকা বসুনোপকুলাঃ

শংসক কৃষ্ণ পদবীং রহিতাশ্রনাং নঃ ॥ [ভাগ, ১০. ৩০. ৩]

—ওগো চূত, পিয়াল, পনস, অলন, কোবিদ্যার—ওগো অর্ধ, অর্ক, বিধ, বকুল

আর, কবচ, নীপ—ওগো, বনুনা তীরের পরার্থভাবক বৃক্ষসকল! তোমরা বল, আবারের ভয় শূন্য করিয়া কক কোন পথে গিয়াছেন ?

রাধার বর্ণনা ভাগবতে নাই। বিরহিণী রাধার অতি চমৎকার চিত্র পাওয়া বাইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। বনুনা হইতে কক উদ্ভবকে পাঠাইয়া দিয়াছেন বৃন্দাবনে। উদ্ভব বৃন্দাবনে আসিলেন, রাধার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, 'দর্শন পুরতো রাধাং কুন্ধ্যাং চন্দ্রকলোপমাম্'—কহ রজনীতে নটেন্দুকল চন্দ্রের স্তায় রাধাকে দেখিলেন, দেখিলেন,

সপদ্য পদ্যপত্রে চ শয়ানাং শোকযুচ্ছিতাম্ ।

কদম্ভীং রকবদ্বনাং স্রিষ্টাক তাত্ত্বদ্বনাম্ ॥

নিশ্চেষ্টাক নিরাচার্য্যঃ স্ববর্ণবর্ণ কুন্তলান্ ।

তুষ্টিভাষ্যর কঠাক কিকিরিবাংস স-যুতাম্ ॥ [ব্রহ্মবৈ কক. ২২ অঃ]

—রক্তবদনা রাধা মলদিগ্ধ পদ্যপত্রে শয়ানা, শোকে যুচ্ছিতা, তিনি কন্দলরক্তা, স্রিষ্টা, ভূষণহীন; স্ববর্ণ-কুন্তলার আচ্ছাদিত নাই, আহার নাই, শুক অধর, শুক কর্ণ—বাস আছে, অতি সাদাস্ত্য ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষমর্দিনী দেবীর উৎপত্তি-বর্ণনাটিও বিস্ময়কর। মহিষাসুরের বোরাছ্যা দেবগণ অর্গলভ হইয়া স্বর্ষাদি দেবতা ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন : দেবগণের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ও শঙ্কর কোথেকে জলিয়া উঠিলেন ঙ্গকুণ্ডনে তাঁহাদের মৃৎমণ্ডল ভগ্নকর আকার ধারণ করিল :

ততোহতিকোপপূর্ণস্ত চক্রিণো বদনাং ততঃ ।

নিশ্চক্রায় মহৎ তেতো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্ত চ ॥

অস্ত্রেষাক দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।

নির্গতঃ স্বমহৎ তৈজসমৈকাঃ সমগচ্ছত ॥

অতীব তৈজস' কূটং জলন্তমিব পর্বতম্ ।

দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্ ॥ [চণ্ডী, ম চ ২ অঃ]

—অনন্তর অতি কোপাবিষ্ট বিষ্ণুর, তৎপরে ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মৃচ্ছাতৈজ নির্গত হইল। শক্রাদি দেবগণের দেহ হইতেও ভীষণ তৈজ নির্গত হইয়া মিলিত হইল। দেবগণ সেই তৈজকে দিপদ্য রূপী জলন্ত পর্বতের স্তায় দর্শন করিলেন।

এইরূপ অসংখ্য কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা পুরাণে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। কালিকা-পুরাণোক্ত 'মহানোৎপত্তি' বর্ণনাও আর একটি তুষ্টিত বিস্ময়! ব্রহ্মা সৃষ্টিপত্তন করিতেছেন, সহসা তাঁহার মন হইতে উৎপন্ন হইলেন বর্ষাকালীন ময়ূরের স্তায় নীলবর্ণা

এক বরবধিনী, নাম তাঁহার 'সন্ধ্যা'। এই রূপবতী কি করিবেন,—তবি ও দেবসম্ম
বখন এইরূপ ভাবিতেছিলেন তখন ব্রহ্মার মন হইতে বিনির্গত হইলেন এক পুরুষ :

কাকনী চূর্ণ পীতাম্বু পীনোরম্ হনালিকঃ ।

হবুভোরকটীজ্ঞো নীলবেষ্টিত কেশরঃ ॥ [কালিকা. ১]

—তাঁহার বর্ণ কাকনচূর্ণের স্তার পীত, পীবর বক্ষ হনানা, উরু, কটি, জ্ঞো
নিটোল,—কেশ নীলকৃষ্ণিত ।

ইনিই মন্থননামা মনোভব মদন । পুরাণে এই মদন-ভবের বর্ণনা বহুবিখ্যাত ।

পূবাণেব ধ্যান ও স্তুতিগুলিও কবিত্বময় । ধ্যানের বিষয় দেবতার রূপবর্ণনা । তন্ন
শাস্ত্রই এই ধ্যানের কল্পভাণ্ডার । পূবাণেও উহাদের সখ্যা অল্প নয় । অতি প্রচলিত
ধ্যানগুলিও ভিতর গণেশ স্বর্ঘ বিষ্ণু, শিব ও শক্তি—এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান এবং
লক্ষ্মী স্বরস্বতী দুর্গাব ধ্যান উল্লেখযোগ্য । এই বর্ণনায় স্তম্ভের স্থিতিবাহিত শব্দ ও
অলঙ্কার-নৈপুণ্যের অসম্ভাব নাই : যেমন লক্ষ্মী হইতেছেন 'কাম্য্য কামকলিঙ্গা',
স্বরস্বতী 'তরুণশকলমিনোবিন্ধিতী শুভ্রকান্তিঃ ।'

পৌরাণিক স্তুতিগুলি স্তম্ভব । স্তুতিতে দেবতার গুণবর্ণনার সহিত ভক্ত-হৃদয়ের
প্রার্থনা ও আকৃতি মিশ্রিত হইয়াছে । বেদেও দেবস্তুতি আছে । বৈদিক স্তোত্রে 'দেহি'
দোহ', 'পাত' 'অব' (বক্ষ্যকব) প্রভৃতি শব্দ অতি উচ্চ গ্রামে অনিত , পৌরাণিক
স্তোত্রে সেখানে নমামি' প্রসাদ' 'নিবদ্যামি'—এককথার আত্মনিবেদনের স্থরটি প্রধান
হইয়া উঠিয়াছে । বৈদিক স্তোত্রে ভক্ত জ্ঞানসংযত, পুরাণে ভক্তি আবেগোচ্ছল ।
পৌরাণিক স্তুতিতে দেবনির্ব্বতা ও পৌরুষের অভাবও পরিদৃষ্ট হয় । 'তৎ প্রসাদঃ
প্রসন্নাত্মন প্রপন্নানা কুরুষ নঃ' [বিষ্ণু] 'দ্ব্যাকেশ জগন্নাথ জগদ্ধাম নমোহম্বতে
[মন্ত্র]—উহাই বিশিষ্ট শব্দ । আবেগোচ্ছলিত হওয়ার এই স্তুতি গীতি-কর্
মত আশ্রয় । দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'নারায়ণী-স্তুতি'গুলি,

দেব প্রপন্নতি হরে প্রসাদ

প্রসাদ মাতর্জগতোৎপত্তিস্ত ।

প্রসাদ বিশ্বম্বরী পাহি বিশ্ব

স্বামীধরী দেবি চরাচরস্ত ॥

—হে আশ্রিত, হে বর্হারিণী, প্রসন্ন হউন + হে

হউন । হে বিশ্বম্বরী, প্রসন্ন হইয়া বিশ্বকে পালন

চরাচর জগৎকে, স্বামী ।

অধিকাংশক্ষেত্রেই পুরাণের স্তুতি নামাবলীর

কালিকা মাত : শতনাম, অষ্টোত্তর

শতনার, সহস্রাব্যয়ের তালিকা, যেমন, পদ্ম সৃষ্টিও সাবিত্রী-ভাবে সাবিত্রীর বিভিন্ন নামের এই তালিকা :

সাবিত্রী পুঙ্কে নাম তীর্থানাঃ প্রবরে শুভে ।

বারাণস্তাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী ॥

প্রয়াগে ললিতাদেবী কামুকা পদ্মাবতী ।

মানসে কুম্ভা নাম মন্দরে কান্ধারিণী ॥ ইত্যাদি [পদ্ম সৃষ্টি. ১৭]

এই ধরনের নামাবলী স্মৃতি ও উহাদের সংখ্যাবাহ্য্য রসবোধকে কুর করে ।

অলঙ্কার প্রয়োগ সম্পর্কে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন । পুরাণ প্রধানতঃ বিবৃতি-প্রধান । ইহার কাজ লোককে জানানো । একান্তে সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রথ একান্তই গৌণ । পুরাণের যে অংশগুলি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রায় অলঙ্কারবঞ্চিত । দুই একটি অলঙ্কার বাহা আছে, তাহা উপমা । সর্গ ও প্রতিসর্গ, বংশ বা মন্বন্তর বর্ণনার উপমা-প্রয়োগের স্বল্পতাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কিন্তু যে দুই একটি উপমা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাদের সৌন্দর্য স্বল্প নয় । ‘ভূমৌ পরধরো বথা’, ‘অরণীষ হতাশনঃ’, ‘প্রাহুর্ভূতা তড়িদ বথা’, ‘নীল ইষাচলো মহান্’ প্রভৃতি উপমা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ । প্রাচীন পুরাণে অলঙ্কারণ অচোঁটাপ্রমত্ত, সচেতনভাবে কৃত্রিম সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস পুরাণের প্রাচীন অংশগুলিতে নাই । কিন্তু অলঙ্কার-হীনতা রচনার দুর্বলতা নয় । রচনারীতি সরল ও অনাড়ম্বর হইলেও বলিষ্ঠ—যেন আহুতিসংকলন সারিক তাপস । উহা সুগভীর চিন্তামূলতার পরিচায়ক ।

কিন্তু কতকগুলি পুরাণে অলঙ্কারনৈপুণ্য সচেতন শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে । বিশেষতঃ হুম্মর পুরুষ কিংবা হুম্মরী নারীর রূপবর্ণনার যে নির্বাচিত রঙ ও রেখার বিস্তারী দৃষ্ট হয়, তাহা প্রেম শিল্পকৃতির নিদর্শন । সে সকল স্থলে রমণীর বদন, ক্রীড়, ভ্রূঙ্গ, কেশকলাপ, পণ্ড, ওষ্ঠ, পীনোরত বক্ষ, ক্রীণ কটি, নিবিড় নিভব, বিশাল জন্মা, পদ, কর ও চরণের বর্ণনায় উপমা-বাচনের বাহ্য্য লক্ষণীয় । রাজীববৎ বদন, ইন্দীবরলগ্ন নয়ন, মেঘেণ ভ্রায় নীলপুস্তল, ধনুঃ ভ্রায় বক্রিম ভ্রূঙ্গ, সিংহের ভ্রায় ক্রীণ কটি, বিবাকর, ভ্রূণকবল—যে-কোন চাক্সবীজীর সাধারণ পৌরাণিক বর্ণনা । যেমন ক্রীমদ্বাপবতে ‘সাম্বিত্রী লক্ষ্মী’র বর্ণনা, কিংবা পুত্রজনীর বর্ণনা : ‘রূপচরশাভোজা’ ‘পলাশাকি’, ‘সিঁহেনাশিঙ্গ পুচ্ছেন স্পষ্টে প্রেয়োদ্রমদ্রুবা’ (বিষ্ণু অশ্বাধ পুথ, প্রেয়ে নামাবলি অ-খহু) ।

রূপ বর্ণনাত্তেও পুরাণে কতকগুলি গভাঙ্গসভিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় । যে কোন

মহৎ চরিত্র—পৃথিবীর ভায় সহিষ্ণু, অগ্নির ভায় দুর্ব্বল, সিংহতুলা পরাক্রান্ত, পবনের ভায় অপ্রতিহত গতি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে গুণোপমার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :

চন্দ্রতুলা হৃদশ্চন্দ্র কন্দর্পসম হৃদয়ঃ ।

বুদ্ধ্যা বৃহস্পতিসম কাব্যে কবি সমস্তথা ॥

বাণীব সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ প্রতিভায়াং তৃণোরিব ।

কুবের তুলোঃ ধনবান্ মহান্ দান্তা মনোরিব ॥

দীপ্তিমান্ সূর্যতুলাশ্চ গান্ধীর্ষে সাগরো যথা

এপর্ষে শক্রতুলাশ্চ সহিষ্ণুঃ পৃথিবীসমঃ ॥ [ব্রঃ বৈ. ব্রহ্ম. ৩]

পুরাণের অলঙ্কার মোটামুটি বীধাধরা, প্রায়ই বৈচিত্র্যহীন। যে স্থলে, বৈচিত্র্য, সে স্থলে পরবর্তীকালের আলঙ্কারিক ঐতিমিচ্ছা শিল্পীর হস্তক্ষেপ আছে।

৬ পুরাণ ও বাংলা সাহিত্য

(i) প্রাচীন যুগ

পুরাণের কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান। এদেশের কবিরাজ শিউড়িপতিমহের দায়াদরূপে পুরাণ-সম্পদের উত্তরাধিকারী। জন্মাক্রান্ত সংস্কারের এই যুগে বাঙালীও পৌরাণিক সংস্কারের অধিকারী। হুপ্রাচীন কাল হইতেই যে এদেশে পুরাণের চর্চা প্রচলিত ছিল, গুপ্ত-পাল-সেন আমলের তাম্রশাসন, দানপত্র ও তত্ত্বলিপিতে পৌরাণিক উপমার প্রয়োগ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেহ কেহ মনে করেন, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সম্বলনে বাঙালীর হাত আছে। দেবীভাগবত, কালিকা ও বৃহদ্রক পুরাণ বৃহৎবঙ্গাকালেরই রচনা। ষাটশ শতকের পূর্বে এদেশে যে সংস্কৃত সাহিত্য রচিত ও সম্বলিত হইয়াছে, তাহাতেও পুরাণের প্রভাব সম্পষ্ট।

মধ্যযুগেও বাংলাদেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ পুরাণ শ্রবণে আগ্রহশীল ছিলেন। লঙ্কর পরাগলধান ‘পুরাণ পঠিত নিত্য হরষিত যতি’ [পরাগলী মহাভারত]। চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে ভাগবত, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও পদ্ম পুরাণাদি হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। জিপুরা ও কোচবিহার রাজসভা ছিল পুরাণ-চর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র। পুরাণ-বিশ্বকোষ এদেশের লোকশিক্ষার অঙ্গ।

পৌরাণিক বিশ্বাস ও সংস্কার এদেশের মর্ম্মস্থলে প্রসারিত। জনসাধারণের জীবন পুরাণের রীতি-নীতি, আচার ও সংস্কার-কুলসংস্কার দ্বারা শাসিত। বাংলার গ্রামে গ্রামে বন্দির ও পূজাহান, আনাচে কানাচে তীর্থস্থান, বৎসর ভরিয়া অন্ধর তৃতীয়া, নাপ পক্ষী,

বটী, দুর্বারী, ভালনবরী প্রভৃতি বিবিধ ব্রতাহুষ্ঠান। এই তৈধিক মনোভাব, এই মূর্তিপূজা, ব্রত ও ভক্তিভাব এবং দেবলীলায় একান্ত বিশ্বাস পুরাণেরই দান। বাঙালীর সাহিত্যচর্চার মূলেও পুরাণ-প্রেরণা একটি বিশিষ্ট প্রেরণা।

প্রাচীন বাংলার অমুবাদ সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ পুরাণের আকরিক বা ভাবানুবাদ। এ বিষয়ে স্রীমদ্ভাগবতের অমুবাদ সর্বাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য। মালধর বহুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিণী, মাধবাচার্য ও চুংখী ভাস্কর্যাসের কৃষ্ণমঙ্গল—ভাগবতানুবাদের বিশিষ্ট নিদর্শন। এই অমুবাদের কেন্দ্রীয় প্রেরণা ছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। ভাগবতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রচারে তাঁহার কীতি অবিস্মরণীয়। মালধর বহুর কাব্যের মর্মাদর্শ তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।^১ রঘুপণ্ডিত বা ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমভরঙ্গিণী রচনার প্রেরণাও চৈতন্যদেব।

শাক্ত অমুবাদ কাব্যগুলির ভিতর প্রধান—মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী সপ্তশতী বা দেবী-মালাখ্য। শিতাধর দাসের মার্কণ্ডেয় কথা, দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা বিজয়, অঙ্ককবি ভবানী প্রসাদের দুর্গামঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন দেবীভাগবত ও ও কালিকাপুরাণ অবলম্বনেও দেবীমালাখ্য রচিত হইয়াছে। মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ, পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গল, রামচন্দ্র মুখুটির দুর্গামঙ্গল বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই সকল অমুবাদ খাঁটি আকরিক অমুবাদ না হইলেও মূল পুরাণের স্বাধ অলভ্য নয়। ত্রিপুরা ও কোচবিহারের রাজসভার আত্মকলো নারদীয়, ব্রহ্মবৈবর্ত, শিব, স্বয়ং ও পদ্মপুরাণের অমুবাদ করা হয়। এই সকল অমুবাদ বাঙালীর পুরাণ-প্রীতির বিশিষ্ট পরিচয়।

অমু অমুবাদ নয়, সংস্কৃত পুরাণের অমুকরণে লৌকিক পুরাণ রচনার প্রয়াসও এ দেশের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্য বাঙালীর জাতীয় পুরাণ। এই সকল কাব্যের দেবদেবী—মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, শীতলা, বটী বদিও লৌকিক, তথাপি তাঁহারা পৌরাণিক পরমা শক্তির মর্মাদর্শ প্রোতিষ্ঠিত। মঙ্গলকাব্য নানাদিক হইতে সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। মূল কাহিনীগুলি পৌরাণিক না হইলেও, পুরাণের মূল লক্ষ্যের পরিপোষক। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের সূচনায় যে দেবখণ্ড সংযোজিত, তাহা পুরাণেরই কাহিনী। উহাতে অতি সংক্ষেপে পৌরাণিক সর্গ, প্রান্তিসর্গ, বংশ ও মহাস্তরাদিও বর্ণিত হইয়াছে।

১। গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

তাঁহা বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ যোর প্রাণ-নাথ।

এইবাক্যে বিকাইছ তাঁর বংশের দ্বাধ ॥ [চৈ. চ. মধ্য, ১৫]

বংশাচরিত্রের বর্ণনাও মঙ্গলকাব্যে আছে, তাহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ হর্ষ বা চন্দ্রবংশোদ্ভূত পৃথ্বীশালমণের চরিত্র নয়, এই বেশেরই কোন লোকশ্রুত বংশের কীর্তমান চরিত্র : লাউসেন সামন্ত-প্রধান সেনবংশের কুলভিলক, চন্দ্রবংশ বৈভবংশোদ্ভব, কালকেতু ব্যাধ-বংশের লক্ষপ্রতিষ্ঠ বীর। সংস্কৃত পুরাণের অন্ততম লক্ষ্য কোন-না কোন দেবতার মহিমা ও পূজাপদ্ধতির প্রচার। মঙ্গলকাব্যেরও সেই একই উদ্দেশ্য। পার্থক্য এই যে, পুরাণের দেবতা পূজা আদ্যের স্তম্ভ উদ্ভোগী হন না, কিন্তু মঙ্গলদেবতা পূজা-লোভী--উপরন্তু মঙ্গলদেবতার পূজা-বিধান লৌকিক ও পৌরাণিক পদ্ধতির মিশ্ররূপ। পুরাণের তৈথিক মনোভাব ও ভক্তিবাদ মঙ্গলকাব্যেরও অন্ততম বৈশিষ্ট্য। মঙ্গল কাব্যের দিগ্‌বন্দনা অংশে বাংলার নিজস্ব পুরাণ-ভীর্ষের পরিচয় আছে, যেমন দাম্ভ্যার চক্রাদিত্য, বোড়-গ্রামের বলরাম, মুণ্ডোপের মন্তেশ্বরী, কাইতীর বাণেশ্বর, মৌলার রত্নী, তমলুকের বর্গভীমা, আমতার মেলাই, খেপুর খেপাই প্রভৃতি।^১ তাহা ছাড়া সংস্কৃত পুরাণে হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের সহিত শ্রাদ্ধকল্পের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা মঙ্গল কাব্যে পাই। জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নরস্ক ('ওদনপ্রাশন') এবং এ-দেহীয় বিবাহবিধির বিস্তৃত বিবরণ। লৌকিক আচার, বিশ্বাস ও ধর্মভাবের উপর পৌরাণিক সংস্কারের প্রভাব-প্রতিষ্ঠাই মঙ্গলকাব্য বিকাশের গোড়ার কথা।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর কাহিনী-উৎস বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। এইসকল পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের গোষ্ঠীলীলা, কালীয়দমন, রাস ও মাথুর প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদ রচনা করিয়াছেন। গোড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর আশ্রয়বিভাব রাধারাগী। এই রাধার উল্লেখ বিষ্ণু বা ভাগবত পুরাণে নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, 'সেই রাধাই নূতন বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্র স্বরূপ।' এই উক্তির স্বার্থার্থ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির যে প্রদঙ্গ পাওয়া যায়, তাহার তত্ত্ব বৈষ্ণব শঙ্করাচর্য, বিষ্ণুপুরাণাদিতেও আছে।^২ বিষ্ণুপুরাণে রাধার নাম নাই। পদ্মপুরাণে রাধাই বিষ্ণুর পরম বরজা—'সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবরজা'। ঠিক এই তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। সেখানে রাধিকা কৃষ্ণের প্রাণসম্বা ও আত্মাধরুণিনী--যথা 'কীরে চ ধাবল্য'। দাহিকা চ হতশনে'। চৈতন্যো-র বৈষ্ণব পদাবলীতে 'রাধা ও কৃষ্ণ' এই তত্ত্বেরই প্রকাশ—'হুঁহু দৌহা হোয়' (গোবিন্দ দাস)।

১. দ্রষ্টব্য কবিকল্প চণ্ডী (১ম ভাগ)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২. 'হ্লাদিনী সঙ্গিনী স-বিশ্বব্যোকা সর্বসংশ্রয়ে' [বিষ্ণু. ১২. ৬২]। বিষ্ণুপুরাণ মতে বিষ্ণুবল্লভ-বিলাসিনী লক্ষ্মীই সেই পরম শক্তি।

বিবরে ও তবে কি চৈতন্ত পূর্বরূপে, কি চৈতন্তোত্তর রূপে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সঙ্গে বৈকব পদাবলীর মিল নিগূঢ়। জয়দেব গোবিন্দীর গীতগোবিন্দ কাব্যের কয়েকটি চিত্রের সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত চিত্রাবলীর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গীতগোবিন্দের সৃষ্টকার যে ‘মেঘবৈবর্তরম’ শ্লোকটি আছে, তাহার প্রসঙ্গ রহিয়াছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। একদিন নন্দ বালক কুককে লইয়া গাড়ীরবনে গোচারণার্থ গমন করেন। কুক-মায়ায় সহসা গগন মেঘাকর হইয়া উঠে। নন্দ মেঘাবৃত গগন, শ্রামল কানন দেখিয়া ও বহু শব্দ শুনিয়া ভীত হন। গোবৎসগুলিকে কেলিয়া কিরূপে তিনি বালককে লইয়া গৃহে যাইবেন, এই চিন্তায় আবৃত হইয়া উঠেন। এমন সময় রাধা সেট পথে যাইতেছিলেন, তখন নন্দ তাঁহার কাছেই কুককে প্রদান করিয়া গৃহে লইয়া যাঁতে বলিলেন, ‘গৃহাণ প্রাণনাথক গচ্ছ ভগ্নে বখাস্থবম্।’^১ ঠিক এই প্রসঙ্গেই অন্তরূপ বর্ণনা জয়দেবের :

মেঘবৈবর্তরমধর বনভুব: শ্রামন্তমালজ্জমৈ-

নন্দ: ভীকরয়ং তদ্বিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। [গীতগো: ১. ১]

—(নন্দ নির্দেশ দিলেন) যে রাধে, নভোমণ্ডল মেঘমেঘর, বনভূভাগ তমালজ্জমে শ্রামন্তকারমর, রাত্রিও সমাগত, তুমি এই ভীত কুককে গৃহে লইয়া যাও।

ড: শশিকৃষ্ণ দাশগুপ্ত মহাশয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত রাধাপ্রসঙ্গগুলিকে অব্যচীন মনে করিয়া বলিয়াছেন, “জয়দেবের ‘গীত-গোবিন্দ’ কাব্যের প্রথম শ্লোকটি পাঠ করিলেই বেশ বোঝা যায়, কবি রাধাকুকলীলার একটি বিশেষ উপাখ্যানকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে বর্ণিত উপাখ্যানটির একটু বিস্তৃততর প্রাচীন রূপ পাটনার ভক্ত আরাধের আকাঙ্ক্ষা ভগ্নে ; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই উপাখ্যানটির যে রূপ বর্ণনা দেওয়া আছে, তাহা পাঠ করিলেই মনে হয়, পরবর্তী কালের কোনও লোক আরাধের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া অনেক থানি সুলভাবেই যেন সেট আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছেন”।^২ বহুমুচয় কিন্তু মনে করিয়াছেন, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তকারের নিকট

১। মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট। শ্রামল: কাননাগুরম্।

কঙ্কাবাত: মেঘশব্দং বহু শব্দং দাক্ষণম্॥

বুড়িধারায়তি স্কলাং কল্পমানান্ত পাদপান্।

দৃষ্টে বং পতিতক্কদান্ নন্দো ভয়মবাপ হ ॥... ---

এতশ্রিত্বরে রাধা অগাম কুকসমিধিম্...

দৃষ্ট। তাং নির্জনে নন্দো বিশ্বয়ং পরমং বধৌ।...

উবাচ যং লাক্ষনেন্দ্রো ভক্তিমহাত্মককর:।...

গৃহাণ প্রাণনাথক গচ্ছ ভগ্নে বখাস্থবম্। [ব্রহ্মবৈ. কুক. ১৫ অঃ]

২। শ্রীরাধার কবিকাপ [কবিতা অধ্যায়]

কণী। বসন্ত: জয়দেবের বর্ণনা ও গোড়ীর বৈকব ধর্মের রাবতত্ব পুরাণ হইতেই গৃহীত, না পুরাণে গোড়ীর বৈকবধর্মের মত প্রাঞ্চিৎ হইয়াছে, ইহা ভাবিবার বিষয়। রূপগোষ্ঠারী বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উল্লেখ করেন নাই সত্য, কিন্তু সনাতন গোষ্ঠারীর ‘ভাগবতামৃত’ এবং গোশালভট্টের ‘হরিভক্তিবিলাসে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।’ তাহা হইলে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই অর্বাচীনত্ব কোন দিক হইতে ? আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানি সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত নয় বলিয়া এবং ইহা বহুল পবিমাণে শাক্ত তন্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই গোড়ীর বৈকব সমাজে ইহা স্বীকৃতি লাভ কবে নাই যদিচ গোড়ীয় বৈকব তত্ত্ব ইহাব অধর্মণ।

বাংলা সাহিত্যে যে শাক্ত সঙ্গীত গুলি পাওয়া যায় তাহাব কাহিনীমূল পুরাণ। বিশেষত: ‘আগমনি’ ও ‘বিজয়া’ গানে যে গল্পাংশ বহিরাছে—বিকৃতিভূষণ হরের সহিত বাজ্রমন্দিরী পার্বতীর বিবাহ, কল্যা-বিবাহ মেনকাব জদগবেদনা, পার্বতীর ঘর-কল্যা চিত্র, অম্ববদলনী মহামায়ার বিবিধ লীলা—এগুলি পুরাণের। এই সকল কাহিনীতে বাংলাদেশের ভূগোঁসব ও বাঙালী মাতৃজগদেব বেদনার চিত্র প্রধান হইয়া উঠিলেন পুরাণের প্রভাব অল্প নয়। পুরাণে আছে,

তস্তা গতে ভগবতি নীললোহিত্যে

সহোময়্যাবতিমহদুত কৃষ্ণঃ ।

সবাক্ষবো ভবতি চি কস ন মনো

বিশ্বম্ জগতি হি কল্যকাপিতুঃ ॥ [পদ্ম সৃষ্টি ৩৪]

—ভগবান নীললোহিত্য উমার সহিত প্রস্থান করিলে কল্যার প্রতি অম্বরক্ত হিমবাজ সবাক্ষব উদ্ভব হইলেন, বিবাহান্তে কল্যাব বিরহে কোন পিতার মন বিশ্বম্ না হয় ?

এই বিরহাতিই আগমনি-বিজয়ার গানে মেনকাব জদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে। শাক্ত সঙ্গীতে মহাদেবের সর্ব ঐশ্বর্যকে সর্বরিক্ততাব প্রতীক মনে করিয়া যে সকল ব্যাঙ্গমতি রহিয়াছে, তাহারও মূল পুরাণ। শিব নিজেই জটিল ব্রাহ্মণবেশে তপস্কার্যতা পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন :

বৃক্ষকো মহাদেবো হুতিলেগী জটায়বঃ ।

ব্যাক্ষর্য্যে শুকটকঃ সখীকো গজকটিনা ॥

কপালমারী নশেরিকঃ সর্বদায়কু বৈদিকঃ ।

বিষয়ঃ গল্পস্বাক্ষর বিতরণঃ বিতরণঃ ॥

অব্যক্তজ্ঞান সত্যঃ গৃহভোগ্য বিবজিতঃ ।

শ্রদ্ধানবাসী সত্যঃ সংসদ পরিবজিতঃ ॥ [কালিকা. ৪০ অঃ]

—মহাদেব রূপবান, অন্ধ নিরঙ্কর ভ্রম মাথে ; সে জটায়ু, ব্যাক্ত্যর্চ তাহার
পরিধান, উত্তরীয় গজচর্ম ; সে নরকপালধারী, সর্বগত সর্পে বেষ্টিত ; তাহার
গলদেশ বিষমভাষে দৃঢ়, তাহাতে একটি অক্ষমালা ; সে বিরূপাক্ষ ও ভয়ঙ্কর ।
তাহার জন্মের স্থিতি নাই, সে গৃহভোগ ত্যাগী, শ্রদ্ধানবাসী ও সংসদ বজিত ।

এই ধরনের অসংখ্য পৌরাণিক প্রসঙ্গকে যথাসম্ভব গৃহস্থালির অঙ্গীভূত করিয়াই
শাক্ত কবিগণ অপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন ।

তাহা ছাড়া শাক্ত গীতাবলীতে যে দ্বৈতমূলক কবিতাগুলি আছে, তাহা পুরাণের
স্বভাব-স্বতির স্বরূপ । নামাংলী দ্বৈতমূলক পৌরাণিক শাক্ত নামাক্তিত্ত্ব স্ববৈধি রূপান্তর ।

(II) আধুনিক যুগ

নব্য বাংলাসাহিত্যেও পুরাণ-প্রাচীর সম্প্রতি স্বাক্ষর বর্তমান । নব্য বাংলার পুরাণের
স্বীকৃতি নবলক পাশ্চাত্য যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে । উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই
পুরাণের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অতিলৌকিক কাহিনীগুলির প্রতি তির্যক কটাক্ষ
নিষ্কপ হইতেছিল : পুরাণের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ খড়্গহস্ত হইয়া
উঠিয়াছিল । এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামনি প্রমুখ পণ্ডিতগণ পুরাণের নূতনতর ব্যাখ্যা
প্রকাশ করিয়া পৌরাণিক মত সমর্থন করিতেছিলেন । পুরাণকে নূতন করিয়া ব্যাখ্যা
করিবার এই মনোভাবটি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল । ইহার ফলে পুরাণ-প্রসঙ্গ হইয়া
নূতন নূতন কাব্য-নাটক রচনার যে দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে, তাহাতে, পুরাণের নব
রূপায়ণ লক্ষণীয় ।

॥ স্বাক্ষর ॥ পৌরাণিক চারিত্রে মানবীয় ভাবের আরোপ নব্যযুগের পুরাণ-পরিষ্কার
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । পুরাণপ্রসঙ্গকে মানবীয় ভাবে পরিবেশন করিবার মনোভাব
মঙ্গলকাব্যেও পরিলক্ষিত হয় । কবিগোলালের গানেও এই মনোভাবের বিচিত্র স্ফুটি
দেখা যায় ; কিন্তু মঙ্গলকাব্যে ও কবিগানে পুরাণের অন্ধ সংস্কার ও অতিলৌকিক
কাহিনী পরিত্যক্ত না হওয়ায়, পুরাণ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই পরিবেশিত হইয়াছে ;
এই দ্বারার আর এক প্রকাশ নব্য বাংলার বাহ্য ও বাস্তব ধরনে রচিত নাট্য-বাহ্য ।
বনোমোহন বহুর সত্য নাটক, দক্ষবজ্র, ক্রবচরিত্র ; হরিমোহন কর্মকারের প্রীতমলিঙ্গা,
পবিত্রকুহর (মদনভঙ্গ ও শিববিবাহ) ; ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাসমিলন,

এবোপাখ্যান, ও বামনভিষ্মা; ভিনকড়ি বিশ্বাসের দৃকবজ্র, তত্ত্বনিপুণ বধ; ব্রহ্মমোহন রায়ের কংসবধ; মতিলাল রায়ের শরাস্বর প্রভৃতি পালা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের কাহিনী লইয়া রচিত এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় সমস্তই গভীর প্রাচীন পুরাণের অতিভক্তিবাহ, অল্প সংস্কার ও আলৌকিকত্ব স্থান লাভ করিয়াছে। বাংলার জনসাধারণের মুখ চাহিয়া এই রাজ্যগুলি রচিত। অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট আলৌকিক দেবলীলার কোন মুক্তিগ্রাহ্য কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন নাই, তাহারা অতি সহজে দেবতা সম্পর্কে যে-কোন সম্ভব-অসম্ভব ঘটনায় বিশ্বাসী। পুরাণের বিকৃতি বা নতুন ব্যাখ্যা তাহারা সহজে গ্রহণ করে নাই। তাই বাংলার লোক-সঙ্গীতে বা রাজ্যের প্রাচীন পুরাণের ভেতরন রূপান্তর সাধিত হয় নাই। লোকের বিশ্বাস ও মানসিক ক্রটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্যকারগণও পৌরাণিক কাহিনীকে পৌরাণিক সংস্কার-বিশ্বাসের আধারেই পরিবেশন করিয়াছেন।

॥ পৌরাণিক নাটক ॥ শিক্ষিত সমাজে পুরাণকে নতুন আঙ্গিকে এবং নতুনভাবে যুগোপযোগী করিয়া প্রকাশ করার প্রবণতা জাগ্রত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে একমাত্র আঙ্গিকের দিক ব্যতীত এই নবভাব প্রায় অদৃশ্য। কোন কোন নাট্যকার পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যুগ-ভাবনাকে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতি ভক্তি, উচ্ছ্বাস ও অলৌকিক দৈবশক্তি নাট্যকার বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। মনোমোহন বসু বাংলা পৌরাণিক নাটককে স্বাভাবিক সুরে বাঁধিয়া, ভক্তি-উচ্ছ্বাসের প্রলেপ রাখাইয়া স্বল্পমুখী স্বাভাবিক নাটকের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালের কোন বাংলা পৌরাণিক নাটক সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। মনোমোহন বসুর নাটকও ভক্তিরস প্রধান। তবে তাহার মধ্যে নবযুগোচিত দেশপ্রেমের স্পর্শ আছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকও ভক্তিরসপ্রধান এবং অতিনাট্যকীয়। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক ঠাকুর রাধাকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মসাধনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত; তাহার ফলে তাহার নাটকে ভারতীয় জীবন-সাধনার শ্রেষ্ঠ নীতি—দয়া, কৃপা, মানবতাবোধ, দানধর্ম ও মানব-প্রীতি প্রভৃতি স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিও ভক্তির অতিউচ্ছ্বাসে ও অলৌকিক পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রভাবে ভারাক্রান্ত। তবে তাহার নাটকে তৎকালীন হিন্দুধর্মের নবঅভ্যুত্থানের (Hindu revivalism) সুরটি ধরা পড়িয়াছে। তাহার দৃকবজ্র, ব্রহ্মচরিত্র প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। কীর্ত্তিপ্রসাদ বিজ্ঞাপিনোদের পৌরাণিক নাটকে যুগের জিজ্ঞাসা থাকিলেও যুগোপযোগী সমাধান নাই। বাংলার পৌরাণিক নাটক প্রাচীন পুরাণের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়াছে

রাজ, বলিষ্ঠতার সহিত পুরাণকে নবচেতনায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই। বাংলা রাজা যে কাজ করিয়াছে গ্রামে, বাংলা নাটক সেই কাজটুকু করিয়াছে সহরে, নগরের নাটমঞ্চে। এই নাটকগুলি জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ভাবধারা সঞ্চার করিয়া দিয়াছে এবং তৎকালে শিক্ষিত সমাজও যে নৃতন করিয়া পৌরাণিক ভাবে অণুপ্রাণিত হইতেছিল, তাহারও প্রমাণ বহন করিতেছে।

॥ কাব্য ও কবিতা ॥ যুগচেতনার সার্বক প্রকাশ ঘটিয়াছে উনবিংশ শতকের নৃতন কাব্য ও কবিতাগুলিতে। মধুসূদনের 'যেমনাদ বধ কাব্য' পুরাণের পথে বাঙালীর নব অভিধানের স্বাক্ষর। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা ও বীরাজনা পুরাণের নবরূপায়ণ। ব্রজাঙ্গনার বিষয় বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় হইতে অভিন্ন হইলেও মূলতঃ পুরাণাশ্রিত। প্রাকৃতিক বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া বাংলার বৈষ্ণবপদে রাখা কোথাও নিজের হৃদয় উদ্ঘাটন করেন নাই। গোপী-রূপের বিরহবেদনা এইভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে শ্রীমন্তাগবতের রাসলীলায় এবং বিশেষভাবে 'ভ্রমরগীতা'র। রাসে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর গোপীগণ বনুনাভীরয় তরলতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রেমময় কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভ্রমর গীতায় কোন গোপী মধুকরকে দেখিয়া তাহাকেই কৃষ্ণের দূত মনে করিয়া অভিমান ছলে নিজের ক্লয়গীতি প্রকাশ করিয়াছে [ভাগবত, ১০. ৪৭. অ.]। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাখাও তরুণ জলধর, ময়ূর, কুসুম, সারিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া হৃদয়ের বিরহ-বেদনাকে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজাঙ্গনার রাখা Mrs. Radha—অনেকটা আধুনিক প্রেমনারায়িকার প্রতীক। 'মহাভাব শিরোরমণি' রাখার ভাবতন্ময়তা তাঁহাতে নাই। ইয়ং-বেঙ্কলের প্রতিনিধি মাইকেলের কাছে পুরাণের চরিত্র কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, ব্রজাঙ্গনার রাখা তাহারই প্রকাশ। পুরাণী প্রতিমার এইরূপ আরও কতকগুলিরূপাঙ্কুরিত মূর্তি 'বীরাজনা' কাব্যের তারা, উর্বশী ও কল্মশী। এগুলি চির পুরাতন তির্যক নারী-প্রেমের বিশেষ যুগভাবিত চিন্তার প্রকাশ। কোথাও কুলবধূর ব্যভিচারী প্রণয় (তারা), কোথাও বারাজনার প্রেমাসক্তি (উর্বশী), কোথাও কুমারীর প্রেম (কল্মশী)—সর্বত্রই প্রযুক্ত মনের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি। নারী-প্রকৃতির এই যুগোপযোগী বিচিত্র প্রকাশ দ্বারা মাইকেলের কাব্যে পুরাণের ব্রজাঙ্গনা স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে।

উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় মনোমত্ততার কবলে স্বাধীনতা হারাইয়া জাতির মনে যে 'জাতি বৈয়' ভাবের উদ্বোধন ঘটিয়াছিল, হেমচন্দ্রের 'বৃজসংহার' তাহার আর এক রূপ। কাহিনী ভাগবতের, কিন্তু কল্পনা হেমচন্দ্রের। বৈভ্য ব্রজাসংহার—ইউরোপীয় মনোমত্তির প্রতীক, আর পরাজিত দেবগণ ধর্মভীরু দৈববল-নির্ভর ভারতবাসীর প্রতীক। এই কাব্যে দ্বীচির ভয়ত্যাগ—'দ্বীচি ত্যজিলা তহু দেবের স্বরূপে'—অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশরকার ভক্ত প্রয়োজন নির্ধারণ আশ্রয়ান—পুরাণ-কাহিনীর এ তাৎপর্য নবযুগের আবিষ্কার। হেমচন্দ্রের পুরাণ-অবগাহনের অন্ততম উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। পৌরাণিক বিশ্বাসকে যুক্তির আলোকে তিনি নতুন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ‘ছারাময়ী’ কাব্যে দ্বাত্তের আদর্শ বাহাই থাকুক, হিন্দু-পুরাণের ‘নরক কলনার’ ছায়া অবশ্যই আছে। তবে হিন্দুপুরাণের মধ্যে পাপের ফল যে নরক ও নরক-ব্রহ্মণাঃ হেমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার শোধনে বিশ্বাসী :

তুষ্টিতির আছে ক্ষয়

সম্ভাপি অনন্ত নয়

পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ। [ছারাময়ী, ২য় পদ্য]

হেমচন্দ্রের আর এক পৌরাণিক কাব্য ‘দশমহাবিভা’। মানবসভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রতীক কালী-তারাদি মহাবিভার রূপ—এই ব্যাখ্যা নবযুগের বিশ্লেষণী যুক্তির দৃষ্টান্ত। ভূমিকায় যদিও বলিয়াছেন, পুরাণাদির আখ্যান তিনি ঠিক ঠিক অঙ্গুলয় করেন নাই, তথাপি কোন-কোন স্থলে পুরাণ-বর্ণনার সহিত গভীর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যেমন—

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্বেচ্ছ কতু তুলি হাত

সতীরে করেন অধেষণ।

পরশিতে পুনর্বার স্বকুমার তত্ব তার

সমতার অভ্যাস যেমন ॥

তখন নয়ন ঝরে পূর্ব কথা মনে সরে

সরে কথা নদী প্রস্রবণ।

বিশ্বনাথ শোকময় নিম্নলিখিত নেত্রজয়

প্রস্তুটিয়া করেন ক্রন্দন ॥ [দশমহাবিভা]

এই বর্ণনা বামন পুরাণের সতীহীন মহাদেবের বর্ণনার অঙ্গরূপ,

কণঃ গায়তি দেবর্ষে কণঃ রোদিতি শব্দরঃ।

কণঃ ধ্যায়তি তবলীঃ দক্ষকন্তাঃ মনোরমাম্ ॥

ধ্যাত্বা কণঃ অপিতি চ কণঃ স্বপ্রায়তে হরঃ।

অগ্রে তথেনঃ গদতি দৃষ্ট, দক্ষস্ত কন্তকাম ॥ [বামন, ৩ষ্ঠ অধ্যায়]

নবলব্ধ সমাজতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দার্শনিকতার ভিত্তিতে বাঙালী হিন্দুর অন্তরে যে নব মানবতাবোধ এবং হিন্দুধর্মের ঐক্যকেন্দ্রিক রূপটি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহারই ভিত্তিতে নবীনচন্দ্র শেন হিন্দু পুরাণকে নতুনভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া পরিণত বয়সে তিনখানি কাব্য প্রণয়ন করেন—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। এই ত্রয়ী কাব্যে ভাবগত একটি মিল

আছে, এবং শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিয়া, অঘিনীলা, মধ্যমীলা ও অম্বালীলাকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। তাই একত্রে এই কাব্যত্রয়কে বলা হয়—‘ত্রয়ীমহাকাব্য’। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে বলিয়াছেন ‘The Mahabharata of the nineteenth century’—মহাভারত এই অর্থে, ইহাতে সমস্ত জাতিধর্মের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড ‘মহাভারত’ প্রতিষ্ঠার করুনা হানলাভ করিয়াছে, এবং সেই মহাভারতীয় আদর্শকে বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া তুলিবার একটি স্বপ্ন মূর্তিবন্ত হইয়াছে। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রীকৃষ্ণ এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র, এবং তাঁহার ধর্মাদর্শ, বিশ্বমানবাত্মকৃতি ও ঐক্যবোধ এই কাব্যের মূল বক্তব্য। কিন্তু মহাভারতীয় কৃষ্ণের শৌর্ষ, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা, তাঁহার নীতিকুশল রাষ্ট্রনেতার রূপ, জ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত কর্মযোগীর আদর্শ—এই কাব্যে বতটা না রূপায়িত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকটিত হইয়াছে পুরাণের প্রেমভক্তির নায়ক শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ। হরিবংশে, শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে এবং অন্তান্ত পুরাণে যে কৃষ্ণচরিত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, চৈতন্যদেবের ভক্তিরসোচ্ছলতায় তাহাকে পুষ্টিত করিয়া কবি কৃষ্ণের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকে বলা চলে, উনবিংশ শতকের নব পুরাণ। পৌরাণিক মনোভাবই প্রধান। সংস্কারকের মনোভাব লইয়া পুরাণের কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, বর্ণব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, জাতিভেদ, মূর্তিপূজা প্রভৃতি দূরীকৃত করিয়া কবি পুরাণকেই বিশ্বকর্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণের বহুদেবতার পরিবর্তে এক বিরাট পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একজাতি, একপ্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রতি অজুলি সন্মত করিয়াছেন এবং এই বিরাটের পূজার অর্ঘ্য যে মানবপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম—তাহাকেও পুরাণের আবেগাত্মক রসোদ্বেল প্রেমভক্তির আদর্শে অহুরঞ্জিত করিয়াছেন। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস সংস্কারমুক্ত মনের সৃষ্টি নবপুরাণ, তাহার মূলকথা :

একজাতি মানব সকল ;

একবেশ—মহাবিশ্ব, অনন্ত, অসীম ,

একই ব্রাহ্মণ তার—মানব-রূপ,

একমাত্র মহাবক্ত—অধর্ম সাধন,

যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ। [রৈবতক]

পুরাণের এই নব রূপায়ণ নবীনচন্দ্রে পরিপূর্ণতা লাভ না করিলেও, তখনকার শিক্ষিত মননশীল হিন্দু কিরূপে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কারমুক্ত মন ও পাশ্চাত্য বিশ্লেষণমুখী যুক্তি লইয়া হিন্দু পুরাণকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী পুরাণকে ভালবাসিয়াছে—তাই পুরাণের ক্রটি-বিমোচনে উদারীন না থাকিয়া যুগের প্রয়োজনানুসারে তাহার পুরাণের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছে।

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমা ॥

উনবিংশ শতকের প্রদীপ্ত প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলী পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত স্বাধীন চিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ। যুগটি ছিল সংশয় ও অবিশ্বাসের যুগ। একদল লোক অন্ধভাবে দেশীয় শাস্ত্র-পুরাণের নিন্দায় তৎপর হইয়াছিলেন, আর একদল পুরাণেতিহাসকে নস্ত্রাং করিয়া বৈদিক জ্ঞানবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে-ছিলেন। ইহারই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, ভারতীয় হিন্দুধর্মের সাবিক রূপটি রহিয়াছে পুরাণের ভিতর। তিনি বলিলেন, পুরাণেতিহাসে আদর্শ চরিত্র আছে, ‘পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার নিহিত আছে’ [ধর্মতত্ত্ব ১ম, ২] এবং আরও বাললেন, ‘পুরাণেতিহাসেই বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেবশিষ্যদিগের মত এই যে পুরাণ-ইতিহাস কেবল বৃথা এবং ঔপধামিকতা, ভণ্ডামি এবং নটামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের স্থায় শ্রেষ্ঠ।’ [ধর্মতত্ত্ব, ২য়, ৩]

এই উক্তিগুলির ভিতর পুরাণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্ফূর্তির পরিচয় সুপরিষ্কৃত। কিন্তু পুরাণের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ তিনি অহুভব করেন নাই। এই সমর্থনের পরে একটা ‘তবে’ আছে, ‘তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাস।’ কটাক্ষটি তীব্র এবং তখনকার দিনে বৈপ্রবিক মনোভাবের পরিচায়ক।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমা নবজাগ্রত যুক্তি, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার সন্ধানী দীপ লইয়া। তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুরাণের বহলাংশ অনৈসর্গিক, অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ; পুরাণের প্রকৃত আদর্শ ও সত্য বহু অবিশ্বাস্ত ও মিথ্যার লক্ষণযুক্ত কাহিনী দ্বারা আবৃত; বহু দেবচরিত্র ‘গুরুতল্লগামী’, ‘লোভী’, ‘স্বার্থপর’, ‘ইন্দ্রিয়পরবশ’ ও ‘মহাপাপিষ্ঠ’। এ সকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম নয়। ‘বাস্তবিক হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর গূঢ় তাৎপর্য আছে। তাহা পরম রমণীয় এবং মহুগ্গের উন্নতিকর।’ [ধর্মতত্ত্ব, ২য়, ৪।]

এই সত্যটিকে পরিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাণ-পরিক্রমা। এই সত্যাত্মসঙ্ঘিসার ফল—‘ধর্মতত্ত্ব’, ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ও ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’। এগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকৃত নব পুরাণ-ভাণ্ড। এই ভাণ্ডের মাধ্যমে তিনি পুরাণের ঈশ্বরতত্ত্ব, অবতারবাদ, জীবতত্ত্ব জন্মান্তরবাদ, দেবোপাসনা ও মুক্তিতত্ত্বের উপর নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। আলোচনায় সর্বত্র পৌরাণিক বিশ্বাসকে গ্রহণ করেন নাই, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য অবলম্বন করিয়াছেন; সাংখ্য-যোগের প্রভাবও গুরুতর।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব পরিষ্কৃষ্টে বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্য-যোগ দর্শনের অন্তর্গত। পুরাণ যেমন

মনে করে, পরমতত্ত্ব লীলার জগদ্রূপে পরিণত, বন্ধিমচন্দ্র তাহা মনে করেন না। তাঁহার মতে, যেমন সাংখ্যবোধমতে, ঈশ্বরের সংজ্ঞাই স্বতন্ত্র। বৈদ্যভিক্টর মত তিনি ‘এক সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ নিত্য পদার্থকে স্বীকার করেন, কিন্তু পৌরাণিক মতে সেই পদার্থ যে স্রষ্টা ও সাকার—তাহা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, নৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। ‘পরমতত্ত্বের ‘আত্মা’ প্রকৃতির ক্ষেত্রে পতিত হইয়া জগতের নৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কার্য চলিতেছে।’ [ধর্মতত্ত্ব, ২. ১৫]।

ঈশ্বর, বন্ধিমচন্দ্রের মতে (যেমন সাংখ্য-বোধ মতে), ‘সর্বগুণের সর্বাঙ্গীণ ক্ষুতির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ’ [ধর্মতত্ত্ব ১. ৪] ; তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাব ; তিনি সর্বভূতময়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; তিনি জগদগুরু, তাঁহার মূর্তি বিস্বরূপ, নিরাকার। অর্থাৎ ঈশ্বর চরম বিকাশের পরিপূর্ণ আদর্শ।

পুরাণমতে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। কিন্তু জীবদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, বন্ধিমচন্দ্র এ বিষয়ে সংশয়বানী। যে বিশ্বাসই থাকুক, কাগজে-কলমে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মানবত্বই প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অবতার হইতেছেন সেই মানুষ, যিনি মানুষী শক্তির প্রকাশ করিয়া মানবতার আদর্শ স্থাপন করেন। ঈশ্বরাদর্শে গঠিত পূর্ণ মানুষই ঈশ্বর অথবা মহত্ত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তিই ঈশ্বর—ইহাই বন্ধিমচন্দ্রের বিশিষ্ট অভিমত।

জীব, তাঁহার মতে পরমাত্মার মায়াবদ্ধ অংশ। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। কর্মফলে জীবের জন্মান্তরবার স্বাক্ষরিতও তিনি পৌরাণিক বিশ্বাসকে ছুঁ করেন নাই। জীবের উপাসনা ও মুক্তিতত্ত্বও পুরাণ-বিশ্বাসের যুগোপযোগী ভাষা। গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, ‘কর্মাহুসারে জীবাত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাঁহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় বা নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। ইহাকে সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে’ [ত্রৈলোক্যভগবদ্গীতা, ২. ১৩]। মুক্তি একটি স্থায়ী সুখ বা দুঃখশূন্য অবস্থা। অথবা বলা যায় পরিপূর্ণ বিকশিত মহত্ত্বের বা ঈশ্বরত্বের অবস্থা। বন্ধিমচন্দ্রের মতে সম্পূর্ণ ধর্মাচরণদ্বারা ইহজীবনেই এই মুক্তি লাভ করা যায়।

এই মুক্তির লক্ষ্যেই জীবের উপাসনা। বন্ধিমচন্দ্রের উপাসনাতত্ত্বেও পৌরাণিক মতের প্রতিফলন আছে। তিনি পৌরাণিক ভক্তিবাদকেই উপাসনার মূল ভিত্তি বলিয়াছেন ; এমন কি প্রতিমাপূজাকেও তিনি গোণ-ভক্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাপাি এই উপাসনাতত্ত্ব পুরাণের পটভূমিতে এক নতুন তত্ত্ব। মানবতাবাদ বা মহত্ত্বের পূর্ণ সুরণ এই তত্ত্বের মূলকথা। ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত বন্ধিমচন্দ্রের অত্মশীলনতত্ত্ব।

‘মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ’—এই মানবওই বহুমুখের পুরাণ-অবীক্ষা ও পুরাণ-সমীক্ষা। এই মানবওই ঈশ্বর, অবতার, কর্ম ও ভক্তিবাহ এবং জীবের পরম পুরুষার্বের বিচার।

বহুমুখ মনে করেন, ঈশ্বরের ‘আভা, যে হাতুর্বে বসে বিকশিত, তাঁহার উপাসনা ও মুক্তি’তত প্রাগ্রসর। তিনি বলেন, ‘তাঁহার (ঈশ্বরের) সর্বগুণসম্পন্ন বিভক্ত স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। তাঁহার নির্মলতার মত নির্মলতা, তাঁহার শক্তির অহঙ্কারী সর্বত্র সকলস্থ শক্তি কামনা করিতে হইবে।—অর্থাৎ তাঁহার সামীপা, সালোকা, সারূপ্য ও সাংখ্যা কামনা করিতে হইবে তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব...ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব।’ [ধর্মতত্ত্ব. ১. ৪.]। তিনি আরও বলেন, ‘ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরের আরাধনা বটে, কিন্তু ভোবামদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রাপ্তিপালনই তাঁহার তুষ্টিসাধন, তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা’ [শ্রীমদ্ভগদগীতা, ৩. ২]। বহুমুখের মতে, নিকাম কর্মই ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, উহাই ভক্তি [‘যখন মহত্ত্বের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি’—ধর্মতত্ত্ব. ১. ১১]। এই ভক্তিই প্রকৃত ‘কৃষ্ণার্পণ’। বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার উপায় অহুশীলন দ্বারা বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান।

মোটের উপর মহুগুধর্ম পালন এবং সেই ধর্মপালন দ্বারা ঈশ্বরের আভায় উদ্ভাসিত হওয়াই মহুগুজীবনের চরম প্রাপ্তি। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচার দ্বারা পুরাণের এই মর্মসত্যের আবিষ্কার, বহুমুখের পুরাণ-পরিক্রমার শ্রেষ্ঠ ফল। এই ফলকে তিনি কেবল প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তাঁহার উপন্যাসাবলীর মধ্যেও প্রকাশ করিয়াছেন। ‘দেবী চৌধুরাণী’ অহুশীলিত মানবধর্মের এক প্রকাশ, আর এক প্রকাশ অনানন্দমঠের ‘সম্ভাষন’। সংকর্ম, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, প্রীতি-দয়াদির সুরণে ইহার ঈশ্বরের আভায় আভাসময়। আর তাঁহাদের সমষ্টিভূত বিকাশের পূর্ণাদর্শ কৃষ্ণচরিত্র।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও পুরাণ-প্রসঙ্গ ॥

বিপুলায়তন রবীন্দ্রসাহিত্যে পুরাণ-প্রসঙ্গ স্বল্প। যে ব্রাহ্মসমাজে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমাজ পৌরাণিক বিশ্বাসের বিরোধী। পুরাণের কুসংস্কার, শুদ্ধ আচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস-বশে নয়, রবীন্দ্রনাথ আবাল্য যে উদার মানবধর্মে পুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সার্বভৌমিক মানবতার আদর্শ তাঁহাকে সকল হীনতা, দীনতা ও নীরস বন্ধনকে পরিহার করিতে

শিক্ষা বিয়াছিল। এইজন্য প্রথম হইতেই যে পৌরাণিক অন্ধবিশ্বাস, বিচার-মুক্ততা ও তৎকালীণ ভারতীয় জীবনকে পঙ্ক ও প্রাণহীন করিয়া তুলিতেছিল, তাহাকে তিনি সর্বদা জানাইতে পারেন নাই। রানসাঁ কাব্যের 'দ্রুত আশা', সোনার তরীর 'হিংস্র ছুই', চৈতালির 'পুণ্যের হিসাব,' মৈষেভের 'মুক্তি', 'অগ্রমত', 'দ্রাণ' প্রভৃতি কবিতার তিনি আচার-পরায়ণতা, অন্ধভক্তি ও কর্মবিমুখতাকে কটাক্ষ করিয়াছেন। এমনকি, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বাহারা পৌরাণিক বিশ্বাস সর্বদা করিতেছিলেন, তাঁহাদের অপচেষ্টাকেও তিনি স্নেহ করিয়া বলিয়াছেন,

টিকিটি যে রাখা গুতে আছে ঢাকা

ম্যাগনেটিজম শক্তি,

ভিলক রেখায় বৈদ্যুত ধার

তায় জেগে ওঠে শক্তি। [কল্পনা—উন্নতি লক্ষণ]

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী', 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'কালের বাত্মা' প্রভৃতি নাটক ও কলঙ্কার ও প্রথা, পুণি ও পুরোহিত, শাস্ত্র, বলিদান ও মন্ত্র-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কারমুক্ত মনের স্বতন্ত্র প্রতিবাদ।

কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ পুরাণকে বর্জন করেন নাই। মহর্ষি-ভবনে মাঝে মাঝে পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইত : 'এখানে পুরাণ পাঠও হইত। কোনদিন পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শাস্ত্রবটিত তর্ক উঠিত' [জীবনস্মৃতি]। তাহা ছাড়া, ভারতবাসী জগদ্বিজিত সংস্কারের মত লোকমুখে নানা প্রসঙ্গ শুনিয়াই পুরাণের সহিত পরিচিত হয়। রবীন্দ্রনাথও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কবির কৈশোর-সৃষ্টি 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতায় পুরাণের জিমুতি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিগুণ রূপায়িত হইয়াছে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। এই ব্যাপারে উপনিষৎ, বৌদ্ধ সাহিত্য, কালিদাসের কাব্য এবং বাংলার মহাজনপদাবলী ছিল প্রেরণার মূল উৎস। ভারতীয় পুরাণকে রবীন্দ্রনাথ লাভ করেন প্রধানতঃ কালিদাস ও বৈকব মহাজনদের মধ্যস্থতায়। মদনভদ্র ও হর্যাপর্বতীর প্রেম এবং ব্রজকাহিনী বিচিত্রভাবে রবীন্দ্র-রচনায় রসসংস্কার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনায় এগুলির প্রভাব অসাধারণ। পুরাণের কমলা লক্ষ্মী রবীন্দ্রকাব্যের কল্যাণী নারী, পুরাণের বীণাশাপি সন্ন্যস্তী রবীন্দ্রকাব্যের মঞ্জুভাবিনী বাণী-ত্ৰী, পুরাণের উর্বশী নিবিশেষ সৌন্দর্যের (Abstract Beauty) প্রতীক। পৌরাণিক শিব বিচিত্ররূপে রবীন্দ্রকাব্যে রূপায়িত হইয়াছেন, কখনও তিনি নটরাজ, কখনও প্রেমিক—তাঁহারই নৃত্যে প্রলয় ঘনাইয়া আসে, তাঁহারই নৃত্যে স্নান হয়। কুটে সৃষ্টির শতদল : শিব ভীষণ স্নান,

ভ্যাল মধুর [উৎসর্গ : মরণ-মিলন]। এই চরিত্রগুলি নানাবিধ হইতে—প্রের ও সৌন্দর্যকল্পনার, স্বভাব ও অর্থও জীবনের ধারণার, প্রেরসী ও প্রেরসী নারীর বিগ্রহগঠনে রবীন্দ্রনাথকে অল্পপ্রেরিত করিয়াছে। অনন্তের লীলাসাম্রাজ্যে কবি বহুক্ষেত্রে উদা ও রাধার প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন। মহাকালকে বর কল্পনা করিয়া স্বভাব-মধুরী আশ্বাসনের কল্পনাটিও অভিনব। এসকল হলে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের পৌরাণিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে নূতন চরিত্র-প্রতীক সৃষ্টি করিয়াছেন।

পুরাণের অঙ্গসংস্কারগুলিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই, বরং পুরাণে প্রচ্ছন্ন মহনীয় ভাবগুলিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পুরাণে যে প্রতিমা, মন্দির ও তীর্থের কল্পনা আছে, তাহা সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য। গৃহ ও অনির্দেশ্য ভাব সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়াই পুরাণে প্রতীকের অবতারণা। ব্যাসদেব নিজেই বলিয়াছেন, তিনি পুরাণ রচনা করিয়া অরূপকে ধ্যানকল্পিত প্রতিমার রূপ দিয়াছেন, শ্রুতিধারা অনির্বচনীয়ের অনির্বচনীয়তাকে ক্ষুদ্র করিয়াছেন, মন্দির ও তীর্থের কল্পনা করিয়া সর্বব্যাপকের ব্যাপকতা বিনষ্ট করিয়াছেন।^১ পুরাণে যে সত্য অপ্রাকৃত কল্পনা দ্বারা আচ্ছন্ন, রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, (১) জীবের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান, (২) ধরণীই শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও মন্দির, (৩) 'বারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা' [চৈতালি] এবং (৪) মহৎ কর্তব্য সাধন করাই মুক্তি-সাধনা। ব্যাসদেবের সঙ্কেতিত অর্থ ই রবীন্দ্রকাণ্ডে ব্যক্তিত হইয়াছে অল্প কৌশলে।

রবীন্দ্রনাথে পুরাণের প্রভাব আরও গূঢ়স্বরূপী। পুরাণের অন্ততম বিশিষ্টতা— (১) জন্মান্তরবাদ, (২) লীলাবাদ ও (৩) ভক্তিবাদ। রবীন্দ্রকাণ্ডে এগুলি বিচিত্র ভাব-রস সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী : অবিচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহের কল্পনায় পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদের (Evolution Theory) প্রভাব থাকিলেও, 'উহাতে হিন্দু পুরাণের প্রভাব অল্প নয়। পুরাণমতে একই চৈতন্তসত্তা কোন জন্মে তমোঘন জড় পদার্থ, কোন জন্মে পরিপূর্ণ চেতনধর্মী জীব। বৃক্ষ-লতা-পুষ্প সেই চৈতন্তেরই রূপান্তর। পুরাণের এই মত রূপায়িত হইয়াছে মহৎসাহিত্যের 'তমসা বহরূপেণ বেষ্টিতা কর্মহেতুনা' শ্লোকে। রবীন্দ্রনাথও মনে-প্রাণে ইহা বিশ্বাস করেন যে, জীব-চৈতন্ত এইভাবে যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া আসিতেছে স্বাবর হইতে জগৎ সৃষ্টিতে। সমুদ্রকে

১। রূপং রূপবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন বৎকল্পিতম্।

স্বভাবানির্বচনীয়তাখিলগুরোহু রীকৃতা বয়সা ॥

ব্যাপিন্ধক নিরাকৃতঃ ভগবতো বস্তীর্থধাত্মাদিনা।

কল্পব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ঃ সংকৃতম্ ॥

দেখিয়া তাই তাঁহার সেই পূর্বজন্মের স্মরণ আগে, যেন সন্মুখের সহিত তাঁহার জন্মান্তরের সম্পর্ক; বুকের পত্র-স্পন্দন দেখিয়া মনে হয়, ওই বুকের সহিত তাঁহার মাড়ীর যোগ এবং এ জন্মের প্রিয়তমাকে দেখিয়া মনে হয়, 'তোমাতেই যেন ভালবাসিয়াছি আমি শতরূপে শতবার।'

ওধু জন্মান্তরবাদ নয়, লীলাবাদও পুরাণের আর একটি বৈশিষ্ট্য। পুরাণের মতে The whole world-order is the play of the Supreme Spirit (Divine Lila)^১ :। 'ব এক দেশা জগদ্ আত্মলীলা স্বকৃত্যবত্যাতি' [ভাগ. ১০. ১০. ৩৪]। সেই আনন্দধন পরমসত্তা বিচিত্রভাবে বিশেষ লীলা করিয়া চলিয়াছেন। স্বরূপতঃ তিনি 'অশেষত'—কিন্তু লীলায় তিনি দুই বা ততো এবং বহু। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা ও ভগবান লীলাময়ী বা লীলাময়। অন্তরে তিনি এক, বাইরে 'বিচিত্ররূপিনী'—বহু। নিখিল জগতে তাঁহার আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য্য-লীলার অন্ত নাই। মাহুঘের সঙ্গে তাঁহার রসের যোগ। পুরাণের লীলাবাদই এই প্রকারে 'অবোধপূর্বভাবে' রবীন্দ্র-কাব্যে লীলার অনন্ত মাধুরী বিস্তার করিয়াছে।

এই লীলাবাদের পরিপূরক ভক্তিবাদ। বিশ্বজগতে অনন্তের যে প্রেম ও সৌন্দর্য্য-লীলা বিলসিত, জীব প্রেমে ও ভক্তিতে সেই লীলারস আশ্বাদন করিয়া ধন্ত হয়। জীব যে তাঁহারই অংশ। ভগবানের সহিত জীবের তাই প্রেম ও রসের সম্পর্ক। ভগবান প্রেমিক, জীব প্রেমিকা; তিনি বঁধু, জীব বধু। পুরাণের এই প্রেম-ভক্তিবাদ সহজনিঃশাসনের মত রবীন্দ্র-রচনার রসলকার করিয়াছে। সাধারূপে বা উমারূপে কবি অনন্তের প্রেম আশ্বাদন করিয়া ধন্ত হইয়াছেন, আর বলিয়াছেন,

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে

আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান। [গীতাঞ্জলি—প্রতিস্থিতি]

ইহা যেন পৌরাণিক এই ভাগবতী লীলারই প্রতিক্রিয়া,—

শক্তিম্প্রাপ্তিত্য পুরুশক্তিঃ পরং পুমান্

আত্মানং ক্রীড়ন্ত ক্রীড়ন্ত করোতি বিকরোতি চ ॥ [ভাগ. ২. ৪. ৭]

॥ রামায়ণ ॥

ইতিহাস ও মহাকাব্য

রামায়ণ বা মহাভারত ভারতবাসীর সর্বাধ-সাধক। এই দুই গ্রন্থে ভারতবর্ষের ধর্মার্থ রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—এক কথায় রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহজীবনের সকল আদর্শ বিদ্যুত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘ভারতবর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।’ রামায়ণ-মহাভারত সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষের জনজীবনে ইহাদের প্রভাবও অপরিমেয়। বেদ এ দেশের প্রধান গ্রন্থ, কিন্তু বেদজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ। পুরাণ এদেশের আর এক সম্পদ, কিন্তু পুরাণের প্রচার সর্বব্যাপক নয়। রামায়ণ-মহাভারতই জনসাধারণের বেদ-পুরাণ। রামায়ণ ‘বেদসম্মিত’, মহাভারত ‘পঞ্চম বেদ’। উভয় গ্রন্থই আবার পুরাণ সন্মূহের বিশ্ব-কোষ। তাই জন-জীবনে রামায়ণ-মহাভারতেরই সমাদর। এ দেশের গৃহজীবনে পুত্রের আদর্শ রাম, ভ্রাতার আদর্শ ভরত ও লক্ষ্মণ, পত্নীর আদর্শ সীতা, আর পরিপূর্ণ মহত্ত্বের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ; ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনের আদর্শ রামরাজ্য।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রামায়ণ-মহাভারতকে Epic বা মহাকাব্য বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এমন কি রামায়ণ-মহাভারতেও উহাদিগকে বলা হইয়াছে ‘ইতিহাস’ [‘ইতিহাসঃ পুরাতনম্’]। ইতিহাস বলিতে বুঝায় পূর্ব বৃত্তান্ত বা প্রাচীন কথা। পুরাণও পূর্ব বৃত্তান্ত বা প্রাচীন কথা। কিন্তু পুরাণ হৃদয় অতীতের কথা, আর ইতিহাস অদূর অতীতের বিবৃতি। পুরাণ হৃদয়ের বলিয়া কল্পনা-প্রধান, আর ইতিহাস অদূরের বলিয়া উহাতে বাস্তবতার দাবী সমধিক। ইতিহাস লোকশ্রুত বংশের লোকশ্রুত ব্যক্তির কীর্তি-কাহিনী। সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এ দেশের দুই যুগপ্রাচীন বংশ। এই সূর্যবংশের ইতিহাস রামায়ণ। রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র ইহার নায়ক। আর মহাভারত বিখ্যাত চন্দ্রবংশের ইতিহাস, কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষের বৃত্তান্ত। যথাক্রমে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের এই ঐতিহাসিক অল্পবুদ্ধি রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যও। বাঙ্গালী আদি কবি, ব্যাসদেবও বিদ্বান্ কবি। স্বপ্রাচীন কাল হইতেই এই দুই গ্রন্থ মহাকাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তবে পরবর্তীকালে অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে অর্থে ইহার মহাকাব্য নয়। রামায়ণ-মহাভারত জাত মহাকাব্য। একটি সমগ্র দেশ বা জাতির সর্ব

তাহাতে উদ্ঘাটিত হয়। এরূপ মহাকাব্য অল্পই লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘মহাকাব্য তো আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে চারিটি মাত্র আছে,—ইলিয়াড, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত।’ রামেন্দ্রচন্দ্রও বলেন, ‘বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন প্রাচীনকালে বাস্কীক, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না’।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মতে একটি দেশের সুপ্রাচীন বীরগাথাই (Heroic Ballad) মহাকাব্যের বীজ। এই বীরগাথার সহিত সেই দেশের পুরাকাহিনী, আখ্যান-উপাখ্যান যুক্ত হইয়া পরিশেষে অটোছুট সমায়ুক্ত বৃহৎ কাব্যের আকারধারণ করে। এইরূপ মহাকাব্য কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনাও নয়। অনেককালের অনেক রচনা ও কিংবদন্তী পরবর্তী কালের কোন শক্তিশাল লেখকের লেখনীমুখে সংহত হইয়া বিশাল মহাকাব্যের কায়া লাভ করে।^১ অর্থাৎ পাশ্চাত্যমতে জাত মহাকাব্যের লক্ষণ দুইটি—ইহার মূল Deeds of heroes এবং ইহার প্রকাশ Impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক।

রামায়ণ ও মহাভারতে এই দুইটি লক্ষণই বিদ্যমান। রামায়ণ-মহাভারত মূলতঃ বীরগাথা—রাম-রাবণের যুদ্ধ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। তাহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে ‘নানানির্দ্দোষকথান্দ্দোষাঃ’ [রামায়ণ], এবং ‘বিবিধাঃ কথাঃ’ [মহাভারত]। রামায়ণ ও মহাভারত যথাক্রমে বাস্কীক ও বেদব্যাসের রচনা বলিয়া গণ্য হইলেও, উহারা যে এক ব্যক্তির রচনা নয় এবং কোন এক যুগের সৃষ্টিও নয়, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রামায়ণে বলা হইয়াছে, বাস্কীক প্রকাশিত রামচরিত্রকে পুনরায় ব্যক্ত করিবার উদ্যোগ করিলেন—‘বাস্কমধ্বেষতে ভূয়ো যদ্যন্তঃ তন্ত্রাধীমতঃ’ [বাল. ৩.১]। মহাভারতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে,

আচখ্যাঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যচকতে পরে।

আখ্যানস্তুতি তথৈবাক্তে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥ [আদি. ১. ২৬]

—এই ইতিহাস পূর্বে কোন কবি কীর্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি ইহা বর্ণনা করিতেছেন এবং পরে কেহ কেহ বর্ণনা করিবেন।

বহুকাল পূর্বে গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল জাত মহাকাব্যের কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, (i) এপিক বর্ণনাত্মক, (ii) উহা আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি অখণ্ড কাহিনী এবং (iii) উহা বলিষ্ঠ গভীর ছন্দে প্রণীত। এই উক্তিতে মহাকাব্য

১। ‘It is not in its entirety the work of a single author, but to some extent the result of a process of evolution and consolidation.—W. D. Hudson [An Intro. to the study of lit. Chap. III]

যে বিষয় ও বর্ণনাগুণে সবুজ এবং উহাতে যে একটি রাজনিক সৌরভ ও বিজুতি থাকে, তাহা আভাবিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাকাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অখণ্ড ও মহত্ব। রামায়ণ-মহাভারত এদিক হইতেও মহাকাব্য। উহার আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত অখণ্ড কাব্য তো বটেই, উপরন্তু উহাতে আছে বিপুল মহত্ব ও গুরুত্ব। ‘মহত্বপূর্ণমাখ্যানঃ রামায়ণমিতি শ্রুতম্’, আর ‘মহত্বান্তর্যাক্ষ মহাভারতমুচ্যতে’। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতকে ‘বৃহৎ বনম্পতি’র সহিত তুলিত করিয়াছেন। আচার্য রাধেন্দ্রনাথ বসেন, ‘মহাভারতকে ভারতের হিমাচলের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়।’ শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতকে বলেন, ‘Olympian’, আর রামায়ণকে বলেন, ‘Oceanic poetry’ [Vyasa and Valmiki—Sri Aurobindo]—রামায়ণ ‘সমুদ্রমিব রজ্জাঢ্যম্’, আর মহাভারত ‘মথামেক্ষর্যহাগিরিঃ’। এই বিশালস্বই ইহাদের মহাকাব্যস্ব।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মহাকাব্যের মূলে যে বীরগাথা থাকে, তাহা ধর্ম ও অলৌকিক বিশ্বাসবিগ্রহিত নিছক মানব-কাহিনী। কালক্রমে ধর্ম ও নীতিকথায় মণ্ডিত হইয়া উগা Religious in character হইয়া উঠে। হোমারের ইলিয়াড-অডেসিতে তাহাই হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারতও ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ তাঁহাদের বস্তুব্য এই যে, ‘নরচন্দ্রমা’ রাম এবং ‘নরবণু বাহার অরূপ’ এমন কৃষ্ণ আদ্যো ছিলেন বীরপুরুষ মাত্র। ক্রমে তাঁহারা বিষ্ণুর স্তরে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, রামায়ণে ও মহাভারতে যে-যে অংশে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণে দেবস্ব আরোপিত হইয়াছে, সেই সেই অংশ প্রকৃষ্ণ। রামায়ণ-মহাভারতে প্রকৃষ্ণ অংশ অবশ্যই আছে। কিন্তু সে প্রক্ষেপবিচারের পথ ইহাই কিনা, বিচার্য। উপরন্তু রামায়ণ-

১। It is true in the Epic poems Rama and Krishna appear as an incarnation of Vishnu, but at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men, acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority.....It is impossible to read either of these two poems with attention without being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes and of the unskillful manner in which these passages are often introduced and without observing how closely they are connected with the rest of the narrative. and how unnecessary they are for its progress—Indian Antiquities. Vol I. Lassen [Quoted from Muir's O. S. T.]

মহাভারতে ধর্মভাব আরোপিত—ভারতবর্ষের ধর্মসাহিত্য সম্পর্কে এ বত অশ্রুতের।

রামায়ণ 'কাব্যবিশ্বকোষ' ধর্মবিশ্বকোষবিভাগ [বাল ৩. ৮] আর মহাভারত,

ধর্মশাস্ত্রমিঃ পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিঃ পরম্ ।

বৈদ্যশাস্ত্রমিঃ প্রোক্তঃ ব্যালেনামিতবুদ্ভিনা ॥ [আদি ৫৭. ২৩]

এই ধর্মভাব পরবর্তীকালের বোঝনাও নয়। ভারতবর্ষের জীবন কোনকালেই ধর্মবিরহিত নয়। ধর্ম ও নীতি বিরহিত জীবনের বিরুদ্ধেই এদেশের সংগ্রাম। কাব্য-বচন অধর্মচ্যুতী দশাননের উপর ধর্মবীর রামচন্দ্রের জয় এবং মহাময় দুর্যোধনের উপর নৃত্যধর্মবাহী কৃষ্ণের জয়—এই সত্যেরই পরিণাম। উপরন্তু রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের অবতারত্ব বহুপূর্ব হইতে স্থাপিত।

২ রামায়ণ-প্রসঙ্গ : কাব্যোৎপত্তির কাহিনী

রামায়ণ 'আদি কাব্য', বাঙ্গালীক 'আদি কবি'। বৈদ্যক কাব্যগণও কবি, কিন্তু আদি কবিখ্যাতি রামায়ণকার বাঙ্গালিকর। কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ কবিরূপ বাঙ্গালীকেই অশ্রুত কবি বলিয়া স্বীকৃতি জানাইয়াছেন।^১ বাঙ্গালীকর কবিজাতির বিবরণটিও মনোজ্ঞ। কবি হুয়ে সৃষ্টি-প্রেরণা কিরূপ গভীর, এই বিবরণ তাহার জলন্ত উদাহরণ। রামায়ণের হুচনা এই কাহিনী লইয়া :

বাঙ্গালীক নারদমুনিকে প্রশ্ন করিলেন, 'কোহস্মিন্ সাম্রাজ্যে লোকে গুণবান্ কচ্চ বীর্যবান্।' নারদ উত্তর করিলেন, 'ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ প্রভুঃ।' নারদ রামচন্দ্রের গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া স্রষ্টাকারে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইতে রাবণ বধান্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করিয়া কাহিলেন, রামরাজ্যে লোক নিরাময়, নীরোগ, আনন্দিত ও হৃদয়ভরবর্জিত হইবে। বাঙ্গালীক রামরূতান্ত শ্রবণ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে স্নানার্থ তপস্বী নদীর তীরে আসিলেন। চতুর্দিকে নির্বিড় বনশোভা, বনে বিহারে প্রমত্ত এক কৌকরমধু। সহসা এক নিষ্ঠুর ব্যাধ কামোহিত কৌকরকে বাণবিন্দু করিল। ভূতলে পতিত রক্তাম্লুত কৌকর, আর তাহাকে ঘিরিয়া কৌকরী করুণ রোদন। মহাবীর অন্তরে করুণার স্ফূর্তি হইল। উদ্বেলিত শোকভরে তিনি অত্যন্তে বলিয়া কেলিলেন,

মা নিবাহ প্রাতিষ্ঠাঃ স্তম্ভগমঃ শাস্ত্রী সযাঃ ।

বৎ কৌকরমধুনাদেকমবধী কামোহিতম্ ॥ [বাল. ২. ১৫]

১। অথ ভগবান্ প্রোচেতসঃ প্রথমঃ মহাশয়ুঃ স্রষ্টব্রহ্মস্রষ্টাদৃশঃ বিবর্তমিতিহাসঃ
রামায়ণে প্রদিশ্য [উত্তররামচরিত. ২য় অঙ্ক ।]—ভবভূতি

—রে মিথ্য! যেহেতু তুই কৌকম্বুসেন্নের একটিকে কারমোহিত অবস্থায় বধ করিলি, সেই মিসিত অনন্তকাল তুই প্রতিষ্ঠানাত্ত করিতে পারিবি না।

বলিয়াই তিনি ভাবিলেন, এ আমি কি বলিলাম, ‘কিম্বৎ ব্যাক্তং ব্রহ্ম’। শিক্তকে ভাঙ্কিয়া বলিলেন, শোকের আবেগে এই বে পানবন্ধ, সমাক্ষয় বিশিষ্ট, লসনমণ্ডিত বাক্য উচ্চারিত হইল, ইহা ‘শ্লোক’ নামে খ্যাত হউক [‘শোকাকর্ত্ত প্রযুক্তো বে শ্লোকো ভবতু স্তাক্তথা’]। শিক্তও মূনির বাক্য অনুমোদন করিলেন। বাগ্মীকির মনে বিভর্ক চলিতেই লাগিল। আশ্রমে ফিরিয়াও তিনি উন্নয়ন রহিলেন। এমন সময়ে আশ্রমে আসিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্ম। বাগ্মীকি তাঁহাকে পাত্ত-অর্ঘ্য-আসন দিলেন, কিন্তু তখনও তিনি শোকাকর্ত্ত হইয়া তন্নয়নচিন্তে পূর্ব শ্লোকের কথাই ভাবিতেছিলেন। অন্তর্ধানী ব্রহ্ম সব বুঝিলেন, সহাস্তে তিনি বলিলেন, ‘শ্লোক এবাস্ত্বং বন্ধো নাজ কার্ধা বিচারণা’—সংশয় করিও না, তোমার এই ছন্দোবদ্ধ বাক্য শ্লোক নামেই বিখ্যাত হইবে। ব্রহ্ম তাঁহাকে নারদবর্ণিত রামের সমগ্র চরিত রচনা-করিতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন :

যচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি ।

ন তে বাগনৃত্য কাণ্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥

যাবৎ স্মার্ত্তান্ত গিরয়ঃ সরিতন্ত মহীতলে ।

তাবজ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচারিষ্যতি ॥ [বাস. ২. ৩৫-৩৬]

—যাহা অবিদিত, তাহাও তোমার বিদিত হইবে, তুমি যাহা এই কাব্যে বর্ণনা করিবে, তাহার একটি বাক্যও মিথ্যা হইবে না। যতদিন মহীতলে গিরি ও সরিৎ থাকিবে, ততদিন রামায়ণকথা এই লোকে প্রচারিত থাকিবে।

ব্রহ্মার বাক্যে বাগ্মীকি ধ্যানযোগে করতলহ আমলকবৎ [‘পাণবায়লকং যথা’] রামের সমগ্র ইতিহাস দেখিতে পাইলেন এবং রামায়ণকথা রচনা করিয়া ‘কুশীলব’ দ্বারা সেই শ্রতিমধুর, শৃঙ্গার-করণ-হাস্ত-রোজ-বীরাদি রসসমম্বিত কাব্য গান করাইলেন। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞবাটে কুশীলবই সর্বপ্রথম এই রামায়ণ গান করিয়াছিলেন।

৩. বাগ্মীকি-রামায়ণের কাহিনী-সার

বাগ্মীকিপ্রণীত রামায়ণ বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যাকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দর-কাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড—এই ছয়কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড সহ মোট সাতকাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে পাঁচশত সর্গ ও ১৪০০০ শ্লোক আছে।^২

২। চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ কবিঃ ।

তথাসংগতান্ পঞ্চষট্কাণ্ডাণি তথোক্তবান্ ॥ [রামা, বাস, ৪।২]

রামায়ণের বালকাণ্ডের সূচনার প্রথম ও সর্গে বাঙ্গালীর কবিত্বলাভের বর্ণনা ; পঞ্চম সর্গ হইতে অবোধা নগরীর ও রাজা দশরথের বিবরণ লইয়া মূল কাহিনীর আরম্ভ । এই কাণ্ডে আছে প্রধানতঃ কণ্ঠশব্দের উপাখ্যান, রামাদির জন্ম, তাড়কা বধ, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের কাহিনী, অহল্যা-মোচন, হরধনুভঙ্গ, রামসীতার বিবাহ ও পরশুরামের দর্পচূর্ণ প্রভৃতি বিখ্যাত বৃত্তান্ত । রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, স্ত্রী-পুরুষে ভেদরহিত বারাকনাদ্বারা প্রভাবিত তপস্বীকণ্ঠশব্দের কাহিনী উজ্জল হীরকপণ্ডের মত একটি ছোটগল্প । এই কাণ্ডের অপর উল্লেখযোগ্য কাহিনী বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ । বিশ্বামিত্র কুশিকগোত্রীয় ক্ষত্রিয়, তপোবলে তিনি হইলেন ব্রহ্মবি । এ এক বিস্ময়কর উপাখ্যান । তেমনি বিস্ময়কর হরধনুভঙ্গ বৃত্তান্ত ! রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধনু গ্রহণ করিলেন, অবলীলাক্রমে শর বোজন করিয়া বজ্রনিম্বনে ধনুভঙ্গ করিলেন, [‘তদ্বতঃপূর্ণমুখ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ’] । বীরভক্তে সীতালভ এই হরধনুভঙ্গের ফল ; তঁহারই অপর পরিণাম পরশুরামের দর্পচূর্ণ ।

অবোধাকাণ্ডের প্রধান ঘটনা—রামাভিষেকের আয়োজন, মন্থরার মন্ত্রণা, রামের নির্বাসন, ‘নিষদামিপলংবাদ’, দশরথের মৃত্যু, রাম-ভরত মিলন, জাবালির নাস্তিকতা, নন্দিগ্রামে রামচন্দ্রের পাদুকাভিষেক ও রামের চিত্রকূট ত্যাগ । অভিষেকের আনন্দোজ্জল মুহূর্তে রাম-নির্বাসন এক মর্যাস্তিক কাহিনী । এ কাহিনী অশ্রু-বিধৌত । গুহ-মিলন আর এক মনোরম বৃত্তান্ত । ‘রামচন্দ্র বর্ণক্ষত্রিয়, গুহ নিবাদ ; ব্যাধ হইয়াও গুহ রামের মিত্র [‘রামস্তাত্মসমঃ সখা’] । গুহ বলিয়াছিলেন, ‘নহি রামাং প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন’ —পৃথিবীতে রামের মত প্রিয়তম আরকেহ নাই । অন্ত্যজের এ সখ্য অতুলনীয় । রামচন্দ্র তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন । এই কাণ্ডের আর এক আকর্ষণ ভরত-মিলন । ভরত ভ্রাতৃত্বভক্তির পরাকাষ্ঠা । রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া জটীচীরধারী ভরত রামের পদতলে পতিত হইলেন, আর্তনাদ করিয়া বলিলেন, ‘তন্তু মে দাসভূতন্তু প্রসাদং কর্তুং বহুসি’ । কিন্তু শিত্রসত্যে অটল রাম । অনন্তোপায় ভরত রাম-প্রদত্ত পাছুকা শিরে লইয়া কিরিয়া আসিলেন । অবোধা ত্যাগ করিয়া নন্দিগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া, অগ্রজের পাদুকাতে অভিষিক্ত করিয়া বহুলজটীধারী মূনির বেশে প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন । ‘জাবালি-সংবাদ’ আর একটি ঘটনা । রামচন্দ্রের প্রতি জাবালির উপদেশ নাস্তিক চাৰ্ব্বাকের প্রতিলিপি : ‘রাম মনে রাখিও, পরলোক নাই । বাহা প্রত্যক্ষ তাহার জন্ত উদ্বোধনী হও, বাহা পরোক তাহা পরিভাগ কর’ [‘প্রত্যক্ষং যদ্ব্যভিষ্ট পরোকং পৃথতঃ কুরু’—অবো. ১১৭. ১৭ । নাস্তিক্যবাদ বে প্রাচীন, জাবালির উক্তি তাহার প্রমাণ ।

অরণ্যাকাণ্ডের ঘটনাসমূহ যেমন ভয়াবহ, তেমনি কল্প । এই কাণ্ডের প্রধান বর্ণনীর

বিষয়—পূর্ণিমা-সংবাদ, মায়ামুগ কথ্য, সীতাহরণ, জটায়ুবধ, রামবিলাপ ও শবরীর
 স্বর্গারোহণ। এখানে রামচন্দ্রের দুই বৈপরীত্যের লক্ষ্যবিশেষ : একদিকে তাঁহার বীর
 যুদ্ধশাসি যুতি, অন্যদিকে ‘শোকরক্তক্ষণঃ স্রীমান উন্নত ইব লক্ষ্যতে’। দুঃখের বনবাস-
 জীবনে প্রাকৃতিক শোভার লীলাহলী পঞ্চবটীতে [‘বনরামায়ণকং যত্র জলরামায়ণকং তথা’]
 পর্ণশালায় স্থলের নীড় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই স্থলের নীড়ে ছবিপাক সৃষ্টি করিল
 কামরূপিণী রাক্ষসী পূর্ণিমা। মারীচ মায়ামুগরূপ ধারণ করিয়া ছলনা করিতে আসিল :
 অপূর্ব যুগ ‘মণিপ্রবর শৃঙ্গাঃ...রত্নপদ্মোৎপলমুখঃ’। রামচন্দ্র তাহাকে ধরিতে ছুটিলেন।
 যতুকালে মারীচ অবিকল রামচন্দ্রের কণ্ঠস্থর অমুল্যকরণ করিয়া ‘কোথায় সীতা’, ‘কোথায়
 লক্ষ্মণ’ বলিয়া আতনাদ করিয়া উঠিল। সীতা মায়ামারীচের ছলনা বুঝিতে পারিলেন
 না, লক্ষ্মণকে সাহায্যার্থে গমন করিতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করিতে
 সীতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, ‘সুদৃষ্টং’—ভূমি ভটমতি, আমার প্রতি তোমার
 অভিলাষ, রামের বিপদই তোমার কাম্য—‘অহং তব প্রিয়ং যন্তে রামস্ত ব্যাসনং মহৎ।
 সীতার বাক্যে লক্ষ্মণের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনিও কঠোর ভাষায় কহিলেন,
 ‘উত্তরং নোৎসাহে বক্তুং দৈবতঃ ভবতী মম’—আপনি আমার নিকট দেবীতুল্য,
 আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় না, বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন,
 ‘গচ্ছামি’ যত্র কাঙ্ক্ষঃ স্বপ্নি তেহন্ত বরাননে।’ কিন্তু স্বাপ্ত আসিল না, আসিল
 পরিত্রাজকের বেশধারী ছট দশগ্রীব। মুহূর্তে ছদ্মবেশ অপসারিত হইল, প্রকাশিত হইল
 নীলমেঘের জায় ভীষণ রক্তাধরধর রাগযুতি। সীতার কেশাকর্ষণ করিয়া মায়াময়
 রথে স্থাপন পূর্বক সে উল্কাকাশে উড়িয়া চলিল। সীতা উন্নতের জায় বিলাপ করিতে
 লাগিলেন, পঞ্চবটীর নদী-বনানী-দিগদ্বন্দ্বাদের উদ্দেশ্য করিয়া আকুলস্বরে বলিলেন, ‘কিপ্রং
 রামায় শংস স্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।’ কিন্তু নিষ্ফল ক্রন্দন। সীতাকে উদ্ধার করিতে
 গিয়া জটায়ু কীণায় হইলেন। সীতা অপরূপ হইলেন। এ অবস্থায় রামের বিলাপ
 অতি করুণ। চেতনে-অচেতনে পার্থক্য নাই। কদম্ব, অশোক, কণিকার, যুগ, ত্রাশ্র,
 হস্তী—বাহা দেখিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, ‘যদি জানীবে শংস সীতাং শুভাননাম—
 যদি জান, বল, স্মৃধী সীতা কোথায়? এই সময়ে অন্ত্যজ শবর-রমণী শ্রমণী শবরী
 তাঁহার বহুদিনের অভীষ্ট রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া ধস্ত হন।

কিঙ্কাকাণ্ডের অন্ততম ঘটনা,—রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী, বালীবধ, তারাবিলাপ ও
 সীতা অধেষণে হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের উত্তোগ। বসন্ত সমাগমে পুষ্পাঢ্য পুষ্পায় বর্ণনা
 লইয়া এই কাণ্ডের আরম্ভ। বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ। সমীরণে সঞ্চালিত কুসুমশাখা, চতুর্দিকে অজস্র
 পুষ্পবৃষ্টি, যুগন্ধী রম্যবনে বটপত্রের অমূল্যজন। তাহার মধ্যে রামচন্দ্রের লক্ষণ বিলাপ

অহো কামত বাক্যক বো পতাবিপি দুর্লভাৎ ।

স্মারয়িত্ততি কল্যাণীঃ কল্যাণভরবাহিনীম্ ॥ [কিকি ১. ৬৮]

—হারের কামের বাস অভাব। যে চলিয়া গিয়াছে, যে দুর্লভ, সেই কল্যাণী
কল্যাণবাহিনীর কথা স্মরণ করাষ্টয়া দেয়।

ইহার পর বালীবধের কাহিনী। অন্তরালে থাকিয়া রামচন্দ্রের পক্ষে বালীকে বধ
করা লক্ষ্য হইয়াছে কিনা, বিতর্কের বিষয়। বন্ধুদের অহুরোধে এই জুগুপ্সিত কার্য
করিয়া রামচন্দ্রকে কলঙ্কভাজন হইতে হইয়াছে। বালী বলিয়াছেন, ‘জ্ঞানে পাপ
সম্বাচারঃ ভূঠৈঃ কৃপমিবাবৃত্তম’। —বুঝিলাম, তুমি পাপাচারী, তুণ্যের কৃপ।

রামচন্দ্র মহাবাক্য উদ্বার করিয়া নিজ দোষ আলন করিতে চেষ্টা করিলেও, কলঙ্ক
অপনীত হয় নাই। এই কাণ্ডের তারাবিলাপও মর্মভেদী। আল্পিত লতা যেমন
বৃক্ষের সহিত মহাসমূহকে বেধন করে, তেমনি বৃত্তস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া তারাবিলাপ
করিয়াছেন। কাণ্ডশেষে মহাবি অনন্ত সাগরের সহিত পাঠকবর্ণের পরিচয় করাষ্টয়াছেন।
আকাশের স্তার তুল্য সাগর, কোথাও স্থির, কোথাও ক্রীড়াচঞ্চল, কোথাও পর্বত-
প্রমাণ তরঙ্গ :

প্রস্থপ্তমিব চান্ত্র ক্রীড়ন্তমিব চান্ত্রতঃ ।

কচিৎ পর্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃত্তম্ ॥ [কিকি ৬৪. ৬]

মহাবীর, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, অজ্ঞানানন্দন হনুমান—ত্রিবিক্রম বিক্রম মত ঈহার বিক্রম—এই
মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন।

হনুমানের সাগর-অন্বেষন বৃত্তান্ত ষায়া হৃন্দরকাণ্ডের সূচনা। এই কাণ্ডের প্রধান
বর্ণনীয় বিষয়—রাবণ-ভবন লঙ্কার বর্ণনা, অশোক বনে শোকাত্তা সীতার চিত্র, সীতার
সহিত হনুমানের লাক্ষ্য, লঙ্কাদাহ ও সীতার অভিজ্ঞানসহ হনুমানের প্রত্যাবর্তন।
অপূর্ব শোভার সার পরিধা ও প্রাকারবেষ্টিত বিশ্বকর্মানিমিত লঙ্কা : রাবণ-ভবন ‘কাকন
চাক্করপম্’। ‘মহীতলে স্বর্গমিব’। ভোগের উপকরণে শোভিত ভোগবর্তা—কোথাও
বিম্বাসবতী সহস্র অঙ্গনা, কোথাও নৃত্য-গীত, পানভোজনের সমারোহ। এই সমারোহের
পাশে অশোকবনে সীতার যুতি, ‘শ্রদ্ধাপক্ষাদৌ চন্দ্রেখামিবামলাম্’। কনকবর্ণাজী আজ
অশ্রুসুখী। রাজ্যশেষে বধন ব্রহ্মরাক্ষসগণের বেদধ্বনিতে পূর্ণ লঙ্কা, তখন অশোকবনে
আলিঙ্গ কামমত্ত, মদমগ্নিত রাবণ। অশোকবনের এই দৃশ্য অবিস্মরণীয়। একদিকে
কামোদমত্ত পরহারসৌভীর গর্জন, অপরদিকে লাক্ষী সীতার তিরস্কার। ক্রোধাক্ত রাবণ
প্রস্থান করিলে একজটা, হরিজটা, বিকটা রাক্ষসীর হল সীতাকে ঘিরিয়া বসিল। কৃষ্ণ
পূর্ণমখা বলিল,

হুয়া চানীরতাঃ কিংঃ সর্বশোক বিনাশিনীঃ ॥

বাহুবং বাসবলাভ নৃত্যামোহব নিহুস্তিলাঃ [হুম্বর ২৪. ৪৭]

—সর্বশোকবিনাশিনী হুয়া আন। আজ বাহুবের বাস ভক্ষণ করিয়া
নিহুস্তিলার সম্মুখে নৃত্য করিব।

এই বিবাদঘন পরিবেশে সীতাকে রামচন্দ্রের অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া হুয়ান
বিষে অস্ত্রত সিকন করিয়াছিলেন। হুয়ানের আর এক কীতি, লঙ্কাবাহ। এই
মহাবীর বীরবিক্রমে লঙ্কাকে লুপ্ত করিয়া রামচন্দ্রকে সীতার বার্তা নিবেদন করিয়াছিলেন।

রামায়ণের ষষ্ঠকাণ্ড যুদ্ধকাণ্ড। ইহা যেমন ঘটনাবল, তেমন ভয়ঙ্কর। একদিকে
কপিসেনার কিলকিলা ও জয়ধ্বনি, অপর দিকে রক্ষোবংশের হুকার ও আর্তনাদ।
রামধেনার সমুদ্র-দর্শন, রামের সহিত বিভীষণের মৈত্রী, নলের সেতুবন্ধন, 'কুন্তকর্ণত
নিধনং মেঘনাদনিবহণম্', এবং 'রাবণস্ত বিনাশক'—এই কাণ্ডের প্রধান ঘটনা।
৪র্থ সর্গে আবার সমুদ্রের বর্ণনা : চন্দ্রোদয়ে ক্ষীত সমুদ্র, ফেনাগুলি যেন মুখের
হাসি, তরঙ্গভঙ্গ যেন উজ্জল নৃত্য, উষ্মিলাল সংবর্ধ যেন সিদ্ধুরাজের ভেরীনিদান।
এই মহাসাগরের একমাত্র উপমা অনন্ত অথর, যেমন অথরের একমাত্র উপমা সাগর :—

সাগরং চাধরং প্রথমধরং সাগরোপমম্।

সাগরং চাধরং চেতি নির্ণয়েষদৃশ্যত ॥ [যুদ্ধ. ৪. ১২০]

এই সাগরে সেতুবন্ধন কপিবর নলের অঙ্কিত কীতি, সেকালের উৎকৃষ্ট শিল্প-
কৃতির নিদর্শন। এই সেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিৰ্মিত, স্তম্ভ ও মানদণ্ডে পরিমিত।
ইহার নির্মাণে বস্ত্রের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে ['পর্বতচ্চ সমুৎপাট্য বস্ত্রৈঃ
পরিবহন্তি চ'—যুদ্ধ, ২২. ৫৬]। কপিসেনার মধ্যে ভেষজবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন সুষেণ।
ইন্দ্রজিৎ যতবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রায় ততবারই রাম-লক্ষণ মায়্যাপাশে বদ্ধ
হইয়াছেন। এই বিপদে ভেষজ আহরণের মন্ত্রণা দিয়াছেন সুষেণ। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর
মদোকত জুঁক রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষণের উপর ময়দানব নিৰ্মিত অষ্ট
'ষটায়ুক্ত শক্তিগেল নিক্ষেপ করিল। লক্ষণ শেলাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।
রামচন্দ্র আহত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন,

দেশে দেশে কলজাগি দেশে দেশে চ বাক্‌বাস্যঃ।

তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সন্যাসিনঃ ॥ [যুদ্ধ ১১৬. ১৪]

—দেশে দেশে স্বী মিলে ; বাক্‌বও মিলে ; কিন্তু এমন দেশ নাই যেখানে
সন্যাসিন ভ্রাতা মিলিতে পারে।

তখনও এই সঙ্কটে সাহসী হলেন সুষেণ। তিনি যুদ্ধ দেখিয়া বুঝিলেন, লক্ষণ

প্রাণ হারান নাই। তাহারই নির্দেশে হস্তমান ওষধি পর্বত হইতে বিশল্যকরণী, সার্বণ্য করণী, সজীবকরণী ও সন্ধানী ওষধি আনিয়া লক্ষণকে বিশল্য ও নীরোগ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকাণ্ডে যুদ্ধ সমায়াগে পূর্ণ। যুদ্ধের বর্ণনাগুলি বৈচিত্র্যহীন হইলেও, তাহারের আকর্ষণ কম নয়। অতি ভীষণ কুন্তকর্ণের প্রতাপ, বজ্রের মত তাহার গর্জন। রামাধর ইন্দ্রজিতির যুদ্ধও নিপুণ, কিন্তু সর্বাশেষ। ভয়ঙ্কর রাম-রাবণের যুদ্ধ। আত্মীয়স্বজন আত্মজের মৃত্যুতে শোকোন্মত্ত অতি ভীষণ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। সমুদ্র ধুমে পরিণত হইল, উত্তাল তরঙ্গ গগনস্পর্শী হইয়া উঠিল। রাম ইন্দ্র-প্রদত্ত মাতলি-চালিত রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সম্মুখান হইলেন। কিন্তু অবধ্য রাবণ। দেবগণের সহিত মহর্ষি আগস্ত্য রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রামচন্দ্রকে সর্বশত্রুবিনাশন 'আদিত্য-রুদ্র স্তব' শিখাইয়া তিনবার তাহা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র আচমন করিয়া শুচিত্ত্ব চিত্তে সেই স্তোত্র জপ করিলেন। তারপর আবার ভীষণ যুদ্ধ শুরু হইল। কিন্তু রাম যতবার রাবণের মস্তক ছেদন করেন, ততবার নূতন মস্তক উদগত হয়। অবশেষে মাতলির নির্দেশে রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। বসুন্ধরা সমগ্র ও কম্পিত হইল। বেদবিধি অনুসারে তিনি সেই অমোঘ বাণ সন্ধান করিলেন। রাবণ নিহত হইল, যেন বেলাত্নমিতে মহাসাগর ভগ্ন হইয়া গেল। দেবগণ স্তোত্র উচ্চারণ করিলেন, চতুর্দিকে সাধু সাধু রব উঠিল। কিন্তু ত্রাতৃ-বিরহে বিভীষণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, মন্দোদরী প্রমুখ রাবণ-মহিবীধের বিলাপে রণস্থল শোকস্থলে পরিণত হইল। রাম বলিলেন, 'মরণাস্ত্রানি বৈরাগি'—মৃত্যুতে শত্রুতার শেষ : তিনি রাবণের দেহ-সংস্কারের নির্দেশ দিলেন। রাক্ষসব্রাহ্মণগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মন্ত্রের সহিত চন্দন কাঠের চিতায় রাবণের দেহ ভস্মীভূত হইল। যুদ্ধ-কাণ্ডের আর একটি ঘটনা সীতার অগ্নিপরীক্ষা। মহর্ষি এখানে রামচন্দ্রের মুখে অতি কড় উক্তি যোজন্য করিয়াছেন : বাহার চরিত্রে আমি সন্দেহ করি, সেই তুমি নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখার জ্বায় অংহান করিতেছে। 'নাশ্তি মে ত্বয়্যভিষেকো বথেষ্টঃ গম্যাতামিতি'—তোমার প্রতি আমার আদক্তি নাই ; যেখানে খুসি সেইখানে তুমি যাও। সীতার প্রত্যুত্তর সত্যজনোচিত ও তেজোদ্রুত। পতির নির্দেশে নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি অগ্নি প্রবেশ করিলেন। অগ্নি অগ্নান মাল্যভূষিতা সীতাকে ফিরাইয়া দিলেন। রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পুষ্পকবিমানে অস্ত্রান্ত্র সঙ্কল সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামচন্দ্র রাজা হইলেন। রাম-রাজত্বের প্রশস্তি ও রামায়ণ-শ্রবণের ফলশ্রুতি শুনাইয়া যুদ্ধকাণ্ডের পরিসমাপ্তি।

উজ্জয়কাণ্ডে রামচন্দ্রের উত্তর জীবনের কাহিনী। ইহাতে মূল কাহিনী-অংশে আছে,

সীতার বনবাস, কুশ ও লবের জন্ম, শত্রুঘ্নের লবণ বধ, রাম কর্তৃক শব্দুকের শিরশ্ছেদ, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ, যজ্ঞবাটে লবকুশের রামায়ণ গান (রামের রাব্যাশ্রাণ্তি পর্বত), সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ-বর্জন এবং রামের মহাপ্রস্থান । প্রসঙ্গতঃ এই কাণ্ডে বিবিধ পুরাণুস্ত বর্ণিত হইয়াছে : তন্মধ্যে প্রধান যক্ষোৎসবের ইতিহাস, রাবণের দিগ্বিজয়, বেদবতী ও রক্তার উপাখ্যান, বানর বংশের পূর্ববৃত্তান্ত, দণ্ডকায়ে র ইতিহাস । উত্তরকাণ্ডে অনেকটা পুরাণের লক্ষণাকান্ত । পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনার দিক হইতে বালকাণ্ড অর্থাৎ প্রথমকাণ্ডের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে । উত্তরকাণ্ডে অশ্বরাজ্যের নিকর । সীতার নির্বাসন হইতে রামচন্দ্রের মহানির্ধাণ পর্বন্ত ঘটনাসমূহ অতি কল্প । ক্রৌঞ্চ-মিশ্রনের বেদনার মহাকবি বায়্যাকির জন্মে যে শোকের উৎস উদ্ভূত হইয়াছিল, উত্তরকাণ্ডে তাহা সহস্র ধারায় পরিণত হইয়াছে । স্বথের দিন আসিতে না আসিতেই সীতার বনবাস । যে সীতাকে রামচন্দ্র অগ্নিশুক করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকাপ-বাদ এবেণে প্রজারজনাগুরোধে সেই সীতাকে তিনি বিসর্জন দিলেন । ব্যক্তিগত প্রেম তাহার জীবনের বড় কথা নয়, বংশমর্যাদা জীবনসর্বস্ব । তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী, সর্বাপেক্ষা রিক্ত, তাহার ত্যাগ অতুলনীয় । সীতা চরিত্রও অতি উজ্জ্বল । পরিত্যক্ত হইয়াও সীতা প্রতিবাদ করেন নাই, স্বামীরই মঙ্গলকামনা করিয়া বলিয়াছেন, —পৌরষের ধর্মরক্ষা করিয়া আপনি কীর্তলাভ করুন ।

এই কাণ্ডের আর এক ঘটনা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষার জন্য স্বর্গসীতার পরিকল্পনা— ‘কাঞ্চনো মম পত্নীঃ চ দীক্ষার্থী যজ্ঞকর্মণি [উঃ ২১. ১৫] । অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বায়্যাকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল, মূল রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই । মূলে আছে, বায়্যাকিই শিষ্যসহ রামচন্দ্রের যজ্ঞবাটে আসিয়াছিলেন এবং কুশ-লবকে রামায়ণের অংশবিশেষ গান করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন । কুশ ও লবের মুখে মধুর রামায়ণ গাণ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র জানিতে পারেন, লব-কুশ সীতার পুত্র । তিনি মহর্ষিকে বাতা প্রেরণ করেন, সীতা যদি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হন, তাহা হইলে তিনি যেন সভামধ্যে নিজ বিভূতির পরিচয় প্রদান করেন । এইখানেই সীতার পাতাল-প্রবেশের সূচনা । পরদিন বায়্যাকি সীতাসহ সভায় উপস্থিত হইলেন । সভায় তখন জিলোক ভাষিয়া পড়িয়াছে । সকলেই ঔৎসুক্যাবেশে পাষণ্ড মূর্তির স্তায় স্থির । মহর্ষি বায়্যাকি সীতাকে অপাপবিন্দু ও শুদ্ধচারিণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন । রামচন্দ্র কহিলেন, যদিও মহর্ষি প্রাচ্যেতসের নির্মলবাক্যে সীতার বিভূতি বিষয়ে আমার সন্দেহের অবকাশ নাই, তথাপি জিলোক-বালী বখন সীতার শপথ শুনিতে আসিয়াছেন, তখন সীতা বিভূতি বলিয়া পরিচিতা

হইয়া আবার প্রীতিপাত্রী হইল। কাব্য-বসন সীতা দৃষ্টি অবনত করিলেন, তারপর কৃতান্তলিপুটে কহিতে লাগিলেন,

বধাং রাঘবদত্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥

মনসা কর্মণা বাচা বধা রামঃ সমর্চয়ে।

তথ্যমে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥

যথৈতৎ সত্যযুক্তং মে বেদ্বি রামাং পরং ন চ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ [উত্তর ৭. ১৫-১৭]

—বদি আমি রাঘব ব্যতীত অন্য কাহাকে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে ধরণীদেবী আমাকে বিবররূপ আশ্রয় দান করুন। বদি মনে, কর্মে, বাক্যে রামকেই ভজনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে দেবী বনুমতী আমাকে বিবররূপ আশ্রয় দান করুন। রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না,—আমার এই উক্তি বাদ সত্য হয়, তাহা হইলে দেবী বনুমতী আমাকে বিবররূপ আশ্রয় দান করুন।

ত্রিসত্য উচ্চারিত হইতে না হইতে ভূতল হইতে নাগবাহিত, রত্নবিকৃষিত এক দিব্য সিংহাসন উখিত হইল। ধরণীদেবী দুই বার ঘায়া মৈথিলীকে বেঠন করিয়া ঝগত সম্ভাষণে অভিনন্দিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করাইলেন। রত্নসিংহাসন রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। মুহূর্তকালের অন্তর সমস্ত জগৎ তত্ত্বিত হইয়া গেল। রামায়ণে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা আছে, তন্মধ্যে সীতার পাতাল প্রবেশ অন্যতম। সীতার জন্ম ও তিরোভাব—হুইই বিস্ময়কর : ভূতল হইতে তিনি উখিতা ['কৃতলাদুখিতা সা'], আবার ভূতলেই প্রবিষ্টা। সীতার অন্তর্দ্বানে রামচন্দ্র কোণে শোকে আকুল হইলেন। এই সময়ই ব্রহ্মার নির্দেশে সভায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ড সীত হইয়াছিল : ইহার পূর্বে রামচন্দ্রের পূর্বচরিত গীত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণারোহণ ও রামায়ণের কলপ্রতি বর্ণনান্তে উত্তরকাণ্ডের সমাপ্তি।

৪. রামায়ণের প্রেক্ষিপ্তাংশ ও কাল-বিচার

'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'। কিন্তু রামায়ণের এই কাণ্ড সংখ্যা লইয়া বিতণ্ডার অন্ত নাই। কেহ বলেন, রামায়ণ ষষ্ঠ কাণ্ড, সপ্তম কাণ্ড অর্থাৎ উত্তরকাণ্ড বাঙ্গালিকির রচনা নয়, উহা পরবর্তীকালের যোজন। প্রথম কাণ্ডও মূল্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে। পণ্ডিত প্রবর Jacobi মনে করেন, সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ড এবং প্রথম কাণ্ডের কিয়দংশ প্রকৃষ্ট। প্রথম কাণ্ডের প্রথম চারি সর্গ সম্পর্কে আপত্তি এই যে, ইহা বদি অন্য

বান্দীকির রচনা হইবে, তবে কবি স্বীয় কবিত্বলাভের ইতিহাসটি উক্ত পুরুষে (1st Person) বর্ণনা না করিয়া, প্রথম পুরুষের উক্তিভেদে (3rd person) বর্ণনা করিলেন কেন? সর্বাংশে বেশি সংশয় উত্তরকাণ্ডে লইয়া। উত্তর কাণ্ডের ভাষা ও রচনারীতি অজ্ঞাত কাণ্ডের ভাষা ও রচনারীতি হইতে স্বতন্ত্র। অবোধ্যা হইতে বুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ঘটনার বে গতি, উত্তরকাণ্ডে তাহা অতি সহজ : মূলকাহিনী অপেক্ষা পুরাকাহিনীর বাহুল্য ইহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বালকাণ্ডে রামায়ণ কাহিনীর দুইটি অল্পকর্মণিক্য আছে—একটি নারদ-বর্ণিত, অপরটি বান্দীকির নিজের। দুইটি অল্পকর্মণিক্য কিছু কিছু অমিল রহিয়াছে। নারদবর্ণিত অল্পকর্মণিক্য ‘রামঃ সীতারহুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরাগুবান্’ বলিয়া রামরাজ্যের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে : ইহাতে উত্তরকাণ্ডের ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় অল্পকর্মণিক্য ‘স্বরাষ্ট্ররজন-শৈব বৈদেহ্যচ বিসর্জনম্’—রামের প্রজাহরণ ও সীতা-নিবাসনের উল্লেখ আছে, কিন্তু উত্তরকাণ্ডে অজ্ঞাত ঘটনার উল্লেখ নাই ; সীতার পাতালপ্রবেশ উত্তরকাণ্ডের বিশিষ্ট ঘটনা : উহার উল্লেখ কোন অল্পকর্মণিকাতেই নাই। তাই অনেকেরই ধারণা উত্তরকাণ্ড বান্দীকির রচনা নয়। রাজশেখর বহু বলেন, ‘তার (বান্দীকির) মূলকাব্য মিলনান্ত, অবোধ্যায় ফিরে যাবার পর রামসীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল, এমন কথা বান্দীকি লেখেননি’।^১ পণ্ডিতগণ আরও বলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে ‘নরচন্দ্রমা’ রামে দেবত্বের আরোপ, সে সকল অংশও প্রক্ষিপ্ত।

এই পদ্ধতিতে ভারতীয় সাহিত্যে প্রক্ষেপ বিচার করা সঙ্গত কিনা, বিবেচ্য। ভারতবর্ষ বহুকাল যাবত সপ্তকাণ্ড রামায়ণকেই স্বীকার করিয়া আসিতেছে। মূল রামায়ণ মিলনান্ত, এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই। নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনও রামায়ণকে করুণরসাত্মক কাব্য বলিয়াছেন [ক্ষণিকালোক ৩র্থ উদ্যোত], চতুর্থ শতকের কবি কালিদাসও রামায়ণের বিরোগান্ত পরিণতিতেই অবলম্বন করিয়াছেন। রামচন্দ্রের দেবত্বও বহুকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কালিদাস তাঁহাকে ‘বিভক্তাত্মা বিতুঃ’ [রঘু ১০. ৩৫] বলিয়াছেন। ভবভূতি বলেন, রামায়ণকথা ‘মঙ্গল্যা চ মনোহরা’। বস্তুতঃ ভগবান যখন নরাকারে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি দেবত্ব নয়, মানবত্বকেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহার দ্বারা ‘নরচন্দ্রমার’ দেবত্ব বাধিত হয় না, এবং দেবতার মাধুর্যই আভাসিত হয় এবং সেই গুণেই ধর্মসাহিত্য কাব্য হইয়া উঠে। কাজেই রামায়ণের যে যে অংশে রামচন্দ্রের দেবত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত, এ বিচার অসমীচীন। উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, এমতও অগ্রাহ্য। উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অবিচ্ছেদ্য

১। বান্দীকি-রামায়ণ (সারস্বতবাদ)—তৃতীয়া

অংশ। উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রক্ষোবংশের আদি ইতিহাস ও কপিবংশের পূর্ব বৃত্তি অজ্ঞাত থাকিয়া বাইত; উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রামায়ণকে আদি-মধ্য-অন্ত সম্বিত মহাকাব্য বলা চলিত না। এক হিসাবে উত্তরকাণ্ড সমগ্র রামায়ণের উপোদ্ভাবত; ইহা না থাকিলে অনেক জিজ্ঞাসা অপূর্ণ থাকিয়া বাইত। বাবণ এত দুর্ব্বল কেন, তাহার উত্তর উত্তরকাণ্ড। উত্তরকাণ্ডের বিবরণ দ্বারাট রামণ-বিজয়ী রামচন্দ্রের পৌরব স্পষ্টীকৃত। মনে হয়, পূর্ব ব্যক্ত রামায়ণে উত্তরকাণ্ডরচনাই বাঙ্গালীর প্রথম কৃতিত্ব। রাম রাজা হইলে তিনি সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়াছেন।^১ উত্তর কাণ্ডের কবিত্বও তুচ্ছ নয়। রাজশেখর বসু রচনায় উত্তরকাণ্ডের প্রকৃষ্টতা স্বীকার করিয়াও বলেন, ‘বাঙ্গালীর নন্দনার কাল হাই হক, একথা নিশ্চিত যে মুক্তগ্রন্থে যিনি লীতার নিবাসন জুড়ে দিয়াছেন, তিনি অতি প্রাচীন ও তাঁর কবিত্বও সামান্য নয়’।

অবশ্য রামায়ণে প্রকৃষ্ট অংশ আছে, উহা এক যুগের রচনাও নয়। বর্তমানে যে আকারে উহা পাওয়া হাইতেছে, আচার্য Winternitz তাহাকে Probably in the period 400—200 B. C বলিয়া মনে করেন।

৫. রামায়ণের সমাজ ও চরিত্র

রামায়ণে যে সমাজের বর্ণনা আছে, তাহাকে অনেকেই কৃষিসভ্যতার প্রতীক মনে করিয়াছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, ‘বাঙ্গালীর যুগ আরণ্য কৃষি সভ্যতার যুগ। তখন পর্বত ও বাহুব বন কাটিয়া চারিদিকে নগর পত্তন করে নাই,—বনের সহিত জনপদের মিলন নিবিড় ছিল। এই জনপদজীবন ও আরণ্য জীবনের মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এই মিলন ও মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাসই রহিয়াছে বাঙ্গালীর কাব্যে।’ [দ্রষ্টব্য]

রামায়ণে মিশ্রণের চিহ্ন আছে। এখানে তিনটি পরিবার, তথা তিনটি বৃহৎ সমাজের কথা পাওয়া যায়: (১) অযোধ্যার রঘুবংশ, (২) কিষ্কিন্দ্যার কপিবংশ, এবং (৩) লঙ্কার রক্ষোবংশ। প্রথমটির নায়ক-নায়িকা ‘নর’, দ্বিতীয়টির ‘বানর’, (বা + নর—নরের বিকল্প) এবং তৃতীয়টির রাক্ষস-রাক্ষসী। মহত্তম সমাজ আর্ধ্যধাবলম্বী, রাক্ষস সমাজ অনাৰ্য গোষ্ঠী এবং কপি সমাজ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও যৌথ পারিবারিক সংগঠন, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি সর্বত্রই প্রায় এক প্রকার। প্রত্যেকটি সমাজে মন্ত্র-প্রবর্তিত শাস্ত্র ও

১। প্রাপ্তরাজ্যতঃ রামতঃ বাঙ্গালীকি ভগবান্ ঋষিঃ।

চকার চরিত্তঃ কংসঃ বিচিঞ্জপদমম্ববৎ ॥ [বাল. ৫. ১.]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অমোঘ প্রভাব বিস্তৃত। যে রাবণ রক্ষোবংশের প্রধান নায়ক, তিনি আহিত্যগ্নি, বেদান্ত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং অগ্নিহোজ্ঞাদি কার্বে ব্রতী [বৃহ. ১১১]। লঙ্কার বড়ল বেদবিদ ব্রহ্মরাক্ষস ছিলেন, নিশাশেষে তাঁহাদের বেদধ্বনিতে পুরী পবিত্র হইত [হুম্বর ১৮]। রাবণের অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়ায় যে পিতৃমেধ, অগ্নিসংকার ও তর্পণাদি করা হইয়াছিল—তাঁহাও ব্রাহ্মণ্য বিধানের অনুরূপ। কপিবংশে বালী ছিলেন পরম নীতিজ্ঞ, চতুঃসমুদ্রে তিনি সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন [উত্তর ৩৪], হনুমান সন্তুষ্ট ও শান্তজ্ঞ। তাঁহার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিয়াছেন, ‘বহু ব্যাচর্যতানেন ন কিকিঞ্চ-শক্তিভম্’ [কিঞ্চি ৩]—ইনি নিশ্চয় বহুবার ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছেন, একটিও অশব্দ প্রয়োগ করেন নাই। মনে হয়, রামায়ণের যুগে আর্বেতুর সমাজ বহুল পরিমাণে আর্ষীকৃত হইয়াছিল, অথবা বলা বাইতে পারে যে, ‘পুরাণ ব্রহ্মবিদ’ প্রাচৈতন্ বাগ্মীকি ব্রাহ্মণ্যধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কপি ও রাক্ষস সমাজের উপর স্বীয় ধর্মবিশ্বাস আরোপ করিয়াছেন। আরোপ ঘাহাই হউক, রামায়ণের কপি বা রক্ষোবংশ যে স্তম্ভচ মানব ধর্মের অধিকারী, তাঁহার অবিরল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

॥ নরসমাজ ॥ নরসমাজে রামচন্দ্র পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, পত্নীপ্রেমিক, আশ্রিত-পালক, প্রজাপুত্ররক্ষক। রামচন্দ্রের ‘প্রাণ ইবাশ্রয়ঃ’ লক্ষণ পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ দেবর, ‘ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলার’। ত্যাগের একাদর্শ, আর সীতা পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার পবিত্রতা অগ্নিভক্ত।

॥ কপিবংশ ॥ রামায়ণের বানরসমাজ মানুষের মতই গোষ্ঠীবদ্ধ। মানুষের মতই তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, পাবিবারিক বন্ধন ও অশ্রুতুতি। এই সমাজেই আছেন নলের মত শিল্পী, সুষেণের মত ভিষগর। সমাজের নেতা ছিলেন বীরবিক্রম বালী। তাঁহার বিক্রমে রাবণ তটস্থ, বান্দব হুন্দুভী পরাস্ত। বালীর স্ত্রী সুষেণ-হুহিতা তারা, তাঁহার পুত্র ধীমান অঙ্গদ, তাঁহার স্নেহের সহোদর সুগ্রীব। এই সুগ্রীবের সহিত তাঁহার বিরোধ। বিরোধের কারণ রাজ্য ও স্ত্রীস্বত্বের ব্যাপার। বালীর অশ্রুপঙ্খিতিতে বালীকে মৃত মনে করিয়া সুগ্রীব কিল্কিয়ার রাজ্য হন এবং অগ্রজ বধূকে রাণীরূপে গ্রহণ করেন। বৎসরান্তে বাজ্যে ফিরিয়া বালী এই কার্যের নিন্দা করেন, সুগ্রীবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নির্বাসিত করেন এবং সুগ্রীবের স্ত্রী কুমাকে গ্রহণ করেন। নির্বাসিত সুগ্রীব স্ত্রীহরণকারী বালীকে নিহত করিবার জন্তই রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে বালীর উপদেশাবলী সুগভীর নীতিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বালী পুত্রবৎসল, পত্নীপ্রেমিক, পুত্রের নাম করিতে করিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, ‘পার্বত্য প্রদেশে স্বীলোকের সন্তীক্ষের আদর্শ

অত্যন্ত লম্ব্বত ছিল না' [রাবারী কথ]। উক্তিটি হয়তো সত্য। তাহার দৃষ্টান্ত বালী-পত্নী তারা। তারা অতি বুদ্ধিমতী ও নর-পারদর্শিনী। লঙ্কটকালে তিনি বালীকে যেমন উপদেশ দিয়াছেন, তেমনি স্ত্রীবেশে উপকার করিয়াছেন। রামকে সাহায্য করিতে বিলম্ব করিলে লঙ্কণ বধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্ত্রীবেশে অন্তঃপুরে আসিলেন, তখন লঙ্কণকে মধুর নীতিবাক্যে ভুলাইলেন তারা। কিন্তু তারার চরিত্র সুবোধ্য। বে তারা বাবীর মৃত্যুতে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছেন, তিনিই আবার স্ত্রীবেশে অকপায়িনী হইয়াছেন। 'কিন্তু হঃখ তুলিতে পারেন নাই অক্ষয়। মাতার প্রতি তিনি দোষারোপ করেন নাই, কিন্তু স্ত্রীবেশে জুগুপ্সিত কর্ম সম্পর্কে অতি তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন [কিঙ্ক. ৫৫. ৩]।

কপিলবাক্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ দাস্ত ও প্রভুভক্তির একাধর্শ বায়ুপুত্র, অজ্ঞানানন্দন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর হনুমান। তিনিই রাম-স্ত্রীবেশে মৈত্রীবন্ধনের সেতু। রামলঙ্কণের লিখিত তিনি ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষায় কথা কহিয়াছেন, কামমোহিত স্ত্রীবেশে রামের সাহায্যে উদ্ধৃত্ত করিয়াছেন। দুর্লভ্য সাগর দেখিয়া বানর সৈন্য বধন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেই সাগর লঙ্ঘন করিয়া অসাধাসাধন করিয়াছেন হনুমান। অশোকবনে শোকাকুলা সীতাকে আবিষ্কার করিয়া তিনি সীতাকে রামের অভিজ্ঞান দিয়াছেন, আবার সীতার দিব্য চূড়ামণি লইয়া রামের মৃতকল্প জীবনে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। ওষধিপর্বত হইতে ওষধি আহরণ হনুমানের আর এক কীর্তি। হনুমানের প্রত্যেকটি কর্ম শাস্ত্রানুমোদিত ও নীতিসঙ্গত। রাক্ষসের প্রতি সাম-দান-ভেদনীতি প্রয়োগ নিফল বুঝিয়াই তিনি রাক্ষস-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হনুমানের সে মূর্তি, সে আন্দোলিত বিশ্বয়কর। তিনি ঘোষণা করিলেন :

দাসোহং কোশলেদ্রস্ত রামস্তাক্রিষ্টকর্মণঃ ।

হনুমাঞ্ শত্রু সৈন্তানাং নিহন্তা মরুতাত্মজঃ ॥ [সুন্দর. ৪২. ৩৩]

—আমি কোশলপতি অক্লিষ্টকর্ম্য রামের দাস : আমি মরুতাত্মজ হনুমান, শত্রু সৈন্তের নিহন্তা।

হনুমানের দাস্ত ও সেবা রামায়ণে অমর হইয়া আছে।

॥ রুকোবংশ ॥ রামায়ণের অন্ততম পক্ষ রুকোবংশ। রাক্ষস 'নরখাদক' বলিয়া বর্ণিত হইলেও রাবণ-পরিবার ঠিক এই শ্রেণীর রাক্ষস নহে। আদি রুকোবংশ ব্রহ্মার তামস সৃষ্টি। প্রাণিপুঞ্জের রক্ষার নিমিত্ত তিনি একদল প্রজা সৃষ্টি করিলেন। জুয়ার কাহনায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে উদ্ভূত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন, রক্ষা কর। তাহারা বলিয়াছিল 'রক্ষাম':, তাই তাহারা রাক্ষস [উত্তর, ৪]

এই বংশের সন্তান হাল্যবান, হালী ও হুমালী। ইহারা বিকৃকর্ভক পরাজিত হইয়া পাতাল আশ্রয় করিয়াছিল। হুমালীর কস্তা 'কৈকলী' পুন্ড্রপুন্ড্র মূনি বিজ্ঞবাকে পতিষে বরণ করেন। বিজ্ঞবা-কৈকলী হইতে রাবণের জন্ম। রাবণ বৈজ্ঞবণ রাক্ষস। এই বংশে অনার্যরক্তে আৰ্যবীজের মিশ্রণ। ইহাদের যে সমাজ, তাহা বর্বর সমাজ নয়। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, মন্দোদরী, সরমা—সকলেই অমৃতভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধার্মিক, কেহ বা অধার্মিক—কেহ সংযত, শাস্ত্রপরায়ণ, আবার কেহ বা মদোদ্ধত, পরশ্রীকাতর ও পরদারলোভী। কিন্তু পিতৃষে কিংবা পুত্রষে, পত্নীষে কিংবা মাতৃষে সকলেই সংবেদনশীল। মাহুষ হইতে তাঁহাদের স্বাভাব্য এই যে, রাক্ষস মারামর, নিকৃতিনিপুণ ও কামাচর। মারা করিয়া তাঁহারা যে-কোন বেষ ধারণ করিতে পারেন, যে-কোন কঠিনের অমুকরণ করিতে পারেন, ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে পারেন। মারীচ মারামৃগের বেষে রামচঞ্জের কঠিনের অমুকরণ করিয়াছিলেন, রাবণ ঋষির ছদ্মবেশে সীতা হরণ করিয়াছিলেন [অরণ্যকাণ্ড]। রামের মারামৃগ ও মারা-সীতার মৃতি নির্মাণও রাক্ষসের নিকৃতি-নিপুণতার পরিচয়। ইন্দ্রজিৎ রাষ-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলে গরুড় বলিয়াছিলেন, রাক্ষসেরা কূটযোদ্ধা—মাতৃষের বল সরলতা—[‘প্রকৃত্য রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ। শূরাণাং শুদ্ধ-ভাবানাং ভবতামার্ক্যং বলম্’—যুদ্ধ ৫০. ৫৩]। মাহুষে ও রাক্ষসে প্রধান পার্থক্য এইখানে। নচেৎ রামায়ণের রাক্ষস অদ্ভুত কিছু নয়। রাশিরাণের রাক্ষসসমাজের কথা চিন্তা করিলে চিবকালের লোভপ্রমত্ত অতিস্পর্ধী মাহুষের কথা মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনার ইহার আভাব দিয়াছিলেন : ‘ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রাহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রসাদদ্বারে শূন্যলিত করে তাদের দ্বারায় কাজ আদায় করত।’ এ ধরনের মাহুষ বর্তমান কালেও দুর্লভ নয়। মধুসূদন পাশ্চাত্য ভোগবাদী, ঐশ্বর্যমত্ত জাতির প্রতীকরূপে এইজন্তই রাবণকে চিত্রিত করবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

রাক্ষস সমাজে আৰ্য ও প্রাগাৰ্য জাতির মিশ্রণ স্থলপট। আৰ্যপূর্ব জাতির কতিপয় বিশ্বাস—হুনিমিত্ত দর্শনে ভয়, শৈব ও শাক্ত মতে বিশ্বাস আর্থবনু মত্রে যাগ-বজ্র প্রভৃতি এই সমাজে প্রচলিত। ‘নিকৃন্তিলা’ বজ্র কি, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন : কেহ বলেন, নিকৃন্তিলা শক্তিযুতি—এখানে নয়বলি দেওয়া হইত, মত্ত পান করিয়া ইহার সম্মুখে নৃত্য করা হইত। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে বাইবার পূর্বে কৃষ্ণবর্ণ সজীব ছাগ উৎসর্গ করিয়া হোম করিতেন—ইহা নিকৃন্তিলা বজ্রের একটি ক্রিয়া [রায়া, যুদ্ধ ৭৩]। এইরূপ আরও কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম আৰ্য-সংস্কার বহির্ভূত।

এই সমাজের প্রধান প্রতিনিধি দশগ্রীব রাবণ। রাবণের আকৃতি ও প্রকৃতি তাঁহার অতুল বিভবের অঙ্গরূপ। রক্তাশ্বর পরিহিত, সর্বাভরণ কৃত, নীলমেষের মত সেই বিশাল যশু, যে-কোন লোকের বিষয়। হুহুমান প্রথম দর্শনেই ‘অপালনঃ স্তম্ভীতবৎ’—ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। রাজসভাতেও এই রাবণকে তিনি দেখিয়াছিলেন : মুক্তাকালযুগিত মুকুট, মহার্ষয়ণিসম্বিত রত্নাভরণ, রক্তচক্ষুনে চর্চিত দেহ, নীলাঞ্জননিভ বর্ণ। পরিধানে মহার্ষি কৌমবসন, বক্ষে চন্দ্রহ্রাতি রজতহার। হুহুমান সন্নিহয়ে বলিয়া উঠিয়াছিলেন :

অহো রূপমহো ধৈৰ্বমহো সত্তমহো দ্যুতিঃ ।

অহো রাক্ষসরাজস্ত সর্বলক্ষণযুক্ততা ॥ [স্কন্দ. ৪২. ১৭]

—অহো, কি রূপ, কি ধৈর্য, কি গুণ, কি দ্যুতি ! অহো, রাক্ষসরাজে সর্বলক্ষণের কি সমন্বয় !

এই রাবণের প্রধান ক্রটি—বলদর্প, জিগীষা ও কামোন্মত্ততা। দশগ্রীবের বলদর্প যে কত প্রচণ্ড, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বাহুবলে কৈলাস পর্বত উৎক্ষিপ্ত করার প্রয়াসে। কৈলাস উৎক্ষিপ্ত হয় নাই, কম্পিত হইয়াছে। শিবের সাম্রাজ্য পদচাপে দশানন ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন : এই ভীষণ রবের জন্ত তাঁহার নাম ‘রাবণ’। অপরিমিত তাঁহার জিগীষা। কুবের-বশ-দেব বিজয়ী রাবণ, রাবণ ত্রিলোক-জয়ী। অমের জয়েচ্চার মতই তাঁহার কামভোগেচ্ছা : তাহার কামাগ্নির আহুতি বেদবতী, রম্ভা, অসংখ্য দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, নাগকন্যা, গন্ধর্বকন্যা। সহস্র নারীর অভিশাপে অভিশপ্ত রাবণ, তাঁহার সর্বাঙ্গে নির্ধাতিতা নারীর উষ্ণ নিঃশ্বাসের জ্বালা। এই জ্বালাকে বাক্যারণিতে মগ্ন করিয়াছিল স্পর্শনা। সে বলিয়াছিল, সীতা পূর্ণ চন্দ্রাননা, তপ্তকাক্ষনবর্ণা,

নৈব চেবী ন গন্ধবী ন বক্ষী ন চ কিমরী ।

নৈবরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে ॥ [অরণ্য ৩৪. ১৭.]

ইহার কল সীতাহরণ। যুদ্ধকাণ্ডে রাবণের অহমিকা ও অবিমূঢ়কারিতা চরমে উঠিয়াছে। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মাতামহ মালাবানের ধর্মোপদেশকে তিনি ভূণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। যত্নের পর যত্নের আঘাতে তাঁহার শোক দুর্জয় ক্রোধে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার আরক্ত চক্ষু হইতে তপ্ত তৈলের ভায় অশ্রু নির্গত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎয়ের বৃত্যুতে তিনি প্রথমে মুগ্ধিত হইয়াছেন, সংজ্ঞালাভ করিয়া ‘হা বৎস, হা বীরশ্রেষ্ঠ’ বলিয়া হাহাকার করিয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার ক্রোধ গ্রীষ্মমার্ভণ্ডের ভায় প্রথর হইয়াছে। এই ক্রোধকে উদ্দীপিত করিয়াছে পতিহীনা, পুত্রহীনা রাক্ষসীদের

বিলাপ। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ কালারির ভায় ভয়ঙ্কর। কিন্তু অপ্রতিহত বিধির বিধান, অতিদর্পের পতন অবশ্যজ্ঞাবী। তাই রাবের ব্রহ্মাস্ত্রে মহাবল রাবণ নিহত হইলেন, বেন বজ্রাহত বৃজাসুর রথ ছইতে পতিত হইলেন। ভাতার যত্নাতে শোকবিহ্বল বিভীষণের বিলাপে রাবণ-চরিত্রের দোষ ও গুণ—দুইই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ‘হায়, ধৈর্য বাহার পজ, হঠকারিতা বাহার পুষ্প, তপস্তা বাহার বল এবং শৌর্য বাহার দৃঢ়মূল, সেই রাক্ষসরাজরূপ বৃক্ষ অস্ত্র রণমধ্যে রামরূপ বায়ুবেগে উন্মূলিত হইল। হায়, ডেজ বাহার দস্ত, আভিজাত্য বাহার মেরুদণ্ড, কোপ বাহার দেহাবয়ব ও প্রসাদ বাহার হস্ত, সেই রাবণরূপ গন্ধহস্তী অস্ত্র রামরূপ সিংহ দ্বারা নিহত হইয়া ধরাতেলে শয়ন করিলেন।’^১ [যুদ্ধ. ১১১ সর্গ]

এই রাবণের পুত্র মেঘনাদ। মেঘনাদ ময়দানবকত্রা মন্দোদরীর পুত্র। জন্মকালে ইনি মেঘের মত সূর্যহান্ ‘নাদ’ করিয়াছিলেন, এইজন্ত নাম মেঘনাদ। মায়ী প্রভাবে ইনি দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাস্তৃত করিয়া ‘ইন্দ্রজিৎ’ নামে বিখ্যাত হন [উত্তর ১২. ৩৪]। মেঘনাদ নিকৃতি-নিপুণ, তামসী বিচার্য সিদ্ধ। নিকৃন্তিলিা যজ্ঞে পাবককে সঙ্কষ্ট করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে, কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। মেঘের আড়ালে থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া ইনি যুদ্ধ করিতে পারিতেন। রাম-লক্ষণকে ইনিই নাগপাশে বদ্ধ করেন। অতি বলশালী মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎ দেশকালজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তিনি পিতৃভক্ত : পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন, যুদ্ধ হইতে ফিরিয়াও পিতাকে প্রণাম করেন। যজ্ঞকালে ষেঘনাদ তাপসসদৃশ—রুক্মাজিন পরিহিত, দণ্ডকমণ্ডলুধারী। যুদ্ধকালে ইনি অতি ভয়ঙ্কর। শত্রুসৈন্য কর্তৃক লব্ধা আক্রান্ত হইলে, জাতি-শত্রু নিধন কর্তব্য মনে করিয়াই তিনি পিতৃপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বিভীষণের প্রতি তাঁহার ক্রোধের কারণ। পিতৃব্য বিভীষণ স্বজনদ্রোহী ও শত্রুর ভৃত্য। ‘ক চ স্বজন-সংবাস: ক চ নীচ-পরাস্রয়:’ তাই—তাঁহার স্তূতীর অভিযোগ :—

ন জাতিস্বং ন সৌহার্দ্যং ন জাতিস্তুব দুর্মতে ।

প্রমাণং ন চ সৌন্দর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ ॥ [যুদ্ধ. ৮৭. ১২]

—হে দুর্মতে, ধর্মদূষণ. তোমার জাতিস্ব নাই, সৌহার্দ্য নাই, ধর্মও নাই, জাতি-প্রেম নাই ; তোমার শাস্ত্রপ্রমাণ নাই, সৌন্দর্যবোধ নাই. ধর্মও নাই।

মেঘনাদ জানেন, স্বজন যদি নিগুণও হয়, আর শত্রু যদি গুণবানও হয়, তবু স্বজনের আশ্রয়ে থাকাই শ্রেয়. কারণ, পর চিরকাল পর :

গুণবান্ বা পরজন: স্বজনো নিগুণোহপি বা ।

নিগুণ: স্বজন: শ্রেয়ান্ য: পর: পর এব স: ॥ [যুদ্ধ ৮৭. ১৪]

এই ইন্দ্রজিৎ লক্ষণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বীর বিক্রম অসাধারণ। বিভীষণ তাঁহাকে ছবিনীত ও গবিত বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন, তথাপি বলিয়াছিলেন ‘হৃদ্যকামস্ত মে বাস্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি’। কবি বাঙ্গালী বল্লভের নিহত ইন্দ্রজিৎের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, ‘শান্তরশ্মিরিবাহিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ’—বেন হুতভেজ আদিত্য, বেন নির্বাণ-প্রাপ্ত অগ্নি।

রাক্ষস বংশে বিভীষণ একটি বিরূপ জিজ্ঞাসা। ইনি কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ। বিভীষণ ধর্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও বৃহস্পতিতুলা জ্ঞানবান। তিনি ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিপৎকালেও বেন ধর্ম মতি থাকে। ধর্ম-মতি বিভীষণ ব্রহ্মার বরে অমর। রাক্ষসকূলে বিভীষণ বেন দৈত্যকূলে পুঙ্লাদ। লুপ্তিতা নারীকূলের প্রতি রাবণের অসদভিপ্রায় জ্ঞানিতে পারিয়া তিনিই ভ্রাতাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, পরদারভিমর্ষণ ও পাপকার্যের ফল অন্তত [উত্তর, ৩০ সর্গ]। রাবণ যখনই কোন পাপকার্য করিতে উদ্ভূত হইয়াছেন, বিভীষণ প্রতিবাদী হইয়াছেন। সীতাহরণের প্রতিবাদ অতি তীব্র। বিভীষণ ধর্মসম্বৃত বাক্যে রাবণের বিবেককে আগ্রত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল অপমান। শেষ পর্যন্ত তিনি রাম-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। বিভীষণের এই স্বজনত্যাগ ও শত্রুপক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পর্কেই বিতর্ক। ইহারই জন্য তিনি ‘ঘরভাঙ্গা বিভীষণ’ নামে পরিচিত। রাবণ তাঁহাকে জাতিশত্রু, ভীক, ভ্রাতৃস্নেহবঞ্চিত অনার্য বলিয়াছেন [যুদ্ধ, ১৬] ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বলিয়াছেন, ‘ধর্মদূষণ’ [যুদ্ধ, ৮৭]। কিন্তু, তিনিও যে জাতিবৎসল, তাহার প্রমাণ আছে। ইন্দ্রজিতকে তিনি নিজে বধ করিতে পারেন নাই, বলিয়াছেন, ‘অযুক্তং নিধনং কতুং পুত্রস্ত জনিতুর্মম’ [যুদ্ধ ৮২], রাবণের বৃত্যুতে তিনি একান্ত শোকবিহ্বল হইয়া বলিয়াছেন, ‘গতঃ সেতুঃ স্তনীতানাং গতো ধর্মস্ত বিগ্রহঃ’।

মন্দোদরী ময়দানবের কস্তা, রাবণের অগ্রমহিষী ও ইন্দ্রবিভ্রী পুত্র মেঘনাদের জননী। তিনি স্বর্ণবর্ণা। অসাধারণ তাঁহার পতিপ্রাণতা। মহর্ষি কখনও কখনও বিদ্যাংচমকের মত তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎের বৃত্যুর পর তাঁহার শোকাহত মূর্তি দেখানো হয় নাই, কিন্তু রাবণের বৃত্যুর পর তিনি বলিয়াছেন, ‘যখন কুমার ইন্দ্রজিৎ রণরথ্যে লক্ষ্মণহস্তে নিহত হইয়াছিল, তখন আমি নিদারুণ আঘাত পাইয়াছি।’ মন্দোদরীর নীরবতাই তাঁহার গভীর পুত্রশোকের প্রমাণ। রাবণের বৃত্যুর পর মন্দোদরী-বিলাপ বর্ণনার করণরূপ বাঙ্গালী কিঞ্চিৎ রূপশক্তা করিয়াছেন। পতির অভাবে মন্দোদরী কান্ধোগে বঞ্চিত হইলেন, এই স্তরটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। মদনভ্রমের পর কালিদাসের রক্তি-বিলাপও অনেকটা এই পর্বাণের। হয়তো ইহা দ্বারা মহর্ষি রাক্ষসরাজ-

বহুবীর কামানজিকেই উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু বৃত্তার শোককরুণ মুহূর্তে এ ধরনের বিলাপ অশোভন—অনেকটা ব্যাকৌত্তির অঙ্গরূপ। এই বিলাপে একদিকে রাবণ-চরিত্রের কামপরায়ণতা ও ঐক্যতা বর্ণিত হইয়াছে, অপরদিকে রাম-সীতার গুণগান করা হইয়াছে। পতিনিন্দা ও বাহাদের জন্ত লঙ্কার সর্বনাশ, তাঁহাদের প্রাণশাসা—বৃত্তা-বিলাপে অসমস্বোচিত। তথাপি সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার মধ্যে রুক্মিণীর পিতৃগর্ব, পতিপ্রাণতা ও সন্তানবাৎসল্যও প্রকাশিত। রুক্মিণী বলিয়াছেন, ‘দানবরাজ হয় আমার পিতা, রাক্ষসগণের অধীশ্বর আমার ভর্তা এবং সুরেন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র’—আমি এই বলিয়া গবিত ছিলাম :

পিতা দানবরাজো মে ভর্তা মে রাক্ষসেশ্বরঃ ।

পুত্রো মে শক্রনির্জিতো ইত্যেবং গবিতা ত্বম্ ॥ [যুদ্ধ, ১১৩. ৪০]

রুক্মিণী আর একটি নারীচিত্র সরমা। ইনি গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা। সরমা যখন মানস সরোবরতীরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বর্ষা হেতু সরোবরের জল বন্ধিত হওয়ার জননী বলিয়াছিলেন, ‘সরো মা বর্ষত’—সরোবর আর বন্ধিত হইও না; তাই তাঁহার নাম হয় ‘সরমা’। বিভীষণ ইহাকে ভার্য্যরূপে লাভ করেন [উত্তর, ১২ সর্গ]। সরমা ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন। ইনি রাবণকর্তৃক অশোকবনে সীতার রক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দয়া, পরোপকারত্ব ও শীলতা গুণে তিনি সীতার সখী হইয়াছিলেন। রাবণ রামের মায়ামুণ্ড দেখাইয়া সীতাকে বিহ্বল করিলে সরমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। সরমার মতে, রাবণ ক্রুরকর্মা সর্বভূতবিরোধী ও ভীষণ। তিনি জানেন, রাবণ বিনষ্ট হইবে, অচিন্ত্য পরাক্রম রাম জয়ী হইবেন। শোকার্তা সীতার প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী অতি সুন্দর, যেন দাবদণ্ড ধরণীতে সুশীতল জলধারা।

৬. বাঙ্গালীকির কবিত্ব

মকলেই বাঙ্গালীকিকে আদি কবি বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। বৃহদ্রথ পুরাণে বলা হইয়াছে, আদি কাব্যবীজ বাঙ্গালীকির অধিকারে ছিল। বাঙ্গালীকি হইতেই ব্যাসদেব সেই বীজ অবগত হইয়া মহাভারত ও পুরাণ রচনা করেন; বাঙ্গালীকি হইতেই নিখিল কাব্যের বিস্তার [বৃহদ্রথ, পূর্ব, ২৮]। বৈদিক ঋষিও কবি, বৈদিক সৃষ্টাবলীও অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ। তথাপি আদি কবির খ্যাতি বাঙ্গালীকির।

ইহার কারণ, লৌকিক কাব্য রচনার সূত্রপাত বাঙ্গালীকি হইতেই। বাঙ্গালীকির পূর্ব অথবা কোন কাব্য রচিত হয় নাই। সুপ্রচলিত অষ্টপদ ছন্দকে লৌকিক কাব্যে প্রথম

প্রয়োগ করেন বাঙ্গালীক। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে কাব্য রচনায় যে রীতি, বাচনভঙ্গি ও রসনির্ভর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারও সূচনা প্রাচ্যেতন্ বাঙ্গালীকিতে।

বাঙ্গালীক শুধু আত্ম কবি মন, এদেশের লোক-মানসে কবি-সংজ্ঞা সম্পর্কে যে একটি সন্মান দৃঢ়মূল ধারণা আছে, তাহার সূতিমান বিগ্রহ। এদেশে কবি তিনি, যিনি 'কান্তদর্শী'। কবি লোকচরিত্রজ্ঞ, কবি ত্রিকালদৃষ্টিজ্ঞ, কবি ধর্মবক্তা, শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, 'সর্বরসৈকবিন্' (সর্বরসভিজ্ঞ)। কবি কাব্য-সংসারে প্রজ্ঞাপতি। এই অর্থে ই বাঙ্গালীক কবি, চির কবির আদি প্রতীক।

শ্রীঅরবিন্দ বাঙ্গালীকির কাব্যকে বলিয়াছেন, 'Oceanic poetry'; রামায়ণে সাগর পারের এক কাহিনী প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—সৈনিক হইতে নয়, রামায়ণে পাই মহা-সাগরের বিশালতা, মহাসাগরের বৈচিত্র্য। এই বিশালতা বাঙ্গালীক-প্রতিভার মর্মকেন্দ্রে। রামায়ণ বিশাল। তাহাতে কৃ-ও আছে, সূ-ও আছে—আছে সমগ্রতা।

কিন্তু এই সমগ্রতাই কাব্যের সর্বস্ব নয়। কবিপ্রতিভার মূল সংবেদনশীল মনন, রবীন্দ্রনাথ বাহাকে বলিয়াছেন 'বেদনা'। এই বেদনার ফলেই শোক শ্লোক হইয়া উঠে। রামায়ণ কাব্য সেই বেদনা বা সংবেদনশীল মনের প্রকাশ।

এই ধরনের মননের প্রত্যক্ষ পরিচয় বাঙ্গালীক-অঙ্কিত চরিত্রগুলি। কালের বৃকে এই চরিত্র যেন পাবাণরেখা। রামায়ণের আর এক গৌরব ইহার বর্ণনা। বর্ণনাগুলিও মননের স্বাক্ষর। রামায়ণে দুইটি নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়, অযোধ্যা ও লঙ্কা। দুইটি নগরীই সর্বরত্ন সমাকীর্ণ, সর্ব ঐশ্বর্যভূষিত ও শিল্পশোভার সার। কিন্তু প্রকৃতিতে এই দুই নগরী স্বতন্ত্র। ষাটশ বোজনায়ত মহাপুরী অযোধ্যা 'নরোত্তম-সমাবৃত'—সেখানে কামী নাই, কদ্ব্যক্তি নাই,

কামী বা ন কদ্ব্যো বা নৃসংসঃ পুরুষঃ কচিৎ । .

সর্বো নরাস্ত নার্ষস্ত ধর্মশীলাঃ স্তৃসংযতাঃ । [বাল. ৬, ৮, ৯]

অযোধ্যার সমৃদ্ধি সাত্ত্বিক সমৃদ্ধি। আর লঙ্কা? তাহাও সর্বরত্নসমাকীর্ণ ও ঐশ্বর্যপ্রধান 'হেমকক্ষা পুরী রম্যা বৈদূর্যময়তোরণা' [অরণ্য ৪৮, ১১]। কিন্তু সেখানে আছে 'মদলব্ধা নারী,' 'মনঃকান্তা বরদ্বী'—সেখানে রাজসিক ঐশ্বর্য আর তামসিক বিলাস। কবি স্তম্ভকোশে নিশাকালের ভোগপুরী লঙ্কার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পাঠককে লইয়া গিয়াছেন রাবণভবনে রাবণের অন্তঃপুরে। ভোগভূমি ও পানভূমির দৃষ্ট দেখাইয়া লঙ্কার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। মহাকবির পাণ্ডিত্য নয়, এই দুই পুরীর বর্ণনায় প্রকাশিত হইয়াছে বাঙ্গালীকির সৎকল।

বান্ধীকি অবন্ত নগরের কবি নন। অরণ্যের তাপস সরগ্র কাব্যে আরণ্যশ্রী সঙ্কার করিয়া দিয়াছেন। কবি নগরকেও দেখিয়াছেন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে, প্রকৃতি-শালিত সন্তানের দৃষ্টিতে। তাই তাঁহার অযোধ্যা—‘উজ্জানান্নবনোপেতাঃ মহতীঃ সালবেখনাম্’ [বাস. ৫. ১২], আর ভোগবতী লঙ্কা অশোকবনিকাশোভিতা—‘সুন্দ পদ্মোৎপলবনা-শ্চক্রবাকোপকৃজিতাঃ।’ [সুন্দর. ১৪. ২৪]

বান্ধীকি প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। সরগ্র স্বায়ং কাব্যখানিই প্রকৃতি-শ্রীবিভূষিত। বন-পাহাড়-সাগরের বর্ণনাগুলি পড়িতে পড়িতে মন অস্ত্র এক রাজ্যে চলিয়া যায়, যেখানে প্রকৃতি মাতা তাঁহার অরূপ দাক্ষিণ্য লইয়া উদার যুতিতে দণ্ডায়মান, যেখানে চিত্রকূট হইতে লঙ্কা পর্যন্ত বনপথের বিচিত্র শোভা। লতাশুল্কশোভিত বন, পুষ্প-সুশোভিত বৃক্ষ, পদ্মোৎপলভূষিত সরোবর, কোকিলকুজিত বৃক্ষ, হংস নিনাদিত বাগী—তাঁহারই ভিতর তপস্বীর সিদ্ধান্তময়। বন-বর্ণনার অস্ত্র নাই, শুনিতে শুনিতে ক্রটিও যেন ক্রান্তি নাই। বর্ণনার উপকরণ প্রায় সর্বত্রই এক, তথাপি প্রতিটি বর্ণনার যেন নতন বিষয়। এক এক ঋতুর পটভূমিকার একই বনভূমির নব নব যুতি : যেমন, হেমন্তের এই পঞ্চবটী,—

বাশ্পাচ্ছন্নান্তরগ্যানি ধবগোধুমবন্তি চ।

শোভন্তেহুদ্ভাদিতে সূর্যে নবন্তিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ।

খজুর পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতরুভিঃ।

শোভন্তে কিঞ্চিদানন্নাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ ॥ [অরণ্য. ১৬. ১৬. ১৭]

—অরণ্য বাশ্পাচ্ছন্ন। তাহাতে ধব ও গোধূমের শোভা। সূর্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ-সারসের কলরব। কনকবর্ণ শালিধানের খজুর-পুষ্পাকৃতি পতঙ্গীর্ণ আনন্দ।

আবার বসন্তের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ পম্পায় এই বর্ণনা,—

পশু রূপাণি সৌমিজে বর্ণানাং পুষ্পশালিনাম্।

স্বস্ততাং পুষ্পবর্ষণি বর্ষণং ভোয়ম্ভামিব ॥...

বিকিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুম্বমোৎকটাঃ

মাকতশ্লিষিতঃ স্থানৈঃ বটপদৈরহুগীয়তে ॥ [কিকি. ১, ১১, ১৪]

—সম্মুখ, দেখ পুষ্পিত বনরাজির রূপ। মেঘের জলবর্ষণের স্তায় বন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। কুম্বমিত বৃক্ষের শাখা সঞ্চালন করিয়া প্রবাহিত বহু, আর তাহার পশ্চাতে শীতলুপ্ত প্রবর পুঞ্জ।

এমনই বর্ষা ও শরদের পটভূমিকার অসংখ্য প্রকৃতিচিত্র—বর্ষার হাল্যাবান, শরদের কিকিছা। বর্ণনাগুলি বহুনিষ্ঠ। অরণ্যের স্নিগ্ধ নীলিমা, গিরিদরীর অকুরন্ত রঙ

কবির নয়নে রাস্তাজন পরাইয়া দিয়াছে। তাই শুধু প্রকৃতিবর্ণনার নয়, নারীর রূপ বর্ণনাতেও আসিয়া ভিড় করিয়াছে প্রকৃতি-জগতের উপমান। বান্দ্যাকির উপমা নির্গ-উপমানে পূর্ণ। তাঁহার সাগরের উপমান অশ্বর, অশ্বরের উপমান সাগর। বৃক্ষের পুষ্পবর্ণনের উপমান মেঘের জলবর্ণন। বান্দ্যাকির রাম রাজীবলোচন, ‘ভূতলাহুখিতা’ সীতা প্রকৃতিরই চহিতা। সীতাকে হারাইয়া রামচন্দ্র যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সীতা প্রকৃতিময়ী। সীতা ‘কদম্বপ্রিয়া’, ‘জাম্বুনদপ্রভা’, ‘বৃগশাবাকী’, ‘চন্দ্র-নিভাননা’, ‘কমলেক্ষণা’, ‘চন্দ্রকবর্ণাভা’ [অরণ্য ৬০]—সর্বোপরি ‘প্রিয়কাননসকারা বনোদ্রস্তা চ মৈথিলী’ [অরণ্য ৬১, ১৫]। নারীর রূপই হউক, নরের রূপই হউক—রূপ-গুণ, শৌৰ্য-বীৰ্য, কঠোরতা বা কোমলতা বর্ণনায় বান্দ্যাকি চির বনচাৰী। বিক্রম বর্ণনায় শাহু’ল, সিংহ, মস্তহস্তী প্রকৃতি উপমান; দশরথ রাজশাহু’ল, বিশ্বামিত্র মূনিশাহু’ল। রাবণের মৃত্যুতে যে উপমাটি ব্যবহৃত হইয়াছে [‘ইন্দ্রকুসিংহাবগৃহীতদেহঃ স্থপঃ কিতৌ রাবণগচ্ছহস্তী’—যুদ্ধ, ১১২. ১১] তাহাতে রাম ও রাবণ যথাক্রমে উপস্থিত হইয়াছেন সিংহ ও গচ্ছহস্তীর সহিত।

বান্দ্যাকির কবিত্ব কালের কষ্টিপাথরে বিচারিত হইয়া গিয়াছে। এই কবিত্বের আদি নিখরনের পুণ্যধারা গ্রহণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় সাহিত্যের পরবর্তী লৌকিক কাব্য। বান্দ্যাকি তাই ‘কবিগুরু’।

৭. রামায়ণের রূপান্তর

কালক্রমে রাম-রাবণের যুদ্ধ এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহা লইয়া অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে। বান্দ্যাকি-রামায়ণ ছৰ্ভাও বান্দ্যাকির নামে বা অন্ত নামে ভিন্নতর রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৌদ্ধগণ রাম-কাহিনী রচনা করিয়াছেন। সিংহলে ও যবদ্বীপেও রামায়ণ রচিত হইয়াছে। জৈনদের বিখ্যাত রামায়ণ ‘শটম চরিত’। সংস্কৃতেও কতকগুলি নবতর রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়। পদ্ম, স্কন্দ ও ভাগবত পুরাণে ও শ্রীমহাভাগবতেও রামায়ণ বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের কাহিনী মূল রামায়ণের অহুগত হইলেও পার্থক্য কম নয়। রামায়ণ কাহিনীকে পরিবৰ্ধিত করিয়া, পরিমার্জিত করিয়া, রূপান্তরিত করিয়া কোথাও উহার চারিপাশে অত্যাঙ্কল অলৌকিক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া নবতর রামায়ণ সৃষ্টি করা হইয়াছে। মনে হয়, মূল রামকাহিনীর সহিত এদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় আকৃতি ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংযুক্ত হওয়ার ফলেই রামায়ণের এই ধরনের রূপান্তর সম্ভব হইয়াছে।

॥ অধ্যাত্ম রামায়ণ ॥

এই রামায়ণ ব্রহ্মাও পুরাণের অন্তর্গত। ইহা বাস্তবিক-প্রণীত নহে। বাস্তবিক যে রামায়ণ প্রণয়ণ করেন, তাহারও উল্লেখ ইহাতে নাই। উত্তরকাণ্ডে বলা হইয়াছে, মুনি বাস্তবিক কুশ-সবকে যে রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শতদ্ব-বর্ণিত রামায়ণ [‘শঙ্করেন পুরা প্রোক্তং পার্বতীয়া পুরহরিণা’ উত্তর’ ৬]

অধ্যাত্ম রামায়ণের কর্তা পুরাণকার মহর্ষি বেদব্যাস। এই রামায়ণের আরম্ভও পুরাণের চংগে। গ্রন্থারম্ভে একটি অতুলকর্মণিকাধ্যায়—তাহাতে নারদ লোকমন্ডল কামনার ব্রহ্মার নিকট ভবিষ্য কলিযুগের সদগতির উপায় জানিতে চাহিলে, ব্রহ্মা হরপার্বতীর কণোপকণন ছলে অধ্যাত্ম রামায়ণ বিবৃত করেন। ইহা আগম জাতীয় পুরাণ।

মূল কাহিনীর দিক হইতে বাস্তবিক-রামায়ণের সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে কতকগুলি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য আছে। রামায়ণে আদিকাণ্ডের নাম ঝলকাণ্ড, লদাকাণ্ডের নাম যুদ্ধকাণ্ড; অধ্যাত্ম রামায়ণে সপ্তকাণ্ডের নাম আদি, অবোধা, অরণ্য, কিকিদ্ধা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর।^১

অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান স্বাতন্ত্র্য আগাগোড়া বিষ্ণুর অবতারত্ব ঘোষণায়। বাস্তবিক-রামায়ণে মাত্র কয়েকটি স্থলে রাম বিষ্ণুর অবতার এবং সেই সকল অংশ বাস্তবিকের নিজস্ব, না প্রকিপ্ত, তাহাও বিতর্কের বিষয়। অত্যাশ্চর্য্য স্থলে রামচন্দ্র নরচন্দ্রমা; মাহুষের মতই রামের বিন্দুতি ও বিভ্রান্তি। ‘মায়ামুগের ছলনায় তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন, সীতাবরহে প্রাকৃতজনের জ্ঞায় বিলাপ করিয়াছেন, মায়ামীতা দর্শনে বিহ্বল হইয়াছেন, শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণের অবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিয়াছেন এবং সীতাকে অপাপবিন্দু জানিয়াও রাবণবধের পর তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানানন্দ সাধারণ মাহুষের মত আচরণ করিয়াছেন। রাম যদি পরম ব্রহ্ম, তবে কেন এই মায়ামোহ? অধ্যাত্ম রামায়ণ এই সংশয়ের উত্তর। বিষ্ণুস্বরূপ রামের মাহুষোচিত এই সকল লীলার সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া রামচন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠাই অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রতিপাদ্য। এইজন্ত এখানে রামের মাহাত্ম্য খ্যাপন উদ্দেশ্যে স্থানে-অস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে মাহাবিরহিত, নিঃশব্দ, নিঃশব্দ ব্রহ্মস্বরূপ রামের স্তব সঙ্গবিত্ত হইয়াছে। ইহা রামায়ণ-রহস্তের ভাঙ্গ, গুহ্যতিগুহ্য রামলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

অধ্যাত্ম রামায়ণ মতে সাক্ষী রামে কোন বিমোহ নাই। মায়ামাহুষরূপে রামচন্দ্র বাহ্য কিছু করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানবশেই করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি

১ বাংলা কৃতিবাসী রামায়ণের কাণ্ডবিভাগ ও নাম অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গৃহীত। অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত কৃতিবাসীর অত্যাশ্চর্য্য বিষয়েও মিল আছে।

কার্য, এমনকি বোহ-শ্রাতি পর্যন্ত জ্ঞানরত। ইহাতে রামচন্দ্র অবতাররূপে কীতিত হওয়ার রাম-ভক্তিই যে মুক্তির কারণ, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে’

শ্রীরামচন্দ্রে হখিলতত্ত্ব সারে

ভক্তিদৃষ্টা নোভবতি প্রসিদ্ধা। [আদি. ১০. ১০]

—অখিল লোকসার শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ় ভক্তিই ভবনাগর তরণের প্রসিদ্ধ তরণী।

এই রামায়ণে অনেকগুলি নতুন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে,

১. ॥ বাঙ্গালীকির পূর্ব বৃত্তান্ত ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণে বাঙ্গালিকির কবিত্ব লাভের বৃত্তান্ত নাই, কিন্তু কিরূপে চোর বিভাধম ব্রাহ্মধি বাঙ্গালীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত আছে। পুরাকালে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও কিরাত মধ্যে বাস করিতেন। শূদ্রগণের তাহার অনেকগুলি পুত্র হয়। পরিবার পালনে অসমর্থ হইয়া তিনি চৌধুরিত্ব অশল্ষন করেন। একদিন তিনি সপ্তাবির পশ্চাতে^১ ধাবমান হন। ঋষিগণ বলেন, তোমার পাশের ভাগী কে—গৃহে গিয়া শুনিয়া আইস। পরিবারের সকলেই কহিল, সকল পাপ তাহার। তখন তিনি করুণ হৃদয় ঋষিগণের নিকট ফিরিয়া এই পাপ হইতে রক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ দেখিলেন, ‘রাম নাম’ জপ করাই মোক্ষের উপায়, কিন্তু এই নরাধমের সে সামর্থ্যও নাই, তাই তাঁহারা বলিলেন, ‘একাগ্রমনসাক্রৈব মরোতি জপ সর্বদা’—একাগ্রমনে রামনামের অক্ষর-বিপর্যয় ‘ম-রা’ শব্দ সর্বক্ষণ জপ কর। ঋষিদের নির্দেশে তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন : ক্রমে তাঁহার নিশ্চল ঘেহের উপর বন্দীকল্প হইল। বহুবল অস্ত্রে ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিষ্কান্ত হইতে বলিলেন, বন্দীক হইতে পুনর্জন্ম হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল বাঙ্গালীকি :

রামপ্যাহ মুনিগণা বাঙ্গালীকিচ্ছঃ মুনীশ্বরঃ।

বন্দীকাং লভবো যস্মাদ্ দ্বিতীয়ঃ জন্ম তে অভবৎ ॥ [অধ্যাত্ম, অবোধ্যা. ৬]

২. ॥ প্রতিবিম্বরূপিণী সীতার কল্পনা ॥ রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত সীতা নন, সীতার ছায়া বা প্রতিবিম্বরূপিণী সীতা। মারীচ মায়ামূগরূপে ছলনা করিতে এবং রাবণ ভিক্রুবশে সীতাকে হরণ করিতে আসিতেছেন—সর্বজ্ঞ রাম ইহা জানিতে পারিয়া সীতাকে কহিলেন :

—রাবণ ভিক্রুরূপে তোমার নিকট আসিবে। তুমি তোমার ছায়া [ছায়াঃ স্বাকারঃ] কুঠিরে রাখিয়া অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং আমার আজ্ঞায় একবৎসর অদৃষ্টভাবে থাক। হে শুভে, রাবণ বধের পর আবার তুমি আমাকে পূর্ববৎ লাভ করিবে। [অরণ্য. ৭]

এই ছায়াসীতাকেই রাবণ হরণ করিয়াছিলেন। রামের হস্তে নিহত হইয়া পরমশপ

প্রাপ্তির আশায় জানিয়া তিনি রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া অশোকবনে রক্ষা করিয়া ছিলেন [লঙ্কা, ১০]। রামচন্দ্র রাবণ বধান্তে এই ছায়াসীতার প্রতি কটুক্তি করিয়া ছিলেন। ছায়া সীতাই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অগ্নি হইতে যে সীতাকে রাম গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত জানকী। এই সীতাকে কিরাইয়া দিয়া অগ্নি বলিয়াছিলেন, ‘তিরোহিতা সা প্রতিবিরূপিণী কৃত্য বদার্থং কৃতকৃত্যতাং গতা।’ [লঙ্কা ১৩]

৩. ॥ রাবণের অভিচারহোম ॥ লঙ্কানগরীর সমূহ বিপদ দেখিয়া রামের সহিত যুদ্ধ অবতারণা হইবার পূর্বে রাবণ শুক্রাচার্যকে স্মরণ করিলেন। শুক্রাচার্য তাঁহাকে হোম করিয়া যুদ্ধে গমন করিতে বলিলেন। যদি হোমবিষ্য না ঘটে, তবে রাবণ অজেয় হইবে। রাবণ হোমদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নির্জন গুহার মৌনাবলম্বন পূর্বক হোম আরম্ভ করিলেন। বিভীষণ ধূম দেখিয়া ভীত হইয়া রামকে শীঘ্র বজ্রবিষ্য করিতে নির্দেশ দিলেন। দশ কোটি বানর অগ্রসর হইল। বিভীষণ-ভাষা সরমা গুহাঘার দেখাইয়া দিলেন। বানরগণ গুহার প্রবেশ করিয়া হোমদ্রব্য বিক্ষিপ্ত করিল, রাবণকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু মৌন রাবণ ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না। তখন অঙ্গদ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া আসিলেন। বিশম্ভবসনা মন্দোদরী করুণবরে রোদন করিতে থাকিলে রাবণ, ‘উত্তমৌ খড়্গমাদায় ত্যজ দেবীমিতি ক্রবন্’—দেবীকে ত্যাগ কর বলিয়া খড়্গ ধারণ করিয়া উদ্ভিত হইলেন। ইহাতে রাবণের যজ্ঞবিষ্য ঘটিল এবং তিনি ঈপ্সিত সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হইলেন [লঙ্কা, ১০]

৪. ॥ রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকার অমৃতের কল্পনা ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণে রাবণবধের পূর্বে রামের ‘আদিত্য হৃদয় স্তব’ পাঠ করার কথা নাই। কিন্তু আর একটি অন্তত কাহিনী আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্র যতবার রাবণের মুণ্ড ছেদন করেন, ততবার তাহা উদ্ধৃত হয়। বিভীষণ তখন বলিলেন, রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকার অমৃত আছে—‘নাভিদেশে অমৃতং তস্ত কুণ্ডলাকার সংস্থিতম্’—আগ্নেয়ান্নে তাহা শোষণ না করিলে মৃত্যু হইবে না। তখন রাম আগ্নেয়ান্নে রাবণের নাভিস্থিত অমৃত শোষণ করিয়া ব্রহ্মান্নে তাঁহাকে নিহত করেন। [লঙ্কা, ১১ শ অধ্যায়]

৫. ॥ ইন্দ্রজিৎবধের কাহিনী ॥ বাঙ্গালী-রামায়ণে, বীর লক্ষ্মণ বিভীষণের সহায়ে নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিয়াছিলেন—এই বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু কোন শক্তিবলে লক্ষ্মণ দুর্ধ্ব ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার আশ্চর্য পুৰাণবৃত্তি আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে। ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রের বধ্য নহে; কিন্তু,

যন্ত দ্বাদশ বর্ষাণি নিব্রাহার্য বিবজিতঃ।

তেনৈব মৃত্যুনিদিষ্টো ব্রহ্মশাস্ত্র হরাস্তনঃ ॥ [লঙ্কা, ৮]

—ব্রহ্মা হির করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাহন বর্ষ আহার-নিদ্রা বজ্জিত,
তাঁহার হস্তে এই চুরাস্তার মৃত্যু হইবে।

অযোধ্যা হইতে নির্গত হইবার পর পাছে রামচন্দ্রের সেবার ক্রটি হয়, এই ভয়ে লক্ষ্মণ আহার-নিদ্রা বর্জন করিয়াছিলেন। তাই তিনি অল্পেই ইন্দ্রজিতকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৬. ॥ রাম সীতা ॥ অধ্যাত্ম রামায়ণের একটি উপাঙ্গের সংযোজন ‘রামসীতা’। সীতা-নির্বাসনের পর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট পরমতত্ত্ব জানিতে চাহিলে, রামচন্দ্র স্বয়ং এই সীতা উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধনমার্গের বাবতীয় স্তর বিশ্লেষিত হইয়াছে। কর্ম হইতেও যে জ্ঞানের সাধনা শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ‘তত্ত্বমসি’ জ্ঞানের অববোধ—ইহাই রামসীতার প্রতিপাদ্য। এই সীতার মতে জ্ঞানই বিদ্যা, ‘বিদ্যাস্ববৃত্তিচরমেতি ভণ্যতে’।

বান্দীকি-রামায়ণ কাব্য। উহার স্নোকে স্নোকে আদি কবির হৃদয়ঙ্গমনির্ভর প্রবাহিত। অধ্যাত্ম রামায়ণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত এবং তত্ত্বভারাক্রান্ত। বর্ণনা নীরস বিযুক্তিহীন, রামস্বত্তিগুলিও কবিত্ব-বঞ্চিত। শ্রীরামের ভগবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থাকায় কাব্যরস তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছেই, উপরন্তু কাহিনীর আকর্ষণও কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাঘব হিসাবে যে কার্যগুলি ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও হৃদয়গ্রাহী, রামের দেবত্ব ও সর্বজনীন স্বীকৃত হওয়ায় সেই রহস্যময় আকর্ষণটুকুও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রামলীলার দুর্জয়ের রহস্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পুরাণকার লীলার মাধুর্যও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

॥ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ॥

যোগবাশিষ্ঠ নামে মাত্র রামায়ণ, বস্তুতঃ ইহা অধ্যাত্ম জগতের সামগ্রী। অধ্যাত্ম রামায়ণেও রামচন্দ্র ও রামলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাতে মোটামুটি মূল রামায়ণ-কাহিনীর স্বাদ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যোগবাশিষ্ঠে কাহিনীকে ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে তত্ত্ব। হিন্দুজীবনের লক্ষ্য—জীবমুক্তি ও মোক্ষই ইহার মূল প্রতিপাদ্য। ইহাও বান্দীকি-প্রণীত। ব্রহ্মার নির্দেশে শিষ্য ভরদ্বাজকে তিনি এই রামায়ণ উপদেশ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও বাশিষ্ঠের কথোপকথন ছলে সমগ্র তত্ত্বকে রূপ দেওয়া হইয়াছে, এইজন্য ইহা যোগবাশিষ্ঠ নামে খ্যাত। ইহাকে মহারামায়ণও বলা হয়।

কথারম্ভে ইহা সূতীক-অগস্ত্য সংবাদ, অগ্নিবৈশ্ব-কারুণ্য সংবাদ, স্কন্ধচি অশ্বর ও দেবদূত সংবাদ—এইরূপ কয়েকটি অবাস্তব কাহিনী দ্বারা সম্পূর্ণিত। মূল কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে রামচন্দ্রের অকাল বৈরাগ্যকে কেন্দ্র করিয়া। রামচন্দ্র বিদ্যাগৃহ হইতে ফিরিয়া, তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু তীর্থ হইতে ফিরিয়াই তাঁহার মনে অভাবানুভূতি

উপস্থিত হইল। তিনি শারদাগমে শুক সরোবরের তীর দ্বি দ্বি ক্রম হইতে লাগিলেন। এমন সময় আসিলেন কবি বিশ্বামিত্র। যজ্ঞ রক্ষা-বিষ অপসারণের জন্ত তিনি দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ ইতস্ততঃ করিলে কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে ঋষিশাপের ভয় দেখাইলেন। রামচন্দ্রকে সভার আনয়ন করা হইল। অমিত্র তেজা রাম আজ মলিন ও ক্রম—তিনি ভোগে বীভৎস, কর্মে প্রেরণাহীন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহার বৈরাগ্যের কারণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন : জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা দেহ ও জীবন—অতি অমঙ্গলকরী তৃষ্ণা, অতি ভয়ঙ্কর যৌবন-মত্ততা—কালের পরাক্রম অপ্রতিহত ; হৃৎকম্প এই সংসারে বাঁচিয়া কিলান, তরবোঃপি হি জীবন্তি জীবন্তি যুগপক্ষিণঃ।

স জীবতি মনো বশ্ত মনেন হি জীবতি ॥ [যোগবাস্য, বৈরাগ্য, ১৪]

—তরলতাও জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে, কিন্তু তিনিই প্রকৃত জীবিত, যিনি মননের দ্বারা জীবিত থাকেন।

অতএব রামচন্দ্রের প্রশ্ন, হে মুনী, সাধুগণ যে উপায়ে হৃৎকম্প হইয়াছেন, সেই মননের উপায় যদি কিছু জানা থাকে, তাহাই উপদেশ করুন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে ঋষির বশিষ্ঠ তখন রামচন্দ্রকে তত্ত্ব সাধনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাই যোগবশিষ্ঠ। ইহা পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ—এই দুই ভাগে ও ছয় প্রকরণে বিভক্ত : প্রকরণগুলির নাম—বৈরাগ্য, মুমুক্শু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশান্তি ও নির্বাণ।

‘যোগবশিষ্ঠ’ অধ্যাত্মতত্ত্বেরই কথা। কিন্তু এই তত্ত্ব জগৎ-পলাতকা, কর্মভ্যাগী, নিশ্চেষ্ট ধর্মতত্ত্ব নয়। কি প্রকারে অজানা বস্তুজীব জানে অধিষ্ঠিত থাকিরা কর্ম দ্বারা জীবন্তু ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, এট রামায়ণে যুক্তিযুক্তার্থ বাক্যে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগযুক্ত হইয়া ভোগ, জ্ঞানযুক্ত হইয়া কর্মসাধনই যোগবশিষ্ঠের সারোপদেশ। ‘জ্ঞানকর্মভ্যাং জায়তে পরমঃ পদমং’—ইহাই ইহার মর্মকথা। ইহা বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের, জ্ঞান ও কর্মের যুক্তবেণী।

অনেকেই মনে করেন, যোগবশিষ্ঠ শুধু জ্ঞান ও তরল সাধনের কথা। অবশ্য ইহা তদ্ব্যমোদীর বতটা আদরগীয়, কাব্যামোদীর ততটা আদরগীয় নয়। তথাপি ইহা যে একান্তই কাব্যশোভাবর্জিত, তাহা নয়। প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোক মনোজ্ঞ উপমাগর্ভ বাচনে বিভক্ত। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে শ্রবণের স্বচ্ছতার ও অর্থালঙ্কারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হয় : ‘অন্তর্দীপনেখব কজ্জলম্,’ ‘মতিঃ কলুবতামেতি প্রাবৃষীব তরঙ্গিনী,’ ‘নৃত্যতি আনন্দরহিতঃ তৃষ্ণা জীর্ণেব নভকী,’ ‘ললনা বিপুলালানে মনোমত্ত মত্তদম্ভঃ’ প্রভৃতি উপমা অতি সুন্দর, অথবা জরার আবির্ভাবে দেহের এট বর্ণনা,

অরুণা বক্রতাযেতি শুভাবলবপনবা ।

তাত তরীতহুর্নাং লতাপুশানতা বখা ॥ [বৈরাগ্য. ২২]

অলঙ্কার-সৌন্দর্য তো আছেই, যোগবাশিষ্ঠের উপাখ্যানগুলিও অতি জবরগ্রাহী। আকাশজ বিশেষর উপাখ্যান, পদ্মনয়নতি ও মণিবাী ভীলার কাহিনী। সূচী রাক্ষসীর কথা (এই রাক্ষসীই ভয়ঙ্কর ব্যাধি 'বিশ্বেচিকা') প্রভৃতি উপন্যাসের মতই চোখাককর। সর্বাপেক্ষা স্বন্দর নির্বাণপ্রকরণের 'চূড়ামা' উপাখ্যান। চূড়ামা ছিলেন নৃপতি শিখিধ্বজের মহিষী। অজ্ঞানতাবশতঃ নৃপতি শিখিধ্বজ পতিত হইয়া বনবাসী হইলে এই চূড়ামা দেবপুত্র কুম্ভের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানদান করেন এবং কর্ণে উৎসাহিত করেন। চূড়ামা ভারতীয় মহীয়সী নারীকুলের অন্ততমা।

॥ অদ্ভুত রামায়ণ ॥

যোগবাশিষ্ঠ যেমন তৎপ্রধান, তেমনি অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী-প্রধান অদ্ভুত রামায়ণ। অতিলৌকিক কাহিনীর বিচিত্রতার জন্তই ইহার নাম অদ্ভুত রামায়ণ। ইহাকে 'অদ্ভুতোত্তর রামায়ণ' বলা হয়। ইহারও প্রণেতা বায়ীকি-। মূল রামায়ণ রচিত হইবার পরে (উত্তর) এই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। সূচনার দেখা যায়, শিখি ভয়ঙ্কর বায়ীকির নিম্নে প্রণয়ন করিতেছেন, ত্রিলোকে শতকোটি রামায়ণ প্রচারিত আছে, মতলোকেও আপনি লোকে রামায়ণ প্রচার করিয়াছেন, উহাতে সত্য নাই, এমন অদ্ভুত আশ্চর্য রামকথা বর্ণনা করুন। বায়ীকি বলিলেন,

নৃণাং হি তাদৃশং রামচরিতং বর্ণিতং ময়া ।

সীতামহাস্মালাং যদ্বিশেষাদজ নোকুবান্ ॥

শুশ্রূষাবহিতো ব্রহ্মন্ কাকুৎস্থচরিতং মহৎ ।

সীতায়্য মূলভূতায়্যঃ প্রকৃতোচরিতকং বৎ ॥ [অদ্ভুত, ১ম. সর্গ]

মূল প্রকৃতি সীতার মহাত্মা বর্ণনা করিবার জন্তই অদ্ভুত রামায়ণ। ইহা সপ্ত বিশ্বেতি সর্গে বিভক্ত। মূল রামায়ণের কাহিনী ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই রামায়ণে শক্তিবাদের প্রভাব অতি স্পষ্ট এবং সীতা যে মূল প্রকৃতিরই অংশ, তাহা প্রতিপাদনের জন্ত ইহাতে অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সীতার উৎপত্তিকাহিনী ও সহস্রকল্প রাবণ বধ।

॥ সীতার উৎপত্তি-কাহিনী ॥ ঈশ্বরাগণ্যে গৃৎসমদ নামে এক মহাতপা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার এক শত পুত্র ছিল, কন্তা ছিল না। লক্ষ্মীকে কন্তারূপে লাভের

নিষিদ্ধ তিনি প্রত্যহ একটি কলসে প্রত্যহ একটু করিয়া মন্থন করিয়া রাখা করিতেন। রাবণ দিবিজয়ে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণের রক্ত দ্বারা সেই কলস পূর্ণ করিয়া উহা লঙ্কার লইয়া আসেন এবং মন্দোদরীর হস্তে দ্রুত করিয়া উহা সাবধানে রাখা করিতে বলেন এবং ইহাও বলেন, কলসে উগ্র বিষতুল্য তেজস্কর ব্রহ্মরক্ত আছে। রাবণ পুনরায় দিবিজয়ে যাত্রা করিলে মন্দোদরী পতিবিরহে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্ভত হইয়া বিষবোধে কলসের সেই রক্ত পান করেন। ইহার ফলে মন্দোদরী গর্ভবতী হন এবং লঙ্কার ভয়ে সেই গর্ভ ফুটক্কেত্র তীর্থে মৌচন করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিছুকাল পরে রাজ্যি জনক ফুটক্কেত্রে বজ্র করিতে আসিয়া বজ্রক্কেত্র কর্ণ করিবার কালে লঙ্কলের সীতার এই কস্তাকে লাভ করেন। ইনিই সীতা [অদ্ভুত, ৮]।

॥ সহস্রবদন রাবণ বধ ॥ রাবণবধের পর রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া রাজা হন। একদিন সীতার সহিত তিনি সভায় সমাসীন ছিলেন। রাবণকে বধ করার নিষিদ্ধ ঋষি অগস্ত্য যখন রামের প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন সর্বসমক্ষে সীতা হাস্য করেন। সীতার হাস্যতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য প্রশ্ন করা হইলে সীতা সহস্রবদন রাবণের কাহিনী বিবৃত করেন। বিশ্বশ্রবী মূনির ঔরসে রাক্ষসী নিকষার গর্ভে দুই পুত্র জন্মে,—একজন দশানন, আর একজন সহস্রবদন। জন্মকালে তাহাদের রবে ত্রিলোক ধ্বনিত হওয়ার উভয়েরই নাম হয় রাবণ। কনিষ্ঠ দশানন লঙ্কার বাস করিতেন, কিন্তু সহস্রবদন রাবণ বাস করিতেন পুষ্করধীপে। লঙ্কার রাবণ সহস্রবদন রাবণ হইতে হীনবল। রামচন্দ্র অহঙ্ক রাবণকে নিহত করায় মূনি তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, এইজন্য সীতার হাস্য। সীতার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া সহস্রবদন রাবণকে বধ করিবার জন্য পুষ্করে যাত্রা করিলেন। যোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্রবদনের ভীষণ শরাঘাতে রামচন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সীতা ভীষ্ম মহাকালীর মূর্তি ধারণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন : তাঁহার উদর ক্ষীণ, চক্ষু কোটরগত, দীর্ঘ জন্মা, কঠে মুণ্ডমালা - তিনি চতুর্ভুজা, দীর্ঘতুণ্ডা, লোলজিহ্বা, জটাভূট মণ্ডিতা; খড়্গ ও শর্পর লইয়া তিনি মহাশবে মগ্ন হইলেন : একে একে সহস্র বদনের কুস্তাওক, কালভঙ্কক, মুণ্ডশ্রীনাড়ি পুত্র নিহত হইল এবং মহাকালীরাগিনী সীতা ছিন্ন মস্তক লইয়া কন্দুক জীড়া করিতে লাগিলেন। এই সময় জানকীর রোমকূপ হইতে কুটীলাকার সহস্র মাতৃকাগণের আবির্ভাব হইল—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, বহলা, অটোজ্জ্বলা, পদ্মাবতী, এড়ী, ভেড়ী পূতনা, কোটরা, দহদহা, লম্বাকী, শিশুমারী, কস্তকা প্রভৃতি। রণস্থল বেন মহাভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি; জনকনন্দিনী এই প্রেতভূমিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যে কম্পিত পৃথিবী, তৃধর, সাগর। তখন স্বয়ং শঙ্কর শবরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত

হহলে দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও রাম যুজ্জিত। ব্রহ্মা হস্তস্পর্শে রামকে সজীবিত করিলেন। রাম উজ্জিত হইয়া সেই মহাকালী মূর্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং কৃতান্তলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম এবার ভীষ্মরূপ সংহরণ করিয়া শাস্ত হইলেন এবং রামকে বর প্রদান করিয়া পুনর্বীর সীতারূপে পুশক রথে অবোধ্যায় করিয়া আসিলেন। এইরূপে সীতা-বাহাদ্র্য প্রচারিত হইল এবং সীতাই যে পরমশক্তি, তাহা প্রমাণিত হইল [অদ্ভুত, ১৭-২৬]।

রামকাহিনী অদ্ভুত ও আশ্চর্য উপাখ্যানে মণ্ডিত হইয়া আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডনে যে বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল, ‘অদ্ভুতোত্তর রামায়ণ’ তাহার দৃষ্টান্ত।

৮. বাংলা দেশে রচিত রামায়ণ

ভারতবর্ষের সর্বত্রই রামায়ণের হুসমান্য। এমন অঞ্চল নাই, যেখানে রামায়ণের প্রচার নাই, বা আকালিক ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হয় নাই। বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এদেশে ‘রামায়ণ’ সম্প্রদায় না থাকিলেও এখানে রামায়ণের প্রভাব গূঢ় সঙ্গারী। রামনাম তারক ব্রহ্ম নাম। এই নাম উচ্চারণ করিয়া এদেশের লোক শয্যাভ্যাগ করে^১, গৃহজীবনে প্রবাস-প্রবচনে রামায়ণের দৃষ্টান্ত দেয়, বৃত্তাকালে কর্ণে রামনাম শুনায়। এদেশের বিশ্বাস রামনামের নামাভ্যাসও যুক্তিধারক।^২ সীতার মত পত্নী, ভরত-লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা, রাবের মত সন্তান কাহার না কাব্য? প্রাচীনকালে রাজার প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের কথা উঠিত : ধর্মশালদেবের তাম্রশাসনে আছে, ‘ধর্মশাল সত্যরক্ষার রামতুল্য ছিলেন এবং তাঁহার অমূল্য বাক্যপাল ছিলেন, ‘সৌমিত্রেয়পাদি তুল্য মহিমা বাক্যপাল নামাহুজ’।

বাংলাসাহিত্যও নানাদিক হইতে রামায়ণের প্রভাবপুষ্ট। প্রাচীন বাংলার ‘শ্রীরাম পাঁচালি’র সংখ্যাবাহুল্য, ঊনবিংশ শতকের কীর্তিস্তম্ভ বধুহৃদনের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’, বাংলা নাটক ও বাড্রায় রামায়ণ-কাহিনীর বিস্তার এদেশের সাহিত্যে রামায়ণের হুম্পট প্রভাব স্ফুটন করে। প্রাচীন বাংলার অমূল্য সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ রামায়ণ। কিন্তু বাংলা রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে, এগুলি বাস্তবিক-রামায়ণের হুবহু অনুবাদ বা অনুকরণ নহ্ন।

১। রাম রাম সোঁড়রণে পোহালায় রজনী।

শয্যা হইতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি। [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]

২। মহাপ্রভু হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, গো-ব্রাহ্মণ-হিংসাকারী ববনের অপার হুঃখ, তাহাদের নিত্য নাই। হরিদাস উত্তর দিয়াছিলেন, প্রভু, চিন্তার কারণ নাই, ববনও যুক্তিলাভ করিবে, কারণ ‘হারাম হারাম’ বলিয়া তাহারাও অজ্ঞাতসারে রামনাম উচ্চারণ করে : ‘ববন সকলের যুক্তি হবে অনায়াসে। হারাম হারাম বলি কহে নামাভ্যাসে।’ [চৈ: চরিতাবৃত্ত, অষ্টা, ৩য় পরিঃ]

বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে যে-সকল রামায়ণকথা প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে একধরনের রাম-কাহিনী প্রচলিত ছিল—লোকের মুখে, কথকের কথকতায় ও মহিলামহলে। তাহাদের মূল লোকশ্রুতি ও বিবিধ পুরাণ; তাহাতে আৰ্যবর্তের জাতির মধ্যে প্রচলিত রামায়ণ-কাহিনী এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে প্রচলিত রামায়ণের প্রভাব ছিল। আর এক ধরনের রামায়ণ বাংলায় প্রচলিত হইয়াছে—আজ কবি বান্দীকির অল্পসংখ্যে। লিখিত আকারে বাংলায় যে রামায়ণ পাওয়া যায়, তাহাতে বান্দীকি-রামায়ণের প্রভাব থাকিলেও 'উহা লোকশ্রুতি ও পুরাণাশ্রিত অলৌকিক কাহিনী ও বিশ্বাস দ্বারা পল্লবিত। বান্দীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অল্পসংখ্য প্রাচীন বাংলা রামায়ণে নাই।

বাংলাদেশে পূর্বপর যে-সকল রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়েকটি প্রধান বিশিষ্টতা লক্ষণীয়: (১) রামচন্দ্রের দেবত্ব (২) ভক্তিভাবের আতিশয্য, (৩) শক্তিবাদের প্রাধান্য এবং (৪) লোকশ্রুতির অল্পসংখ্য। বাংলাদেশ ভক্তিবাদের দেশ, এদেশের নদ-নদীতে গঙ্গাভক্তির প্রাবল্য, এদেশের মাটিতে গঙ্গা-মুক্তিকার ভিলক, এদেশের হৃদয়ে ভক্তির অক্ষুণ্ণ নিখর। তাই বাঙালীর দৃষ্টিতে রামচন্দ্র 'নরচন্দ্রমা' স্বাভাবিক নহেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার; বাঙালীর নামাবলীতে ও কীর্তনের গানে মুদ্রিত 'হরেক্ষম' নাম। শক্তি-ভাবনাও এদেশের অঙ্গতম বিশিষ্টতা। বাঙালী মা-পাগল জাতি, তাই এদেশের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্যে মাতৃভাবাসক্তির প্রকাশ। বাংলা রামায়ণও মাতৃভাবে বিলসিত। লোকশ্রুতি হইতে সমাজত নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীর সংযোজনও বাংলা রামায়ণের বৈশিষ্ট্য।

ক. সংস্কৃত রামায়ণ

বাংলাদেশে সংস্কৃতেও রামায়ণ রচিত হইয়াছে। পাল আমলে লিখিত চুইখানি রামচরিতের সন্ধান পাওয়া যায়—অভিনন্দের রামচরিত ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত।

অভিনন্দের 'রামচরিত' অসম্পূর্ণ। ইহার ছত্রিশটি সর্গ স্বাভাবিক পাওয়া গিয়াছে। ইহার কাহিনী প্রচলিত রামকাহিনীর অল্পরূপ। প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রামায়ণে হনুমানের মুখে একটি দেবী মাহাত্ম্য বিষয়ক স্তব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত: ইহার সহিত আছে 'কবিশ্রুতি'। এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি আৰ্য্যভট্টের দ্বারক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এক অর্ধে কাব্যের বিষয় গ্রাণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং দশরথ-নন্দন রাম কর্তৃক গ্রাণবধ ও সীতার উদ্ধার; অপর অর্ধে কৈবর্তরাজ দিব্য কর্তৃক বরেন্দ্রী গ্রহণ,

রামপাল কর্তৃক ভীমরূপী রাবণবধ এবং ‘জনকভূবা’ রূপিনী জন্মভূমির উদ্ধার। ইহা প্রকারান্তরে একটি ঐতিহাসিক কাব্য। পাল আমলে বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত-রাজের বিরোধ ও রামপাল কর্তৃক সেই বিরোধ দমন এষ্ট কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। তবে কাহিনীর কাঠামো রামায়ণ-ভূমক। কবি সত্যাচর নন্দী আত্মশ্রমিচয়ে এই গ্রন্থকে ‘কলিযুগ রামায়ণ’ এবং নিজেকে ‘কলিকাল বাঙ্গালীকি’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন [‘কলিযুগ রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাঙ্গালীকি:’—রামচরিত, কবি-প্রশস্তি]। ইহাতেও বাঙালীর স্বাক্ষরভাবসন্ধির পরিচয় রহিয়াছে। ভীমরূপী রাবণ ভবানী-মহেন্দ্রের উপাসক :

স ভবানী সমুপেতো ভুজঙ্গম বিদ্বৃষিতঃ স্বয়ং দেবঃ ।

ষিঙ্গরাজ কেতুরাসীমুস্তা পুণ্যস্ত যস্তান্তঃ ॥ [রামচঃ, ২. ২৬]

—ভীম সকলপ্রকার অধর্ম হইতে মুক্ত ছিলেন; ভুজঙ্গম-বিদ্বৃষিত চন্দ্রকলা-লাভিত দেব মহাদেব ভবানীসহ তাহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

খ. বাংলা রামায়ণ

॥ কৃত্তিবাস ॥ ভাষায় রচিত ‘শ্রীরাম পাঁচালী’র আদি কবি পণ্ডিত কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতক)। শুধু আদি কবি নহেন, বাংলা রামায়ণের জনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল রূপ কি ছিল, তাহা জানা অসম্ভব; যে রূপে এই রামায়ণ পাওয়া বাইতেছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের বহু কবির হাত পড়িয়াছে। কথক ও গায়নের মুখে মুখেও অনেক কাহিনী বোজিত হইয়াছে। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই রামায়ণকে বলিয়াছেন, ‘Composite Text’: উক্তিটি মিথ্যা নয়। বর্তমানে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপের কূটতর্ক ছাড়িয়া দিলে, অল্প বৈশিষ্ট্য-গুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীকি-রামায়ণের বিস্তারিত বা সংক্ষেপিত—কোনদিক হইতেই আকরিক অম্লবাদ নয়। কৃত্তিবাস যদিও একাধিকবার বলিয়াছেন, ‘বাঙ্গালীকি প্রসাদে রচে, রামায়ণ গান’ কিংবা ‘কৃত্তিবাস রচিল বাঙ্গালীকিমুনি বরে’—কিন্তু কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণে আদি কবির এই প্রসাদের ভাগ অতি অল্প। বাঙ্গালীকির বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের নাম কৃত্তিবাসে হইয়াছে আদিকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড। চরিত্রসংষ্টিতেও কৃত্তিবাস স্বতন্ত্র: বাঙ্গালীকির আদর্শ ‘নয়চক্রমা’ বর্ষবান্ রাম, কৃত্তিবাসের আদর্শ কোমলতার আধার ভগবান রাম। বাঙ্গালীকি ধিকৃত্তা অল্পতপ্তা কৈকেয়ীর মনোভাব বিশ্লেষণ করেন নাই,—রাম অবোধ্যায় কিরিন্মা আলিলে কৃত্তিবাস অল্পতপ্তা কৈকেয়ীর যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে

মতিমীর বিব-নিধান নাই, আছে জননীর অশ্রু-উজ্জ্বল, 'যদি রাম যা বলিয়া না
 ডাকে আমারে। ত্যজিব এ পাশ প্রাণ বিষণ করে।' বান্দীকির রাবণ মনে-
 প্রাণে রামের শত্রু, কৃষ্ণবাসের রাবণ প্রকারাচর্যে রামভক্ত, যত্নাকালে তাঁহার মুখে
 রামভক্তি 'অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন। দয়া করি মন্তকেতে দেহ স্রীচরণ ॥'
 কৃষ্ণবাসী রামায়ণের বহু ঘটনা আবিষ্কারের বহিস্কৃত : রামনামে রত্নাকরের পাশকর,
 হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, গজাস্পর্শে সৌদাম রাজার মুক্তি, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ,
 রঘুর দিগ্বিজয় ও দানকীর্তি, অজ্ঞ-বিলাপ, হনুমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্ডার লঙ্কাত্যাগ,
 তরঙ্গীসেন-কাহিনী, অহিরাবণ ও মহীরাবণ বৃত্তান্ত, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, রাবণের
 চণ্ডীপাঠ অন্তরঙ্গকরণ, যত্নাকালে রাবণের রামচন্দ্রকে রাজনীতি শিক্ষাদান, রাবণের
 স্বর্ণের সিঁড়ি রচনা করিবার কল্পনা, লবকুশের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ববন্ধন ও যুদ্ধ
 প্রভৃতি। এই সকল ঘটনা কৃষ্ণবাস নানা ভাষা হইতে আহরণ করিয়াছেন।
 বাংলার লোকশ্রুতি, অধ্যাত্মরামায়ণ ও পদ্মপুরাণ বা কালিকাপুরাণের কাহিনী এবং
 কালিদাসের রঘুবংশের প্রভাব কৃষ্ণবাসে গুরুতর। সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাঙালীর
 মানস-প্রবণতা ভক্তিবাদ ও শাক্তবাদের প্রভাব। ভক্তিবাদের দেশে কৃষ্ণবাস রাম-
 ভক্তির চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন : কৃষ্ণবাসী রামায়ণে রাম-বৈরা রাবণ, তরঙ্গী-
 সেন, বীরবাত্ত সকলেই রামভক্ত। তরঙ্গীসেন রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিয়াছেন, তাহার
 রথে ও ধ্বজপতাকায় লেখা 'লক্ষ লক্ষ রাম নাম গজাভক্তিকাতে', তিনি বলিতেছেন,
 'রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা'। রামের হস্তে নিহত হইয়াও 'তরঙ্গীর কাটাছুও
 রাম রাম বলে'। ভক্তিবাদের যেমন এই একদিক, তেমনই মাতৃভাবাসক্তি ইহার আর
 একদিক। রাবণের পুত্র মহীরাবণ কালিকাভক্ত : 'কালিকা পূজিয়া সে পাইল
 বরদান'—এই মহীরাবণ মায়াবলে রাম-লক্ষণকে হরণ করিয়া পাতালে কালিকার
 নিকট বালি দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। রাবণ নিজেও ছিলেন শক্তির বরণপ্রভু ;
 যুদ্ধকালে দেশীর স্বস্তি করায় দেবী তাহাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন : 'অসিত-
 বরণা কালী কোলে দশানন।' এই রাবণবধের জন্তই রামচন্দ্রের অকালে দেবীর
 বোধন : 'তদ্বয়ম মতে পূজা করে রঘুনাথ'—শুধু তাই নয়, ১০৮টি নীলগয়ের একটি
 অপহৃত হওয়ার 'নীলকমলাগ' রাম 'ফুল নীলোৎপল' সদৃশ নয়ন উৎপাটন করিতে
 উদ্ভত হইলে দেবী তাহাকে রাবণবধের বর প্রদান করেন। ভক্তি এ শক্তির এই
 অপার মহিমা কৃষ্ণবাসী রামায়ণের অন্ততম বৈশিষ্ট্য।

॥ অজ্ঞাত রামায়ণকার ॥ বাংলা রামায়ণে অধ্যাত্ম রামায়ণ বা লোকশ্রুতিতে
 প্রচলিত রামায়ণের প্রভাবই বলবান। কৃষ্ণবাসের পরে অনেকে রামায়ণের কোন

বিশেষ অংশ বা পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনা করিয়াছেন : সেগুলিতেও বান্দীকির অঙ্গুহতি নামে রাজ। এই অংশগুলির মধ্যে লক্ষণদ্বিধিজয়, অঙ্গনরায়বার, শিবরাসের বৃদ্ধ তরঙ্গীসেনবধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই পালাগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণেও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর (১৭০২) অঙ্গনরায়বার ও তরঙ্গীসেন বধ— বাহা ‘বিকুপূরী রামায়ণ’ নামে পরিচিত, তাহার অধিকাংশই কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়। বিজ ভবানীনাথের শ্রীরাম পাঁচালী অধ্যায় রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। বিজ লক্ষণও অধ্যায় রামায়ণের অঙ্গুসরণে রামায়ণ রচনা করেন, তাহার আধিকাংশ রাজ পাওয়া গিয়াছে।

॥ অদ্ভুত আচার্য ॥’ ইনি উত্তরবঙ্গের কবি। পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য। মাতার নাম মেনকা। স্বর্গত মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন, ইনি বোডাল শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। রামচন্দ্রের নির্দেশ লাভ করিয়া তিনি রামায়ণ রচনা করেন, সেইজন্য তাহার নাম হয় ‘অদ্ভুত আচার্য’ : ‘প্রভুর রূপা হইল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত নাম হইল সেই সে কারণ’ ॥ [আশ্চকাণ্ড]। ‘পুরাণেতে শুনি রাম বিক্রমের সীমা’— ইনি বহু পুরাণ ঘটিয়া রামায়ণ রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বাঙালীর লক্ষ্য পল্লবিত অলৌকিক কাহিনীর প্রতি, আর এই সকল অতিলৌকিক কাহিনীর ভাণ্ডার পুরাণ। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ নানাদিক হইতে পুরাণ-কাহিনীর মত পল্লবিত। কবিত্ব নিতান্তই অল্প, বর্ণনা বিবৃতি-প্রধান। ইহার কাণ্ডগুলির নাম, আশ্চ, অবোধ্যা, অরণ্য, কিল্কিলা, জ্বলরা, লঙ্কা ও উত্তরা। সুযোগ পাইলেই কবি পুরাণোক্ত নানা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন : আশ্চকাণ্ডে বিষ্ণুর রামরূপে বান্দীকিকে দর্শনপ্রদান, কঙ্ক-বিনতার কাহিনী, শিব-পার্বতীর বিবাহ, বলির বৃত্তান্ত, প্রহ্লাদ ও ঋষের উপাখ্যান প্রভৃতি শৌর্যগণিক অঙ্গুহতি রামায়ণে নব সংযোজন। ইহাতে রাবণ-কুন্তকর্ণাদির জন্ম বৃত্তান্ত আশ্চকাণ্ডেই বর্ণিত হইয়াছে। দশরথের কাহিনী শুরু হইয়াছে উনত্রিংশ অধ্যায় হইতে। এইটুকু হইতে জৈন রামায়ণের ঘটনা-বিব্রাসের সহিত ইহার মিল লক্ষিত হয়। আর একটি নূতন অদ্ভুত ঘটনা—মাধব পাটনীর নৌকার রাম-লক্ষণ-বিষামিজের নদী পার হওয়ার বৃত্তান্ত [আশ্চ, ৬৪ অধ্যায়] : রামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাটনীর কাঠের নৌকা সোনার পরিণত হইল দেখিয়া মাধব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল,

আজি মোর হাতে তোর কড়ু নিস্তার নাই।

রাখা নাও করি বেটা বাবা কোন ঠাই।

কিন্তু তুল ভাঙ্গিল মাথার দ্বীর কথার। সে বুঝিল, রামচন্দ্রই অখিল ভুবনপতি।^১

অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণে এইরূপ—অনেক অদ্ভুত কথা আছে। ইহা হইতে জানা যায়, পূর্বজন্মের দশরথ—‘পূর্বে দ্বীপটি পরে দশরথ রাজন’; এই রামায়ণ মতে কৃত্তার নাম নন্দনা।

॥ চন্দ্রাবতী ॥ লোকশ্রুত কাহিনী-স্ববলিত আর একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর। চন্দ্রাবতী প্রসিদ্ধ মনসামর্জলকার শিববংশীদাসের বিদুষী কত্তা। ইনি ষোড়শ শতকের কবি। ময়মনসিংহ অঞ্চলে মহিলাদের মুখে মুখে এখনও চন্দ্রাবতীর রামায়ণের অংশবিশেষ স্মৃত হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, দ্বাবতীর রামায়ণ-কাহিনীর সহিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সাদৃশ্য আছে। এখানে সীতার জন্ম-কাহিনী অদ্ভুতান্তর রামায়ণের অমূল্যরূপ। রাবণ মর্ত্য ও পাতাল জয় করিয়া মুনীদের রক্তে পূর্ণ একটি কটরা মন্দোদরীকে প্রদান করেন এবং বলেন, উহাতে উগ্র বিষ আছে। রাবণ অশোকবনে অপহৃত্য দেবকন্তাদের সহ প্রমোদ করিতেছেন সংবাদ পাইয়া মন্দোদরী বিষ মনে করিয়া সেই রক্ত পান করেন, তাহার ফলেই একটি ডিম্ব প্রসূত হয়। গণকেশরী বলেন, ‘এই ডিম্ব কত্তা এক গো লড্ডিবে জনম। তা হইতে রাক্ষস বংশ গো হইবে নিধন’। রাবণ এই সংবাদ পাইয়া ‘সোনার কটরার মধ্যে গো রূপার খিল দিয়া’ সেই ডিম্ব সাগরে ভাসাইয়া দেন। মিথিলার মাধব জালিয়া সেই কটরা লইয়া ধরে আসে এবং সাধ্বী পত্নী ‘সীতা’র হস্তে অর্পণ করে। একদিন একটি আশ্চর্য রূপসী কত্তা আবির্ভূত হইয়া কটরাটিকে জনকরাজার ধরে পাঠাইয়া দিতে বলে। মাধবপত্নী কৌটাটি জনকরাজার রাণীর নিকট লইয়া যায় এবং তাহার বিনিময়ে বহু ধনরত্ন লাভ করে। এইখানেই কটরার ডিম্ব হইতে সীতার উৎপত্তি হয়। জালিয়ার পত্নী সতীর নাম অনুসারে কত্তার নাম রাখা হয় সীতা [‘সতার নামেতে গো কত্তার নাম রাখে সীতা’]। রামের জন্ম-কাহিনীও স্বতন্ত্র: আটকুড়া দশরথ রাজা একজন মূনির নিকট হইতে একটি ফল লাভ করেন, সেই ফল ভক্ষণ করায় তিন রাণী হইতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রামের হৃদয় ভঙ্গ হইতে রাবণবধ পর্যন্ত কাহিনী সীতার বারমাতা বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সীতা-নির্বাসনের কারণটি অভিনব: কেকয়ীর একটি কত্তা ছিল—নাম কুত্মা। সেই নির্বন্ধ করিয়া রাবণ কেমন জানিতে চাহিলে সীতা মাটিতে রাবণের

১। ভারতচন্দ্রের দ্বীপপাটনীর সহিত মাধবপাটনীর সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ উভয়েই কোন সাধারণ লোকশ্রুতি হইতে বৃত্তান্তটি গ্রহণ করিয়াছেন।

২। ব্রটব্য চন্দ্রাবতীর রামায়ণ—পূর্ববঙ্গ স্মৃতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখান এবং প্রান্তিকবশতঃ সেই চিত্রের পার্শ্বে মিত্রিত হইয়া পড়েন
কুকুরা রাবচন্দ্রকে ডাকিয়া বলে,

তন তন দাদা গুগো কহি যে তোমারে ।

বলিতে পারের কথা গো বাক্য নাহি সরে ॥

বিশ্বাস না কর দাদা দেখ গো আসিয়া ।

তোমার সাতা নিত্রা যায় গো রাবণ বৃকে লইয়া ॥

ইহাট্ট শাস্ত্রের বনবাসের কারণ । চন্দ্রাবতার রামায়ণ অসম্পূর্ণ । কুকুরা কাহিনীর পর আর কোন অংশ পাওয়া যায় নাই । চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে বাংলা রামায়ণের বিশিষ্টতা সহজেই ধরা পড়ে । বাংলা দেশের রামায়ণ বাংলাদেশেরই বিচিত্র সংস্কার ও বিশ্বাসের রূপায়ণ । কাহিনীর কাঠামো আগ রামায়ণের হইলেও ইহার বেশির ভাগ চরিত্র ও ঘটনা লোকপ্রসিদ্ধি হইতে সমাজিত ।

॥ বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ॥^১ এদেশে জনপ্রিয় রামকাহিনী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টে যে কিরূপ রূপান্তর লাভ করিয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের ‘নতন রামায়ণ’ । রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন : ‘আমি বুদ্ধ আমি অস্ত্রে কছি অবতার’ । মহাকাব্যের ইচ্ছায় তিনি বুদ্ধের অবতাররূপে অষ্টদীর্ঘ ইষ্টয়াছেন, এবং রামায়ণ রচনা করিয়াছেন হতমানের অতুল্যায়, ‘রামানন্দ লিখিল মাকতি আজ্ঞা পায়া ।’ কবিরচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ পাওয়া যায় নাই, লঙ্কা-কাণ্ডের শেষাংশে পুঁথি খণ্ডিত । কিন্তু ইহার মধ্যে মহাধান শক্তিবাহী বৌদ্ধ প্রভাব অতি স্পষ্ট : তাহার মতে, দারুচন্দ্র (পুরীর জগন্নাথ) এবং রামচন্দ্রও বুদ্ধ : ‘রামচন্দ্রের চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি সবই বৌদ্ধভাব বা নির্বানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন ।’ রামানন্দের রামায়ণে কাহিনীর কাঠামো প্রচলিত রামায়ণের মত হইলেও ইহা যোগ-যোগ-সাধনের কথায় পূর্ণ : ইহাতে বৌদ্ধ তত্ত্বাচার ও যোগাচারের প্রভাব লক্ষ্যীয় ।

॥ জগৎরাম ও রামপ্রসাদ ॥ ‘অদ্ভুতোত্তর রামায়ণ’ বা ‘অদ্ভুত রামায়ণের’ অতুল্যরূপে বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন জগৎরাম রায় ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদ । এই রামায়ণে আটটি কাণ্ড আছে—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যাকাণ্ড, কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, পুষ্করাকাণ্ড এবং উত্তরাকাণ্ড । পুষ্করাকাণ্ডের শেষাংশ রামরাস । জগৎরাম প্রথমে সমগ্র কাব্যটি রচনা করেন, পরে লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড পুত্র রামপ্রসাদ কর্তৃক বিস্তৃত করিয়া লেখা হয় । পুঁথিখানি সমাপ্ত হয় ১৭২১

১। দ্রষ্টব্য বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ—নগেন্দ্রনাথবহু (হরপ্রসাদ-সংস্করণ লেখালা, ১ম খণ্ড)

ক্রীষ্টাব্দে। বাংলা অদ্ভুত রামায়ণ প্রধানতঃ সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনেই রচিত। ইহাতে ভরদ্বাজ-বান্দীকি-সংবাদে বিশেষভাবে সীতার সাহায্য বর্ণনা করা হইয়াছে। পুন্স কাণ্ডটিই বিশেষত্ব যুক্ত। এই কাণ্ডেই সীতার হস্ততত্ত্ব, পুন্সরাধিপ সহস্রবৃদ্ধ রাবণের বৃত্তান্ত, সহস্রবৃদ্ধ রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের পরাজয়, সীতার মহাকালীরূপ ধারণ, সহস্রবৃদ্ধ রাবণবধ ও রামকর্তৃক প্রকৃতিরূপা সীতার শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর 'রামরাস'। রামরাস সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণে নাই, ইহা সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনা এবং উহাতে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। জগৎরামের রামায়ণে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ-বহির্ভূত অনেক অতিরিক্ত কাহিনী স্থান পাইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের একটি অধ্যায়ে রাম প্রসাদ এই রামায়ণের সম্পর্কে বলিয়াছেন,

সীতারাম লীলা নবা রচিলা সুন্দর কাব্য

ত্রিঅদ্ভুত রামায়ণ নাম।

অদ্ভুত অধ্যায় মত একত্র করিয়া যুত

রচনা বিবিধ রসধাম ॥

বাংলা অদ্ভুত রামায়ণে অধ্যায় রামায়ণের প্রভাব গুরুতর। উপরন্তু আছে সহস্রবিধ বৈষ্ণবমত ও শক্তিবাদের প্রভাব। বস্তুত বাংলা রামায়ণ বাঙালীর বিচিত্র মানস-প্রবণতারই প্রতীক।

গ. নব্য বাংলায় রামায়ণের নব রূপান্তর

বাংলা রামায়ণ যে পুরাপুরি বান্দীকি রামায়ণের অনুলিপি নয়, উহাতে যে অধ্যায় ও অদ্ভুত রামায়ণ বা অন্ত্যন্ত পুরাণবর্ণিত রামায়ণ এবং দেশপ্রচলিত নানাপ্রকার সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাব বিদ্যমান, তাহা আলোচিত হইয়াছে। বাংলা রামায়ণে বাঙালীর নিজস্ব মানস-প্রবণতার ছাপ অতি স্পষ্ট। অলৌকিক অধ্যাত্মবাদ, ভক্তি-বাদ ও শক্তিবাদের দেশে—দেশজ এই বিশিষ্টতাই সংস্কৃত রামায়ণের পঙ্কে নব প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছে। পুরাকাহিনী এইভাবে যুগে যুগেই নূতন আকার প্রাপ্ত হয়; কোথাও বিকৃত হয়, কোথাও সংস্কৃত হয়, কোথাও আবার যুগপ্রয়োজনের বাহন হইয়া উঠে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্বোধিত বাঙালীর জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বেদীন নবপ্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেদিন স্পষ্টতঃ দুইটি নূতন ধারায় পুরাতত্ত্বকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা দেখা গেল : (১) পুরাতনকে স্ব-স্বরূপে প্রকাশ করিবার আশ্রয় এবং (২) পুরাতনের আত্মদিকে নূতন যুগের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করার

প্রায়শ। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সমাজে পুরাতনের গতানুগতিক অঙ্কুরণ, পৌরাণিক অন্ধবিশ্বাস ও অলৌকিকতার মোহ কোনদিনই পরিবর্তিত হয় নাই : তাহার ফলে কথকতার বা কবিগানে, ব্যাক্য বা ব্যাক্যানাটো সেই অলৌকিকতা, সেই চমকপ্রদ ভক্তি-বিশ্বাসের অদ্ভুত কাহিনীরই প্রাধান্য থাকিয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের বাংলা রামায়ণেও এই তিনটি ধারার অল্পবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্বরণ রাখিতে হইবে যে, এই শতাব্দীতে অথও রামায়ণ বড় বেশী রচিত হয় নাই। কেবল একখানি অথও রামায়ণ পাওয়া যাইতেছে—রাজকৃষ্ণ রায় অন্মদিত রামায়ণ; ইহা মূল বাঙ্গালী-রামায়ণের পঞ্চাশবাদ। অল্পবাদে কবি নানাপ্রকার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন—কোথাও পরার, কোথাও ত্রিপদী, কোথাও অমিত্রাক্ষর, কোথাও বা সংকুত ছন্দ। ছন্দের বৈচিত্র্যের তত্ত্ব নয়, বাঙ্গালী-রামায়ণের বধ্যবধ মূল্যবাদের তত্ত্বই ইহা অমূল্য। প্রাচীন কোন বাংলা রামায়ণ এ-বাদ দিতে পারে নাই। প্রাচীন কবিদের রামায়ণ বাঙ্গালীর চায়া মাত্র, কায়া নয়—রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ মূলের কায়া, মূলের একটি অবিকল প্রতিলিপি। কোন কোন স্থলে অল্পবাদে দুর্বল হইলেও, কবি মূলকে কোথাও বিরূত করেন নাই। রাজকৃষ্ণ রায়ের এই রামায়ণ ছাড়া এমুগের রামায়ণমূলক সকল রচনাই রামায়ণের অংশ মাত্র। বিজ্ঞানাগরও গল্পে সীতার বনবাস রচনা করিতে গিয়া রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের অংশবিশেষকে গ্রহণ করিয়াছেন। যাত্রা নাটকের পালার কিংবা কাব্য-কবিতায় রামায়ণের কোন-না-কোন খণ্ডিত অংশই অবলম্বিত হইয়াছে।

॥ যাত্রা ও নাটক ॥ প্রাচীন যাত্রার গান, ভক্তি-বিশ্বাস ও অতিলৌকিকতাকে উপজীব্য করিয়া মনোমোহন বহু পৌরাণিক নাটক রচনার যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রামায়ণ-কাহিনীও নাট্যযাত্রার পালার স্থান লাভ করিয়াছিল। মনোমোহন বহুর ‘রামাভিষেক’, ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্রের ‘জানকী-নাটক’, হরিমোহন কর্মকারের ‘ইন্দুমতী’, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘মৈথিলীমিলন’ ও ‘সীতার বনবাস’ কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সীতার বনবাস’, ‘রামবনবাস’, ‘রামাভিষেক’, ও লক্ষ্মণ-বর্জন—তিনকড়ি বিশ্বাসের ‘সীতার বনবাস’, ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ ও ‘সীতার পাতাল প্রবেশ’—ব্রজমোহন রায়ের ‘রামাভিষেক’ ও ‘শতস্রঙ্গ রাবণবধ’ এবং মতিলাল রায়ের ‘সীতাহরণ’, ‘রামরাজ্য’ ও ‘রাবণবধ’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যাক্যানাটো রামের দেবত্ব ও ভক্তির উজ্জ্বল বাংলা রামায়ণের বিশেষত্বকেই স্বরণ করাইয়া দেয়। যাত্রার সহজ চমক সৃষ্টিতে অদ্ভুত অলৌকিক বিশ্বাসকে প্রয়োগ করিয়া ইহা প্রাচীন বঙ্কণীর চারিপাশেই ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। পৌরাণিক নাটক রচনার গিরিশচন্দ্রও এই বঙ্কণকে ছিন্ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার ‘রাবণ বধ’, ‘সীতার বনবাস’, ‘লক্ষ্মণবর্জন’, ‘সীতাহরণ’ প্রভৃতি নাটক প্রাচীন ভক্তি-

বিশ্বাসেরই একটু রকমকে। বরং রামায়ণ-কাহিনীর একটি নৃত্যমতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যজ্ঞেন্দ্রলালের ‘পাবাগী’ ও ‘সীতা’ নাটকে। কিন্তু যজ্ঞেন্দ্রলাল নব্যযুগের চিন্তার আলোকে ‘পাবাগী’ নাটকের ইঙ্গ ও অহল্যা চরিত্রকে নতুন করিয়া সৃষ্টি করিতে গিয়া পৌরাণিক আদর্শকে ভুল করিয়াছেন। পুরাণকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করিবার স্বাধীনতা লেখকের থাকিলেও, আদর্শচরিত্রকে আদর্শপ্রভুরূপে চিত্রিত করিবার স্বাধীনতা না থাকাই বাহ্যনীর : তাহাতে পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরাণের সিন্ধু রসাস্বাদে ব্যাভাত ঘটে এবং চিরাগত বিশ্বাস আহত হয়। যজ্ঞেন্দ্রলালের ইঙ্গ ও অহল্যা চরিত্র এই দোষে দুষ্ট। রামায়ণে অহল্যা ‘বিশ্বকালী’, ‘মহাভাগা’, ‘তোতিত-প্রভা’, ‘বশবিনী’—তিনি ইন্দ্রমায়ার ভ্রাতা,—আর ইন্দ্র দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত ‘ভূমতিবশা’, কিন্তু পশ্চাতে ‘অমৃতপ্ত’; রামায়ণে ইন্দ্র-অহল্যার সঙ্গম ঘন একটা দৈব-নিশ্চিন্তি [বাল, ৪৮-৪৯ সর্গ]। কিন্তু যজ্ঞেন্দ্রলালের ইন্দ্র লম্পট ও কামুক, অহল্যা বেচ্ছার দ্বিচারিণী। ‘পাবাগী’ নাটকে অহল্যার ভূমিকা সন্তোষ-লালসা-তাড়িতা লামাক্তা নারীর স্তায় : স্বামীর প্রতি তাঁহার অভিযোগ :

বাধিলে কেন নব সুকোমল

কুহুমিত পল্লবিত শ্রামল বরগী

নীরস বিত্তক বৃক্ষকাণ্ডে ?

তিনি ইন্দ্রকে বলেন, ‘সত্য ভালবাস ?’ প্রেমিককে লইয়া প্রেমিকার স্বর্ণরচনার কলনাটিও আধুনিক : অবৈধ রত্নসন্তোষের জন্ত স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিতেও অহল্যার বিবেকে বাধে নাই। পুরাণ লইয়া এ ধরনের নবসৃষ্টি নিম্ননীর। কিন্তু ‘পাবাগী’ নাটকের ক্রটির প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞেন্দ্রলাল করিয়াছেন, ‘সীতা’ নাটকে। সেখানে তিনি রামায়ণ-কাহিনীকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, যেভাবে চরিত্র-গুলির নবমতর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে যেমন একদিকে আছে নব্যযুগের স্বীকৃতি, তেমনি অপরদিকে আছে নৈপুণ্যের পরিচয়। রামায়ণে রাম সীতাকে অগ্নিভক্ষা ও অপাপবিদ্ধা জানিয়াও কেবলবংশ মর্যাদা ও কীর্তিরক্ষার জন্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন : তাঁহার নিকট প্রেম হইতেও বড় ছিল কীর্তি ও মহৎ বংশগৌরব—কিন্তু ‘সীতা’ নাটকে রাম একরূপ নিরুপায় চইয়া, কুলগুরু বশিষ্ঠের প্ররোচনাবশে শাস্ত্রের মুখ চাহিয়া সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন : রাম এখানে বশিষ্ঠের হস্তে জড়নকমাত্র, কিন্তু প্রেমিক। বশিষ্ঠ ক্ষয়হীন স্বাতন্ত্র্য-বিধির গোষ্ঠী : তাঁহার নিকট শাস্ত্রের বিধানের কাছে ব্যক্তিগত মেহ, প্রেম, কোমলতা নিতান্ত মূল্যহীন। এই নাটকে বাগ্মণিক এক অভিনব চরিত্র—তিনি ক্ষয়বান্ ; সমাজের বৃশ্চিকার্ত্তে বলিপ্রদত্তা নারীর অভিযোগ তাঁহার কণ্ঠে অগ্নিবীণা

রবে বাজিয়া উঠিয়াছে। রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটনা অলৌকিক, দীতানটকে
এক ঘটনা। সূক্তিসিদ্ধ : ভূমিকম্পে পৃথিবী বিচলিত হওয়ার সীতা পাতালে প্রোথিত হন।
এইভাবে সীতানটকে মূল রামায়ণের স্বাদও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অপরদিকে নবযুগের
চিন্তাধারাও মাড়ত হয় নাই।

॥ কাব্য-কবিতায় রামায়ণ-প্রসঙ্গ ॥ নব ধ্যান-ধারণার যুগে শিক্ষিত বাঙালী-
সমাজে স্ব-স্ব প্রবণতা অনুসারে পুরাণ কাহিনী গ্রহণ করার যে প্রয়াস জাগ্রত হইয়াছিল,
তাহার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। মধুসূদন ছিলেন ইয়ং
বেঙ্গলের প্রতিনিধি। তাহার কীর্তিস্তম্ভ 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ইউরোপীয় সাহিত্যের
আবাদজনিত নবতর রসাত্মকত্বের প্রকাশ। শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক পাশ্চাত্য জাতি
'১৮শ শতাব্দীর ইয়ংবেঙ্গলের চেতনায় যে বিশ্বয় ও প্রজ্ঞাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল, মেঘনাদ-
বধ কাব্য সেই যুগ-চেতনার সার্থক রূপায়ণ। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগভাবনার
পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধকাব্য একখানি নব রামায়ণ। এই কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদ
অমেয় ঐশ্বর্য, অপরিমিত মনশক্তি ও বলিষ্ঠ মানবের প্রতীক। এই ঐশ্বর্য, এই
শক্তি প্রাচীন ভারতের রাক্ষসী শক্তি-সমৃদ্ধির প্রতীক হইলেও ইহাতে পাশ্চাত্য ভাবের
প্রতিসরণ অতিশয় স্পষ্ট। রাম-লক্ষ্মণকে মধুসূদন যোগা মর্ষাদা দিয়াছেন, তাঁগদিগকে
বিভিন্নরূপে চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তাঁহারা পুরুষকারের জীবন্ত
প্রতিমূর্তি দৈবাহত রাবণ ও মেঘনাদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারেন নাই। রাম-
লক্ষ্মণের মধ্যে দুর্বলতা ও পরাজিত মাহুস্বলভ মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে।
মধুসূদনান্বিত দেবদেবীর চরিত্রেও পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের প্রভাবচ্ছটা বিচ্ছুরিত
হইয়াছে। মহাদেব, পার্বতী, ঈশ্বর, শচী, বারুণী, লক্ষ্মী প্রভৃতি—ভারতীয় দেবদেবীর
পাশ্চাত্য সংস্করণ। কিন্তু মধুসূদন পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও বান্দীকি-
প্রতিভাকে অমান্য করেন নাই; ভাবশিষ্টের মত তিনি যেমন বলিয়াছেন, 'নরি আমি
কবিশুণ্ড, তব পদাঙ্কে বান্দীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি, তেমনি কার্ণবে ও সত্যতা ও
নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি হানে হানে মূল রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের
রাবণ ও মেঘনাদের শক্তিমত্তা ও সমৃদ্ধি মূল রামায়ণকেই অরণ্য করাইয়া দেয়; রাজসভায়
'হেমকুট-হেমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ' রাবণের মূর্তি, মূল রামায়ণের অশেষ রূপ,
ধৈর্য, সন্ত ও দ্রুতির আধার রাবণের স্মারক। নিকুন্তিয়া যজ্ঞাগারে বিভীষণের প্রতি
মেঘনাদের স্বেবোক্তিও রামায়ণের প্রতিধ্বনি। তাহা ছাড়া, পঞ্চবটীবনের বর্ণনায়, পঞ্চবটী-
কনে রামসীতার দাম্পত্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে, অশোকবনে সরমাচিত্র রূপায়ণে এবং
রাক্ষসের অশ্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনায় মধুসূদন বান্দীকিরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

অনুভূতির এই-নিষ্ঠা প্রাচীন বাংলা রামায়ণে দৃশ্য। যুদ্ধের প্রতি এ নিষ্ঠা উন্মত্ত শতকের ঐতিহ্য-অবগাহনের একটি বিশিষ্ট রূপ।

নেখনানবধ কাব্য ছাড়াও মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যের দুইটি পত্রিকা ‘দশরথের প্রতি কেকয়ী’ এবং ‘লক্ষ্মণের প্রতি শূৰ্পণখা’—রামায়ণের ঘটনা লইয়া রচনা করিয়াছেন। এই পত্রদ্বয়ে কেকয়ী ও শূৰ্পণখা রামায়ণের পুরাণ-ভূমিতে সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, কেকয়ীর অভিযোগ নব যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত, শূৰ্পণখার প্রেমাসক্তি ভোগস্ববিকিতা কাম-লোলুপা বিধবায় প্রোমাভীপ্সার দর্পণ।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও রামায়ণ ॥ রবীন্দ্রনাথও রামায়ণের প্রভাব কম নয়। যদিও সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে রামায়ণ-প্রসঙ্গ খুবই অল্প, তথাপি রামায়ণের প্রতি তাঁহার যে কি গভীর সজ্ঞাবোধ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি প্রবন্ধে ও কবিতায়। প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে রামায়ণকে তিনি বহুকোটি নয়নারীর অজস্র শাস্তি ও শক্তির প্রেরণা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; ইহা ভারতবর্ষের চিরকালের আশা-কামনার প্রতীক, ভারতীয় মহৎ আদর্শের প্রতিনিধি, ভারতবাসীর গৃহ-জীবনের কাব্য। ‘পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত ঘাটতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে’ [প্রাচীন সাহিত্য]।

‘পুরস্কার’ কবিতায় তিনি বলিয়াছেন, সেই কোন্ যুগে রামায়ণের ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে, আজিও সেই স্বর ‘মধুর-করুণ তানে’ হৃদয়কে বিধুর করিয়া তুলিতেছে :

সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধনিতে
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে

বাজে মানবের কানে [সোনার তরী—পুরস্কার]

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রচিন্তে রামায়ণের প্রভাব নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ তাহার প্রথম স্বাক্ষর। অবশ্য ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র প্রেরণা মূল রামায়ণ নয়, বিহারীলালের ‘সারদামঙ্গল’—তথাপি বাল্মীকির কবিত্বলাভের ঘটনাটি কবিচিন্তে যে কি গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালের অপর কয়েকটি প্রবন্ধে ও কবিতায়। ‘কাহিনীর’ অন্তর্গত ‘ভাবা ও ছন্দ’ কবিতায় কথাই প্রথমে উল্লেখ করা বাইতেছে। এখানে একটিকে আরোপিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের মর্ত্য ও মানবপ্রীতি, অপরটিকে রূপান্তরিত

হইয়াছে কবি-জীবন ও কাব্যানুষ্টিয় প্রেরণা সম্পর্কে তাহার ধারণা। বাস্তবের ভাব্যর দৈগ্ধ ও চন্দ্রের তুমিকা সম্পর্কে বাস্তবিক মনোভাব কবির নিজেরই মনোভাব :

মানবের জীর্ণবাক্যে যোর ছন্দ দিবে নব সুর,

অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে বাবে কিছুদূর

ভাবের স্বাধীন লোকে । [কাহিনী—ভাষা ও ছন্দ]

সহসা আবিষ্কৃত দৈবীছন্দে বাস্তবিক দেবতার বন্দনা গান করিতে চাহেন নাই। চাহিয়াছেন আদর্শ মাতৃবের বন্দনা করিতে—ইহাও মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মূল রামায়ণকে বিকৃত করেন নাই, মোটামুটি ঘটনাটিকে অবিকৃত রাখিয়া কাব্যমত সম্পর্কে নিজস্ব মত পরিবেশন করিয়াছেন। মূল রামায়ণে ব্রহ্মা বাস্তবিককে বলিয়াছিলেন,

যচাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি ।

ন তে বাগনুভা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥ [বাল, ২. ৩৫]

‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় নারদ বাস্তবিককে কহিয়াছেন—

‘সেই সত্য’ বা রচিবে তুমি,

যটে বা, তা সব সত্য নহে । কবি, তব মনোভূমি

রামের জনমস্থান, অযোধ্যায় চেয়ে সত্য জেনো ।

বাস্তবিক কবিত্বলাভের ঘটনাটি আরও বিচিত্র ভাবে কবি-চেতনার প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই ঘটনার মধ্যে কবির কাব্যানুষ্টিয় অন্তর্নিহিত মূল সত্যটি নিহিত আছে, এবং ইহার মধ্যে রামায়ণের অন্তরাখ্যার সমগ্র সুর ধ্বনিত হইয়াছে,

কোন আঘাতে বাস্তবিকর হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল ?

করণার আঘাতে। রামায়ণ করণার অশ্রু-নির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর

শোকাত ক্রন্দন রামায়ণ কথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে।...ক্রৌঞ্চমিথুনের

গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক [সাহিত্য—কবীজীবনী]

রত্নাকর দস্যুর ঋষি জাভের কাহিনী বাস্তবিক-রামায়ণে নাই, আছে অধ্যাত্ম রামায়ণে। রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাস হইতে এই কাহিনীর সহিত পরিচিত হইয়াছেন। এ কাহিনীও রবীন্দ্র-মানসকে আলোড়িত করিয়াছে। তাহার মতে এই ঘটনা, ভারতবাসীর চক্রে রাবচরিত্র যে কত বড়, কি গভীর ভক্তি ও প্রেরণার উৎস, তাহা উল্কাটন করিয়াছে :

আর একটি গল্প আছে, রত্নাকরের কাহিনী। সে আর এক ভাবের কথা।

রামায়ণের কাব্য-প্রকৃতির আর এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প

রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রাম-সীতার বিচ্ছেদ দুঃখের অপরিণীমকরণাই যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দৃষ্টান্তে কবি করিয়া তুলিয়াছে, রামের এমন চরিত্র, ভক্তির এমন প্রবলতা। রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কত বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছেন, এই গল্পে যেন তাহাই মাণিয়া দিতেছে [সাহিত্য—কবিকীবনী]

রবীন্দ্রচিন্তকে উল্লেখিত করিয়াছে আর একটি কাহিনী—ঋষাশৃঙ্গ মূনির উপাখ্যান। ঋগাশৃঙ্গ নারী-পুরুষে ভেদ জানিতেন না। তিনি বারাকন্দাদের দেখিয়া তাঁহাদিগকে উত্তম ঋষিক্রমে অভ্যর্থনা করিয়া পূজা করেন। ঋষিপুত্রের এই পূজার একজন বারাকন্দা কিভাবে কলুষ জীবনে প্রেম-জ্যোতির স্পর্শলাভ করিয়া সহসা আগিয়া উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ ‘পতিতা’ কবিতায় সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বারাকন্দার স্তম্ভ-জাগরণের কথা মূল রামায়ণে নাই, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিজস্ব ভাব আরোপিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মানসীকাব্যের ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতা। রামায়ণের ঘটনামাত্র অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবধাত্তী জননীর অন্তরের অপরিণীম স্নেহ-ব্যাকুলতার তথ্য অহল্যার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। অহল্যার নিকট কবির এ জিজ্ঞাসা নূতন, অহল্যা যেন এক নবতর সৃষ্টি—স্মৃতি-বিস্মৃতির রহস্যময় ভাবাবেশে যিনি ভূমিগর্ভ হইতে স্নেহকোলাহল মুখর ধরণীর বৃকে আগিয়া উঠিয়াছেন, ‘ধরিজীর সজোজাত কুমারীর মত স্তম্ভর সরল শুভ্র।’ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, ‘বান্দ্রীকির সীতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই অহল্যার সৌন্দর্য্য অতি স্পষ্ট।’ [ত্রয়ী]

এইভাবে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের রসচেতনাকে আন্দোলিত করিয়াছে। এ কথা ঠিক যে, ‘রক্তকরবী’ নাটক রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রামায়ণকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, রামায়ণের রাবণ চির-কালের ‘বহল-গ্রহী বহুপ্রাসী দেবদ্রোহী’ লুপ্ত সংগ্রহ-প্রয়াসের ভয়াল মূর্তি : রামায়ণে কর্ণকীবী ও আকর্ষণ-জীবী দুই জাতীয় সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষ মূর্তিমন্ত হইয়াছে, শুধু তাই নয়, বঙ্গপুত্রীয় নিশ্চাপ সম্পদের মধ্যে নারীশক্তি নন্দিনীর আবির্ভাব—লঙ্কার দেবদ্রোহী লঙ্কুর মধ্যে মানব কল্পা সীতার আবির্ভাবের অতুলরূপ। এখানে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধনতাত্ত্বিক বস্তুসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া রামায়ণের মর্মার্থ আবিষ্কার করিয়া পুরাতনের ভিত্তিতে নব-উপলব্ধ মানস-সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন।

॥ মহাভারত ॥

১. ভূমিকা

মহাভারত স্তবিশাল গ্রন্থ। ইহা সমুদ্রের মতই বিশাল, বিস্তৃত, গভীর ও গভীর, সমুদ্রের মতই রম্য। সাগর-সহরী গণনা করা দুঃসাধ্য, মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্র্য নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। বিপুল মহত্ব ও ভারতের জন্তই এই গ্রন্থের নাম মহাভারত।

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশি। রামায়ণের কাহিনী সরল : উহার সপ্তকাণ্ডে মূল কাহিনী ব্যতীত মাত্র একশত উপাখ্যান আছে। মহাভারতের পর্বসংখ্যা আঠার; মূল কাহিনীর অতিরিক্ত ইহাতে অসংখ্য কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এমনও হইয়াছে যে, অনেকস্থলে মূল কাহিনী শুরু হইয়া গিয়াছে,— ‘অত্রাপ্যাহরণমন্তীতিহাসং পুরাতনম্’ বলিয়া মহাভারতকার কথার পর কথা যোজন্য করিয়া কাহিনীকে শাখায়-প্রশাখায় জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

রামায়ণেও বৃহত্তর সমাজের চিত্র আছে। বৃহত্তর সমাজের সংঘাত প্রদর্শিত হইয়াছে : তথাপি রামায়ণ মুখ্যতঃ পারিবারিক কাহিনী। মহাভারতের সমাজ বিস্তৃততর, সংঘাত আরও প্রচণ্ড। মহাভারতের গৃহযুদ্ধে সমগ্র ভারত যুদ্ধ, সমগ্র ভারত আন্দোলিত। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জীবনের সকল নীতি—রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, গৃহধর্ম, রাজধর্ম, আপদধর্ম—ধর্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র সবই মহাভারতের বিপুল অঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছে। রাজা জন্মেজয়ের নিকট ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির বিষয় ইহাতে বাহ্য আছে, তাহা অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে বাহ্য নাই, তাহা কুড়াপি নাই :

ধর্মে চার্খে কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ ।

যদিহাস্তি তদন্তত্বে যদেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥ [আদি, ৫৭, ২৪]

মহাভারত সম্পর্কে এ উক্তির সত্যতা অবিসংবাদিত।

২. মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় ও পর্ব বিভাগ

মহাভারত মূলতঃ কুরু-পাণ্ডবের বিরোধের ইতিহাস। কুরুকুলে দুর্য়োধন ছিলেন একটা মন্ত্র্যবর মহাবল্লভ; কর্ণ তাহার স্বহৃদ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুত্র ও কল এবং অমনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। আর পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মবর

বহাঙ্কর; তাহার স্বত্ব অর্জুন, শাখা ভীমসেন, যাত্নীহৃত নকুল ও সহস্রেন পুশকল এবং কুক ও ব্রাহ্মণবর্গ তাহার মূল।' মহাভারত এই মহাময় মহাবুক ও ধর্মময় মহাঙ্করের সংঘর্ষে মহাময় মহাবুকের পতন ও ধর্মময় মহাঙ্করের বিজয় ও উত্থানের কাহিনী। এই মূলকাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে আরও অনেক কথা ও কাহিনী। বহু নহ-নদী দ্বারা বেধন মহাসমুদ্র বধিত ও ক্ষীত হয়, তেমনি 'বিবিধাঃ কথাঃ' দ্বারা বিচিত্রার্থ মহাভারত ক্ষীত ও বধিত হইয়াছে। এই প্রবধিত ভারতকথা অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেছে,—দম্ব, দর্প, অতিমানিতার শোচনীয় পরিণাম দেখ, পরিণাম দেখ ধর্মের—মনে রাখিও, 'যতো ধর্মঃ ততো জয়ঃ।'।

মহাভারতে মোট পর্বসংখ্যা আঠার। আঠারটি পর্বের নাম,—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, কর্ণ, শল্য, দ্রোণিক (ঐষীক), ক্রী, শান্তি, অশ্বশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্ণারোহণ পর্ব। তন্মধ্যে আদিপর্বে আছে ভগ্নেজয়ের সর্পসত্র প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের কাহিনী, আত্মীকোপাখ্যান, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত, দুয়ন্ত-শকুন্তলার কাহিনী, যযাতি উপাখ্যান, পরাশর-মৎসঙ্গন্ধা সংবাদ, ভীষ্মকাহিনী, অশ্ব-অধিকা-অশ্বালিকা বৃত্তান্ত, ধৃতরাষ্ট্র-পাত্ত-বিভূরের জন্ম, দুর্বোধনাদি শতপুত্রের জন্ম, পাণ্ডুর প্রত্যাগ্যা, বনে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম, পাণ্ডুর মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরাদির হস্তীনাপুরে আগমন, কুরু-পাণ্ডবের বাল্য-ক্রীড়া ও অশ্বশিক্ষা, পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্বোধনের ঘেব, বারণাবত-প্ররাগ, জতুগৃহদাহ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও পঞ্চপতিবরণ, পাণ্ডবদের খাণ্ডবগ্রহে রাজ্যলাভ, অর্জুনের বনবাস ও খাণ্ডবদাহ বৃত্তান্ত। সভাপর্বে ময়দানব কর্তৃক সভানির্মাণ, অরাসন্ধ বধ, পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়, যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় বজ্র, শিশুপাল বধ, ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য দর্শনে দুর্বোধনের পরিতাপ ও শকুনির পরামর্শে অন্ধকীড়ার উদ্যোগ, অন্ধকীড়া, যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন ও বস্ত্রহরণ, ভীমের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রৌপদীর বরলাভ, পুনরায় দ্যুতক্রীড়া ও দ্যুতপণে পরাজিত যুধিষ্ঠিরের দ্বাদশ বৎসরের জন্ত সামান্য বনবাস ও এক বৎসরের জন্ত অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়া পঞ্চদ্রাতা ও দ্রৌপদীসহ বনগমন। বনপর্বে কিরীট বধ, বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর

১। দুর্বোধনো মহামরো মহাঙ্করঃ স্বত্বঃ কর্ণঃ শকুনিস্ত্র শাখা।

দ্রুশাসনঃ পুশকলে সম্বন্ধে মূলঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহননীষী ॥

যুধিষ্ঠিরো ধর্মমরো মহাঙ্করঃ স্বত্বোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত্র শাখা।

যাত্নীহৃতো পুশকলে সম্বন্ধে মূলঃ কুক ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ [আদি. ১.৭১-৭২]

অহযোগ, অহমাজের নির্বিক্ত অর্জুনের বনগমন, কীরাতার্জুন সংবাদ, অর্জুনের বর্গগমন ও উর্বশী-প্রত্যাখ্যান, অতিকরণ নলোপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা, সোমক-কাম্বিক সংবাদ, অষ্টানক উপাখ্যান, নিবাতকবচ বধ, মার্কণ্ডেয়-রাওব সম্মেলন, দুর্যোধনের খোঁষাযাত্রা, ইন্দ্রদ্রাঘের উপাখ্যান, সাবিদ্রী উপাখ্যান, রামায়ণ কথা, শিব-উপাখ্যান, ধর্মব্যাদ্যগ্রকরণ ও বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ। মহাভারতের বনপর্ব ভারতীয় কথা-সাহিত্যের মহামূল্য ভাণ্ডার। বিরাতপর্বে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস। ইহাতে আছে ছদ্মবেশে পাণ্ডবগণের বিরাতনগরে প্রবেশ, কীচকবধ, গোগ্রহ ও উত্তরা-অভিমুখ্যের বিবাহ। উল্লোমোগপর্ব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্ব। ইহার বিষয়, পাণ্ডবগণের সন্ধির প্রচেষ্টা, কৃকের দৌত্য, বিদুরের উপদেশ, কৃকের কুরুসভায় প্রবেশ, কৃষ্ণী কর্তৃক বিদূলা উপাখ্যান বর্ণনা, কর্ণকৃষ্ণী-সংবাদ, যুদ্ধের উত্তোষ, কোরব পক্ষে ভীষ্মকে সৈন্যপত্যে বরণ ও অশ্ব-শিখণ্ডী-কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণপর্বে সজয়-ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ, উত্তরপক্ষের সৈন্যসমাবেশ, যুধিষ্ঠিরের দর্শাস্তব, শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যুদ্ধারম্ভ, ভীষ্মের পরাজয় ও শরণশ্রা। দ্রোণপর্বে প্রধান বর্ণনায় বিষয় চক্রব্যূহে পরিবেষ্টিত সপ্তরথী কর্তৃক অভিমুখ্যবধ, অর্জুনের জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথ বধ, ঘটোৎকচবধ ও রোহাঙ্কর দ্রোণবধ বৃত্তান্ত। কর্ণপর্বে কর্ণ ও শল্য সংবাদ, ত্রিপুরাসুর বধ বৃত্তান্ত, কর্ণের প্রতি শল্যের তীব্র বাক্য, প্রচণ্ড যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক হুঃশাসনের রক্তশান ও কৃকার বৌসংহার এবং বৈরথসময়ে অর্জুন কর্তৃক মেদিনীগ্রস্ত রথে হতভেজ কর্ণ বধ। শল্যপর্বে শল্য ও শকুনি বধ, দুর্যোধনের বৈশ্যায়ন হৃদে জলন্ত করিয়া অবস্থান, ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ। সৌপ্তিক পর্বে অশ্বখামার সৈন্যপত্য গ্রহণ, দ্রোণদ্বীর পক্ষপূত্র বধ, অশ্বখামার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও দুর্যোধনের মৃত্যু। ঐষীক পর্ব সৌপ্তিক পর্বেরই একটি উপপর্ব। শ্রীপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের লোহভীমচূর্ণ ও বিলাপ, গান্ধারীর বিলাপ ও কৃকের প্রতি অভিলাপ, কোরব ও পাণ্ডবদ্বীগণের করুণ শোক, যুদ্ধমৃতদিগের উদ্দেশ্যে উর্পণ, কৃষ্ণী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণের পরিচয় প্রদান। এই পর্বটি অতি করুণ। ইহাতে সজ্ঞনের মনও অধীর হয় ও নয়নে অশ্রু আনয়ন করে—‘সজ্ঞনমনোবৈরব্যাক্র-প্রবর্তকঃ’। তাহার পর বহুবিখ্যাত শান্তিপর্ব, ইহাতে শরণশ্রাগত ভীম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজধর্ম, দেশ-কালোচিত আপদ্রম্য ও অতি বিদ্বত মোক্ষধর্মের বর্ণনা। অজকুশাজনপর্বও ‘ধর্মালীঃ পরিকল্পিতঃ’—ইহাতে ধর্মের আচার, অর্থের ব্যবহার, দাসের পাত্র ও সত্যের স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাও বহুবিধা কথার ভাণ্ডার। এই পর্বের শেষাংশে ভীষ্মের বর্গারোহণ। ভীম শেষ পর্বন্ত এই সত্যোক্তি করিয়া নিরাহেন, ‘বভুঃ কৃক ভভো ধর্মো বভো ধর্মভতো জয়ঃ।’ অশ্বমেধপর্বে

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, বকস্‌ উপাখ্যান, অহুসীতা কথন, অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ, অর্জুনের ত্রিগর্ভ-প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-মণিপুর-মগধাদি বিজয়, অর্জুত নকুল-কাহিনী, যজ্ঞসমাপ্তি ও কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা। আশ্বমজবালিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডারী-কৃষ্ণীর বানপ্রস্থ অবলম্বন ও দাবানলদগ্ধ হইয়া যত্ন। অতি ভয়ঙ্কর যৌমজ্ঞপর্বে যদু-বংশ ধ্বংস কর্তন। মহাপ্রাস্ত্যানিকপর্বে নির্বেদপ্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান ও একে একে দ্রোণাশ্বী, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীষ্মের পতন, যুধিষ্ঠির-কুরু সংবাদ ও যুধিষ্ঠিরের স্বর্গলোকে যাত্রা। সবশেষে স্বর্গারোহণপর্বে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত সহ মহাভারত পাঠের কলশ্রুতি বর্ণনা দ্বারা অষ্টাদশ পর্ববৃত্ত মহাভারতের পরিসমাপ্তি।

২. মহাভারতের কাহিনী-সম্পদ

মহাভারত কথাসাহিত্যের বিশাল রত্নকোষ। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মহাভারতের বিপুল রত্নকোষে যুগ-যুগান্তের বহু সৌত উপাখ্যান (Bard Poetry), ব্রাহ্মণ্য উপাখ্যান (Brahmanical myths) এবং নীতিমূলক শ্রামণ্য রচনা (Ascetic Poetry) স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মতে সৌত উপাখ্যান গুলিই মহাভারতের আদি স্তর, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ কাহিনীগুলি পরবর্তীকালের যোজন। ঐকি এইভাবে মহাভারতের কাহিনী বিভাগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ প্রায় প্রত্যেক কাহিনীতেই এই তিন প্রকার রচনার মিশ্রণ আছে। তবে কোন কোন কাহিনীতে প্রেম ও বীরত্বের প্রাধান্য, কোনটিতে ক্রিয়াকর্মের প্রাধান্য, কোনটিতে বা নীতিকথার প্রাধান্য। এইদিক হইতে কাহিনীগুলিকে (i) প্রেম ও বীর্যের উপাখ্যান, (ii) ধর্মমূলক উপাখ্যান ও (iii) নীতিমূলক উপাখ্যান—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

॥ প্রেম ও বীর্যের কাহিনী ॥

প্রাচীনকালের প্রেম ও বীর্যের মূল্য ছিল অপরিমীয়। এগুলি মানুষের ভাবস্থির বৃত্তিগুলির অন্ততম, আদিভ্রমও বটে। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রেম ও বীর্যের আধারেই রচিত। মহাভারতের রুক ও প্রমথরার কথা, দুঃশ্বত ও শকুন্তলার উপাখ্যান, কচ ও দেবযানীর কাহিনী, যযাতি-শশিষ্ঠা সংবাদ, তপতী-সংবরণ কথা, নলোপাখ্যান, দামোদ্র-পাখ্যান ও বিহুলার কথা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

রুক ছিলেন প্রথিতযশা প্রমথির পুত্র। বিবাহবয়স-যেনকার কস্তা হৃদয়ী প্রমথরাকে দেখিয়া তিনি বোহিত হন এবং পিতার অহুমতি লইয়া প্রমথরাকে বিবাহ করেন।

কিন্তু প্রথমরা অচিরেই সর্পদংশনে মৃত্যুদণ্ডে পতিত হন। ক্রম তখন প্রায় উন্মাদ প্রিয়াবিরহে হতচেতন। নিজ পরামায়ুর অর্দ্ধাংশ দানে স্বীকৃত হইয়া তিনি প্রথমরাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ক্রমর এ প্রেম তুলনা রহিত [আদি, ৮-২]।

আর একটি প্রেমের কাহিনী দ্বয়ন্ত ও শকুন্তলার কাহিনী। বিশ্বামিত্রের ঔরসে অঙ্গরী যেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয় এবং তিনি আশৈশব কথমুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা হন। একদিন রাজা দ্বয়ন্ত বনে মৃগয়া করিতে আসিয়া প্রকৃতির লীলাভূমি কথাশ্রমে উপনীত হন। কথমুনির অন্তঃস্বস্থিতে শকুন্তলাই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং রাজার প্রেমের উত্তরে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। রূপমুগ্ধ দ্বয়ন্ত গাঢ়রমতে বিবাহের প্রস্তাব করিলে শকুন্তলা এই বলিয়া বিবাহে সম্মত হন যে, তাঁহার গর্ভাশ্রিত পুত্রকে রাজ্য দান করিতে হইবে। রাজা প্রতিশ্রুতি দান করিয়া শকুন্তলার সহিত মিলিত হন এবং শকুন্তলাকে শীঘ্রই রাজধানীতে লইয়া যাইবেন বলিয়া রাজ্যে ফিরিয়া যান। কথমুনি আশ্রমে ফিরিয়া দ্বিব্যচক্ষুদ্বারা সমস্ত বৃদ্ধান্ত অবগত হইয়া এ বিবাহ অসম্মোদন করেন। তিন বৎসর পরে শকুন্তলার ‘সর্বদমন’ নামে এক পুত্র হয়। পুত্র হইলে কথমুনি সপুত্র শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করেন। শকুন্তলা স্বামী সকাশে উপনীত হইয়া নিজ পরিচয় দিয়া সর্বদমনকে বোবরাজ্যে অভিবিস্ত করিবার প্রার্থনা জানান। রাজা সব জানিয়াও শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন :

সৌহৃদ্য শ্রীষ্য তদ্বাক্যং তস্তা রাজা স্মরমপি ।

অত্রবীর স্মরাবীতি কস্ত স্বঃ ছুট তাপসি ॥ [আদি. ৮৮. ১২]

শকুন্তলা লঙ্কার মরিয়া গেলেন, ক্রোধে তাঁহার নয়ন তাম্রবর্ণ ধারণ করিল, রাজাকে কটাক্ষে দৃষ্টি করিয়া তিনি বক্রদৃষ্টিতে রাজার পানে তাকাইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, —হে মহারাজ, জানিয়াও আপনি কেন নিঃশব্দচিন্তে প্রাকৃত জনের ভ্রায় ‘আমি জানি না’,—এই মিথ্যা বলিতেছেন। ব্যর্থ হইল শকুন্তলার অভিযোগ, ব্যর্থ হইল হিতোপদেশ ও অহ্নয়—রাজা তচ্ছিলাভরে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

সহসা সর্বলক্ষ্যে মৈববাণী হইল, হে রাজন্ এ পুত্র তোমারই, ইহাকে গ্রহণ কর—‘তন্মাতরম্ব দ্বয়ন্ত পুত্রঃ শাকুন্তলঃ নৃপ।’ আকাশবাণী দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার রাজা দ্বয়ন্ত ‘কষ্টে প্রমুদিতশচিপি প্রতিজ্ঞগ্রাহ তং সূতম্’ এবং ‘তাক্ষৈব ভাৰ্গ্যঃ দ্বয়ন্তঃ পুত্রমাসাং ধর্মতঃ।’ মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যানে দুর্বাসার শাপের কথা নাই। রাজার চরিত্রও তেমন মহত্বের দাবি করিতে পারে না, কারণ, রাজা জানিয়া শুনিয়াও শকুন্তলাকে অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

কচ ও দেবধানীর উপাখ্যানটিও হৃদয় প্রেমের কাহিনী : ইহা বহাভারতের বহাতি-উপাখ্যানের অন্তর্গত। বৃহস্পতিপুত্র কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা শিক্ষার জন্য শুক্রাচার্যের নিকট আসেন। বিদ্যালভের জন্য তিনি গুরু গুরু ও গুরুকর্তা দেবধানীকে পরিচর্যা করিতে থাকেন। দেবধানীও সীত-নৃত্যাদি দ্বারা কচের পরিচর্যা করিতেন। এই চর্যা প্রেমে পরিণত হয়। কচ অনেকবার দানবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন, প্রতিবারই দেবধানীর নির্বন্ধাতিশয্যে শুক্রাচার্য তাঁহাকে উদ্ধার করেন। কচের প্রতি দেবধানীর এই প্রেম ছিল গৌণ। একবার অহুরেরা কচকে দগ্ধ করিয়া তাহার ভয়চূর্ণ হৃদয় সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্যকে পান করিতে দেয়। শুক্রাচার্য তাহা পান করেন। এদিকে কচকে না দেখিয়া দেবধানী আকুল ভাবে রোদন করিতে থাকেন। পিতাকে বলেন, ‘প্রিয়ো হি মে ভাত কচোহভিরূপঃ।’ শুক্রাচার্য তখন কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করেন। কচ গুরুর উদর ভেদ করিয়া নির্গত হন এবং সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রভাবে গুরুকে সঞ্জীবিত করেন; কচ অতীষ্ট লাভ করিয়া স্বর্গগমনে উচ্ছত হইলে দেবধানী কচের নিকট আপন হৃদয় উন্মোচন করেন এবং বলেন, ‘গৃহাণ পাণিঃ বিধিবগ্নম নরপুরুষতম্’ : ‘সৌহার্দে চাহুরাগে চ বৈশ্ব মে ভক্তিযুগ্তমাম্।’

কিন্তু কচ দেবধানীকে বিবাহ করিতে পারেন না। দেবধানী গুরুকর্তা, ‘গুরোঃ কৃতরা’ কচের ভগিনীস্বানীয়া। তাই কচ বলিলেন, ‘ভগিনী ধর্মতো মে স্বা যৈবঃ বোচঃ স্রমধ্যমে’ : ‘আপুচ্ছে স্বাঃ গমিষ্যামি শিবমাংশং মে পথি’—তুমি আমার ভগিনী, এরূপ কথা বলিও না; অহুমতি দাও, গমন কর; আশীর্বাদ কর, বেন আমার পথ শিবময় হয়। দেবধানী তখন অভিশাপ দিলেন :

যদি মাং ধর্মকামার্থে প্রত্যাশাস্তি যচ্চিতঃ।

ততঃ কচ ন তে বিদ্যা সিদ্ধিমেষা গমিষ্যতি ॥ [আদি, ৬৫. ১৬]

—আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, হে কচ, তোমার বিদ্যা সকল হইবে না।

কচও প্রত্যভিশাপ দিলেন, তুমি কামের বশবর্তী হইয়া আমাকে অভিশাপ দিয়াছ, আমিও বলিতেছি, কোন ঋষি-পুত্র তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন না।

বহাতি-শমিষ্ঠার কাহিনীও মনোহর। শমিষ্ঠা ছিলেন দানব বৃষপর্বীর হৃদিভা। তিনি দুর্ভয় বশতঃ দেবধানীর দাসী হন। দেবধানীর সহিত রাজা বহাতির বিবাহ হইলে শমিষ্ঠাও পরিচারিকারূপে বহাতিভবনে গমন করেন। শুক্রাচার্য বহাতিকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, বৃষপর্বহৃদিভা শমিষ্ঠাকে পুত্রনীরায় মত পালন করিও, উহাকে শব্যায় আহ্বান করিও না। কিন্তু কার্যতঃ নিয়মভঙ্গ হইল, শমিষ্ঠার প্রেমে বোহিত হইয়া বহাতি তাহার সহিত মিলিত হইলেন। এই নিয়মভঙ্গের ফল শুক্রাচার্যের অভিশাপ

ও বধাতির জরা। পুঙ্খের বৌবনের সহিত বধাতির জরাবিনিবয়ের কাহিনীও আশ্চর্য। পিতার নির্দেশ পূত্র পুরু বধাতির জরা গ্রহণ করেন। বধাতি পুঙ্খের বৌবন লইয়া পুনরায় ভোগে আসক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্বন্ত তিনি বৃদ্ধিতে পারিলেন,

ন জাতু কাষ: কামানামুপভোগেন শায়াতি ।

হবিষা কুরুবৎসো ব ভূয় এবাতিবর্দ্ধতে ॥ [আদি ৭৫]

—অগ্নিতে দ্রুতপ্রদান করিলে, অগ্নি যেমন শান্ত না হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তেমনি কাষ-সন্তোষ দ্বারা কাষ নিবৃত্ত না হইয়া উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তপতী-সংবরণ কাহিনীও একটি অপূর্ব প্রেমের কাহিনী। কুরুবংশের বিখ্যাত বলবান ও রূপবান রাজা ছিলেন সংবরণ। বধাবিধানে প্রত্যাহ তিনি উদয়-সূর্যের উপাসনা করিতেন। একদিন বৃগয়ার্থ বনে গমন করিলে সহসা হিরণ্যচূড়িত এক কন্যা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়। অপরূপ রূপ, যেন সূর্যমণ্ডলপ্রভা আদিত্যজ্যোতি। রাজা সংবরণ মগনবাণে পীড়িত হইলেন, যুদ্ধের মত তিনি প্রহ্ন করিলেন, তুমি কে, কাটার কন্ডা? রাজার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে সেই আয়তেশ্বরা মেঘমধো বিদ্যাতের স্তায় অস্তহিতা হইলেন: 'সৌদামিনীং চাভ্রেসু তত্রৈবাস্থরধীয়ত।' উন্মত্ত রাজা সংবরণ তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় কন্ডাটি আবার আসিলেন, মধুর বাক্যে রাজাকে আশস্ত করিলেন। রূপোন্মত্ত রাজা কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'ন হ্যহং ভদ্রতে ভীকৃ শক্যামি খলু জীবিতুম্।' কন্ডা বলিলেন. হে রাজন্, আমি পিতৃমতী কন্ডা, আমার নিজের আত্মদানে স্বাতন্ত্র্য নাই। আমিও আপনাকে ভালবাসিয়াছি, আপনি পিতার নিকট বাঞ্ছা করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন:

অহং হি তপতী নাম সাবিদ্র্যবরজা স্ততা ।

অন্ত লোকঃপ্রদীপস্ত সবিতু: ক্রত্ৰিয়র্ষভ ॥ [আদি, ১৬৫, ২৫]

—হে ক্রত্ৰিয়বর, আমার নাম তপতী, আমি লোকপ্রদীপ সবিতার চুহিতা, সাবিদ্রীর অমুজা ভগিনী।

তপতী অস্তহিতা হইলেন। সংবরণ স্বপ্ন হইয়া উর্দ্ধমুখে কুতাঞ্জলি পুটে কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করিলেন। বশিষ্ঠদেব সংবরণের হইয়া সূর্যের নিকট তপতীকে প্রার্থনা করিলেন। রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংবরণ, নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা তপতী—আর প্রার্থনা করিতেছেন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ। সূর্যদেব সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে অনেক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিরহ-মিলনের অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান বল-ববরজী কাহিনী। ভাগ্যবঞ্চিত বৃদ্ধির দুঃখিত হইয়া

একদিন বৃহদ্রথকে প্রেম করিয়াছিলেন, আবার ভায় এমন দুর্ভাগ্য লগতে কাহারও আছে কি ? বৃহদ্রথ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘সত্তোহুঃখিততরো রাজানীং পৃথিবীপতে’—হে রাজন, আপনার অপেক্ষা দুঃখিততর এক রাজা ছিলেন,—তিনি নিষধ দেশের বীরলেন রাজার পুত্র ধর্মজ ও অর্ধজ পুণ্যলোক নল। নলের মত সৌভাগ্য কার ? তিনি রূপবান্, গুণবান্—দেবেশ্বরের মত তাহার সার্থভৌমত্ব, স্বর্ষের মত ভেজ। বিদ্বদ্দেশের রাজা ভীমের কন্যা দময়ন্তীও ছিলেন অম্লরূপ সম্পন্ন। :

দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা বপুৰ্বা শ্রিয়া ।

সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ স্তমধামা ॥ [বন. ৪৫. ১০]

হংস-দোত্যে নল এই দময়ন্তীর প্রেম লাভ করেন। স্বয়ম্বর সভা আহূত হইলে নল নিষধ দেশে বাইতেছিলেন, সহসা পথে ইন্দ্রাদি দ্বিকপালগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের একজনকে বররূপে বরণ করিবার জন্ত নলকেই হৃতরূপে দময়ন্তী সর্কাশে প্রেরণ করেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। প্রেমিক প্রেমিকার নিকট বাইতেছেন অস্ত্রের প্রেমের দোতা লইয়া। পরিচয় পাইয়া দময়ন্তী বলিলেন,

দেবেভ্যোহং নমস্কৃত্য সর্কোভ্যাঃ পৃথিবীপতে ।

বুণে স্বামেব ভর্তারঃ সত্যমেত্তদব্রবীমি তে ॥ বন. ৪৬. ৭০]

—হে পৃথিবীপতি, দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া এই সত্য করিতেছি, আমি আপনাকেই পতিরূপে বরণ করিলাম ।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর অপর দৃশ্য। দেবতাগণ নলের সদৃশ মূর্তি ধারণ করিয়া সভায় বসিয়াছেন। বিদ্বত-নন্দিনী সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নলের তুল্যাকৃতি পঞ্চ পুরুষ সভা আলো করিয়া রহিয়াছেন। কে নল, নির্ণয় করা দুসাহ্য। দময়ন্তী বুঝিলেন, এ দৈবী মুরা। তখন কৃতজ্ঞলিপুটে কম্পিত স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন,

বচসা মনসা চৈব যথা নাভিচরাম্যহম্ ।

তেন সত্যেন বিব্ধান্তমেব প্রদিশন্ত মে ॥ [বন. ১৮]

—বাক্য ও মনে যদি আমি ব্যভিচারী না হইয়া থাকি, তবে সেই সত্যে দেবগণ আমার নলকে বিদিত করিয়া দিউন ।

দময়ন্তী-উপাখ্যানের প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি চিত্র রোমাঞ্চকর ও কোতূহলোদ্দীপক ; কাব্যসৌন্দর্যও অমূল্য। নল ভ্রাতা পুত্রদের সহিত দ্যুতক্রীড়ায় একে একে সর্বস্ব-ভারা হইয়া মনস্বিনী দময়ন্তী সহ এক বয়ে বনচারী হইলেন। দুঃখের উপর দুঃখ বাড়িতে লাগিল, স্বর্ণপক্ষী ধরিতে গিয়া নল বন্থখানিও হারাইলেন। শেষে মতিহীন হইয়া বিজনবনে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিলেন। মহাভারত অরণ্যে দময়ন্তীর সে

অসহায় অবস্থা ও আকুল ক্রন্দন অতি মর্মস্পর্শী। দয়য়ন্ত্রী কোনপ্রকারে চেদিয়াক
স্বাভাব্য অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইলেন। নলও বনমধ্যে নাগদংশনে বিরূপ হইয়া কতূর্ণণ
রাজার সারথি হইলেন। অবশেষে চতুর্থের দিন শেষ হইল। দীর্ঘ বিয়হাস্তে, নল
ও দয়য়ন্ত্রী মিলিত হইলেন। মিলনের সে দৃশ্য করুণ-মধুর।

উদ্যোগপবের অন্তর্গত বিহুলা-সঙ্কর সংবাদটি একটি বিশুদ্ধ উৎসাহোদ্বীপক কাহিনী।
সন্তানের বৈরুধ্য দেখিলে ভারতের বীরাজনা নারী কি অসীম ভেজোগর্ভ বাক্য-তাহাকে
কর্মে প্রেরণা দিতেন, বিহুলা-উপাখ্যান তাহার অলঙ্ঘ্য দৃষ্টান্ত। বিহুলা ছিলেন ক্ষত্রধর্ম-
নিয়তা বীরাজনা। তাহার পুত্র সঙ্কর সিদ্ধুরাভ কতক বিনিম্বিত হইয়া উত্তমশূন্য
অবস্থায় শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিহুলা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অগ্নিগর্ভ
বাক্য উচ্চারণ করিলেন

অনন্দন ময়াজাত দ্বিতাতঃ হর্ষবর্দ্ধন।

ন ময়া স্বং ন পিতা চ জাতঃ ক্রাত্যাগতোচসি ॥ [উদ্যোগ ১২৪ঃ]

—রে আমার অনন্দন, শত্রুর হর্ষবর্দ্ধন, তুমি কোথা হইতে জন্মিয়াছ?

পিতাও তোমাকে জন্ম দেন নাই। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

বিহুলার বাক্য করুণ, কিন্তু অগ্নিফুলিঙ্গ। ইহা জালা স্ফুটি করে, মর্মে কঠিন
আঘাত হানে, বজ্রের মত গর্জন করিয়া উঠে,

মা ধুমায় জলাত্যন্তমাক্রম্য জহি শত্রুবান্।

জল মূর্ছণ্যমিত্রাণং মুহূর্তমপি বা কণম্ ॥ [উদ্যোগ. ১২৪. ৩১]

—ধূমিত হইয়া থাকিও না, জলিয়া উঠ, শত্রুকে হনন কর—কণকালের
জন্তও শত্রুর মস্তকে প্রোচ্ছলিত হও।

বিহুলার এই বাক্যে হতোত্তম সঙ্কর কশা-ভাঙিত অশ্বের জায় উত্তেজিত হইয়া
শত্রুকে নিজিত করিয়াছিলেন।

॥ ধর্মমূলক উপাখ্যান ॥

ধর্মমূলক কাহিনীগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত। এগুলি বাগবজ্ঞ, ব্রতাসুচীন, দানখ্যান
ভীর্ষমহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রশংসার মুখর। অধিকাংশই পুরাণের অলৌকিক কাহিনী।
জগৎজয়ের সর্পলজ্ঞ, দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন, যযাতিপতন, অগস্ত্যাখ্যান, পরশুরামের
কাহিনী, মাহাত্ম্য কথা, অষ্টাবক্র ও বন্দীর উপাখ্যান, ভীম-হনুমান সংবাদ, আজগর
প্রকরণ, মহু-সংকলংবাদ, পতিব্রতোপাখ্যান, ধর্মব্যাধ সংবাদ, সাবিত্রী-সত্যবান
কাহিনী, বক-মুখিষ্ঠিরসংবাদ, ত্রীমন্তগবদগীতা, বরুণ কাহিনী, অহুসীতা প্রভৃতি এই

শ্রেণীর রচনা। মহাভারতের বনপর্ব, শান্তিপর্ব, অশ্বশাসনপর্ব নানাদিক হইতে এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা করে। ধর্ম ও যুদ্ধ বিষয়ক বহু আলোচনা এগুলিতে স্থানলাভ করিয়াছে। তীর্থ-মহিমা বিষয়ক সকল রচনাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই কাহিনীগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী ‘বক-যুধিষ্ঠির সংবাদ’ [বন, ২৮৬—২৮৮]। বন মধ্যে পাণ্ডবগণ অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছেন, এমন সময় এক যুগ এক ব্রাহ্মণের অরণি হরণ করিয়া বনমধ্যে আত্মগোপন করিল। ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের শরণার্থী হইলেন। যুগ অবেষণ করিতে করিতে তৃকর্ত পাণ্ডব। সহসা সম্মুখে এক জলাশয় দেখা গেল। একে একে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম জল আহরণে গেলেন, কিন্তু কিরিয়া আসিলেন না : তখন যুধিষ্ঠির চলিলেন জলের উদ্দেশে। গিয়া দেখিলেন, চারি ভ্রাতা মৃত—সম্মুখে এক বিশালদেহ বক্রঙ্গী বক্ষ। বক্ষ বলিলেন, জলাশয়ের জল তাঁহারই অধিকারে, তাঁহার প্রেরণ উত্তর না দিয়া যে জল পান করিতে অগ্রসর হইবে—সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। নকুলাদি চারি ভ্রাতা এই ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। যুধিষ্ঠির তখন প্রশ্ন করিলেন, কি আপনার প্রশ্ন। বক্ষের প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন চারিটি।

কা চ বার্তা কিমার্চবঃ কঃ পথঃ কচ্চ মোদতে

মমৈতান্ভূতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িষ্য জলং পিব ॥ [বন ২৮৭. ৮০]

বার্তা কি ? আশ্চর্য কি ? পথ কি ? স্থলী কে ? এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া জল পান কর।

যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিলেন :

অশ্বিন্ মহামোহময়ে কটাহে

স্বর্ধ্যাগ্নিনা রাজিদিনেভবেন।

মাসতুর্দবী পরিষট্টনেন

ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥ [বন ২৮৭. ৮২]

—কাল স্বরূপ অগ্নি, দিন ও রাজিরূপ ইন্দ্রন দ্বারা মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়া জীবগণকে মহামোহরূপ কটাহে পাক করিতেছে—ইহাই বার্তা।

অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছন্তি ধমমন্দিরম্

শেষাঃ স্থিরম্মিচ্ছন্তি কিমার্চবতঃপরম্ ॥ [বন. ২৮৭. ৮৩]

—জীবগণ প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে : তাহা দেখিয়াও অবশিষ্ট লোক মনে করিতেছে তাহারা অমর—ইহা হইতে আর আশ্চর্য কি ?

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ

নানৌ মুনীর্বন্ত মতং ন ভিন্নম্।

ধর্মতত্ত্বঃ নিহিতঃ গুহায়াম্

মহাজনো যেন পতঃ স পশ্যঃ ॥ [বন, ২৮৭, ৮৪]

—বেদ ভিন্ন, স্মৃতিও ভিন্ন ভিন্ন ; যুনিদের মতেরও মিল দেখা যায় না।

ধর্মের তত্ত্ব গুহার নিহিত (হুবোধ্য) : স্মরণ্য মহাজন-নির্দিষ্ট পথই পথ।

দিবসস্তাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ ।

অনুগী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥ [বন. ২৮৭. ৮৫]

—হে জলচর বক, যিনি অঙ্গুলী ও অপ্রবাসী হইয়া স্বীয় গৃহে দিনশেষে শাকরও ভোজন করেন, তিনিই সুখী।

যুধিষ্টির এই উত্তর কতকগুলি অতি কঠিন প্রশ্নের সমাধান। হিন্দু প্রোড়োক্তিতে এই উত্তরগুলি চিরস্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত।

ধর্মবিষয়ক রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ ভীষ্মপর্বোক্ত ‘শ্রীমদ্ভগবদগীতা’। কৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভগবান কৃষ্ণ দ্বারা এই মহামূল্য উপদেশ গীত হইয়াছিল, তাই ইহার নাম গীতা। যুত্তরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সূত সত্তয় এই অংশ যুত্তরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা আঠারটি অধ্যায়ের সমষ্টি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, ইহার অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত, সম্ভবতঃ দ্বাদশ অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি। কেহ কেহ সমগ্র গীতাকেই মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে গীতা তেমন প্রাচীনও নয়। কুট প্রশ্নকে কুট তর্ক দ্বারা নিরসন করার চেষ্টা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রশ্নের প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। গীতা উপনিষৎ। উপনিষদের ভাব ও ভাষায় সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে ; অতএব গীতার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়িত। ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। ভারতীয় জীবনের সহিত বাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, ভীষ্ম মহাসময়ের তুর্ধনিমান মধ্যেই গীতার অমৃতবর্ষী গীতধ্বনি একান্ত স্পষ্টত। ঝটিকানুজ জীবন-সমুদ্রে গীতা অবিকম্পিত সন্ধানী দীপ। গীতার পরিবেশটিও সুপারকল্পিত। গীতার অধ্যায়-সংখ্যা অষ্টাদশ, ইহাও গভীর তাৎপর্ষ্য-বোধক। ইহা অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের সার। স্মরণ্য গীতার অধ্যায়-সংখ্যাও যাহা আছে। তাহা হইতে কম নয়।

কুরুক্ষেত্রের প্রাত্যহস মহাসময়ের পটভূমিকায় দুই দলের অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী [কোরবপক্ষে একাদশ ও পাণ্ডবপক্ষে সপ্ত] মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে। সৈন্তদল যুযুৎসু। কোরবপক্ষে ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদে শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, পাণ্ডবপক্ষের পাঞ্চজন্ত-মেঘদন্ডাদি শব্দের নির্বোধে কোরব জয় লচকিত। সহসা অর্জুনের বৈকুণ্ঠ উপস্থিত হইল। দুই দলের

মধ্যে রথে অবস্থান করিয়া তিনি নিকটতম আত্মীয়-বন্ধনের এই ভরসার বৃৎস্ব হৃতি ধর্শন করিলেন, কুলক্ষয়ের ভীষণ পরিশ্রম শ্রবণ করিয়া শিহরিত হইলেন। তাঁহার মূখ শুক হইল, দেহ কাপিতে লাগিল, গাণ্ডীব বেন হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। নিতান্ত উৎসাহহীন হইয়া তিনি সারথি কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ, হায় আমরা কি মহাপাপ করিতে উচ্চত হইয়াছি, রাজ্যহরণের লোভে আত্মীয়-বন্ধন বিনাশে প্রস্তুত হইয়াছি—আমার পক্ষে জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর কল্যাণকর। এই বলিয়া অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্তে রথের উপর বসিয়া রহিলেন।

ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের এই বৈরব্যা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন :

ক্লেঃস্য শাস্ত্রমমঃ পার্থ নৈতৎ জ্ঞাপপত্ততে ।

কুঃ হৃদয় দৌবলং ত্যাক্তোত্তিষ্ঠ পরম্ভপ ॥ [গীতা, ২. ৩]

—হে অর্জুন, স্ত্রীবতা প্রাপ্ত হইও না, এ কাপুরুষতা তোমার উপযুক্ত নয় ; হে শত্রুতাপন, ক্রুরের এই কুঃ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্তিত হও ।

তাহার পর একে একে আরম্ভ হইল সাংখ্যযোগ [২য় অধ্যায়], কর্মযোগ [৩য় অধ্যায়], জ্ঞানযোগ [৪র্থ অধ্যায়] কথন। এ জগতে আত্মা অবিনশ্বর, কে কাহাকে মারে, কে মৃত হয় ? জীর্ণবসন ত্যাগ করিয়া মানুষ্য যেমন নববস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি দেহী জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে মাত্ৰ :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণ-

ভুতানি সংযাতি নবানি দেহা ॥ [গীতা, ২. ২২]

এইরূপে কৃষ্ণ সাংখ্যের সার ব্যাখ্যা করিলেন, কর্মের প্রশংসা করিলেন, জ্ঞানালোকে অজ্ঞান বিনষ্ট করিতে বলিলেন। দশম অধ্যায়ে আসিয়া কহিলেন বিজুতিযোগের কথা : ভগবানই সব, অনন্ত বিবে ভগবানের অনন্ত বিজুতি। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ ধর্শন। অপূর্ব কবিশূর্ণ এই অংশ। অর্জুনকে দিব্যচক্ৰ প্রদান করিয়া ভগবান তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন : অর্জুন দেখিলেন—

অনেক বক্তৃ নয়নমনেকাভূত ধর্শনম্ ।

অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্তমাদৃশম্ ॥

দিব্য মাণ্যাবরধনং দিব্য গচ্ছাত্মলেপনম্ ।

সর্বাস্তর্চরনং দেবরসং বিশ্বতোমুখম্ ॥

দ্বিবি স্তম্ভ সহস্রত ভবেৎ যুগপদ্বিভিতা ।

বহি ভাঃ সদশী সা শ্রাদ্ভাসক্তত মহাস্থানঃ ॥ গীতা, ১১.১০-১২]

—ঠাহার অনেক বক্তা, অনেক নয়ন, অনেক অদ্ভুত আকৃতি—অনেক ঠাহার দ্বিবি আভরণ, অনেক দ্বিবি আয়ুধ। তিনি দ্বিবি মালো ও বস্ত্রে ভূষিত, দ্বিবি গন্ধে অমূল্য। অতি আশ্চর্য্য এই অনন্ত বিশ্বতোমুখ রূপ। বহি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের আভা উদ্ভিত হয়, তবে সেই দীপ্তির তুল্য হইতে পারে।

গীতা হিন্দুর জীবনবেদ, কর্মের প্রেরণা, ধর্মের মূল, অধ্যাত্ম চিন্তার সার। হিন্দু-জীবনে জানে, কর্মে ও ভক্তিতে যে আপাত বিরোধ আছে, গীতা তাহার সার্বক সমন্বয়। গীতায়তে ‘বাহুদেবঃ সর্বমিতি’ ইহাই জানের চরম, ‘স্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন বধা নিযুক্তোহস্মি তথা কয়োমি’—ইহাই কর্মের শেষ কথা, ‘তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন’—ইহাই ভক্তির সার উপদেশ। গীতার শ্লোকগুলি মধুর অমৃতবর্ষা।

॥ নীতিমূলক কাহিনী ॥

মহাভারতে প্রচুর নীতিকথা—ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও কামনীতি বিষয়ক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পাণ্ডাত্য পণ্ডিতগণের মতে বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদের প্রভাবে ভারতী-কথায় এগুলির সংযোজন ঘটিয়াছে পরবর্তীকালে। এগুলি শ্রামণ্য রচনা (Ascetic poetry), কিন্তু ভারতীয় জীবনে ‘নীতি’ বৌদ্ধদের দান—এ মত গ্রহণীয় নয়। আবহমান কাল হইতে ভারতীয় জীবন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ-প্রবচনের মত এগুলি সাধারণের সম্পত্তি, কোন শ্রেণীবিশেষের নয়; বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ, জৈন বা হিন্দু—সকলেই এক সাধারণ ভাণ্ডারের অধর্মণ।

নীতিকথাগুলির মধ্যে কতকগুলি কথা জীবজন্তু বা জড় প্রকৃতি বিষয়ক—এগুলি রূপক জাতীয় রচনা; আবার কতকগুলি কথা পুরাণাশ্রয়ী বা মানবজীবনাশ্রয়ী। গল্পগুলি অতি প্রাচীন। যে-কোন বক্তা স্বযোগ পাইলেই এই সকল যুগ-প্রাচীন কথার দৃষ্টান্ত দিয়া নিজ বক্তব্য সমর্থন করিতেন। কথাগুলি নীরস বক্তব্যকে সরস করিয়া তুলিত ও বক্তব্যে একটা বিশেষ গুরুত্ব সঞ্চার করিত।

প্রাণীমূলক কাহিনীগুলির ভিতর যুত্তরাষ্ট্রের নিকট কৃষিক-বণিত শৃগাল-ব্যাঘ্র-মৃষিক-বৃক-মকুল-কথা [আদি, ১৪১], শিশুপাল-কথিত যুদ্ধহংস ও ভূলিক নারী পক্ষিনীর কথা [সভা, ৪১ ও ৪৪], শান্তি পর্বের দীর্ঘশ্রী শকুল মন্ত্রের উপাখ্যান, লোমশ নামক চতুর বিড়ালের কাহিনী ও শৃঙ্গ-শৃগাল সংবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত। রাজধর্ম বা আশ্রমধর্ম কখন প্রসঙ্গে এই সকল নীতিকথার অবতারণা করা হইয়াছে। বিচিত্রা

কথার ভাণ্ডার মহাভারতের বনপর্বে, শান্তিপর্বে ও অস্থান পর্বে এইরূপ অসংখ্য নীতিকথার প্রসঙ্গ আছে। পুরাণাশ্রয়ী কাহিনীগুলির মধ্যে বিতর-বর্ণিত বিরোচন-স্বধা সংবাদ [উল্লেখ, ৩৫] একটি বিশ্যাত কাহিনী। স্বর্গ ও কুমি প্রভৃতির লোভে বা পুত্রের স্বার্থেও মিথ্যাচারণ করা অসুচিত, এই প্রসঙ্গে বিতর ঋতরাষ্ট্রকে এই কাহিনী বর্ণনা করেন। কোশলী নারী এক কস্তার স্বয়ংস্ব উপলক্ষ্যে দৈত্য বিরোচন ও ব্রাহ্মণ স্বয়ংস্ব মধ্যে বিতর উপস্থিত হইল—দৈত্য বড়, না ব্রাহ্মণ বড়। স্বীয়স্বয়ং জন্ত উভয়ে বিরোচন-পিতা প্রহ্লাদের কাছে গেলে, প্রহ্লাদ নিরপেক্ষভাবে পুত্রের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া সত্য কথা বলিলেন, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কুন্তী-কথিত বিতলা উপাখ্যানও [উল্লেখ, ১২৪] এই পথ্যায়ের। স্বকর্মদোষে মাছুষ ফল ভোগ করিয়া থাকে—এই প্রসঙ্গে শান্তিপর্বে একটি আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। গৌতমী ব্রাহ্মণীর অশ্রের যন্ত্রিণী স্তায় এক পুত্র ছিল। সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হয়। অজ্ঞানক নামে এক ব্যাধ সেই সর্পকে বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট আসে। তখন বাসকের মৃত্যুর জন্ত কে দায়ী—ইহা লইয়া বিতর উপস্থিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, বাসকই তাহার মৃত্যুর জন্ত দায়ী। শান্তিপর্বে মৃত্যুদেবীর কাহিনীও সুন্দর : ব্রাহ্মণ নির্দেশে মৃত্যুদেবী জীবের প্রাণহরণের নিষ্ঠুর কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন : জীবের হৃদয়ে এই মৃত্যুদেবার অশ্রুই ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। এই কাহিনীতে মৃত্যুদেবীর করুণাধন রূপটি বড় সুন্দর। স্বীপবোক্ত অরণ্য-পথিকের কাহিনীও অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। কটকময় অরণ্যে এক শ্রান্ত পথিক চলিয়াছে আশ্রয়ের আশায়। এমন সময় এক হস্তী ও এক রাক্ষসী তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্ভূত হইল। পথিক প্রাণভয়ে ছুটিতে গিয়া লতাজালে বদ্ধ হইয়া এক কূপমধ্যে পড়িয়া গেল : লতাজালে পা বদ্ধ হওয়ায় সে হেঁটমুণ্ডে কুলিতে লাগিল। কূপের নীচে ছিল এক মহাভয়ঙ্কর সর্প, সে ফণা তুলিয়া পথিককে দংশন করিতে উদ্ভূত হইল। এদিকে একদল সোমভি পথিককে দংশনে অস্থির করিয়া তুলিল, একটি মুষিক আসিয়া লতাবন্ধন ছিন্ন করিতে লাগিল। মহাত্ম্যে আতঙ্কগ্রস্ত পথিক, চতুর্দিকে মৃত্যুর ফাঁদ। কিন্তু সেই অবস্থাতেও উপরের মনুচক্র হইতে পতিত ফোঁটা ফোঁটা মধুর আশাদে সে তুলিয়া রহিল। ইহা সংসারকূপে নিপতিত মানবের একটি রূপক।

বিখ্যাত ভ্রেন-কপোত ও শিবী রাজার কাহিনীও নীতিকথার অন্তর্ভুক্ত। ইহা পরশাসনরকার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাহা ছাড়া কাম-কোষাদি রিপূর তাড়না বানধর্ম, রাজধর্ম, আপধর্ম ও গৃহধর্ম কখন প্রসঙ্গে বহু নীতিকথা বিবৃত হইয়াছে। স্বস্বাভিমান বনজন্মের বিরোধে, মানব-প্রভৃতির গুণার্থ নির্ণয়ে, রহস্যের হোয়ার,

জীবনের স্পর্শ ও রূপকাংগুরণের মহিমায় অনেকগুলি কথা কাব্যের লক্ষ্যাক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে শাস্তিগোষ্ঠী সন্নিহিত সাগর সংবাদটি উল্লেখযোগ্য [শাস্তি ১১০]। একদিন সন্নিহিত সাগর নদীকে প্রশ্ন করিলেন, তোমরা স্রোতে বৃক্ষগুলিকে উৎপাটন করিয়া ভালাইয়া লইয়া যাও, কিন্তু বেতলতার কোন ক্ষতি কর না কেন? গদ্যমানবী উত্তর করিলেন, বৃক্ষগুলি পরকে আচ্ছন্ন করে না, নত হয় না বলিরাই নদী কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু বেতল জলের বেগ আসিতে দেখিরাই নত হয়, বেগের কাল বুঝে ও আত্মরক্ষার উপায় জানে—এই জন্তই সে বিনষ্ট হয় না। ভীষ্ম এই দৃষ্টান্ত দিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন।

এবম্বেব বদা বিধানান্ততে হতিবলঃ রিপুন্ম্।

সংগ্রয়েষৈতসীঃ হতিমেতৎ প্রজ্ঞান লক্ষণম্ ॥ [শাস্তি. ১১০. ১৪]

—বুদ্ধিমান মানুষ বধন শত্রুকে নিজের অপেক্ষা অধিক বলশালী মনে করিবেন, তখন এইরূপ বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ইহা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের লক্ষণ।

ভারতীয় এই সকল নীতিকথা কতকাল ধরিয়া মানুষের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বলা দুষ্কর। এই কথাগুলিরই সঙ্কলন দেখা যায় পরবর্তী কথাসাহিত্যে—জাতকে, পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে।

৪. মহাভারতীয় চরিত্র

মহাভারত মহৎ চরিত্রের মহাসমুদ্র। সমুদ্রের যেমন সংখ্যাহীন উষ্মি, কোনটি উন্নত, কোনটি অবনত, কোনটি কেনোচ্ছ্বাসিত—তেমন দম্ভ, দর্প, অতিমানিতা ও অতিচারী শক্তির ফেনোচ্ছ্বাসে এখানে কাহারও প্রমত্ত হস্তার, মানবতা, ক্ষমা, দয়া, সত্যের অপার মহিমায় কাহারও স্নগড়ীর সমুদ্রতি।

সকল চরিত্রের পুরোভাগে আছেন পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ। তিনি তৎকালের শ্রেষ্ঠ মানব। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের বক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তিকে অর্ঘ্যদানের প্রশ্ন উঠিলে ভীষ্ম ‘অমৃতত তদা কৃষ্ণমর্হনীরতমঃ ভূবি’—ভূমণ্ডলে কৃষ্ণকেই পূজ্যতম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন [সভা ৩.]। বস্তুতঃ জ্যোতির্কমণ্ডলে যেমন সূর্য, ভূমণ্ডলে তেমন কৃষ্ণ। পুরাণের কৃষ্ণ, মহাভারতে সর্বনীতিকুশল কর্মী। অবশ্য মহাভারতেও তাঁহার ভগবত্তা হুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিই পরম পুরুষ—‘আদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ’—বিশ্বের বস্তু বিকৃতি, তাঁহারই অংশ—তিনিই বিশ্বরূপ। তথাপি মহাভারতে কৃষ্ণের ভূমিকা প্রধানতঃ ধার্মিক নীতিকুশলী মানবের ভূমিকা। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনিই অগ্রণী,

ধর্মযুদ্ধে তিনিই প্রধান সহায়। কৃষ্ণের পাকদন্ত-নির্বোধ ধর্মযুদ্ধের আহ্বান, কৃষ্ণের উপদেশ বিপদে বল, অবসাদে প্রেরণা, নিরুত্তম জীবনে কর্ম-প্রবৃত্তি।

মহাভারতের আর একটি গৌরবময় চরিত্র 'ভীষ্ম'। ভীষ্ম শাপদ্রষ্ট ছাড়া নামক বহু; শাস্ত্রের ওরসে গঙ্গাপর্বে বর্তো জন্মগ্রহণ করেন; তাই তাঁহার নাম দেবদ্রত ও গাল্পেয়। পিতার জন্ত তিনি কঠিন সত্য করিয়াছিলেন, বিমাতা সত্যবতীর বে সন্তান হইবে, সেই হইবে আমাদের রাজা ['বোহস্তাং জনিত্বতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি'—আদি ২৪.৮৭]; দাসরাজের নিকট আরও ভীষণতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 'অমৃত প্রভৃতি মে দাস ব্রহ্মচর্য্য ভবিষ্যতি'—আজ হইতে ব্রহ্মচর্য্য আমার অবলম্বনীয় হইবে। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার আকাশ হইতে অঙ্গরা, দেবতা ও পিতৃগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার নাম হইল ভীষ্ম। শাস্ত্র তুট হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করেন 'বচ্ছন্দ মরণং তুটো দদৌ তমৈ মহামুনে' [আদি ২৪]। সার্থক ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, দাঁর পরিগ্রহ করেন নাই। ভ্রাতাদের জন্ত তিনি কাশীরাজহুহিতা অবা, অধিকা ও অহালিকাকে বর্ষান্তকে হরণ করিয়া আনিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ষকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মের এই কার্যে অঘার নারীষ আহত হইয়াছিল; ইহার পরিণাম শিখণ্ডীরূপে অঘার জন্ম। এই শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের কারণ। ভীষ্মের কয়েকটি কর্ম অত্যন্ত তুর্বোধ্য—১. কৌরবসভার দ্রোপদীর চরম লাহনার সময় ভীষ্মের নিক্রিয়তা এবং ২. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার কৌরব পক্ষে অংশ গ্রহণ। রাজসভার দ্রোপদীর অতি কাতর প্রার্থনার উত্তরে ভীষ্ম শুধু বলিয়াছেন, 'ন শক্ণোমি বিবেকমুমেতৎ'—আমি বথার্থ উত্তর দিতে পারিতেছি না; দ্রোপদী বধন বলিলেন, কৌরবগণ আপনারা বলুন, আমি জিতা না অজিতা? ভীষ্ম তখনও বলিতেছেন :

উক্তবানস্মি কল্যাপি ধর্মন্ত পরমা গতিঃ।

লোকে ন শক্যতে জাতুমপি বিজ্ঞেয়হাস্মতিঃ ॥ [সভা, ৬৬. ১১]

—হে কল্যাপি, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, জগতে ধর্মের সন্মাত্র গতি বিজ্ঞ। লোকেরাও বুঝিতে পারেন না।

ভীষ্মের পতন ভাগ্যের পরিহাস। শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়া অর্জুন তাঁহার উপর হস্তীদ্বয় শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতেও বৈবস্বতী হইল, হে মহাধর্মবর্দ্ধন যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। ভীষ্ম অস্থভাগ করিলেন। অর্জুনের বিষমব্যাণে কতবিকৃত হইয়া তিনি রথ হইতে ছুতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দেহে অসংখ্য শরবিদ্ধ হইয়াছিল,

এইকল্প রথ হইতে পতিত হইলেও তাঁহার বেহ কৃতল স্পর্শ করিল না। তিনি শরশব্যায় শায়িত হইলেন এবং উত্তরাধিকারের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইচ্ছানুযায়ী বর বলে জীবিত রহিলেন। সুকলেক্তে সুকল অবসান পৰ্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শান্তিপূর্বে তিনি বুদ্ধিধীরকে বৈধর্ম্যকথা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও প্রত্যেক হিন্দুর শোকে সাক্ষ্য, দুঃখে শক্তি, জীবনে মহতী প্রেরণা। মহাভারতের কথার বলা যায়,—ভারতগণ-পিভারহ গদানন্দন মহাত্মা ভীষ্ম ছিলেন,—

বৃহস্পতিসমং বৃদ্ধ্য কাময়া পৃথিবীসমম্।

সমুদ্রমিব গান্ধীর্ষে হিমবন্তমিবহিরম্ ॥

প্রজাপতিমিবৌদার্ষে তেজসা ভাস্করোপমম্।

মহেন্দ্রমিব শত্রুপাং ধ্বংসনং শরবৃষ্টিভিঃ ॥ [উত্তোগ, ১৪৬. ২-৩]

‘ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী’—মহাময় চর্যোধন-মহাবৃক্ষের মূল। মাতার দোষে ও ঋষির শাপে তিনি জন্মাক, কিন্তু ‘দীর্ঘবার্হমহাভেজাঃ’—দেহে দশহাজার হস্তীর বল [‘নাগাবৃত্ত-সমপ্রাণঃ’]। কিন্তু বুদ্ধিমান ও বলবান হইয়াও অকৃত্যবশতঃ তিনি রাজ্যলাভ করেন নাই। গান্ধাররাজনন্দিনী গান্ধারী তাঁহার পত্নী। এই গান্ধারী হইতে তাঁহার শত পুত্র লাভ হয়—তন্মধ্যে প্রধান চর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহাক্ত [‘পুত্রস্নেহসম্বিত’] ধৃতরাষ্ট্রের বত দুর্ভম পুত্রস্নেহ বশে। পাণ্ডুপুত্রগণকে তেজস্বী ও উন্নত হইতে দেখিয়া তিনি অনুশাসনবশ হইয়াছিলেন। এই সময় মন্ত্রী কর্ণিক ধৃতরাষ্ট্রকে যে কূটনীতি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের জীবন-নীতি [আদি. ১৩৫] ; সমগ্রজীবনে ধৃতরাষ্ট্র এই নীতি দ্বারা চালিত হইয়াছেন। কর্ণিক বলিয়াছিলেন,

১. শপথেনাপ্যসিং হস্তাদর্শদানেন বা পুনঃ।

বিবেণ মায়ায়া বাপি নোপেক্তেত কথঞ্চন ॥ [আদি ১৩৫. ৫৩]

—শপথ, ধনদান, বিব বা মায়া প্রয়োগে শত্রুকে বিনষ্ট করিবে, কখনও উপেক্ষা করিবে না।

২. প্রহরিগ্ধন প্রিয়ং ক্রম্যৎ প্রহরয়পি ভারত।

প্রহৃত্য চ কৃপারীত শোচেত চ ক্রমেত চ ॥ [আদি. ১৩৫. ৫৬]

—বাহাকে প্রহার করিতে হইবে, বা বাণকে প্রহার করা হইতেছে, তাহাকে প্রিয় কথা বলিবে; প্রহার করিয়া শোক প্রকাশ করিবে, দয়া দেখাইবে এবং কাঁদিবে।

৩. সুপুণ্ডিতঃ শ্রাবকঃ কলবান্ তাদুপারহঃ ।

আম ত্রাং পকসকালো ন চ জীবন্তে কহিচিৎ ॥ [আদি. ১৩৫. ৬৬]

‘ফুল দেখাইবে, কিন্তু ফল দিবে না; ফল দিলেও ছুরায়োহ করিবে, এবং অশক হঠয়া শকের মত থাকিবে; কখনও জীর্ণ হইবে না।’ [অহঃ-হরিদাস সিদ্ধান্তবাসীশ]।

ধৃতরাষ্ট্রের জীবনে এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতিটি কাজে তিনি ‘ঋধাচিত্তঃ’। তাঁহার অন্তরে অনুরাগ, বাইরে ধর্মভাব। ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরের সহিত তিনি পরামর্শ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। মুখে ধর্মকথা, কার্যতঃ পাণ্ডবের অনিষ্ট-চিন্তা। তিনি গান্ধারীকেও ছলনা করিয়াছেন। গান্ধারীর আবেদনের ফল দ্বিতীয় দ্যুতক্রীড়া। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের বহিবিষ দুর্ধোধন। তাই পুত্রের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ। স্নেহবশতঃ দুর্ধোধনের সমস্ত কর্মকে তিনি সমর্থন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র একদিকে ধারযুক্ত অসিরস্ত্রায় কেবল আপন বৃত্তি ধারাই কার্য করিতেন, প্রায়ই অসং লোকের পরামর্শ লইতেন। তিনি শুণু জয়ান্ব ছিলেন না, জ্ঞানান্ব ছিলেন। পরিণাম জানিয়াও যে দুর্কারে তাঁহার সমর্থন ছিল, তাহার প্রমাণ ‘বদাভ্যোঃ : তদা নাশংসে বিজয়ায় সঙ্কর’ উক্তিগুলি [আদি. ১]। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ অতি করুণ : শতপুত্রের নিধনবাতা শ্রবণ করিয়া তিনি ‘বাতাহত ইব ক্রম’ ভুতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন [শ্রীপর্ব. ১]। অগ্নিদ্বাছে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পকশাণ্ডবের মধ্যে প্রথম তিন পাণ্ডব তিন রসের মূর্তিমান্ বিগ্রহ। যুধিষ্ঠির শান্ত রসের, ভীষ্ম রোদ্ররসের এবং অর্জুন বীররসের। বিপুল ধর্মমহাক্ষয়ের তাঁহার্য্য এক একটি অঙ্গ। মহাভারতের অতি ভয়ঙ্কর আঘাতে যুধিষ্ঠির চিরস্থির ও শান্ত। সার্থক তাঁহার ধর্মরাজ নাম। ধর্মের গতি হুম্ম ও গহীন—এই হুম্ম গহীন ধর্মপথের পথিক যুধিষ্ঠির। তাই তিনি সশরীরে স্বর্গ গমনের একাধিকারী।

ভীষ্মের রোদ্র মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর। অগ্রজকে তিনি অমান্য করেন নাই, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন। কুমার অপমানে সভাপর্বে ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠ বিকূর্ণিত হইল, করে করে নিশ্বেষণ করিয়া মহাশ্বনে তিনি বলিতে লাগিলেন :

অস্ত্র পাপস্ত্র দুর্বৃদ্ধেভ্যস্তাপসদস্ত্র চ

ন পিবেয়ঃ বলাদ্যকো ভিষ্ম চেক্ষয়িষ্যঃ যুধি ।

মত্তেভদেবমুক্তাহং নকূর্ব্যা পৃথিবীশ্বরঃ

শিতামহানঃ সর্বেবাং ন্যাহং গতিমবাপ্নুয়াম্ ॥

—ভারত কুলের এই পাশের বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া বহিঃরূপে ইহার রক্ত পান না করিতে পারি, তাহা হইলে আমি বেন পিতৃ-পিতামহের গতি লাভ না করি।

হুঃশালনের বন্ধোত্তরে দ্রৌপদীর বেণী-সংহার ভীষের মহাভয়ঙ্কর রৌত্রকর্ম।

তৃতীয় পাণ্ডব পাণ্ডাবধা অর্জুন কৃষ্ণের কথা। অর্জুন ও কৃষ্ণ,—নর ও নারায়ণ—এই দু'রে মিলিয়া পূর্ণ শক্তি। সঙ্কল্প বলিয়াছিলেন :

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোদধনুর্ধরঃ ।

তত্র ক্রীবিভয়ো ভূতি ঐবা নীতির্মতির্ময় ॥ [গীতা. ১৮ ৭৮]

—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থ বর্তমান, সেইখানেই রাজ্যশ্রী, অত্যাশ্রয়, বিজয় ও ঐবা নীতি বিরাজমান,—ইহাই আমার অভিমত।

উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্জুনের দেহবল ও মনোবল বিশ্ববিশ্রুত। তিনি বীর, প্রেমিক, জিতকাম, যোগ ও ভোগের একাদর্শ। কিরাতবেশী মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তিনিই পাণ্ডপত অশ্রু লাভ করিয়াছেন, স্বর্ণপদী উর্বশীর প্রলোভন হেলায় জয় করিয়াছেন এবং মৎস্যভেদ করিয়া বাজসেনীকে তিনিই পাণ্ডবদের জন্ত জয় করিয়াছেন। অর্জুনের প্রেমিক মূর্তিটিও অগ্নয়োগ্য। তিনি দ্রৌপদীপ্রিয়; আবার হুভদ্রা, উলুপী ও চিত্রাঙ্গদারও ধোয়। কুরুক্ষেত্রের মহাহবে ভগবানের গীতা তাঁহার উদ্দেশ্যেই গীত হইয়াছিল। মহাভারতীয় জীবনগুলির মধ্যে অর্জুনের জীবনই সর্বাপেক্ষা ঘটনাবহুল—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান অঙ্গগোচর তাঁহারই। মহাপ্রস্থানিক পর্বে এই অর্জুনের পতন অতি কর্ণক। দয়ায়, ধর্মে, শরণাগতরূপে ও বিক্রমে তাঁহার সমান কে ? তথাপি তাঁহার পতন হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, ‘অবশেষে ধনুর্গ্রহানেষ সর্বাংস্ কাস্তপঃ’ [মহাপ্র. ২]—কাস্তনী অন্তান্ত ধাতুকীকে অবজ্ঞা করিতেন। বীরস্বের এই অহঙ্কারই অর্জুনের পতনের কারণ। ধর্ম সামান্ত খলনকেও কমা করে না, অর্জুনের মধ্য দিয়া ইহাই মহাভারতের শিক্ষা।

অস্তান্ত পুরুষচরিত্রের মধ্যে দুর্বোধন ও কর্ণক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। দুর্বোধন মহাময় মহাবৃদ্ধ :

অন্নবুদ্ধিরহঙ্কারী নিত্যঃ মুকুমিতি ক্রবন ।

ক্রুরো দুর্ধর্ষণো নিত্যমসঙ্কটক বীর্ষবান ॥ [শ্রী ১. ২৮]

—তিনি অন্নবুদ্ধি, অভিমাত্রী, ক্রুর, অসহিষ্ণু, নিত্য অসুখ ও বলবান; সর্বদা বলিতেন, মুকু চাই।

দুর্বোধনের অতিশয়শক্তি, অসহিষ্ণু মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাণ্ডবদের

প্রতি তাঁহার জাতকোষ। ছলে, বলে, কোশলে পাণ্ডবদ্বিগকে অপমানিত ও নির্জিত করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। কর্ণের বীরত্বব্যঞ্জক যুতি দেখিয়া অর্জুনের বোধ্য প্রতিদ্বন্দী বনে করিয়া তিনি কর্ণকে অকরাভ্যে অভিষেক করেন। দুর্বোধনের প্রায় সকল কর্মই দুর্কর্ম। জতুগৃহদাহ, রাজসভায় কৃষ্ণার অপমান, বানী ব্যক্তির প্রতি দুঃসহ স্পর্ধিত দুর্বাচ্য দুর্বোধনের অপকর্মের পরিচয়। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়—রাজা দুর্বোধন একক। তাঁহার রাজনীতি দ্বিতীয় রহিত। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলিয়াছিলেন :

অহং হি পাণ্ডবান্ হৃষা প্রশান্তা পৃথিবীমিমাম্ ।

মাং বা হৃষা পাণ্ডুপুত্রাঃ ভোক্তারঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ [উভোগ ৫৭]

—হয় আমি পাণ্ডবদের হত্যা করিয়া পৃথিবী শাসন করিব, নয় পাণ্ডুপুত্রগণ আমাকে নিহত করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে।

দুর্বোধনের দৃষ্ট রাজসিক, পরশ্রীকাতরতাও রাজসিক। উভোগপর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, দ্রুতরাষ্ট্র, গান্ধারী, এমন কি কৃষ্ণ পর্যন্ত পাণ্ডবদের রাজ্য দান করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্বোধনের এক উক্তি, ‘সমর্থাঃ স্য পরান্ জেতুং বলিনঃ সময়ে বিভো’। কৃষ্ণকে তিনি বলিয়াছেন :

যাবচ্চ তীক্ষ্ণঃ সূচ্য বিধোদগ্ৰেণ যারিব ।

তাবদপ্যপরিত্যজ্য ভূমে নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ [উভোগ, ১১৮]

—সূক্ষ্ম সূচির অগ্রভাগে বতটুকু ভূমি ধরে, তাহাও পাণ্ডবদের দিব না।

এই দুর্বোধনের পরিণাম অতি ভয়াবহ। বৈদ্যায়ন হৃদে স্তম্ভিত জলে দুর্বোধনের আশ্রয় গ্রহণ মদশক্তির পুঙ্খিত পরিণাম। ভগ্ন উরু, রক্তাক্ত দুর্বোধনের চিত্র আরও শোচনীয়। হৃদতীরে সন্ধ্যার আবির্ভাব অতিদর্পের অবসানসূচক। এই মহাপতন-কালেও দুর্বোধনের গর্বোক্তি :

উৎসাহচ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিষ্টা যুয়ুৎসতা ।

দিষ্টা চামি হতো যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ ॥ [সৌপ্তিক. ২];

—আবার ভাগ্য আমি নিত্য উৎসাহ লইয়াই যুদ্ধ করিয়াছি ; আমার ভাগ্য জ্ঞাতিবান্ধব নিহত হইলে আমি নিহত হইয়াছি।

মহাভারতে দীপ্ত পুরুষকারের প্রতিযুতি কর্ণ। আদিপর্বের অন্তরঙ্গশালায় এই যুক্তির আবির্ভাব অতীব বিস্ময়কর। অর্জুনের অন্তর্দৃষ্টি প্রদর্শন প্রায় শেষ হইয়াছে, বাত্মরনি মন্দীকৃত, সহসা বজ্রাঘাত শব্দের ভায় গুরু বাহ্মাফোট প্রত হইল, সকলে সুবিষয়ে চাহিয়া দেখিলেন, পরপুরুষ কর্ণ বিস্তীর্ণ রক্তধূমে প্রবেশ করিতেছেন :

সহজঃ কবচঃ বিদ্রং কুণ্ডলোদ্ধোতিতাননঃ ।

সধনুর্ভব নিম্নিঃশঃ পাদচারীষ পর্বতঃ ॥ [আদি. ১৩১]

—তিনি সহজ কবচধারী, কুণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত আননঃ ধনু ও তরবারিসহ তিনি বেন এক সচল পাদচারী পর্বত ।

কিন্তু সৌরদীপ্ত এই পুরুষ দৈব বাবা অভিতপ্ত । কুন্তীপুত্র হইয়াও তিনি হৃতপুত্র নামে পরিচিত, আজন্ম মাতৃপরিত্যক্ত ও মাতৃনেহবঞ্চিত । রক্তহলে সকলে স্বপ্ন তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন, তখন কর্ণের মুখ লক্ষ্য করিয়া আরক্ত ‘বভৌবর্ষাধু বিক্লিষ্টঃ পদ্মগঞ্জিতঃ যথা’ । হৃতপুত্র জানিয়া ভীম ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, ‘কুলস্ত সদৃশতুর্গঃ প্রতরো গৃহতাং স্বয়া’—ওহে, তুমি শীঘ্র তোমার কুলের যা কাজ তাই কর, কণা হাতে নাও । আবে এক চিত্র জ্ঞানদসভায় লক্ষ্যভেদের দৃষ্ট । ভারতের গণ্যমান্ত রাজকুল-বর্গের সম্মুখে কর্ণ লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় দ্রৌপদী বলিয়া উঠিলেন, ‘নাহঃ বরয়ামি হৃতম্’ । এ লক্ষ্য কর্ণ হাসি দ্বারা ঢাকিতে চাহিয়াছেন, সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি কাম্পিত করে ধনু ত্যাগ করিয়াছেন । অথচ এই কর্ণ ছিলেন দাতা ও রথিশ্রেষ্ঠ । পূর্বে কর্ণের নাম ছিল বহুবংশ । ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি কর্ণ ভেদ করিয়া সহজ কুণ্ডল দান করিয়াছিলেন, একান্ত তাঁহার নাম হয় কর্ণ বা বৈকর্তন । জীবনে তিনি ‘দ্বিষ’ এই কথাই বলিয়াছেন, প্রার্থীকে কখনও ‘নাই’ বলেন নাই—‘দদানীত্যোব বোহবোচয় নাস্তীত্যর্থিভিঃ’ । বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না । ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন,

বৃষো মহেন্দ্রো দেবেষু বৃষঃ কর্ণো নরেষুপি ।

তৃতীয়মন্তঃ লোকেষু বৃষঃ নৈবাহুশুশ্রম ॥ [কর্ণ. ৬]

—দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ ; অপর কোন শ্রেষ্ঠ তৃতীয় ব্যক্তির নাম শুনি নাই ।

বস্তুতঃ কর্ণ ছিলেন ‘সিংহখেলগতি ধীমান্ ঘৃণী দাতা যতব্রতঃ’ [শাস্তি. ১]—সিংহের মত সখেলগতি, ধীমান্, দয়ালু, দাতা ও যতাস্রা । কিন্তু দুর্য়তি দুর্বোধনের সংসর্গে তিনিও দুর্য়তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নানারূপ অধর্ম কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন । যুদ্ধকালে কর্ণ ধর্মের দোহাই দিলে রক্ত যুক্তি-যুক্তভাবে এই পাপ কর্মগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, দুর্বোধন তোমারই পরামর্শে বিব প্রয়োগে ভীমকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, দ্যুতসভার তুমিই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের নির্দেশ দিয়াছিলে, সপ্তদ্বী মিলিত হইয়া বালক অভিমত্যাঁকে নিহত করিয়াছিলে, হে রাধেয়, ‘কুতে ধর্মস্তদা গতঃ’—নেহিন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল ? কর্ণ এ অভিযোগের উত্তর দিতে

পারেন নাই, 'লক্ষ্মণাবনতো কুশা নোত্তরং কিকিছুক্তবান্' [কর্ণ. ৬৬]। কর্ণ হুম্মের ১৩ হইলেও সত্যনিষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধোত্তোগ পর্বে কুন্তী বেদিন মাঠেই ও কর্ণকেই প্রলোভন লইয়া কর্ণের নিকট আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, সেদিনও সত্যপরাধ কর্ণ অবিচলিত চিত্তে এই কথাই বলিয়াছিলেন,

সর্বকামৈঃ সংবিভক্তঃ পুজিতশ্চ বথাস্থম্ ।

অহং বৈ ধার্তরাষ্ট্রাণাং কুর্বাং তদফলং কথম্ ॥ [উত্তোগ. ১৩৬]

—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার স্ত্রের এক আমাকে অতীত বস্ত্র দিয়াছেন, আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, আমি কি তাঁহাদের এই পূজা নিফল করিতে পারি ? কুরুকে তিনি বলিয়াছিলেন,

মৎস্নেহাচ্চৈব রাধায়াঃ সত্যঃ কীরমবাতবৎ । ..

তস্তাঃ পিণ্ডব্যাপনয়ং কুর্বাদশ্বধিঃ কথম্ ॥ [উত্তোগ. ১৩৭]

—আমার প্রতি স্নেহবশতঃ রাধার সনে দুগ্ধস্কার হইয়াছিল . আমার মত লোক কি কবিয়া সেই রাধার পিণ্ডলোপ করিতে পারে ?

কর্ণের সমগ্র জীবনই দৈবাভিতপ্ত। যুতাকালের দৃষ্ট অতি করুণ। পরশুরামের আভিশাপে তিনি ব্রহ্ম অশ্বেষ সন্ধানময় বিশ্বত হইয়াছেন। যেদিনী রথচক্র গ্রাস কবিয়াছে, তিনি প্রাণপণে রথচক্র উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। নিষেধ ও অন্তরয় সবেও অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, কোধে তাঁহার নয়নে অশ্রুপাত হইতেছে। এই অবস্থায় অর্জুনের মহাবাহুে কর্ণের মস্তক ছিন্ন হইল :

তদ্রথদাদিত্য সমান বর্জস্

শরস্রভৌমধ্যগ ভাস্করোপমম্ ।

বরাকর্মব্যামশতচ্চযুপতে-

দিবাকরো হস্তাদিব রক্তমণ্ডলঃ ॥ [কর্ণ ৬৬]

—রক্তমণ্ডল সূর্য যেমন অন্তর্গত হইতে পতিত হয়, উদয়-সূর্যের মত তেজস্বী, শরৎ মধ্যাহ্নের ভাস্করের মত প্রচণ্ড সেনাপতি কর্ণের মস্তকও তেমনি ভূতলে পতিত হইল।

কর্ণের খণ্ডিত দেহ হইতে একটি তেজ নির্গত হইয়া সূর্যমণ্ডলে মিলাইয়া গেল। যেন মর্ত্যের আদিত্য-তেজ স্বর্গীয় আদিত্যে বিলীন হইল।

মহাভারতের স্ত্রী চরিত্রগুলিও অপূর্ব। প্রথমেই মনে পড়ে দেবী গান্ধারীর কথা।

পতিব্রতা মহাভাগা সমান ব্রতচারিণী ।

উগ্রেশ তপসা যুক্তা সত্যতঃ সত্যবাদিনী ॥ [স্ট্রী. ১৬]

ইনি গাঙ্গাররাজ সুবল-মন্দিরী। অন্ধ রাজার সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া পতিব্রত-পরায়ণা গাঙ্গারী পট্টবস্ত্র ধারী নিজচক্ষু আবৃত করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী গাঙ্গারী শতপুত্রের জননী, কিন্তু জীবনে তিনি অসুখী। গাঙ্গারী ধর্ম-দর্শিনী। অথচ যে শব্দের তিনি মহিষী ও মাতা, সে শব্দ অধর্মচারী। স্বামী পুত্র, ভ্রাতা—সকলেই অধর্মের পোষক। যেদিন রাজসভায় পুত্রেরা রজঃস্বলা জ্যোপদীর প্রতি অশ্রদ্ধা অত্যাচার করিল, সেদিন এই ‘মহাপ্রাজ্ঞা’ ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইলেন, ‘হে রাজন, যুধ’ ও অশিষ্ট পুত্রগণকে প্রস্ত্রয় দিবেন না, ‘মা বালানামশিষ্টানামনুপমংহা মতিঃ প্রভো’; আপনি বংশনাশের কারণ হইবেন না, ‘মা কুলস্ত কয়ে ঘোরে কারণং স্বং ভবিষ্যসি’; আমি বলিতেছি, এই কুলপাংসন পুত্রকে ত্যাগ করুন, ‘তস্মাদয়ং মমচিন্তান্ত্যজতাং কুলপাংসনঃ’ [সভা. ৭২] কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আসন্ন সঙ্কটে তিনি যেমন একদিকে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্তঃযোগ করিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে উৎপলগামী পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

ন যুদ্ধে ভাত কল্যাণং ন ধর্মার্থৌ কৃতঃ সুখম্।

ন চাপি বিজয়ং নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিধ্যঃ ॥ [উত্তোগ : ২০]

—হে পুত্র, যুদ্ধে কল্যাণ নাই ধর্ম নাই, অর্থলাভের প্রত্যাশা নাই, সুখও নাই; ইহাতে জয়েরও হিরতা নাই। সুতরাং যুদ্ধে মন দিও না।

কিন্তু মনস্বিনী মাতার কথায় পুত্র কর্ণপাত করে নাই। প্রতিদিন যুদ্ধে যাইবার পূর্বে মাতার আলীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া দুর্যোধন বলিত, ‘অশ্বিন জ্ঞাতিসমুদ্বর্ষে জয়মহু ভবীতু মে’। গাঙ্গারী শুধু বলিতেন, ‘যতোধর্মন্ততো জয়ঃ’। তিনি এষ্ট ভীষণ যুদ্ধের পরিণাম জানিতেন। স্ত্রীপর্বে শোকাকুল গাঙ্গারীর মূর্তি অতি করুণ। তাঁহার শত পুত্র নিহত, নয়নে অশ্রু-উচ্ছাস। কুরুকে তিনি অভিসম্পাত করিয়াছেন। তথাপি ইহারই ভিতর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আধার গাঙ্গারী অভিতপ্তা কুন্তীকে সাহসনা দিয়া বলিয়াছেন, ‘অবশান্তাবী সম্প্রাপ্তঃ’—বাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, ‘মন্তে লোকবিনাশোহয়ং কালপর্যায় চোদিতঃ’। এই ধর্মদৃষ্টিই গাঙ্গারীর শোকে সাহসনা।

পৃথা কুন্তীর চরিত্রও অস্বর্ষন্দে ক্ষতবিক্ষত। পাণ্ডুবামাতা হইয়াও তিনি জীবনে দুঃখী। পুত্রদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার তেজস্বিতাও অসাধারণ। যুদ্ধপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের নিজস্বতা দেখিয়া তিনি জলিয়া উঠিয়াছেন। বিহ্বলা-সঙ্কল্প সংবাদ পরিবেশন করিয়া তিনি পুত্রকে তিস্রুককাষ্ঠের মত জলিয়া উঠিতে বলিয়াছেন,

যুধ্যস্ব রাজধর্মেন মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্।

মা গমঃ কীপপুণ্যস্বং সানুজঃ পাপিকাং গতিম্ ॥ [উত্তোগ. ১২৩]

—রাজবীরস্বারে যুদ্ধ কর, পিতৃশিত্যবহ্নের নাম ডুবাইও না, কীলপুণ্য হইয়া অত্মজগণের সহিত পাশগতি প্রাপ্ত হইও না। -

কুন্তী-চরিত্রের একটি সহস্রময় অধ্যায় কর্ণের জন্ম। কর্ণ কুন্তীর কুমারী-জীবনের কলঙ্ক, প্রথম বাতৃত্বের স্বধাংশুর্ষ। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে এই পুত্রকে জন্মদাতা মজ্জায় ডরিয়া তিনি জলে বিলর্জন দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহালমরের প্রাকালে তিনি এই গোপন তথ্য কর্ণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন,

কৌন্তেয়স্বঃ ন রাধেরো ন তবাস্বিরথঃ পিতা ।

নাসি হতকুলে জাতঃ কর্ণ ভবিষি মে বচঃ ॥ [উত্তোগ, ১৩৫]

—তুমি রাধের নও, অধিরথও তোমার পিতা নন। হে কর্ণ, আমার কথা শুন, তুমি হতকুলে জাত নও, তুমি কুন্তীপুত্র ।

কুন্তী প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন। তিনি কর্ণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, ‘অনাময়ঃ স্বশি শু চেতি ।’

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে মহাকর্ষি কর্ণের জন্ম কুন্তীর শোকের কোন চিত্র উদঘাটন করেন নাই। স্বাণর্ষে কুন্তী যে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, তাহাও যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রগণের দীর্ঘ অদর্শনের জন্ম। কর্ণের জন্ম নয়। কি দুঃসহ শোক তাঁহার হৃদয়ে ছিল, বুঝা যায় তখন, যখন বুকের তর্পণ করিবার জন্ম পাণ্ডুপুত্রগণ গলায় অবতরণ করিয়াছেন। কুন্তী সহসা শোকে আকুল হইয়া বাষ্প গদগদকণ্ঠে পুত্রগণকে বলিলেন,

কর্ণস্ত সত্যসঙ্কত সংগ্রামেষণলারিনঃ ।

কুরুধ্বমৃদকং তন্তু ভ্রাতুরগ্নিষ্টকর্মণঃ ॥ [স্ত্রী, ২৭]

কর্ণের জন্মকথা গোপন করিবার জন্ম যুধিষ্ঠির মাতাকে তীব্র অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্মান্ত কুন্তী তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

মহাভারতের আর একটি বিস্ময়কর দ্বীচরিত্র বজ্র-সমুখিতা, কৃষ্ণকুটিলকুন্তলা ক্রপদনন্দিনী দ্রৌপদী। সমগ্র মহাভারতীয় জীবন তাঁহার উচ্চ দীর্ঘশ্বাসে অভিভূত।

দ্রৌপদী ভ্রাতা দ্বী। অপূর্ব সুলক্ষণী। ‘নৈব ব্রহ্মা ন মহতী নাতি কৃষ্ণা ন রৌহিনী’; তাঁহার রূপ চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ, সূর্যের মত দীপ্ত—কোশল্যাপ্ত তাঁহার অঙ্গগন্ধ [‘বস্ত্রা রূপং সৌমস্বর্ষপ্রকাশং গন্ধশ্চাস্তাঃ কোশল্যাত্রাং প্রবাসিত’—আদি ১২০]। বজ্রবেদী হইতে উখিতা বলিয়া তাঁহার অপরা নাম ‘বাজসেনী’। দ্রৌপদীই ভারত-লম্বরের অরণি। রাজকন্তা ও রাজবধু হইয়াও তিনি ভুলভুখিতা। বিবাহলয় হইতেই এই দুঃখ। অস্বস্তি সভায় এক বীরের কণ্ঠে তিনি বরমালা অর্পণ করিলেন, কিন্তু ভাগ্যের লিখনে তিনি হইলেন পঞ্চদশীর পত্নী। রাজস্বয়ংবরের আনন্দ-

মহোৎসব শেষ হইতে না হইতে তিনি দ্যূতপথে পণ্যা হইলেন, রাজস্বনা অবস্থায় অগণিত রাজস্ববর্গের সম্মুখে লাহিতা হইলেন, তারপর একবস্ত্রা মুক্তকেশী দ্রোণদী স্বামীকে সঙ্গে বনবাস বরণ করিলেন। সামান্ত বনবাস অন্তে অজ্ঞাতবাসের দুঃখনিশি সমাগত হইল, রাজস্বাজ্ঞেশ্বরী হইলেন বিরাট-গৃহের সৈরিকী। দ্রোণদীর দুঃখের শেষ কোথায়? জীবনভর দ্রোণদী মর্মে যে বহিঃজালা বহন করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের শোণিত-তর্পণে তাহার শেষ পূর্ণাহতি।

দ্রোণদী অপূর্ব তেজস্বিনী ও নয়কুশলা। কৌরব দ্যূতপড়ার দ্যূতে তিনি জিতা না অজিতা—এ নীতির প্রসঙ্গে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও ধর্মবিদগণের কণ্ঠ নিশ্চূপ হইয়া গিয়াছিল। তখনকার তেজোদৃশ্য মূর্তিটিও অবিস্মরণীয়। পঞ্চপতি পথে বহু, দ্রোণদী অসহায়। সেই অবস্থায় দুঃশাসনেব প্রতি তাঁহার ক্রুদ্ধ গর্জন, ‘নৃশংসকর্মণ স্বমনাৎসবৃত’, রাজস্ববর্গের উদ্দেশ্যে তাঁহার দিক্কার, ‘দ্বিগন্ত নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্মস্তথা’, ‘ক হু মর্মে মহীকিতাম্’—তেজস্বিতার অলস্ত দৃষ্টান্ত। ‘প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা’ দ্রোণদীর আর এক মূর্তি বৈতবনে। যুধিষ্ঠিরের ক্রমা ও অমহা দেখিয়া জলিয়া উঠিলেন, স্বামীকে অহুমোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘দুঃখার্থঃ দুঃখিতঃ দৃষ্ট। কস্মাৎস্বা নীবর্বতে’, ‘ধ্যায়ন্তু স্বর্জুনঃ দৃষ্ট। কস্মাদ্ রাজন ন কুপ্যসি’, ‘মাং বৈ বনগতাঃ দৃষ্ট। কস্মাৎ কমসি পাণ্ডিব।’ স্থতীত্র স্নেহে তিনি কহিলেন,

ন নির্মহাঃ কত্রিয়োহস্তি লোকে নির্বচনঃ স্মৃতম্।

তদন্ত স্বয়ি পশ্চামি কত্রিয়ে বিপরীতবৎ ॥ [বন. ২৪]

—লোকে বলে কত্রিয় ক্রোধশূন্য হয় না, হে মহারাজ, আজ আপনাতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।

এই তেজস্বিনী মনস্বিনী মহিলার আর এক কুড়িত চিত্র দেখা যায় উপগ্রব্য নগরে। যুদ্ধের উত্তোগ প্রায় সমাপ্ত। এমন সময় যুদ্ধবিরতির দৌত্য লইয়া রুধু বাইতেছেন হস্তীনাপুরে। সহদেব ও সাত্যকি ব্যতীত অপর সকলেই শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী। এই সময়ে আসিলেন দ্রোণদী ‘সসিতা আরতযুদ্ধজা’, ‘অশ্রু পূর্ণেক্ষণা’। প্রথমে তিনি বলিলেন, হে রুধু, সাম দান দ্বারা যে শত্রু বশীভূত হয় না, জীবিতার্থীর উচিত তাহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করা। ক্রমে কণ্ঠ উচ্চতর হইল। নিজ গৌরবের কথা ঘোষণা করিয়া তিনি বলিলেন, হে কেশব, আমার মত ভাগ্যবতী কে [‘কা তু নীমন্তিনী মাদৃক পৃথিব্যামস্তি কেশব!’], আমি দ্রুপদ রাজার নন্দিনী, যুধিষ্ঠিরের ভগ্নী, আপনার প্রিয় সখী আর ইজুতুল্য পঞ্চপাতকের পত্নী। সেই আমি কেশাকৃষ্টা হইয়াছি, ‘দানী-ভূতানি পাপানান্ লভামধ্যে ব্যবস্থিতা’। যুদ্ধের্তে গর্ব বেন গর্জন করিয়া উঠিল,

বিক পার্শ্বতঃ ধূম্রতাঃ ভীষসেনস্তঃ ধিগ্, বলম্।

যতঃ দুৰ্বোধনঃ কৃষ্ণঃ মুহূৰ্ত্তমপি জীবতি। [উদ্যোগ. ৭৬]

ভারপর সেই কৃষ্ণা কৃষ্ণকটিল, অসংকৃত, মহাসর্পের তার কান্তিবৃত্ত কেশকলাপ
বামহস্তে ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ কৃষ্ণকে বলিলেন,

অরতঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কুশাসনকরোদ্ধত।

স্বৰ্ভবাঃ সর্বকার্যেষু পরেবাঃ সন্ধিমিচ্ছতা ॥ [উদ্যোগ. ৭৬]

—হে পুণ্ডরীকাক্ষ, সন্ধি করিবার সময় কুশাসনকরদ্বিত এই কেশের কথা মনে
রাখিবেন। বলিতে বলিতে কৃষ্ণার নয়নে অত্যক্ষ ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

দ্রৌপদীর এই অশ্রুসিক্তা স্মৃতিভা মূর্তিই কৃষ্ণক্ষেত্র-যুদ্ধের অরণি।

মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র পাষাণরেণুর মত স্পষ্ট ও জীবন্ত। মুখ্য চরিত্রগুলির
তো কথাই নাই, শকুনি, বিকর্ণ, অভিমন্যু, উত্তর ও উত্তরা, ভদ্রক, সুভদ্রা, হিড়িম্বা
ঘটোৎকচ, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, বক্রবাহন প্রভৃতি গোণ চরিত্রগুলিও উজ্জল। চরিত্র-
চিত্রনে ব্যাসদেব অদ্বিতীয়।

৫. মহাভারতের সাহিত্যিক মূল্য

মহাভারত ইতিহাস। মহাভারতেও মহাভারতকে ইতিহাসই বলা হইয়াছে :
'ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবর্তীহৃতঃ' [আদি. ১. ৫৫], 'অয়োনায়েতিহাসোহয়ং
শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা' [আদি. ৫৭. ২০]। কিন্তু এই ইতিহাস লোকপালগণের
কর্মের ইতিহাস মাত্র নয়, মর্মের ইতিহাস। এইখানেই মহাভারতের কাব্যতা।
উপরন্তু এই ইতিহাস, 'অলঙ্কৃতঃ শুভৈঃ শব্দৈঃ'—সুন্দর শব্দ দ্বারা অলঙ্কৃত, 'ছন্দোবৃত্তৈশ্চ
বিবিধৈরম্বিতম্'—নানাবিধ ছন্দে অম্বিত [আদি. ১. ২৮] এবং ইহার বিষয় ও
উপাখ্যান অতি আশ্চর্য—'বিচিত্রার্থপদাখ্যানম্' [আদি. ২. ৩৫]। নিপুণ কবি
ব্যাসদেবের 'মনঃসাগর সমুদ্রতঃ' এই যে মহৎ আখ্যান, ইহার রসসিদ্ধিও সন্দেহাতীত।
আচার্য আনন্দবর্ধন এবং লোচনকার অভিনব গুপ্ত উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন,
মহাভারত অপূর্ব শাস্ত্ররসাত্মক কাব্য।^১ বিপুল শাস্ত্রই মহাভারতের রসধনি।
'বিপুল মহাভারত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় এবং পর্বের পর পর্ব
পড়িয়া চলিয়াছি, কত রাজা, কত ঋষি, কত মানব, কত মহারানব, কত ভূচ্ছ বা
দৃহৎ ঘটনা, কত ব্যক্তি, কত জাতি, কত জীবন, কত যুদ্ধ, স্বীপর্ষ, শাস্তিপর্ষ,

১। মহাভারতেহপি শাস্ত্ররূপঃ কাব্যচ্ছায়াধরিনি বৃক্ষিপাণ্ডববিরলাবধান বৈমনস্ত-
দারিনীঃ সযান্তিষ্পনিবরতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাংপর্বঃ প্রাধাত্তেন যপ্রবক্তত
দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শাস্ত্রোরসস্ত মুখ্যতয়া বিবক্তা বিষয়তেন হচিত্তঃ—
শ্রদ্ধালোক. ৪. ৬

মহাপ্রস্থান পর্ব—সহস্র বটনার অরণ্য স্বভার উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলই মনের ভল্লার পড়িয়া বাইতে লাগিল; জগৎ জীবন কিছু মনে রহিল না। ধনি উঠিতে লাগিল শান্তি শান্তি—বিপুল বৈরাগ্য, কঠিন কর্তব্য, দুঃখ, শোক, দম্ব, ঘন, বকনা, সংঘর্ষ, উল্লাস ও অবসাদ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, সব অতিক্রম করিয়া স্থিতি ও গতি। শান্তি, শান্তি! ইহাই মহাভারতের ধনি’।^১ রবীন্দ্রনাথও মহাভারতের কাব্যিক বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, মহাভারত ‘একটি বিরাট গানে’ এক ভীষণ। শান্তির ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে :

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রস্থান
স্বকল আশার বিবাদ মহান
উদাস শান্তি করিতেছে দান

চির-মানবের প্রাণে। [সোনার তরী, পুরস্কার]

মহাভারত সত্যই অপরূপ কাব্য। যে কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শোক, রূপা, হস্ত ও উৎসাহ উদ্দীপিত হয়, বাহ্য পাঠ করিতে করিতে মুহূর্ত্ত হর্ষ, দুঃখ, ভক্ত, যোগাঙ্ক, নির্বেদ উপস্থিত হয়—তাহা শুধু কাব্য নয়, মহৎ কাব্য। রামায়ণ যেমন মহাকাব্য, মহাভারতও তেমন মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের গোরব (i) ইহার কাহিনী, (ii) ইহার চরিত্র এবং (iii) ইহার বর্ণনা।

মহাভারতের কবিত্ব বিচার করিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, ‘Vyasa is the most masculine of writers’^২; মহাভারতের কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্যক্তিত্বে ও বুদ্ধিমত্তায় ব্যাসদেব অনন্ত। ব্যাস-প্রণীত কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনাতেও এই স্বদৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ।

কাহিনী ও চরিত্রগুলির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভারতীকথা কথা-সাহিত্যের মূল্যবান ভাণ্ডার। কাহিনীগুলি নানারসের নিবন্ধ। শৃঙ্গার, বীর, করুণ হাস্য, ভয়ানক—সকল রসই এগুলি সরস। স্বীপর্ব যেমন করুণ রসের আধার, তেমনই মৌলপর্ব ভয়ানক রসের। নলোপাখ্যানটি ‘ধর্মিষ্ঠ করুণোদয়ম্’। প্রত্যেকটি কাহিনী আবার স্বপ্নভীর পাণ্ডিত্য, স্বতীক্ৰম মনন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়বহ। রসালো, ইষ্টপোত্তী-কথনে, সজ্জিহাপনে, বিগ্রহসংঘটনে, সমস্তার সমাধানে ও শোকের সান্ধার কাহিনীগুলির আবেদন হৃদয়গ্রসারী। জাতকে, পঞ্চভক্তে, হিতোপদেশে এই কাহিনী-গুলিই সম্বলিত হইয়াছে। মহাভারতের চরিত্রগুলিও বিশিষ্ট ও স্বকীয়তায় প্রোজ্জল।

১। কাব্যালোক (ব্যকনা ও ধনি) —ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত।

২। Vyasa and Valmiki—Sri Aurobindo.

এই সৃষ্টির পৌরব সঠিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তারই পৌরব। পুরাণেও অসংখ্য চরিত্র আছে। তাহাও ব্যাসদেবের সঙ্কলন। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রে ও মহাভারতীয় চরিত্রে প্রভেদ আছে। মহাভারতের চরিত্র প্রথমে ব্যক্তিব্যক্তক ও জীবন্ত। তাহার কারণ, মহাভারতের চরিত্রগুলি স্ববির প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। ভারতযুদ্ধের প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্র নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রাবির অর্গারোহণের পর মহাভারত রচনা করেন।^১ পুরাণের ভিত্তি স্মৃতি ও শ্রুতি, উহা অনেকটা কল্পনার সৃষ্টি। এইজন্য পৌরাণিক চরিত্র অপেক্ষা মহাভারতীয় চরিত্রের স্বাধ ভিন্নতর। মহাভারতীয় চরিত্রে আছে জীবনের সোনার কাঠির স্পর্শ। ধৃতরাষ্ট্রের মেহাক্ষতা ও কুটিলতা, দ্রুপদেবের দম্ভ, কর্ণের পুরুষকার, শকুনির শাঠ্য, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, দ্রোণদ্বীর তেজস্বিতা, যুধিষ্ঠিরের ধর্মধীরতা, অর্জুনের বীরত্ব, কৃষ্ণীর ধৈর্য এবং সর্বোপরি কৃষ্ণের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত। গৌণ চরিত্রগুলিও শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতির পরিচর।

॥ বর্ণনা সৌন্দর্য ॥

মহাভারতের বর্ণনাও আশ্চর্য সংযম-শাসিত ও শৌক্যব্যাক্তক। এই কাব্যে মহাকাব্যের উপযোগী অসংখ্য বর্ণনা আছে : রূপবর্ণনা, প্রকৃতি-বর্ণনা ও বৃদ্ধবর্ণনা। বর্ণনায় যে গভাভূগতিকতা নাই, তাহা নয়—কিন্তু বিশিষ্টতাও লক্ষণীয়। যেমন, বজ্র-সম্মুখতা পাকালী দ্রোণদ্বীর এই বর্ণনাটি,—

কুমারী চাপি পাকালী বেদিমধ্যাং সমুখিতা ।

হুভগা ধর্মদীপাসী সসিতায়তলোচনা ॥

শ্রামা পদ্মপলাশাকী নীলকুঙ্কিত যুজ্জ্বা ।

তাত্রভূসনখী হুজ্জ্বার পীনশয়োধরা ॥

মাহুবাং বিগ্রহং কৃষ্ণা সাক্ষাদমরবর্ণিনী ।

নীলোৎপলসমো গন্ধো যন্তাঃ কোশাৎ প্রধাবতি ॥ [আদি ১৬০]

—কুমারী পাকালী বেদিমধ্য হইতে সমুখিতা ; তিনি হুভগা, ধর্মদীপা, শ্রামা, সসিতায়তলোচনা ; তাহার কেশকলাপ নীল ও কুটিল, যথ তাম্রবর্ণ ও কুটিল, স্তনযুগল উন্নত। বেন সাক্ষাৎ দেববালা মাহুবীরূপে অবতীর্ণ। তাহার অঙ্গে কোশবাস্ত্র নীলশয়ের গন্ধ।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বাস্তবিকবর্ণনা হইতে এ বর্ণনার স্বাতন্ত্র্য আছে।

১। তেহু জাতেহু বৃদ্ধেহু গতেহু পরমাং গতিম্।

অব্রবীভারতঃ লোকে মাহুবেহসিন্ মহাশ্ববিঃ ॥ [আদি ১. ৫৭]

বাস্তবিকিতে আছে আবেগ, ব্যাসদেবে সংবন্ধ—বাস্তবিকিতে হৃদয়বস্তা, ব্যাসদেবে বুদ্ধিমত্তা।
—বাস্তবিকিতে কোমলতা, ব্যাসদেবে পৌরুষ।

মহাভারতেও প্রকৃতিবর্ণনা আছে। মহাভারতের যুগে নাগরিক সভ্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে, রাষায়ণের আরণ্য ত্রীকে বহল পরিমাণে গ্রাস করিয়াছে মহাপুরীর সভ্যতা। তথাপি এ যুগেও নগর অরণ্য-পর্বত হইতে বেশিদূরে সরিয়া যায় নাই। রাষায়ণের প্রকৃতিবর্ণনার স্নেহতা ও হৃদয়তা মহাভারতে নাই। মহাভারতে প্রকৃতিবর্ণনার প্রাকৃতিক বস্তুর ভার। বর্ণনাস্তলি প্রায়ই নানাজাতীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও বন-বিহঙ্গের নাম-তালিকায় ভারাক্রান্ত। কোন কোনস্থলে তালিকা এত দীর্ঘ যে, তালিকার তলে সৌন্দর্য ভূবিয়া যায়, থাকে শুধু তথ্যের ভার। যেমন, গন্ধমাদন পর্বতের এই বর্ণনা—

‘বৃক্ষসকল সর্বকতুর ফলভরে আঢ্য, সর্বকতুর কুস্থমে সমুজ্জল ও ফলভরে অবনত হইয়াছে। আম্র, আম্রতক, ভব্য, নারিকেল, তিন্দুক, মুগ্ধাতক, জীব, দাড়িম, বীজপুত্র, পনস, কদলী, খজুর, বিব, অম্বুবেতস, চম্পক, কদম্ব, কশিখ, জম্বু, গম্ভারী বদরী, প্রক্ষ, উড়ুধর, বট, অশ্বখ, ক্ষারিক, ভরাতক, আমলকী, হরিতকী, বিভাতক, ইজ্জদ, করমর্দ, মহাকল ও কেন্দুক এতদ্ভিন্ন অমৃতকল সুবাহু ফলসম্মাচিত বিবিধ বৃক্ষসকল গন্ধমাদন সাহস্রে শোভিত হইয়াছে।... চকোর, শতপত্র, ভূজরাজ, শুক,কোকিল, কলবিহু, হারিত, জীব-জীবক, প্রিয়ক, চাতক ও অন্তান্ত বিবিধ বিহঙ্গরাজি এই সকল বৃক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রোত্রময় হৃদয় কুঞ্জন করিতেছে; পুওরাক, কোকনদোংপল, কল্লার-কমলে ইত্যন্ততঃ সমাচিত সরোবর সকল চতুর্দিকে জলচর পক্ষিপণ দ্বারা মনোহর হইয়াছে; এই সকল সরোবর কলহংস, চক্রবাক, জলকুকুট, কারণ্ডব, প্রব, হংস, বক ও মদগু এইসকল পক্ষিপণে সমাকর্ষিত হইয়াছে।’ (কালিগ্রন্থসংগ্রহ)

মহাকাব্যের যুগের প্রকৃতিবর্ণনা প্রায়শঃ বস্তানট। কিন্তু এই ধরনের বর্ণনায় বস্ত-দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও রসদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বর্ণনার এই বস্তুর ভার থাকিলেও বনপ্রবেশের আনন্দ ও তৃপ্তি স্পষ্ট হয় না। বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে হৃৎক কুস্থমের গন্ধে, বনবিহঙ্গের কুঞ্জে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব পরিবেশে সহজেই হৃদয় মুগ্ধ হয়।

এই গ্রন্থকে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, রূপবর্ণনার ও প্রকৃতিবর্ণনার কিংবা অন্ত যে কোন বর্ণনার পুরাণ হইতে মহাভারত স্বতন্ত্র নয়। পুরাণকর্তাও ব্যাসদেব, মহাভারতের প্রণেতাও ব্যাসদেব। কবি যেখানে এক, বর্ণনাও সেখানে একরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি মহাভারতের বর্ণনার পুরাণ অপেক্ষা অধিক সংবন্ধ; এখানে রঙের

রোণা ও তুলির টান উভয়ই নিশ্চুতর। পুরাণের বর্ণনা বিবৃতিস্বায়,—তাহাতে কবিকর্মের
প্রয়াস কাচৎ পার্শ্বকূট; মহাভারতের বর্ণনা উক্তি-বৈচিত্র্যে পূর্ণ—রীতি বহুল পরিমাণে
আলঙ্কারিক। শ্রোণপথে কবি যুদ্ধশাস্ত্র রণক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের একটি বর্ণনা করিতেছেন :
নিহার আকর্ষণে সৈন্তগণ মৌরব, এখন তাহারা নিহারমণ্ডলিন্দল, যেন পটে আঁকা কোন
চিত্রকরের চিত্র [‘কুশলৈঃ শিল্পীভির্ন্যস্তং পটে চিত্রমিবাভূতম্’], এমন সবর চন্দ্রোদয় হইল
ততঃ কুমুদনাথেন কামিনীগুণাপাণুনা।

নেদানন্দেন চন্দ্রেন বাহেজ্ঞী দিগলভতা ॥ [শ্লোক ১৫৮, ৪৫]

—তখন কুমুদবাহুব কামিনীগণের গুণদেশের স্তায় পাণ্ডুর্বর্ণ নয়নানন্দ কিরণ
যারা পূর্বদিক্ অলঙ্কৃত করিলেন।

ক-মে শিল্পলবর্ণ উদয়-পর্বতের সিংহস্বরূপ চন্দ্র শুভা হইতে নির্গত হইলেন :

হরবুবোস্তম গাত্র সমদ্যুতিঃ স্নয়শরাসনপূর্ণগমপ্রভঃ।

নববর্ধস্বিত চাক মনোহরঃ প্রবিস্ততঃ কুমুদাকরবাহুবঃ ॥ [শ্লোক ১৫৮, ৪৭]

—হরবুবের স্তায় শুভ্রবর্ণ, কামদেবের পুষ্প-পুষ্পের স্তায় বেতকাঁড়ি, নববর্ধর
হাতের স্তায় চাক মনোহর চন্দ্র ক্রমে আরও একটু উপরে উঠিলেন।

ততো মুহূর্ত্তাভুবনং জ্যোতির্ভূতমিবাভবৎ।

অপ্রথামপ্রকাশক জগামান্ত তমস্তথা ॥ [শ্লোক ১৫৮, ৫১]

—মুহূর্ত্তমধ্যে জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল, রহস্তখন অজ্ঞের অন্ধকার
স্বরায় দূরে গমন করিল।

সহসা চন্দ্রের বিভার জগৎ মিনের স্তায় আলোকিত হইল। প্রভাতে যেন পদ্মবন
জাগিয়া উঠে, তেমনই প্রভাত হইয়াছে মনে করিয়া স্রষ্ট সৈন্তগণ আগিয়া উঠিল,

যথা চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ কৃতিতো সাগরো ভবেৎ।

তথা চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ স বভূব বলার্ধবঃ ॥ [শ্লোক ১৫৮, ৫৫]

—চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন উবেলিত ও ছুঁক হয়, সেই সৈন্ত-সমুদ্রও তেমনই
উবেলিত ও ছুঁক হইল।

এ বর্ণনা অত্যাশ্চর্য কবিকর্মের স্বাক্ষর।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনাগুলিও উল্লেখযোগ্য। পুরাণেও যুদ্ধবর্ণনা আছে।
মহাভারত ভো যুদ্ধরইকাব্য—কিন্তু বর্ণনার পার্থক্য অতি স্পষ্ট। রামায়ণ ও মহাভারতের
তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ শ্রীহরার বখ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য
করিয়াছেন, ‘বিশেষত ইহার (মহাভারতের) যুদ্ধবর্ণনা রামায়ণের মত কেবল গাছ-
পাখর হোড়ান্নাতির ব্যাপার নয়, রাক্ষস ও বানরের বীভৎস রস প্রধান শক্তি-আত্মকামের

ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যূহনির্মাণ, সৈন্যপতা-কৌশল, কূটবুদ্ধিবল ও মানবীর বাত প্রতিবাতির প্রযুক্তি।^১ পুরাণ ও মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গেও এই উক্তি প্রযোজ্য। পুরাণের যুদ্ধ অনেকটা দৈবাত্মের যুদ্ধ, মহাভারতের যুদ্ধ মানবীর বুদ্ধির, মানবীর শক্তি ও কৌশলের। দৈবাত্মের প্রযুক্তি থাকিলেও মহাভারতাত্মক নালিক, বৃহন্নালিক প্রভৃতি অস্ত্র আধুনিক যুদ্ধাত্মকে অরণ্য করাইয়া দেয়। মহাভারতের যুগে ভারতের ধর্মবৈধ বিজ্ঞা নানাদিক হইতে সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া মহাভারতে আছে বিবিধ ব্যূহনির্মাণের কৌশল। অভিন্নত্বাধারের তত্ত্ব দ্রোণ কর্তৃক রচিত চক্রব্যূহ মহাভারতের একটি নিম্ননীয় অরণ্যীয় কীর্তি : কিন্তু উহা যুদ্ধসম্ভার ও সৈন্য সমাবেশে বুদ্ধিমত্তার প্রোজল দৃষ্টান্ত :

চক্রব্যূহো মহারাজ আচার্যেণাভিকল্পিতঃ ।

তত্র শক্রোপমা সর্বৈ রাজানো বিনিবেশিতা ॥ [দ্রোণ. ৩১]

—হে মহারাজ, চক্রব্যূহ আচার্য দ্রোণ কর্তৃক অভিকল্পিত, তাহাতে ইচ্ছতুল্য সকল রাজা সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন।

এই ব্যূহের মধ্যস্থলে ছিলেন রাজা দুর্ধোধন, তাঁহাকে বেঁটন করিয়া ছিলেন মহারথ কর্ণ, দুঃশাসন ও কৃপ। ব্যূহের প্রবেশপথে ছিলেন স্বয়ং, দ্রোণ এবং শ্রবক পর্বতের মত অচল সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ। জয়দ্রথের একপার্শ্বে অশ্বখামা ও ও দ্রুতরাষ্ট্রের জিশজন পুত্র; অপর পার্শ্বে ধৃতি শকুনি, শল্য ও তুরিষবা। দ্রোণাচার্য-পরিকল্পিত এই ব্যূহবিজ্ঞান নিঃসন্দেহে আশ্চর্য যুদ্ধকৌশলের পরিচয়। জয়দ্রথকে অর্জুনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্রোণকর্তৃক চক্র-শকট ব্যূহ নির্মাণ কৌশলের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বাইতে পারে।

॥ ব্যাসকূট ও প্রহেলিকা ॥

মহাভারতের বর্ণনায় কবিত্ব ভো আছেই, একক ভাবে ইহার শ্লোকগুলির কাব্য-মূল্যও বৃদ্ধি। ভারতকথার প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোক হীরকের মত উজ্জ্বল ও নিহিতার্থ-বোধক। উহাতে আশ্চর্য মনোবিভা ও মনোমগ্ন বিলম্বনের স্বাক্ষর বিস্তারিত। মহাভারতে শক্তি ও স্মৃতিশক্তিবলীর সংখ্যা অসংখ্য : হিতোপদেশ ও নীতি উপদেশের অন্ত নাই। শুক্রনীতি ও বাহুস্পত্য নীতির ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ইহাতে শ্লোক পরিবেশন করা হইয়াছে।

১. রাংলাসাহিত্যের বিকাশের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে সংকৃত সাহিত্যে যে সকল চাপক্যাক্ষর, নীতিশব্দক বা বৈরাগ্য শব্দক রচিত হইয়াছে, তাহা বহাভারতীয় শ্লোকগুলিরই প্রকারভেদে বাজ ; কোথাও বা ভবৎ প্রভিমানি ।

বহাভারতে এই শ্লোক ব্যতীত আছে কতকগুলি 'বাসকূট' ও প্রহেলিকা । এই শ্লোকগুলি পরবর্তীকালের ধাঁধা, তর্জী ও প্রহেলিকার উৎস । অবশ্য প্রহেলিকার কিছু কিছু নিবর্ণন রহিয়াছে বৈদিক সাহিত্যে । অথেষ্টের 'হংসবতী বক' এবং বিশেষতঃ ঋষি দীর্ঘতমাদৃষ্ট শব্দ [ঋ, ১. ১৬৪] রহস্যময় ও গূঢ়ার্থব্যাক্ত । এই রচনাধারার সৃষ্টিস্থিত প্রকাশ বহাভারতের 'বাসকূট' । কিংবদন্তী এই যে, ব্যাসদেব গণেশকে বহাভারত লিখিয়া দিবার অল্পরোধ করিলে, গণেশ একটি মর্তে রাজি হন যে শ্লোকগুলি বলিবার সময় ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না, তাঁহাকে অনর্গল বলিয়া বাইতে হইবে । ব্যাসদেব তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া আর এক মর্ত করেন যে, লিখিবার সময় গণেশকে অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে । ব্যাসদেব কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াই এক একটি কূট শ্লোক বলিতেন, অর্থ বুঝিয়া তাহা লিখিতে গণেশের একটু বিলম্ব হইত । সেই অবসরে ব্যাসদেব আবার চিন্তা করিয়া পরের শ্লোকগুলি বলিয়া বাইতেন । ইহাই 'বাসকূট'-উৎপত্তির জনশ্রুতি । জনশ্রুতি বাহাই হউক 'বাসকূট' আশ্চর্য প্রহেলিক।—বাসকূটের ভাষা হুবোধ্য না হইলেও অর্থ অতি রহস্যময় । বাচ্য অর্থ ইহার প্রকৃত অর্থ নয়, নিহিতার্থ উল্কাটন করাও দুঃসাধ্য । যেমন,

১. সুধিষ্ঠির বারশাবতে বাইবার সময় প্রাজ বিহুয় প্রাজ সুধিষ্ঠিরকে হুবোধ্য ভাবারউপদেশ দিয়াছিলেন : এই বৃত্তান্তটি একটি হৈয়ালীরাধাধ্যমে প্রকাশকরা হইয়াছে :

প্রাজঃ প্রাজপ্রাণপজঃ প্রাণপজমিবৎবচঃ ।

প্রাজঃ প্রাজঃ প্রাণপজঃ প্রাণপজঃ বচোহব্রবীৎ ॥ আদি, ১৩৯. ২০]

ইহার বাচ্যার্থ—প্রাজ ও প্রাজকথার অভিজ্ঞ বিহুয় প্রাজ কথার অভিজ্ঞ সুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ; প্রাজ প্রাজকে, প্রাণপজ প্রাণপজকে এই কথা বলিলেন ।^১

২. আর একটি ব্যাসকূট বিরাট পর্বের । বিরাটরাজপুত্র উত্তর কুরুসৈন্য দ্বর্পনে

১। ঐচতত্তমসেবের নিকট অবৈত মহাপ্রভু-প্রেরিত তর্জীটিও ঠিক এইরূপ :

বাউলকে কহিও মোকে হইল আউল ।

বাউলের কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল ।

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ [উঃ চ. অধ্য ১৯ পঙ্কি]

ভীত হইয়া পলারনে উত্তত, স্ত্রীব বেশী অর্জুন তাহাকে কিরাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন।
তখন স্রোণ বলিয়াছিলেন :

নদীজ লঙ্কেশ বনারি কেতুন গাহারো নাম নগারিহুহঃ ।

এবোহনবাবেবধরঃ কিরীটী জিহ্বা বয়ঃ নেহতি চাত্ত পাবঃ ॥ [বিরাট ৩৬]

ইহার বাচ্যার্থ : হে ভীম (নদীজ), এই স্ত্রীববেশধর কপিলবন (লঙ্কেশ-বনারি
কেতু) ইন্দ্রপুত্র (নগারিহুহ) অর্জুন (নগাহারো নাম) কিরীটী আঘাতিকে
জয় করিয়া আন গাভীগুলি লইয়া বাইবে ।

ব্যানকূট ছাড়া প্রহেলিকা জাতীয় লোকের সংখ্যাও মহাভারতে প্রচুর।
প্রহেলিকার বহিরঙ্গ ব্যানকূটের মত, কিন্তু ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। প্রহেলিকার
গূঢ়ার্থ বুদ্ধিগম্য। লাক্ষ্যবিশেষের অর্থ জানা থাকিলে প্রহেলিকার অর্থ নির্ণয়ে
কষ্ট হয় না। লক্ষ্যবস্তুর মতে প্রহেলিকা 'কূটার্থ ভাবিতা কথা'—উহার বহুপার্থ
প্রচ্ছন্নঃ^১

১. মহাভারতের বনপর্বে অষ্টাবক্র উপাখ্যানে অষ্টাবক্রের প্রতি জনকের প্রশংসা
প্রহেলিকাজাতীয়। জনক প্রশ্ন করিলেন :

বড়বে ইব সংযুক্তে স্তোনপাতে দিবৌকলম্ ।

কন্তরো গর্তমাধন্তে গর্তং সমুত্ত্বত কন্ম ॥ [বন ১০২, ২৬]

—দুইটি ঘোটকীর স্তায় বাহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং দুইটি শ্রেন পক্ষীর
স্তায় বাহাদের পতন হয়, কোন্ দেবতা তাহাদের উৎপাদক ? তাহারাই বা কাহার
উৎপাদক ।

২. উভোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিহুরের এই উক্তিটিও একটি প্রহেলিকা,

একরা যে বিনিশ্চিত্য ত্রীঃচতুর্ভির্ভশে কুহ ।

পক জিহ্বা বড়্ বিদিত্বা লপ্ত হিহ্বা স্ত্রী ভব ॥ [উভোগ, ৩০, ৫০]

—এক দ্বারা দুইকে জানিয়া, তিনকে চার দ্বারা বশ কর ; পাঁচকে জয় করিয়া,
ছয়কে জানিয়া, সাতকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রী হও ।

এইরূপ বহু প্রহেলিকা মহাভারতে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। ব্যানকূটই হউক
বা প্রহেলিকা হউক, উক্তিগুলি প্রথমে বুদ্ধিসীল। তবে বুদ্ধির পরীক্ষা ইহাদের
অন্ততম লক্ষ্য হইলেও রসস্বাদের লক্ষ্যটিও উপেক্ষীয় নয়। প্রহেলিকার যে কোতূহল
উৎসাহ হয়, তাহাতে কোতূহলোত্তর স্পর্শও বর্তমান ।

১। ব্যাকীকৃত্য কমপি অর্থঃ বহুপার্থত গোপন্যং ।

বড় বাহাদুরাবর্ষী কথ্যতে না প্রহেলিকা ॥

৬. বহাভারতের খিল অংশ (হরিবংশ)

‘হরিবংশ’ বহাভারতের পরিশিষ্ট। ইহাও ব্যাসদেবের রচনা। বহাভারত কীর্তন করা হইলে আরেকর বিস্তৃতভাবে বৃকি-অঙ্কবংশের কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন, ‘কথয়ত্ব কুলং তেবাং বিস্তরণেণ তপোধন’। এই জিজ্ঞাসার উত্তর ‘হরিবংশ’ ইহাতে বিশেষতঃ ভগবান বিষ্ণুর লীলা কীর্তিত হইয়াছে।

হরিবংশের মোট তিনটি পর্ব : হরিবংশপর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব। হরিবংশ পর্ব পুরাণ-লক্ষণসহ বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণের তুমিকা; বিষ্ণুপর্ব কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার বর্ণনা, ভবিষ্যপর্বও অনেকাংশে কৃষ্ণের দ্বারাবতী লীলার অন্তর্ভুক্ত।

হরিবংশ নানাদিক চইতে পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ বিষ্ণুপর্ব : ইহাই কৃষ্ণের জীবন-লীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত এই অংশের সাদৃশ্য আছে। ভাগবতে রাধার নাম নাই, হরিবংশেও রাধার নাম নাই; এখানে গোপী-ক্ৰীড়ার নাম ‘হল্লীস’ এবং ইহার বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। শারদী সন্দের নিশায় চন্দ্রোদ্ভাসিত বন দেখিয় কৃষ্ণ ‘মনচ্চক্রে রতিং প্রতি’। গোপীগণ ‘বাধীনা পতিভিঃপ্রীতিভির্মাভূতিস্তথা’—কৃষ্ণকে অধেষণ করিতে বনে আসিলেন, তাঁহারা ‘দামোদরপরায়ণা’, তাঁহাদের মুখে কৃষ্ণচরিত গান [গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং]। কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত মনোরথানুসরণ ক্রীড়া করিলেন :

এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কতঃ ।

শারদীযু সচন্দ্রাহ নিশাহু মুমুদে হৃদী ॥ [হরি. বিষ্ণু. ২০]

—ইহাই হরিবংশের গোপী-ক্ৰীড়া বা হল্লীস।

হরিবংশে দুইটি ‘আর্য্য্য স্তব’ বিস্তৃত হইয়াছে। এই স্তবে শক্তিদেবীকে ‘কোটবী’ (মহা), ‘দাক্ষীণীঃ মদুরাবাসাঃ’ এবং ‘কিরাতীঃ চৌরবসনাঃ চৌরসেনানামকৃত্যাম্’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য ইনিই যে আবার ‘অচিন্ত্যা হুগ্রমেরা’ তাহাও বলা হইয়াছে [হরি. বিষ্ণু. ১২০]। উষা-অনিকন্ড কাহিনীতে এই দেবীই উষাকে বর দিয়াছিলেন, ‘উষে স্বং ঐতমপেধ্য্য ভদ্রাং লহ রমিষ্ঠসি’। উষা ও অনিকন্ডের গোপন মনোবাসনা লিখ হইয়াছিল। Winternitz মনে করেন, হরিবংশের আর্য্য্যস্তব প্রকৃষ্ট।

এই গ্রন্থে বহাভারতের দুইটি দুর্গাভবের কথা মনে পড়ে; একটি বিদ্যাটপর্বে

সুখিষ্টি-কৃত হুর্গাভব আর একটি ভীষণপর্বের অঙ্কন-কৃত 'হুর্গাভব'। বিরাটপর্বের স্তবটি অনেকই প্রকিণ্ড মনে করেন। অঙ্কনের হুর্গাভবের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণভাগত নারায়ণী-স্ততির প্রতিলিপি আছে। মহাভারতে হুর্গাভবের 'সিন্ধবেনা', 'কালী', 'কপালী' 'করালী' নামগুলি পাওয়া যায়। এই নামগুলিও উল্লেখযোগ্য :

ভবকালি নবভভ্যং মহাকালি নমোহম্বতে ।

চণ্ডি চণ্ডে নবভভ্যং ভাঙ্গিণি বরবর্ণিণি ॥ [ভীষ্ম. ২৭. ৫]

মহাভারতের দেবীরূপ আর্ঘ্যকৃত ; হরিবংশে প্রাগাৰ্ঘ্য রূপটি পরিষ্কৃত :

পর্বতাত্রেয়ু বোরেষু নদীষু চ শুভাহ চ ।

বাসন্তব মহাদেবী বনেশুশবনেষু চ ।

শবরৈবকরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ স্থপূজিতা ।

ময়ূরপঙ্খজিনি লোকান্ ক্রমাস সবশঃ ॥ হরি. বিষ্ণু. ৩]

'হরিবংশ' হইতে তৎকালীন অভিনয়কলার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। বহু লৈঙ্গগণ নটবেশে গিরিরাজ প্রবেশ করিয়া রামায়ণ অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন,

নান্দিন্ চ বাদয়ামাস প্রত্যাগো গম্ এষ চ ।

সাম্বন্ত বীৰ্যসম্পন্নঃ কাৰ্য্যার্থং নটতাং গতঃ ॥

নান্দ্যন্তে চ তদা দ্রোকং গজাবতরপাশ্রিতম্ ।

মৌলিগেয়স্তদোবাচ সম্যক্ স্ববিনয়ান্বিতম্ ॥ [হরি. বিষ্ণু. ২৪]

অভিনয়কলার এই পদ্ধতিই দেখা যায় পরবর্তী সংস্কৃত নাটকে। অধর্মণ কে ? হরিবংশ, না সংস্কৃত নাটক ? পণ্ডিতপ্রবর Wilson-এর মতে হরিবংশ নবম শতাব্দীরও পূর্বের। মনে হয়, হরিবংশ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক বা তাহারও পূর্ববর্তী।

মহাভারতের খিলঅংশ (পরিশিষ্ট) হইলেও, মহাভারতের কবিশ্ব হরিবংশে নাই। হরিবংশের প্রকৃতি পুরাণের অঙ্গরূপ। বর্ণনা বিবৃতি-প্রধান ও অনেকটা নিরাভরণ।

২. জৈমিনী মহাভারত ॥

মহাভারত প্রসঙ্গে মহাভারতের আর একটি সংস্করণ 'জৈমিনী-ভারত'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার বিশেষত্ব অশ্বমেধ পর্বের বর্ণনায়। বৈয়াক্ষী মহাভারতে অশ্বমেধ-পর্বের বিবিস্বয়ের অংশ অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু জৈমিনী-ভারতে এই অংশ বিস্তৃত। ইহাতে স্ত্রীরাজ্যে (প্রমীল-রাজ্যে) স্বকীয় অশ্বের অভিযান এবং চন্দ্রহাদের উপাখ্যান বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা মহাভারত অশ্বমেধপর্বের বর্ণনায় জৈমিনী-ভারতকেই অঙ্গলয়ণ করিয়াছে।

৭. বাংলা মহাত্মারত

রায়বর্গের রত মহাত্মারতকথাও বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত। 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা', 'ধর্মপুত্র সুব্রত', 'রক্তনে ঘোষণা', 'বিভূরের পুত্র', 'মাতুল শকুনি', 'মাতাকর্ণ', 'ভীষ্মের পদা', 'করে কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি প্রবাদ-প্রবচন হইতে মহাত্মারত কোন্ কোন্ বিক হইতে বাঙালীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা অস্বপ্নান করা যায়। রায়বর্গের রত মহাত্মারত ঠিক গৃহস্থালির আদর্শ হিসাবে এদেশে দান লাভ করে নাই। মহাত্মারতে জাতিবিরোধ এমন চরমে উঠিয়াছে যে, সর্বভারতীয় রাজস্ববর্গের বুদ্ধকোলাহলে পরিবারিক জীবনের প্রীতিমিষ্ট শাস্ত পরিবেশটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহাত্মারতের গৃহজীবনে কোথায় যেন অভিযান আছে। লুপ্তপ্রায় পৌরব বা কোরববংশের বাতি বখানিয়মে জ্বলেন নাই। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাবশে চিরকুমার রহিলেন, সত্যবতী-সুত চিত্রাঙ্গদ অকালে যুদ্ধে নিহত হইলেন, বিচিত্রবীর্য সন্তোষে প্রবৃত্ত হইয়া বন্দারোগে প্রাণ হারাইলেন। অতএব বংশ রক্ষা হইল না। ভগবান ব্যাসদেব যে নিয়মে সেই বংশধারাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাও এদেশের গৃহজীবনের আদর্শ নয়। কুরুবংশে কানীন পুত্র কর্ণের দীর্ঘবাস পড়িয়াছে, কৃকার হাহাকারে গার্হস্থ্য জীবন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মারত গৃহজীবনের আদর্শ নয়, বিভীষিকা। 'মাতুল শকুনি', 'করে কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি প্রবাদ তাহারই ইঙ্গিত। অবশ্য ধর্মশাস্ত্ররূপে মহাত্মারতের 'মতোবর্মন্ততোজয়ঃ' নীতি বাঙালীর অন্তরে ক্রমাক্রমে গ্রথিত হইয়া আছে।

ধর্মশাস্ত্ররূপে বাংলাদেশে মহাত্মারতের এই প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত স্বদূর পাল আমল হইতে পাওয়া যায়। মদনপালদেবের পাটমহিষী চিত্রমতিকা বটেধরস্বামী নামক একজন পাঠকের মুখে ভারতকথা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণাশ্বরূপ তাঁহাকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।^১ বস্তুতঃ অব্যতসমান ভারতকথা বাংলাদেশে ধর্মশাস্ত্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত। পুণ্যকামী ব্যক্তি মহাত্মারত শ্রবণ করেন, বাঙালীর প্রান্তবাসরে 'বিরাত', 'ঈতা' পাঠ করা হয়, যত্নের শোককরুণ পরিবেশে 'শান্তিপর্ব' পাঠ করিয়া বাঙালী শান্তি ও সাধনা লাভ করে, বিভূরের যুদ্ধকণায় তৃপ্ত ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া দারিদ্র-দৈন্ত পীড়িত ভক্ত বাঙালী অশ্রুজলে সিক্ত হয়।

কিন্তু ভাবার মহাত্মারত রচনার পশ্চাতে অন্য একটা উদ্দেশ্য দেখা যায়। রায়বর্গ ও মহাত্মারত দুইই রাজস্বতাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভাবার ভারত

১। পতিভট্টপুত্রবটেধরস্বামিশ্রবণে পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকার। বেদব্যালগ্রোক্ত প্রপাঠিতমহাত্মারত সমুৎপত্তিদক্ষিণাশ্বেন ভগবন্তঃ বৃহত্তারকমুদিত শালমীকৃত্য ঐক্যতোহমতি—মদনপালদেবের তাম্রশালম।

রচিত হইয়াছিল মুসলমান সম্রাটের অজ্ঞায়। প্রাচীন বাংলা মহাভারতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডব বিজয় পাকালিকা' এবং শ্রীকর নন্দীর 'অশ্বমেধ কথা'। এই দুইখানি কাব্যই মুসলমান লঙ্করদের নির্দেশে রচিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পোটা লঙ্কর পরাগলখান, আর শ্রীকর নন্দীর কাব্যের উৎসাহবাহতা পরাগলহৃত ছুটিখান। লঙ্কর পরাগলখান ধর্মযতি—'পুরাণ শুনত নিত্য হরষিত যতি'—আর ছুটিখানও 'বলিকর্ণ দশীচি সন্ধান বার দান।' অতএব ধর্মকাহিনী প্রবণ করিবার আগ্রহ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে বাতাবিক। কিন্তু অস্তান্ত পুরাণ ছাড়িয়া মহাভারতের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল কেন? অনেকেই মনে করেন, মহাভারতে রাজনীতির প্রাধান্য। ভারতকথা রাজনীতির ফুটকোশলে ও যুদ্ধের দ্বারা পূর্ণ। মহাভারত পাঠের কলঙ্কটিতে বলা হইয়াছে—'জয়ো নামেতিহাসোহয়ং স্রোতযো বিজিগীষুণা'। মুসলমান সম্রাটগণ ছিলেন জিগীষু; হুসেনশাহ 'অনুশব্দে সুশাওত', লঙ্কর পরাগলখান চট্টগ্রাম বিজয়ী, আর ছুটিখান 'সমরে নির্ভর'। তাই জয়েচ্ছু সম্রাটগণের পক্ষে যুদ্ধবর্ণনাবহুল 'জয়াখ্য' পাণ্ডববিজয় প্রবণের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বিতীয়তঃ বাংলায় রচিত মহাভারতগুলিতে অশ্বমেধ পর্বের সংখ্যাবহুলা যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অশ্বমেধ পর্বের আদর্শ বৈয়্যাসকী মহাভারত নয়, জৈমিনীকৃত মহাভারত। বৈয়্যাসকী মহাভারতে পাণ্ডবগণের দ্বিযজ্ঞ বর্ণনাপ্রসঙ্গে পাঁচম ও উত্তর ভারতজয়ের কাহিনী প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু জৈমিনীভারতে প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে ভারতের পূর্বাঞ্চল জয়ের কাহিনী। মুসলমান লঙ্করদেরও বিজয়ের লীলাভূমি ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চল। তাই অশ্বমেধ পর্ব প্রবণে মুসলমান সম্রাটগণ এত আগ্রহাধিত ছিলেন। সম্ভবতঃ জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের জয় গোরব প্রচারের আকাঙ্ক্ষাও মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব দ্বারা সম্পন্ন হইত। হয়তো তাঁহারা বুঝাইতে চাহিতেন, যে পূর্বদেশ জয় করিতে আসিয়া গাণ্ডীবধন্য অজ্ঞানের বিজয় গাণ্ডীব বারবার হস্তচ্যুত হইয়াছে, সেই দেশ তাঁহারা অবলীলাক্রমে জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন। যোড়ের উপর বাংলাভাষার প্রাচীন মহাভারত রচনার প্রেরণা ঠিক ধর্মশাস্ত্র প্রবণের আকাঙ্ক্ষার জাগ্রত হয় নাই, উহার পশ্চাতে অস্তান্ত রাজনৈতিক কারণগুলিই প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়। বাংলার অশ্বমেধপর্ব রচনার প্রাচুর্যও এই সত্য প্রমাণ করে। জিগীষু ব্যক্তিদের দ্বারা বা জয়েচ্ছু নৃপতিদের প্রেরণায় এগুলি রচিত হইয়াছে।

কিন্তু আদৌ যে উদ্দেশ্যেই বাংলামহাভারত রচিত হইয়া থাকুক, শেষ পর্যন্ত ইহা ধর্মশাস্ত্রের স্থানই অধিকার করিয়াছে। বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে যে মহাভারতখানির সমাদর, বাহার প্রতিষ্ঠা কৃতিবাসী রামায়ণের তুল্য, সেই কান্দীশালী মহাভারত এদেশে ধর্মগ্রন্থরূপেই প্রচারিত : কান্দীশালের মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যও ধর্মমূলক :

যেই বাহা করি হোক তনয়ে ভারত ॥

গৌবিন্দ করেন পূর্ণ ভার মনোরথ ॥

প্রচারবাহ্য্য ও জনপ্রিয়তার কানীরায দাসের মহাভারত বাংলার সর্বাগ্রগণ্য। কানীরাযদাসের নামে প্রচলিত মহাভারতখানি কানীরাযের একাধি রচনা কি না, সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন Composite text, কানীরাযের মহাভারত সম্পর্কেও অল্পরূপে সন্দেহ প্রযোজ্য। ডঃ হুসুয়ার সেন বলেন, ‘অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবির রচনাগ্রন্থ মিলিত হইয়া কানীরাযের নামিত ভারতপাঁচালীতে পরিণত হইয়াছিল। কানীরাযের কাব্য বলিতে আমরা কানীরায-গোষ্ঠীর এই সংহিতাই বুঝি’।^১ উক্তিটির বাথার্থ অশংসনিত। কানীরাযদাস ভাষায় ভারতপাঁচালীর আদিপ্রণেতাও নহেন—তথাপি বাংলার মহাভারতরচনার বাণ্যভীর গৌরব কানীরাযদাসের। এই মহাভারতখানি বিশ্লেষণ করিলেই বাংলা-মহাভারতের রূপ ও স্বরূপ ধারণা করা সম্ভব।

(১) প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য প্রারম্ভ: মূল হইতে বিচ্যুত, উহা স্বাধীন করন। ও লোকশ্রুতিধারা পরবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু কানীরাযদাসী মহাভারত এ দিক হইতে একটি ব্যতিক্রম। উহাতে স্বাধীন করন। ও বাংলার লোকশ্রুতি বা বিশ্বাস স্থান লাভ করিলেও উহা মোটামুটি মূলের সার্থক অন্তর্ভাব। রামায়ণে যেমন অবাধ করন। মুক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইয়াছে মহাভারতে সেরূপ হয় নাই। বাংলা মহাভারতে মূল সংক্ষেপিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্ভাব প্রায় মূলেকেই অন্তর্ভবন করা হইয়াছে। যেমন,

(ক) বৈরাগ্যকী মহাভারতের ‘কুমারা চাপি পাঞ্চালী বেলীমধ্যাং সমুখিতা’
দ্রোণদীর উৎপত্তি-বর্ণনা [আদি ১৬০] কানীরাযদাসী মহাভারতে হইয়াছে:—

তবে ঐ বজ্রমধ্যে কস্তার উৎপত্তি।

জন্মমাত্র দণ্ডিক করে মতাচ্যুতি ॥

নীলপদ্ম আভা অঙ্গে অমর বশিরী।

নিফলক ইন্দ্রজ্যোতি ঘনপীনস্তনী ॥

অঙ্গের নৌরত এক যোজন ব্যাপিত।

সুপ্রসন্ন বস্ত্রক গজব বাহিত। [আদিপর্ব]

১। বাহালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড)—ডঃ হুসুয়ার সেন।

(খ) ইজ্ঞাপ্রদে দুৰ্বোধনের প্রবাদ : বৈয়াসকী মহাভারত—

ন কদাচিৎ সভায়যো বার্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।
 ক্ষাটিকঃ জলসানন্ত জলমিত্যাভিশঙ্করা ।
 স্ববদ্রোৎকর্ষণঃ রাজা কৃতবান্ বুদ্ধিমোহিতঃ ॥
 দুর্মনা বিমুখশ্চৈব পরিচক্রাম তাত্ সভাম্ ।
 ততঃ হলে নিপতিতো দুর্মনা ব্রীড়িতো নৃপঃ ॥
 ততঃ ক্ষাটিকতোয়াঃ বৈ ক্ষাটিকাবুজশোভিতাম্ ।
 বাপীঃ মদ্বা হলমিতি শ্রবাসাঃ প্রাপতজ্জলে ॥
 জলে নিপতিতঃ দৃষ্ট্বা কিঙ্করা জহহতৃশম্ । [সভা. ৪৫]

কাশীদাসী মহাভারত :

বিহার মাতুল সহ করে নয়বর ।
 ক্ষাটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর ॥
 জল জানি নয়পতি গুটার বসন ।
 পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লঙ্কিত রাজন ॥
 তথা হইতে কতদূরে গেল নয়বর ।
 লঙ্কার মলিন মুখ কাঁপে ধরধর ॥
 ক্ষাটিক মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল ।
 সবসন দুৰ্বোধন বাপীতে পড়িল ॥
 দেখিয়া হাসিল লবে বত সভাজন । [সভাপর্ব]

(গ) যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকের প্রশ্ন : বৈয়াসকী মহাভারতে :

কা চ বার্তা কিমার্চ্য্য কঃ পশাঃ কশ্চ বোদতে ।
 মমৈতান্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িষ্য জলং পিব ॥ [বন. ২৮৭]

কাশীদাসী মহাভারত :

কিবা বার্তা কি আর্চ্য পথ বলি কারে ।
 কোন্ জন স্থখী হয় এই চরাচরে ॥
 পাণ্ডুপুত্র আমার বে এই প্রশ্ন চারি ।
 উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥

(২) মোটামুটি মূল্যায়ন হইলেও কাশীদাস স্বাধীনতাও প্রচুর দেখাইয়াছেন :

(ক) প্রথমতঃ কাশীদাসী মহাভারতে কোথাও মূলের ঘটনা ইচ্ছানুযায়ী লঙ্কিত, উহাতে পারম্পর্য-ক্রমও লঙ্কিত । বৈয়াসকী মহাভারতের অমূল্যানপর্ব এবং মহাপ্রহেলিকা পর্ব

কাশীদাসে নাই—এইগুলি সংক্ষেপে বর্ণাক্রমে শান্তি ও বর্ণারোহণপর্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাশীদাসে গদাপর্ব ও ঐবীক পর্ব পৃথক পর্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। মূলে ‘গদামূকপর্ব’ শল্যপর্বের উপপর্ব এবং ঐবীক পর্ব সৌপ্তিক পর্বের অন্তর্ভুক্ত। মূলের পর্বসংখ্যা একরূপ থাকিলেও পর্বনাম নির্বাচনে কাশীদাসে স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

(খ) কোন-কোন স্থলে মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে কাশীদাস রঙে-রেখায় বিস্তারিত করিয়াছেন, যেমন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের এই অংশ :

মূল : ততো হুঃশাসনো রাজন্ দ্রৌপত্যা বসনং বলাৎ ।
 সভামধ্যে সমাক্ষিপা ব্যাপাক্ষটুং প্রচক্রবে ॥
 কৃককৃ বিকৃকৃ হরিং নরকৃ জ্ঞাপ্য বিক্রোশতি রাজসেনী ।
 ততস্ত ধর্মো হিন্তুরিতো মহাত্মা সমাব্রণোদ্বিবিধৈবস্ত্র পূটৈঃ ॥
 আক্লম্ব্যমানে বসনে দ্রৌপত্যন্ত বিশাম্পতে ।
 তক্রপমশয়ং বস্ত্রং প্রোত্তরাসীদনেকশঃ ॥
 নানারাগবিরাগাণি বসনান্তথ বৈ শ্রভো ।
 প্রোত্তরবস্তি শতশো ধর্মন্ত পরিপালনাৎ ॥ [সভা. ৬৫]

কাশীদাসী মহাভারত :

একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী স্তম্ভরী ।
 হুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
 সঙ্কটে পড়িয়া দেবী সজল নয়নে ।
 আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে নারায়ণে ॥
 ওহে প্রভু কৃপাসিক্ত অনাথজনের বহু
 অধিলের বিপদ ভঞ্জন ।
 হেথায় সভার মাঝ ইথে নিবারিতে লাগ
 তোমা বিনা নাহি অস্ত্রজন ॥
 যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি সংহার করিতে কটি
 পুনঃপুনঃ হও অবতার ।
 ৬৫ তাঁহার চরণ ছায়া স্রিয়া স্পিহু কারা
 অনাথার কর্ত্ত প্রতিকার ॥
 দ্রৌপদী আকুল জানি অস্থির সে চক্রপাণি
 ষার নাম বিপদভঞ্জন ।

ধর্মরূপে বিশ্বপতি রাখিতে এলেন সতী

সত্যধর্ম করিতে পালন ॥

আকাশবার্গেতে রয়ে বিবিধ বসন লৈয়ে

ত্রৌণদ্বারে সন্ধনে যোগায় ।

বত ডঃশালন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে

আচ্ছাদন করি সর্বগায় ॥

লোহিত পিঙ্গলপীত নীল শ্বেত বিরচিত

নানাচিত্র বিচিত্র বসনে ।

বিবিধ বর্ণের শাড়ী ডঃশালন ফেলে কাড়ি ।

পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল চানে ছানে ॥

(গ) কালীদাসদ্বারা নৃতন বিষয়যোজনাও অল্প নয়। বনপবে ত্রিংশসরাজার উপাখ্যান, বিদ্যুত ত্রীক্রেত্ৰ মাংসাদি—বিরটিপর্বের গোয়াল অংশে রণভূমে চামুণ্ডার আগমন ও খর্পর ভরিয়া অর্জুনের কল্যাণে মৃতসৈন্তের ক্রিয় পান—শান্তিপর্বে একাদশী মাংসাদি ও হরিমন্দির মার্জনের ফল বর্ণনা প্রভৃতি মূল মহাভারতে নাই। শুধু তাই নয়, কালীদাসী মহাভারতেও ভক্তিবাদের—বিশেষতঃ হারভক্তিবাদের যে প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাও মূলবহির্ভূত। তবে ভক্তিবাদী রামায়ণের লোবশ্রুতি ও ভক্তিবাদের তুলনায় কালীদাসে অবাস্তব অংশের যোজনা অল্প।

(ঘ) কালীদাসী মহাভারতে মূল হইতে বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা বেশী অশ্বমেধপর্বে। বাংলায় রচিত অশ্বমেধপর্বের আদর্শ বৈয়্যাসকী মহাভারত নয়, জৈমিনী মহাভারত ও গর্গসংহিতা। বৈয়্যাসকী মহাভারতে পাণ্ডবগণের দ্বিবিজয়ের বর্ণনা অংশ সংক্ষিপ্ত। উহাতে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে মকুন্ড-উপাখ্যান, অঙ্গুগীতা ও দানধর্মের কথা। দ্বিবিজয় অংশে দ্বিগন্ড, সিদ্ধদেশ, গান্ধার ও মগধজয়ের সহিত সংক্ষেপে প্রাগ্জ্যোতিষ, মণিপুর ও বজ্রজয়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু জৈমিনীভারতে বজ্রাখের স্ত্রীরাজ্যে গমন, চন্দ্রহংসরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ আছে। কালীদাসী মহাভারতে মকুন্ডের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত, বিদ্যুতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যুবনাথরাজার কাহিনী; অঙ্গুগীতা বা দানধর্মের প্রসঙ্গ একেবারেই অঙ্গুপস্থিত; যুদ্ধাংশের বর্ণনায় কালীদাস মূলের সভাপর্বের পাণ্ডবদ্বিবিজয় ও অশ্বমেধপর্বের পাণ্ডবদ্বিবিজয় একত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মূলের নীলরাজার কাহিনী—যেখা কালীদাসে অতি বিদ্যুত নীলধ্বজ-জনা উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। সভাপর্বের হংসধ্বজ রাজার প্রসঙ্গ কালীদাসে বিদ্যুত হংসধ্বজকাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কালীদাসদ্বারা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ

কল্পিত ভাৱতের পূৰ্বাৰূপ জৱের কাহিনী—এই কাহিনীগুলির মধ্যে প্রধান পৰীক্ষা-ব্রাহ্মণ বজাৰের প্ৰবেশ এবং বনিপুৰে বজ্জবাহনের উপাখ্যান।

৮. অব্যমুখে বাংলায় ভারতী কথার রূপায়ণ

প্ৰাচীন বাংলায় মহাতারতের বিচিত্র উপাখ্যান যেমন বাংলা মহাতারতের মাধ্যমে পৰিবেশন করা হইয়াছে, তেমন আধুনিক বাংলায় ভারতীকথার রূপ পৰিবেশিত হইয়াছে নবযুগের বাজা, নাটক ও কাব্য-কবিতার মাধ্যমে। কালীপ্ৰসন্নসিংহের মহাতারতের পদ্ধতিবাহ ব্যতীত অথও কোন মহাতারত নবা বাংলায় রচিত হয় নাই। বাজা বাজা, নাটকে ২১ কবিতার রূপ লাভ করিয়াছে তাহাও মহাতারতান্তৰ্গত কোন খণ্ড উপাখ্যান। বাজার ভক্তিবাদ, অলৌকিক বিশ্বাস ও রোদ্ৰসের প্ৰভাব। তাই বীরসের নামে রোদ্ৰসাস্ত্ৰক ‘অভিমত্ৰ্যবধ’ (কেদারনাথ, তিনকড়ি বিশ্বাস, ব্ৰজমোহন রায়), নতীনারীর কাহিনীৰূপে ‘সাবিত্ৰী সত্যবান’ (তিনকড়ি বিশ্বাস, কেদারনাথ, ব্ৰজমোহন), ‘নলদময়ন্তী’ (হরিশ্চন্দ্ৰ মিত্ৰ, ভোলানাথ মুখো) এবং ভক্তিমূলক কাহিনী-ৰূপে ‘তৰ্বাসার পারণ’ (ভোলানাথ মুখো), পাকালীর বস্ত্ৰহরণ (তিনকড়ি বিশ্বাস) প্ৰভৃতি পাল বাজাব প্ৰধান উপাখ্যে হইয়াছে। বাজাপালার আদৰ্শও মূল মহাতারত নয়, কাশীদাসী মহাতারতই উহাদের আদৰ্শ। তাহাও আবার অতিউজ্জ্বলিত ভক্তি, মূল চান্ত, মোহৰ্শক রোদ্ৰসের মিলনে অতিনাটকীয়। মহাতারতীয় উপাখ্যান লইয়া রচিত নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্ৰের ‘পাওব পৌরব’ ও ‘জনা’ নাটকের বিষয়বস্তু কাশীদাসী মহাতারতের অসম্বন্ধপৰ্ব হইতে সমাহৃত। জনার চরিত্ৰে বধুহরণের ‘নীলশ্ৰব্দের প্ৰতি জনা’র প্ৰভাব বিস্তৰমান। পিঁবাধে ভক্তি প্ৰদৰ্শনই এই নাটকের মূল ভাব; জনার প্ৰতিহিংসাপরায়ণা মাতৃমৃত্তি অতিউজ্জ্বলে পূৰ্ণ। এই প্ৰসঙ্গে কীরোদপ্ৰসাদ বিজ্ঞাবিনোদের চয়খানি নাটক—বজ্জবাহন, সাবিত্ৰী, উলুপী, ভীষ্ম, মক্ষাকিনী ও নরনারায়ণ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কাহিনী মহাতারত হইতে সংগৃহীত। বজ্জবাহন ও উলুপী নাটকের কাহিনীতে কাশীদাসের অহংমতি বেশি। কীরোদপ্ৰসাদের সৰ্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নাটক ‘ভীষ্ম’ ও ‘নরনারায়ণ’। উভয় নাটকেই দুইটি প্ৰধান চরিত্ৰ—ভীষ্ম ও কৰ্ণ মানবীয়ভাবে চিত্ৰিত। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পৌৰুষ দৈবধাৰা নিশ্চিত। অলৌকিকতা ও ভক্তিবিশ্বাসকে অতিক্ৰম করিয়া মানবীয় ভাব বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভীষ্ম নাটকে ‘হাতি’ চরিত্ৰের পৰিকল্পনা নৃতন, শিখণ্ডী-অনিত ভীষ্মের অন্তৰ্বেও নৃতনৰ আছে। নরনারায়ণ নাটকের কৰ্ণচরিত্ৰ মহাতারত হইতে স্বতন্ত্ৰ। মহাতারতে যে কৰ্ণ দ্ৰৌপদীর বস্ত্ৰহরণে বজ্জা দিরাছেন, এখানে সেই কৰ্ণই

বিষয়ে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। পদ্মাবতীচরিত্র মূল মহাভারতে নাই। তজ্জবলে পদ্মাবতীর দূর হইতে কককে আকর্ষণ করার দৃষ্ট অলৌকিকতার চূড়ান্ত। ককতজ্জ্বলে কর্ণচরিত্রের পরিসংখ্যাপ্তি—শৌরাণিক নাটকের উপযোগী হইলেও মূল হইতে বিচ্যুত। 'নরনারায়ণ' নাটকে কীরোরপ্রসাদ নৈম ও পুরুষকারের বন্দরূপ যুগোপযোগী একটি সমস্তা অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত পুরাণ-ভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই—শেষ পর্যন্ত 'নিরতি কেন বাধ্যতে' নীতিটই হয় চটয়াছে।

পুরাতন কাহিনীকে যুগোপযোগী আলোকে প্রকাশ করার প্রবণতা উনিশ শতকের প্রথম বৈশিষ্ট্য। যদুসদন বীরসদনা কাব্যে কয়েকটি মহাভারতীয় চরিত্র অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগের প্রেম-বিচিহ্নকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। দুঃস্বপ্নের প্রতি শতৃঙ্খলা, শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ, অর্জুনের প্রতি জ্যোপদী, চর্বাধনের প্রতি ভানুমতী, ভয়ভয়ের প্রতি চুশলা এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা প্রভৃতি পত্রিকাগুলির বিবরণ মহাভারত। মূল পুরাতন, কিন্তু ভাবনা ও প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন। শতৃঙ্খলা পদ্মকালিদাসের প্রভাব গ্রহিয়াছে; মহাভারতের শতৃঙ্খলা ব্যক্তিগত হোয়া উজ্জল, যদুসদনের শতৃঙ্খলা ব্যক্তি-বাতব্যাঅপেক্ষা ব্যক্তি-ব-বজিত। এক চুশল প্রণয়ভীতির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে : পত্রের ভাষাও গোপন-প্রণয়িনীর আবেগ-পাকিত। জালবীর পদ্মে আধুনিক। কোন প্রণয়িনীর সাধনা-দায়ক প্রত্যাখ্যান—'পত্নীভাণ্ডে আর তুমি ভেদ না আহার।' মহাভারতে জ্যোপদী অর্জুনের দেবপুরে গমনকালে বলিয়াছিলেন, 'নৈব নঃ পার্থ ভোগেশু ন ধনে মোহ আবিতে। তুষ্টিবু ভির্ভবিত্রী বা স্ত্রি হীর্ষ প্রবাসিনি' [বন. ৩৭]—তুমি হীর্ষ প্রবাসী হইলে আমার ভোগে, ধনে বা জীবনে আকাজ্ঞা থাকিবে না, তথাপি তুমি গমন কর, 'বতি প্রাপ্তুছি কোরব।' অর্জুন বর্গপুরে গমন করিলে জ্যোপদী উতলা হইয়া বৃধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, 'শুভ্রামিব চ পত্নামি তত্র তঃ বহীমিহাম।'—সম্যসাচী ব্যতীত আমি এই পৃথিবীকে শূন্য দেখিতেছি। মহাভারতেব বিরহিণী জ্যোপদীর এই অবস্থাকে স্মরণ করিয়া যদুসদন জ্যোপদীর পত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতীয় জ্যোপদীর তেজস্বিতা এ পত্রে নাই, আছে প্রণয়ভীতা এক নব্য নারীর চুশল বর্বাখ্যান—'অরুণী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?' চর্বাধনের প্রতি ভানুমতী ও ভয়ভয়ের প্রতি চুশলা পত্রিকা দুইটিও উনিবিংশ শতকের নারী-মানসের প্রতীক। এই সকল পত্রিকার মধ্য বিরা, নব্য বন কিরূপে প্রাচীন সাহিত্যের রসাব্যবহে তৎপর হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জনার পত্রিকা। জনার চিত্র কাশীদাসী মহাভারত হইতে সন্ধানিত। তেজস্বিনী জনমীর ও দ্বারীর প্রতি অভিযোগকারিণীর মূর্তি যুগোচিত ভাবে প্রকাশিত। যদুসদনে পুরাণ প্রণয়ন পদ্ধতি পদ্ধতিগত বিবাদের পথে নয়, নবলক বৃত্তির পথে।

বহাভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও অপরিণীত প্রত্যাবোধ ছিল ; ভারতীয় জীবনের প্রতিিনি এই বহাভারতের রাসাধাৰীও ছিল হৃৎস্পৰ্শী । বহাভারত যে হৃৎ হৃৎ ধরিতা এশেনবাসীর জ্বরে এক স্কন্ধ শান্তির বাণী স্ফুৰিত করিতা দিতেছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতাছেন [দ্বৈত পুরস্কার—সোনারতরী] । বহাভারতের কয়েকটি আখ্যানকেও তিনি নূতনভাবে রূপ দিতাছেন : বিহার অভিশাপ, গাছারীর আবেদন, কৰ্ণকুন্তী সংবাদ, নরকবাস প্রভৃতি নাট্যকাব্য এবং চিত্রাঙ্কনা নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এই সকল কাহিনীতে তিনি পুরাতনী ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করেন নাই—কিছু পরিবৰ্জন করিতাছেন, কিছু পরিবৰ্ণন করিতাছেন, কিছু পরিবৰ্তনও করিতাছেন—তাহা করিতাছেন মূল কাহিনীর সহিত সঙ্গতি রাখিতাই, কিন্তু সৰ্বাপেক্ষা বড় কথা তিনি সৰ্বত্রই নিজস্ব একটি চিত্রাধারাকে রূপায়িত করিতাছেন ।

বিহার অভিশাপ' বহাভারতের আদিপর্বের কচ-দেববানী সংবাদ অবলম্বনে রচিত । দেববানী প্রণয়ে ব্যর্থ হইয়া বেমন কচকে অভিশাপ দিতাছিলেন, 'কচ ! ন তে বিজ্ঞা সিদ্ধিমেধা পশিষ্যতি'—তেমনি কচও দেববানীকে অভিশাপ দিতাছিলেন, কামপ্রণোদিত হইয়া তুরি বেমন আত্মাকে অভিসম্পাত করিলে, আমিও বলিতেছি তোমারও কাম পূৰ্ণ হইবে না । [আদি ৬৫] । 'বিহার অভিশাপে' কচের প্রত্যভিশাপ নাই, আছে আশীৰ্বাদ ও শুভেচ্ছা,

আমি বর দিচ্ছ দেবী, তুরি স্থখী হবে ।

ভুলে বাবে সৰ্বগ্রানি বিপুল গৌরবে । [বিহার অভিশাপ]

'সোহাৰ্দ্দে চাহুহাণে চ' ঐতিহাসিক দেববানীর চিত্রটি নূতন না হইলেও—জ্বরের ষাত-প্রতিষাত রবীন্দ্রনাথে নূতন ; বাচনভঙ্গী এবং অরণ্যের রূপকল্পগুলিও মৌলিক ।

'গাছারীর আবেদন'এর মূল বহাভারতের সতাপৰ্ব ও উত্তাপৰ্ব । সতাপৰ্বে ষোড়শীর লাক্ষনা চরণে উঠিলে গাছারী বলিতাছিলেন, 'তদ্ব্যধনঃ বহুচনাং ত্যজ্যতাং কুলশাশনঃ' । বহাভারতে গাছারী ধৰ্মভীক নারী, তাঁহার জীবনের মূলদৰ্শন 'বতোধৰ্মন্ততো জয়ঃ' । রবীন্দ্রনাথের গাছারীতেও এই আদৰ্শ প্রতিবিম্বিত, তাঁহারও আবেদন, 'ভাগ করো এইবার' । গাছারী এখানে চরোখন-জননী হইয়াও সমগ্র অত্যাচারিতা নারীর প্রতিিনিধি । চরিত্রটি বহাভারতের চরিত্র হইতে ভিন্ন নয় । অবশ্য বহাভারতে ষোড়শীর প্রতি গাছারীর কোন আশীৰ্বাসী নাই, রবীন্দ্রনাথে উহা কুন্তীর উক্তি হইতে গৃহীত । তাহাবতী-গাছারী সংবাদও মৌলিক । 'অন্ত আমি অন্তরে বাহিরে'—দুতরাষ্ট্রের নৃপ এ ধরনের উক্তি বহাভারতে নাই । বহাভারতে দুতরাষ্ট্র চিরকণ্ঠ । তাঁহার প্রোচকু কোটীল্যনীতির দিক হইতে । অবশ্য পাণের পরিণাম তিনি জানিতেন, জানিতাও

পুঙ্খবহুশেষ ও জাতির প্রতি অহুয়া হেতু তিনি পাণের সন্ধান হইতে বিরত হইতে পারেন নাই। দুর্বোধনের প্রতি তাঁহার যে মেহাঙ্কতা ছিল, তাহা সুপরিস্কৃত। দুর্বোধন মহাভারতের কুটরাঙ্গনীতিক, মণোমত দুর্বোধনেরই প্রতীক। দুর্বোধন যে সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহা মহাভারতের 'কৃত্তিক-নীতি' বা শুক্রনীতি বা 'বার্হস্পত্য নীতি'রই প্রতিধ্বনি—নৃতনয় বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যে দৃষ্টান্ত ও উপমাগত বাচন দ্বারা উহা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে গৃহীত। কর্ণ ও কুন্তী রবীন্দ্রনাথের নৃতন সৃষ্টি নয়। কুন্তী এখানে মেহলীলা জননী। মহাভারতেও কর্ণকে রত্নশালার দর্শন করিয়াই কুন্তীর মূর্ত্তা ['কৃত্তিকভোক্তৃত্বা মোহং বিজাতার্থা জনাম হ' —আদি ১০১] : দুর্বোধন কণ্ঠক কর্ণের অহুয়াজ্যে অভিযুক্ত হওয়ার সংবাদে কুন্তীর সন্ধ্যা ['কৃত্তিক্যন্ত প্রত্যভিজায় দিবালক্ষণসূচিতম্ । পুঙ্খবহুশেষং মেহাঙ্করা শ্রীতিরজারত' -- আদি ১০২], বনপর্বে কানীন পুত্রকে বণিরজুয়ার ভরিয়া জলে ভাসাইতে গিয়া কুন্তীর বিলাপ ও বাৎসল্য ['দত্তা সা প্রমদা বা স্বঃ পুত্রেষু করয়িততি । বস্ত্রাঙ্ক ভূষিতঃ পুত্র স্তনং পান্ত্রলি দেবজ ॥' —বন. ২৬২] উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু উদ্যোগপর্বে কুন্তী নিজের পুত্রদের অসম্মল আশঙ্কা করিয়াই কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিচরের নিকট যুদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভীতা হইলেন, কৌরব পক্ষের ভীষ্ম-দ্রোণের কথা চিন্তা করিয়া ভাবিলেন,—একমাত্র পাশপতি কর্ণই মোহবশত চুর্য্যভিপরায়ণ দুর্বোধনের অহুযতী হইয়া পাণবগণকে খেব করে। অতএব আজ তাহার নিকট বাইরা, বাহাতে পাণবদের প্রতি তাহার মন প্রশম হয়, তাহার চেষ্টা করিব, 'আশংসে স্বত কর্ত্ত মনোচ্ছং পাণবান্ প্রতি'। ইহারই ফল কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। এই সংবাদে কুন্তী আশ্বিনয়ারায়ণ তার কার্য করিয়াছেন, কর্ণের প্রতি ঐকান্তিক মেহ এখানে অল্পদৃষ্টান্ত, মেহ বাহা তাহা পাণবদের তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে কুন্তীর মধ্যে অপার স্বাক্ষরহেয় ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কর্ণের হুক্তি ও প্রত্যাশানোক্তি মহাভারতেরই প্রতিধ্বনি, কিন্তু একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা তাঁহার মেহবুদ্ধি :

এসো মেহময়ী
তোবার হৃদয় হস্ত সলাটে চিবুকে
রাখো কলকাল।

—এ ধরনের উক্তি মূল মহাভারতে নাই।

'স্নানকথন' কবিতার উৎস বনপর্বের সৌরভ-বৃত্তিক কাহিনী [বন, ১০৫-৬]।

মহাভারতের কাহিনী এখানে চলিয়া লাজানো। মহাভারতে আছে, কৃষিক এক-পুত্রক লোক রাজাকে দিয়া পুত্রবেশ বস্ত্র করাইয়া তাঁহাকে শতপুত্রের অধিকারী করিয়া তুলেন। বৈশ্বকর্মে হিংসাহেতু কৃষিক প্রত্যাচারভাগী হইয়া নরকে গমন করেন এবং রাজা লোক স্বর্গগমনের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু রাজা ঔদার্যবশে স্বীয় পুণ্যফল কৃষিকে অর্পণ করিয়া সমভাবে কৃষিকের সহিত নরক ভোগ করিয়া একলক্ষ গুহর সহিত মুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীতে নরকের বর্ণনা দিয়াছেন, নরকবাণী প্রেতগণের মৃত্যু-প্রীতির কথা বলিয়াছেন—এগুলি মহাভারতে নাই। তিনি শাস্ত্রীয় ধর্মার্থের দিক হইতে বিচার না করিয়া কাহিনীটিকে মানবধর্মের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, মানবধর্ম হইতে বিচ্যুত হওয়ার কৃষিক নরক ভোগ করিতেছেন, আর লোক মানবস্নেহবশতঃ স্বর্গের অধিকার লাভ করিয়াছেন। লোকের আশ্রয়ভাগের দৃষ্টান্ত উভয়স্থলেই উজ্জল রাখায় অস্বিকৃত। লোক বলেন,

পুণ্যান্ ন কাশ্যে লোকানুভেদং ব্রহ্মবান্ধিনম্,
ইচ্ছাম্যহমননৈব সচ বস্ত্রং সুরালয়ে ॥
নরকে বা ধর্মরাজ কর্মণামস্ত সমো হুহম্ ।
পুণ্যাপুণ্য ফলং দেব সমমস্তাবয়োরিহম্ ॥ [বন, ১০৬]

ভেমনি বলেন রবীন্দ্রনাথের লোক :

যতকাল কৃষিকের আছে পাণভোগ
ততকাল তার সাথে কর মোর যোগ,
নরকের সহবাসে দাও অমৃতমতি ।

রবীন্দ্রনাথে মহাভারত-চর্যা এক অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে ‘চিদ্ভাঙ্গনা’ নাট্যকাব্যে। মহাভারতে আছে, অর্জুন মণিপুররাজকন্যা চিদ্ভাঙ্গনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং মণিপুররাজের নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁহাকে জানান, বংশের নিয়মানুসারে চিদ্ভাঙ্গনাকে পুত্রিকা করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার বে পুত্র হইবে—সেই হইবে মণিপুত্রের বংশরক্ষক। অর্জুন এই স্তোত্র চিদ্ভাঙ্গনার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে চিদ্ভাঙ্গনার বস্ত্রবাসন নামে এক পুত্র হয়। অর্জুন তিন বৎসর মণিপুত্র থাকিয়া চিদ্ভাঙ্গনার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। মহাভারতে চিদ্ভাঙ্গনা প্রসঙ্গ অতি সংক্ষিপ্ত।

তন্ত চিদ্ভাঙ্গনা নাম হুহিতা চাক্ষর্যনা ॥

তাং দর্শ্য পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীঃ যদুজ্জয়া ॥

দৃষ্ট্৷ চ তাং বরায়োহাঃ চক্রে চৈত্রবাহনীম্ ॥ [আদি ২০৮]

এই কাহিনী-কল্পকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব প্রেমের বৃত্ত রচনা করিয়াছেন, এবং নারী সম্পর্কে তাহার বিশিষ্ট চিন্তাব্যবাস্যকে রূপায়িত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখাইতে চাহিয়াছেন রূপ-পরিচয় বশে নারীর যে পরিচয়, তাহা পুরুষের মালমালকে উদ্দীপিত করিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারে, কিন্তু প্রেম আপাইতে পারে না। বদনলহরে নারীর যে জয়, সে জয় নারী-জীবনের সার্থকতা বহন করে না। নারীর আসল রূপটি রহিয়াছে নারী-জন্মে। জন্ম-লৌক্যের সেই জ্যোতির্ময় আলোকেই নারীর স্বার্থ পরিচয়। সে লৌক্য অবিরল ভোগ নয়, তাহার সহিত দুঃখ, ভয়, লজ্জা, দুর্বলতাও জড়িত—এবং তাহাই প্রকৃত নারী-জন্ম। অপূর্ণতা বিনামো সেই ‘অনন্ত বহু’ জন্ম যেদিন পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হয়, সেইদিনই নারীর সার্থকতা। তাই অজ্ঞানের নিকট চিত্রাঙ্কন শেব নিবেদন :

আমি চিত্রাঙ্কন।

যেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি

নহি, অবহেলা করি পুষ্টি রাখিবে

গিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ

বোরে লক্টের পথে, ছুরছ চিত্তার

যদি অংশ হাও, যদি অহুসতি কর

কঠিন তত্ত্বের তব সহায় হইতে,

যদি হুখে হুখে বোরে কর লহরী

আমার পাইবে তবে পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথে চিত্রাঙ্কন শুধু নারী নয়, একটি নারী-তত্ত্ব।

॥ নির্ধারিত ॥

অনন্ত্য লোপামুদ্রা সংবাদ	৮১	এরিয়েটল	২২৫
অগ্নি পুরাণ	২,২৩৩	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৩৬
অমরবর্ণন হুক্ত	৫,১২,২১	কচ ও দেবদানী	৩৪৩,৩৮১
অভিভ্য ভেদাভেদ (ভক্ত)	১৭০-১৭৬	কঠোপনিষৎ	৪২
অৰ্ঘ্যবায়	৩৫	কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ	৩৮২
অৰ্ঘ্যশাস্ত্র	৫২	কণাদ	১১৮-১২০
অকুত আচার্য	৩২৮-২২	কপিল	১২৩
অধ্যাত্ম রায়ারণ	৩১৭-২০	কবি পুরাণ	২৬৮
অন্নবাহিনী	২৩২	কল্প-হৃত্ত	৫৫
অভিনন্দ	৩২৫	কামহৃত্ত (বাৎস্তায়ন)	৫৭
অভী: ময়	৩১-৩২	কালিকা-মঙ্গল	২৩৭
অরণ্যামী-হুক্ত	২২	কালী ভক্ত	১৮৫
অষ্টাধ্যায়ী	৫৩	কাশ্মীরায় দাস	৩৭৪-৭২
অক্ষ-হুক্ত	৮২	কুয়ালিল ভট্ট	১৩২
আপস	১৮৪	কুলার্ণবভট্ট	১৮৭
আগ্ন্যবগীশ কৃষ্ণানন্দ	১০৮	কর্মপুরাণ	২৬৫
আগ্ন্যবনী ও বিজয়া	২৮১	কৃষ্ণবাস	৩৩৬-২৭
আচার্য সায়ণ	১,৩,৪,৩০,৬৫,৬৬	কেনোপনিষৎ	৫০
আনন্দ লহরী	১৮২	কৌশলী শাখা	২৬
আত্মবেদ	৫৭	কৌশলীতকি ব্রাহ্মণ	৩৬
ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ	৪০	করপাঠ	৩
ইন্দ্র-রোহিত সংবাদ	৩৩	বিল হুক্ত	২
ঐশোপনিষৎ	৪৫	গরুড় পুরাণ	২৬৬
উত্তর মীমাংসা	১৩৬	গাঙ্গারবেদ	৫৮
উদা-হৈমবর্তী কাহিনী	৫০	গায়ত্রী মন্ত্র	৫,১২
উর্বশী ও পুরুষবা ৫ (পা) ৬,১৭,৮২-৮৬		ঐতিহ্যগোবিন্দ	২৮০
কব্	৪	গৃহ হৃত্ত	৫৬
কত	১২,৭৫	গোপথ ব্রাহ্মণ	৩৭
কবি	৪	গৌরব সংহিতা	১২৮

(II)

যোয, পিরিশচক্স	২৮০,৩০২,৩৭৩	জিয়ধু	১০
যোয. রাযামক (বৃদ্ধাবতার)	৩৩০	জাযক বয়	৫,১৪,৬৫
চতীমকল	২৩৪	কন্ত. মধুহন	৩৭২-৮০
চতুঃবেষ্টিকলা	৫২ (পাঠটীকা)	কর্তপানি	২৭
চক্রাবতী	৩২২-৩০	কশমহাবিত্তা	২৮৫
চাৰ্বাক কৰ্ণন	১৪৭-৫২	কানিক্তি	৬
চিহ্নাকলা	৩৮০-৮৪	কিকেন্দ্রলাল (রায়)	৩০৩
চিহ্নাকনি-নীতিতি	১২২	কুর্গাচরণ ভট্টাচার্য	২৭,২৭
ছন্দ	৪,৫৪	কুম্ব ও শকুন্তলা	৩৪২
ছান্দোপা উপনিষৎ	৪৭	দেবতা	৪
ছায়াময়ী	২৮৫	দেবী-হৃত	৫,১২,২৩
জগৎসার	৩৩০	ধনুর্বেদ	৫৮
জমক-বাক্যবদ্য সংবাদ	৪৭	নজরুল	২৪৩
জাবাল-সভ্যাকর	৪৮,৭৫	নন্দী, সভ্যাকর	৩২৫
জাবালি-সংবাদ	২২৮	নল-ধনুর্ভটী কাহিনী	৩৪৪-৪৬
জৈমিনী মহাত্মারত	৩৭২	নাট্যশাস্ত্র	৫৮-৫৩
জ্যোতিষ	৫৫	নাদভব	২২৩
ভাষ্য	১৮৪	নারদীয় পুরাণ	২৬১
ভর্কৃষ্ণাশি নন্দয়	২৮৪	নারায়ণী	৬,১২,৭৩
ভর্কৃষ্ণাশি, মধু-রানধ	১৫৫	নারদীয় হৃত	৬,১২-২০
ভর্কালংকার চন্দ্রকান্ত	১৫২-৫৩	নিষ্কৃতি	৭১,৭৭,৩০
ভট্ট-জীব	২১৩	নির্বাণ	২০০,২০২
ভদ্র	১৮৪	নিষার্ক	১৪৫
ভদ্রালোক	১৮২	নিরুক্ত	৫৪,৩০
ভদ্রসার	১৮৮	পকবজ	৭৪
ভপতী-সংবরণ কাহিনী	৩৪৪	পনি	৭৬
ভাগ্য ব্রাহ্মণ	৩৬	পদপাঠ	৩
ভারতভদ্র	১৮৫-৮৬	পদ্মপুরাণ	২৫৩
ভৈত্তিরীয় সংহিতা	২৩	পানিনি	৫৩

(III)

পাতকল বর্ণন	১২৮	বীরাচরন	২৮৪,
পাখতী	১৭৮	বৃহদ্বর্ষপুরণ	২৬৩, ৩১৩
শিকল ছন্দ	৫৫	বৃহদ্বারণ্যক	৪৫-৪৭
পুংস	১২৫-২৬	বৈকব সহজিয়া	২২৪
পুংস হৃত	৫, ১৮-১৯	ব্যালকুট	৩৬৩
পৃথিবী হৃত	৫, ৩২-৩৪, ৩৯	ব্রজাকনা	২৮৪
শৈশলান সংহিতা	২৭	ব্রহ্মপুরণ	২৫৩
প্রকৃতি	১২৪	ব্রহ্মবৈবর্ত	২৬৩-৬৪, ২৭২, ২৮০, ২৮১
প্রতিসর্গ	২৪৮	ব্রহ্মহজ্ঞ	১৩৬
প্রশকসারভঙ্গ	১৮৯	ব্রহ্মাণ্ড পুরণ	২৬৬, ২৬৮
প্রভাকর	১৩২	ব্রহ্মোদ্ভ	৬, ৩৫-৩৬, ১২০, ১০৪
বক-মুখিটির সংবাহ	৩৪৭	ব্রাত্য	৩৪, ৭৩
বজ্রচক্র	১৫৫, ১৫৮, ১৫৯-৬০	ভট্ট গুরুবর্মিল	২৭
বল্লোপাখ্যায় রাখালবাস	১৮১	ভট্ট ভবদেব	২৭
বল্লোপাখ্যায়, হেমচন্দ্র	২৮৪-৮৫	ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ	১৮১, ২০১, ২০৩
বরাহ পুরণ	১৬৪	ভবিক্তপুরণ	২৬৩
বরিস্তারহস্ত	১২০	ভাগবত পুরণ	২৬০
বহুবন্ধ	২০০	ভারতচন্দ্র	২৩৩
বহু, বগীন্দ্রবোহন	২১৫	ভাকর রায়	১২০
বহু, বনোবোহন	২৮৩	ভিক্ত	৭৩
বাক্সনের সংহিতা	২৩	ভোজ	৭৩
বারন পুরণ	২৬৫	বংত্র পুরণ	২৭৪
বালখিল্য হৃত	২	বধুলোক	১০
বার্হম্পত্য বর্ণন	১৫৬	বনসাবল	২৩৫
বারুপুরণ	২৬০	বঙ্গসংহিতা	৫৬
বিজ্ঞান-সঙ্গর সংবাহ	৩৪৬	বহুস্তর	২৫১
বিজ্ঞানবিনোদ, কীরোরপ্রসাদ	২৮৩, ৩৭২	বহানিবাণ তন্ত্র	১৮৬
বিকৃতিপাথ	১২৮	বার্কণ্ডের পুরণ	২৬২
বিকুপুরণ	২৫২	বাহ্যিক বর্ণন	২০০
বিহারীলাল	২৪৩-৪৪	বায়াবাহ	১৩৩

মুকুন্দ দাস	২৪০	শ্রীভঙ্গা বদল	২৩৭
মুকুন্দরায় কবিকল্পণ	২৩৫	শৌনক সংহিতা	২৭, ৩০
মেঘনাদবধকাব্য	৩৩৪-৩৫	শেতকেতু-আকুশি সংবাদ	৪৮
মৈত্রেরী-বাজবল্য সংবাদ	৪৫, ৪৬	শেতাখতর উপনিবৎ	৪৪
মহ-মর্জিকতা সংবাদ	৪২-৪৪	শ্রীঅন্নবিদ্য	২৩৫
মহ-মহী সংবাদ	৮৪-৮৫	শ্রীভাস	১৪১, ১৭১
মহাতি কাচিনী	৩৪৩	শ্রীমত্তবদগীতা	৩৪৮-৫০
মারল	১৮৪	শ্রীহৃত	২২
মাত ২ (পা), ৪৭৬, ৩০, ৩১		শ্রুতি	২
মুদ্রী	২২৬-২৭	মহীজিৎশংকর	১৩১
মোগলবাণী	৩২০-৩২	মল্লী বদল	২৩৭
মোগলচর	২০০	মল্ল্যাকর নন্দী	৩২৫-২৬
মোগলী বাজবল্য	১২৮	মল্ল্যজ	১৮৩
মাজিগত	৫, ১২, ২৩	মহল্লকর রাবণ	৩২৩-২৪
মাজিত	১১৮	মার্বভৌর, বাজ্জের	১৫৬
মাজিগলাং সেন	২৪১-৪২	মার্বাভিলক	১৩০
মাজিগত	১৪৫	মার্বাভিলক	২৪৩-৪৪
কর	৬৫	মুক্ত	৫
কর-গ্রন্থরা	৩৪১-৪২	মুকীহত	২২২-২৩
কোহিতহৃত	৬	মুকীহত	৫, ১৭
লিঙ্গ পুরাণ	২৬৪	সেন, কিতিবোহন	২১৭
লোকায়ত	১৪৬, ১৭৬	সেন, নবীনচন্দ্র	২৮৫
লঙ্কাকাব্য	১৮৩	সোমত	৬২
লতপথ ব্রাহ্মণ	৩৬, ৭৫ (পা)	সোম-সিতা	৩৮, ৮৩, ৮৪
লতকত্রি	৫, ৬৫	সৌন্দর্য লহরী	১৮৭.
লতপদাবলী	২৪০-৪৩	কল্প পুরাণ	২৬৫
লতানন্দভরজিনী	১১৮	স্বামী নিগমানন্দ	১৫৮
লতী বক্শিয়ারজন	১৪১	হঠযোগ প্রদীপিকা	১২৮
লতী হরপ্রসাদ	২০১	হরিবংশ	৩৭১-৭২
লব সংহিতা	১২৮	হলাধ্ব, ভট্ট	৩৭, ৩৮
লিঙ্গাশ্র	৫৩	হংসবলী বক্	৫
লিঙ্গোদগি, বদ্বাণ	১২২, ১৫৫, ১৫৬	হিরণ্যগর্তহৃত	৫, ১৩-২০

। গ্রন্থপঞ্জী ।

আচার্যশঙ্কর ও রামায়ণ :

আবাকের পরিচয় :

অবেদ লিখিতা [২য় সং] :

ঐতিহাসিক রহস্য :

কাব্যালোক :

পোশাজবহু কেমোশিণ জেক্‌চার :

পোর্থ বিজয় :

পৌড়ের ইতিহাস [১ম, ২য়] :

জানসাগর [আলিয়ারা] :

চার্বাকধর্ম

চিন্নর বহু :

জীবনীকোষ [পৌরাণিক] :

তত্ত্বকথা :

তত্ত্ব-পরিচয় :

ধানের বহুরী :

জয়ী :

কব্জালোক ও সোচন :

নাথশব্দ :

পূজা-পার্বণ :

পূর্ববঙ্গ গীতিকার [৪র্থ খণ্ড, ২য়] :

বহ্নিমন্ত্রের উপভাস :

বহুভাষা ও সাহিত্য :

বাঙলা বহুলকাব্যের ইতিহাস :

বাঙলার বাউল :

বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা :

বাঙালীর ইতিহাস :

বাঙালীর ইতিহাস [১ম, ২য়] :

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম, ২য়, ৩য়] :

বেহালা গ্রন্থাবলী. ৩ :

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ডঃ হুদীরহুবার দাশভূক্ত

রমেশচন্দ্র বসু

রামদাস সেন

ডঃ হুদীরহুবার দাশভূক্ত

চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী প্রকাশিত

রজনীকান্ত চক্রবর্তী

আবুলকরিম সাহিত্য বিশারদ

দক্ষিণারজন শাস্ত্রী

কিত্তিরোহন সেন

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

চিন্তাধরণ চক্রবর্তী

হুদয় শাস্ত্রী

হুদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ শশিভূষণ দাশভূক্ত

কালিদাস ভট্টাচার্য ও হুদয়

সেনগুপ্ত সম্পাদিত

শ্রীকল্যাণী বসু

যোগেশচন্দ্র দাস বিদ্যানিধি

কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বোহিডলাল হুদয়দাস

দীপেশচন্দ্র সেন

ডঃ আভতোষ ভট্টাচার্য

কিত্তিরোহন সেন

ডঃ শ্রীহুদার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ নীহাররজন দাস

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ হুদয় সেন

কিন্দাস বসু

- | | |
|---|------------------------------------|
| ৩১. বেদক কল্যাণিকা : | কংগ্রেস বাথ বিশ্ব |
| ৩২. বৌদ্ধের দেবতাবাদী : | ঐতিহাসিকভাবে ভাটনাভ |
| ৩৩. বৌদ্ধের ও জৈনধর্মিত্ব : | ডঃ পশুপতিলাল দাসগুপ্ত |
| ৩৪. ভারতের শক্তিসাম্প্রদায় ও শাক্যসাংঘাতিকতা : | ডঃ পশুপতিলাল দাসগুপ্ত |
| ৩৫. ভারতবর্ষীয় উপানিষদ সমগ্র [২য়] : | অক্ষয়চন্দ্র সরকার |
| ৩৬. হারবার্ট [হারবার্টসম্মেলন] : | ঐতিহাসিকভাবে বহু |
| ৩৭. শাক্যসাংঘাতিকতা ও শক্তিসাম্প্রদায় : | ঐতিহাসিকভাবে বহু |
| ৩৮. ঐতিহাসিক অর্থনীতিবিদ : | ডঃ পশুপতিলাল দাসগুপ্ত |
| ৩৯. নব্যজৈন ধর্মতত্ত্ব : | বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী |
| ৪০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে দেখানো [১ম, ২য়] : | নরেন্দ্রনাথ সান্যাল ও ডঃ |
| | হরীচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী |
| ৪১. হারবার্ট [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] : | নৃত্যনন্দন চক্রবর্তী |
| ৪২. বিষ্ণু যন্ত্রপরিমাণ | প্রবন্ধনাথ মুখোপাধ্যায় |
| ৪৩. A History of Ancient Sanskrit Literature : | F. Maxmuller |
| ৪৪. A History of Indian Literature : | A. Weber |
| ৪৫. A History of Indian Literature : | M. Winternitz |
| ৪৬. An Introduction to Indian Philosophy : | Dr. S. C. Chatterjee & D. M. Mitra |
| ৪৭. Cambridge History of India : | E. J. Rapson |
| ৪৮. Eastern Lights : | Mahendranath Sircar |
| ৪৯. Early History of the Vaishnava faith and movement in the 18th Century : | Dr. S. K. De |
| ৫০. History of Indian Philosophy : | Balvalkar and Banerjee |
| ৫১. Literary History of India : | R. W. Fraser |
| ৫২. Obscure Religious Cults : | Dr. S. B. Dasgupta |
| ৫৩. Original Sanskrit Texts [O. S. T.] : | Muir |
| ৫৪. Pre-historic Ancient & Hindu India : | B. D. Banerjee |
| ৫৫. Principles of Tantra : | A. Avalon |
| ৫৬. Rigveda Samhitā : | Edw. F. Maxmuller |
| ৫৭. Sadhanamala : | Binyotosh Bhattacharyya |
| ৫৮. The Oxford History of India : | V. A. Smith |
| ৫৯. The History of Philosophy—Eastern & Western Vol I : | Dr. S. Balakrishnan |
| ৬০. The story of Philosophy : | Will Durant |
| ৬১. The Religion of Man : | Satishchandra Tagore |

